পূর্ব পার্বতী

প্রফুল্ল রায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স
প্রাইভেট লিমিটেড।
কলিকাতা ১২

প্রথম প্রকাশ—ভাদ্র, ১৩৬৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ—মাঘ, ১৩৬৫

প্রকাশক—শচীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

১৪ বঙ্কিম চাটুজ্জে স্ট্রীট

কলিকাতা-১২

মুদ্রাকর—ক্ষীরোদচন্দ্র পান

নবীন সরস্বতী প্রেস

১৭ ভীম ঘোষ লেন

কলিকাতা-৬

প্রচ্ছদপট পরিকল্পনা

আশু বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রচ্ছদপট মুদ্রণ

ভারত ফোটোটাইপ স্টুডিও

বাঁধাই—বেঙ্গল বাইণ্ডার্স

আট টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

অগ্রজপ্রতিম

শ্রীসাগরময় ঘোষ

পরম শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের কথা

আমি উপন্যাসে ভূমিকার পক্ষপাতী নই। কিন্তু কোন কোন ক্ষেত্রে ভূমিকা অপরিহার্য। 'পূর্ব পার্বতী' এ রকম একটি ক্ষেত্র।

ভারত সীমান্তের নাগা উপজাতির জীবনযাত্রা ভিত্তি করে এই উপন্যাস রচিত হয়েছে।

নাগাদের মধ্যে গোষ্ঠী এবং বংশগত অসংখ্য ভাগ ও ভেদ রয়েছে। নানা ভাষা এবং উপভাষার প্রচলন আছে। সমাজব্যবস্থা, উৎসব এবং ধর্মাচরণের আনুষঙ্গিক রীতিও সর্বত্র এক নয়। তা সত্ত্বেও সামগ্রিক ভাবে (স্বল্পসংখ্যক শিক্ষাপ্রাপ্ত ছাড়া) সকল শ্রেণীর নাগার মধ্যে আদিম বন্য চরিত্রের উপাদান-গুলি মূলতঃ অভিন্ন। লালসা, প্রতিহিংসা, তীব্র রতিবোধ, হিংস্রতা প্রভৃতি প্রবণতাগুলির প্রকাশভঙ্গিতে তেমন কোন তফাত নেই।

নাগাভূমি। সংখ্যাতীত পাহাড়মালা, দুর্গম অরণ্য, নদী-জলপ্রপাত-ঝরনা-মালভূমি-উপত্যকা দিয়ে ঘেরা সীমান্তের এই দেশটি সমতলের বাসিন্দাদের কাছে অপরিসীম বিস্ময়ের বিষয় হয়ে রয়েছে। শ্বাপদসঙ্কুল এই দেশটিতে মানুষের জীবন কি রকম, তাদের সমাজ কোন নীতিতে চলে, কৌলিক ও সামাজিক আচার আচরণ—এ সব সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নেই।

নাগা পাহাড়ের নিসর্গরূপ অপূর্ব। ভীষণ এবং সুন্দরের এমন সার্থক স্বচ্ছন্দ মিশ্রণ ভারতের অন্য কোথাও আছে কি না সন্দেহ।

নাগাদের জাতীয় জীবনের প্রাথমিক ইতিহাস বর্ণাঢ্য। যূথচারী মানুষগুলির গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে, বংশে বংশে সংঘাত, প্রতিহিংসা, নারী ও ভূমি আয়ত্ত করার উত্তেজনায় প্রতিটি মুহূর্ত রোমাঞ্চকর। এদের উৎপত্তি সম্বন্ধে প্রচুর রূপকথা ও উপকথা ছড়িয়ে আছে।

কিন্তু গত কয়েক দশকের ইতিহাস শুধু বর্ণময়ই নয়, বেগবানও। ইংরেজদের অভিযান; খ্রীষ্টান মিশনারী, সমতলের বেনিয়া ও সামরিক কর্মচারীদের দৌলতে সভ্যতার আলো এবং অন্ধকার আসা; জাতীয় চৈতন্যের উন্মেষ; গাইডিলিও আন্দোলন; দ্বিতীয় মহাসমর; স্বাধীনতা; ফিজোর অভ্যুত্থান—নাগা পাহাড়ে প্রতিটি মুহূর্তে উন্মাদনা, নিমেষে নিমেষে দৃশ্যপট পরিবর্তন।

সময়ের চতুর কারসাজি সত্ত্বেও নাগামনের মৌলিক বৃত্তিগুলি এখনও বিশেষ বিকৃত হয় নি।

'পূর্ব পার্বতী' জাতিতত্ত্বের গবেষণা নয়; নাগাদের কাম-লালসা-হিংসা, ন্যায়-অন্যায়-বোধ এবং জীবনের দ্রুত পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে ইতিহাসভিত্তিক উপন্যাস।

নাগাদের অগণ্য গোষ্ঠীগুলির মধ্য থেকে একটিকে বেছে নিয়ে তাদের অখণ্ড এবং সমগ্র জীবনবোধকে এই উপন্যাসে রূপ দেওয়া হয়েছে।

সুবৃহৎ আয়তন এবং সাধারণের ক্রয়ক্ষমতার দিকে লক্ষ্য রেখে গ্রন্থটিকে দু'টি স্বয়ংসম্পূর্ণ পর্বে প্রকাশ করার ব্যবস্থা হয়েছে। বর্তমানে প্রথম পর্বটি প্রকাশিত হ'লো।

শুধু পাদপ্রদীপের জলুসই নয়, নেপথ্যের আয়োজনটুকু পাঠকসমাজে জানানো প্রয়োজন।

এই গ্রন্থ রচনার প্রথম প্রেরণা দিয়েছিলেন অগ্রজপ্রতিম শ্রীসাগরময় ঘোষ। নাগা পাহাড়ে পাঠানো থেকে শুরু করে উপন্যাসটির নামকরণ এবং প্রতিটি ছত্রে তাঁর স্নেহ ও আন্তরিকতার প্রীতিপ্রদ উত্তাপ অনুভব করি। তাঁর সঙ্গে আমার সম্পর্ক সম্পাদক-লেখকের গণ্ডি পেরিয়ে ঘনিষ্ঠতা বিচারের বহু মাপকাঠি ডিঙিয়ে গিয়েছে। আমার সাহিত্যিক জীবনে তাঁর অফুরন্ত উৎসাহের উৎস হয়ে থাকার কথাটি স্মরণ করে ঋণ পরিশোধের দুঃসাহস করবো না।

এর পরেই যাঁর নাম করতে হয়, তিনি শিলংয়ের শ্রীহেমন্তকুমার গুপ্ত। হেমন্তবাবু আমার শ্রদ্ধাভাজন। এই একনিষ্ঠ সাংবাদিক ও নির্যাতিত দেশপ্রেমীর কাছে গ্রন্থটির জন্য অজস্র অমূল্য উপকরণ এবং পরামর্শ পেয়েছি। এ প্রসঙ্গে তাঁর পরিবারের প্রতিটি ব্যক্তির সস্নেহ সহৃদয়তা ও শিলংয়ের কয়েকটি অপরূপ দিন তাঁদের মধ্যে কাটাবার কথা মনে রেখে কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি।

আমার পরম শ্রদ্ধাস্পদ সুসাহিত্যিক শ্রীভবানী মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্তর ঋণ এই সূত্রে স্বীকার করি।

লামডিংয়ের শ্রীপ্রাণবল্লভ তালুকদার ও তাঁর পরিবার, ডিমাপুরের শ্রীমহাদেব কাকতি, কোহিমার শ্রীডেকা, শ্রীসেনগুপ্ত, মোককচঙের

শ্রীমথুরপ্রসাদ সিংহ, মিঃ সেমা, মিঃ আও, মিঃ গ্রীয়ারসন এবং ইম্ফলের শ্রীথম্বাল সিং, শ্রীগিরিধারী ফুকন, শ্রীগোস্বামী ও শ্রীসত্যকিঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বিচার সহায়তার কথা উল্লেখযোগ্য।

সেই তিনটি পাহাড়ী সর্দার, যারা দিনের পর দিন, রাতের পর রাত আমাকে তাদের জীবনকথা, রূপকথা, উপকথা এবং অসংখ্য উপাদান যুগিয়ে 'পূর্ব পার্বতী' রচনা সম্ভব করেছে, তাদের কাছে আমার ঋণ পর্বত-প্রমাণ। এই সঙ্গে সেই নাম-প্রকাশে-অনিচ্ছুক দোভাষী বন্ধুটি এবং আবাল্য সুহৃদ শ্রীচিন্ময় ভট্টাচার্য ও শ্রীঅর্ধেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহয়তার কথা স্মরণ করি।

'দেশ' পত্রিকায় এই গ্রন্থ প্রকাশকালে যে সকল সহৃদয় পাঠক-পাঠিকা পত্র দিয়ে আমার উৎসাহ বর্ধন করেছিলেন, নানা কারণে স্বতন্ত্রভাবে তাঁদের উত্তর দেওয়া সম্ভব হয় নি। এই সুযোগে ত্রুটির মার্জনা চেয়ে তাঁদের ধন্যবাদ জানাই।

'বেঙ্গল পাবলিশার্সে'র কর্তৃপক্ষ 'পূর্ব পার্বতী'-কে সুরুচিশোভন করে প্রকাশ করার ব্যাপারে যে যত্ন নিয়েছেন, সে জন্য এবং ভবিষ্যতের কথা ভেবে কৃতজ্ঞতার পালা শুরু এবং শেষ করলাম।

বাটানগর
২০শে ভাদ্র ॥ ১৩৬৪

প্রফুল্ল রায়

এই লেখকের অন্যান্য গ্রন্থ

সিন্ধুপারের পাখি

নাগমতী

দূরের বন্দর

তাসের মিনার

নতুন দিন

অন্তরঙ্গ

রূপসীর মন

১।

এক

পাহাড়ী উপত্যকা। ভেরাপাঙ্ গাছের ছায়াতল দিয়ে বিশাল একটা চড়াই-এর দিকে উঠে গিয়েছে। ভেরাপাঙ্ আর জীম্‌বো গাছ। ঘনবদ্ধ। পাহাড়ের তামাভ মাটি থেকে কণা কণা প্রাণ সঞ্চয় করে উদ্দাম হয়ে উঠেছে এই অরণ্য। মাঝে মাঝে সাঙ্‌লিয়া লতার ছায়াকুঞ্জ। যেখানেই একটু রন্ধ্র পেয়েছে, সেখানেই পাথুরে মাটি চৌফালা করে মাথা তুলেছে আখুশি আর খেজাঙের ঝোপ। আতামারী লতা সাপের মত বেয়ে বেয়ে উঠে গিয়েছে খাসেম গাছের মগডালে।

উদ্দাম বন। কাঁটালতার জটিল বাঁধনে বাঁধনে কুটিল হয়ে রয়েছে। রোদ, বৃষ্টি আর অবারিত বাতাস থেকে স্বাস্থ্য আহরণ করে উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে।

পাহাড়িয়া অরণ্য। ভয়াল আর ভয়ঙ্কর। এতটুকু ফাঁক নেই, এতটুকু রন্ধ্র নেই। শুধু মৃত্যুর মত আশ্চর্য এক হিমছায়া নিথর হয়ে রয়েছে তার পাঁজরের নীচে। সবুজ আর সবুজ। একটা তরঙ্গিত সবুজ সমুদ্র স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে পাহাড়ী ডাইনীর কুহকে।

ভীষণ এই পাহাড়িয়া বন। তবু মেশিহেঙ্ ঝোপের বাহারী ফুলে এই নিষ্ঠুর বন্যতার মধ্যে কিছুটা স্নেহের আভাস পাওয়া যায়। কিছুটা শান্তি আছে সোনু গাছের নরম নরম মুকুলে।

অনেক দূরে বৃত্তাকারে বাঁক নিয়েছে টিজু নদী। ঘন নীল জল। রাশি রাশি পাথরের বাধাকে কলোল্লাসে মাতিয়ে মাতিয়ে, ফেনার ফুলকি ফুটিয়ে ফুটিয়ে বাঁকে বাঁকে হারিয়ে গিয়েছে। এখান থেকে নীল হাঁসুলির একটা চকিত ঝিলিকের মত মনে হয় টিজু নদীকে। এই পাহাড়ী বনের কোথায় কোন খাড়াই টিলার ওপর থেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে নামছে জলপ্রপাত। কোথায়ও বা সাপেথ্ কুঞ্জের পাশ দিয়ে শব্দহীন ঝরনা রেখার আঁকিবুকি টেনে নীচের দিকে মিলিয়ে গিয়েছে। দূরের ঐ টিজু নদীর উচ্ছ্বাস, অজানা প্রপাতের এই কল-কল উল্লাস—এগুলিই এই পাহাড়ী বনের হৃৎপিণ্ড হয়ে অহরহ বেজে চলেছে।

শীতের রোদে মধুর আমোদ আছে। আর সেই রোদই সোনালী আমেজের মত ছড়িয়ে পড়েছে উপত্যকার ওপর। সবুজ সমুদ্রটা রোদের অকৃপণ সোনা মেখে রূপময় হয়ে উঠেছে।

ওপরে অবারণ আকাশ। তার নীল রঙে আশ্চর্য ক্রূরতা। কোথায়ও দু এক টুকরো মেঘের ভ্রূকুটি ভেসে বেড়াচ্ছে। অনেক উঁচুতে পাহাড়ের চড়াইটা ঘিরে এখনও সাদা কুয়াশার একটা চিকন রেখা স্থির হয়ে রয়েছে।

বাঁ দিকে অবিন্যস্ত ওক্ বন আর আপুফু গাছের জটিল জটলা। সহসা তার মধ্য থেকে ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো দুটি বন্য মানুষ। ঘন তামাভ গায়ের রঙ। বিশাল বুকে, অনাবৃত বাহুসন্ধির দিকে থরে থরে পেশীভার উঠে গিয়েছে। স্ফীত নাক, মোটা মোটা ঠোঁট। আর ভাসা ভাসা দুটি পিঙ্গল চোখের মণিতে আদিম হিংস্রতা। কানের ওপর দিয়ে সারা মাথায় চক্রাকার রেখা টেনে চুল কামানো। খাড়া খাড়া উদ্ধত চুল; দুটি কান আর ঘাড়ের ওপর কিছু কিছু ছড়িয়ে পড়েছে। বিরাট থাবায় দুজনেই মুঠো করে ধরেছে জীম্‌বো পাতার মত তীক্ষ্ণমুখ বর্শা। মোটা মোটা আঙুলের মাথায় খরধার নখের মুকুট। বর্শার লম্বা বাঁশে সেই নখগুলি স্থির হয়ে বসেছে। সারা মুখে দাড়ি-গোঁফের চিহ্নমাত্র নেই। গাল, চিবুক আর গলার রাজ্য থেকে তাদের নির্মূল করা হয়েছে। সচ্ছিদ্র কানে পিতলের গোলাকার গয়না। সারা দেহ অনাবরণ। একজনের কোমরের চারপাশে হাতখানেক চওড়া পী ম্যুঙ্ কাপড়। গাঢ় কালো রঙের প্রান্তে ঘন লালের আঁকিবুকি। পরিষ্কার কৌমার্যের সঙ্কেত। আর, একজনের পরনে জঙগুপি কাপড়; একেবারে জঙ্ঘার সীমানায় নেমে এসেছে। গাঢ় নীল রঙের ওপর চারটে সাদা সাদা দাগ। সেই সাদা দাগের আড়াআড়ি চারটে লাল রেখা আঁকা। বিবাহিতের পরিচয়। সেই সঙ্গে বোঝা যায়, মানুষটা প্রিয়জনদের অনেকগুলো ভোজ দিয়ে জঙগুপি বস্ত্রের সম্মান অধিকার করেছে।

সামনেই একটা বাদামী রঙের বিশাল পাথর। চারপাশে পাংশু ঘাসে পাহাড়ী রুক্ষতা। ঘাসের পাতায় পাতায় রাত্রে শিশির ঝরেছিল। সে শিশির কণা কণা শুভ্র আর নিটোল মুক্তার মত জমে বরফ হয়ে গিয়েছিল। আবার সূর্যের নতুন উত্তাপে এখন গলে গলে টলটলে জলবিন্দু হয়ে গিয়েছে। রুক্ষ পাহাড়ী ঘাসের ওপর ফাটা ফাটা পায়ের চিহ্ন এঁকে বাদামী পাথরের ওপর এসে দাঁড়ালো দুজন।

শীতের হিমাক্ত বাতাস উঠে আসছে টিজু নদীর ওপার থেকে সাঁ সাঁ করে ঝাঁপিয়ে পড়ছে ওক্ আর ভেরাপাঙ্ গাছের জঙ্গলে। সেদিকে একবিন্দু ভ্রূপাত নেই পাহাড়ী মানুষ দুটির। এতটুকু মনোযোগ নেই।

দুজনে একবার চোখাচোখি হলো।

একজন বললো, "কী রে সেঙাই, কোনদিকে যাবি। এদিকে সুবিধে হবে না, মনে হচ্ছে।"

সেঙাই এতক্ষণ তার শী ম্যুঙ্ কাপড়ে একটা শক্ত গিঁট দিয়ে নিচ্ছিল। গম্ভীর গলায় এবার সে বললো, "হু। তাই মনে হচ্ছে। একটা কানা হরিণ পর্যন্ত নজরে আসছে না। এক কাজ করা যাক, ঐ টিজু নদীর দিকে চল্ যাই রেঙকিলান। সম্বর কি চিতাবাঘ পাবোই ওদিকে।"

একবার চমকে উঠলো রেঙকিলান। গলাটা তার কেঁপে কেঁপে উঠলো, "কিন্তু ওদিকে তো সালুয়ালাঙ বস্তী। আমাদের শত্রুপক্ষ। ওরা দেখলে একেবারে কিমা বানিয়ে ছাড়বে দুজনকে।"

দু চোখের পাত্র ঘৃণায় ভরে উঠলো সেঙাই-এর, "কেলুরি বস্তীর নাম তুই ডুবিয়ে দিবি টিজু নদীতে! বিয়ে করে একটা ছাগী হয়ে গিয়েছিস রেঙকিলান।"

"কী বললি!" রেঙকিলানের দুটি পিঙ্গল চোখে হত্যা ঝিলিক দিয়ে উঠলো, "আমি ভীতু হয়ে গিয়েছি! আমি ছাগী বনে গিয়েছি!"

"হু, হু। ছাগী না, একটা টেফঙ (পাহাড়ী বানর) হয়ে গেছিস।" নির্বিকার গলায় বললো সেঙাই, "আপোটিয়া (তুই মর)।"

খিস্তিটা নিঃশব্দে পরিপাক করলো রেঙকিলান; তারপর সেঙাইর দিকে তাকালো। দুটি চোখ থেকে তার পিঙ্গল আগুন বেরিয়ে আসছে। কিন্তু আশ্চর্য শান্ত গলায় সে বললো, "চল্, কোন্ চুলোয় যাবি।"

সেঙাই সামনের দিকে বর্শাসমেত হাতখানা প্রসারিত করে দিল, "হুই টিজু নদীর দিকে—"

"বেশ।" জঙগুপি কাপড়ের গোপন গ্রন্থি থেকে একটা বাঁশের চাঁচারি বের করলো রেঙকিলান। তারপর আড়াআড়ি করে দুটি ঠোঁটের মধ্যে রেখে শব্দ করে উঠল। সেই তীক্ষ্ণ শব্দের তরঙ্গ প্রতিধ্বনিত হতে হতে উপত্যকার ওপর দিয়ে খাড়াই প্রান্তের দিকে মিলিয়ে গেল। একটু পরেই সেই একই শব্দ পাহাড়ের শীর্ষ থেকে বাতাসের ওপর তরঙ্গিত হতে হতে ভেসে এলো। রেঙকিলানের শব্দটি সঙ্কেত। পরের শব্দটি উত্তর।

সেঙাই বললো, "তা হলে ওঙলেরা ঠিক এসেছে।"

"হু। আর দেরি করে লাভ নেই। চল্। ওরা ঠিক দূর পাহাড় দিয়ে আসবে।"

বাদামী পাথরটার ওপর থেকে দুজনে ভেরাপাঙ গাছের নিবিড় অরণ্যে ঢুকলো। মাথার ওপরে পাতার নিশ্ছেদ ছাদ। রোদ আসার একটুকু ফাঁক নেই। নাগা পাহাড়ের এই ঘন বনে সূর্যের প্রবেশ নিষিদ্ধ। নীচে আশ্চর্য হিমাক্ত ছায়া। মাঝে মাঝে বাঘনখের আঁচড়ের মত ফালি ফালি পথ। চারপাশে কাঁটালতা ঝুলছে। খুগু পাতারা দুলছে। আর উদ্দাম হয়ে উঠেছে বুনো কলার বন। ঋতুমতী পৃথিবী এই নাগা পাহাড়ের উপত্যকায় অকৃপণভাবে সুশ্যাম জীবন উপহার দিয়েছে।

পাহাড়ী ঘাস। কোথাও কোমরসমান উঁচু, কোথাও হাঁটু পর্যন্ত। ওক্ আর জীম্‌বো গাছের ফাঁক দিয়ে এগিয়ে চলেছে সেঙাই আর রেঙকিলান। বার বার কাঁটালতার আঘাত লাগছে। তামারঙ দেহ থেকে রক্তরেখা ফুটে বেরিয়েছে। সেদিকে একবিন্দু ভ্রূক্ষেপ নেই।

মাথার ওপরে আকাশ নেই। শুধু ওক্ আর ভেরাপাঙ পাতার নীরন্ধ্র ছাদ প্রসারিত হয়ে রয়েছে।

মাঝে মাঝে বুনো মৌমাছির ঝাঁক উড়ে যাচ্ছে। লাফিয়ে লাফিয়ে গাছের আড়ালে মিলিয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী বানরের দল। পাহাড়ী ঘাসের ওপর দূরে দূরে মাথা তুলেই আউ পাখিরা অদৃশ্য হচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে লাল রঙের শানিলা পাখিদের। অস্বাভাবিক লম্বা তাদের ধূসর রঙের ঠোঁট। গাছের শাখায় শাখায় ঠোঁট দিয়ে ঠকঠক শব্দ করছে থারিমা পতঙ্গেরা।

পাহাড়ী বনের বাধা ছিঁড়ে ছিঁড়ে এগিয়ে চলেছে সেঙাই আর রেঙকিলান। মাঝে মাঝে বাঁশের চাঁচারিতে তীব্র-তীক্ষ্ণ শব্দ করছে রেঙকিলান। সঙ্গে সঙ্গে আগের মতই বাতাসে দোল খেতে খেতে ভেসে আসছে তার উত্তর। পাহাড়ের দূর সীমা ধরে তাদের অনুসরণ করে চলেছে ওঙলেরা।

নাগাদের মধ্যে শিকারের একটি প্রথা আছে। শিকারীরা ঘন বনের মধ্যদেশ দিয়ে শিকারের সন্ধানে এগিয়ে যাবে। আর দুজন মানুষ বহু দূরে পাহাড়ের প্রান্ত বেয়ে বেয়ে তাদের খাবার নিয়ে অনুসরণ করবে। বাঁশের

চাঁচারিতে শব্দ তুলে দু দলের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করা হয়। এবং উভয় দলের অবস্থিতি বুঝিয়ে দেওয়া হয়।

আচমকা একটা খুঙগুঙ গাছের মগডাল থেকে একটা পাহাড়ী ময়াল সাপের বাচ্চা আছড়ে এসে পড়ল ঘাসবনের ওপর। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল সেঙাই আর রেঙকিলান। একটিমাত্র মুহূর্ত। তারপরেই সেঙাইর বর্শাটা আকাশের দিকে উঠে গেল। সেই হিমছায়ার মধ্যেও ঝিকমিক করে উঠলো খরধার ফলাটা। সেঙাইর ঠিক পাশেই রেঙকিলান। তার চোখেও পিঙ্গল ঝিলিক।

কিন্তু আশ্চর্য! সেঙাই-এর বর্শাটা আকাশের দিকেই স্থির হয়ে রইলো। চক্ষের নিমেষে ময়ালের বাচ্চাটা একটা কালো বিদ্যুতের রেখা এঁকে সাপেথ কুঞ্জের আড়ালে পলাতক হলো।

প্রথম শিকার। তা-ও ফসকে গেলো। সেঙাই তাকালো রেঙকিলানের দিকে। রেঙকিলানের চোখও তার দিকেই নিষ্পলক হয়ে রয়েছে। আর দুজনের দৃষ্টিতেই পৃথিবীর সমস্ত সন্দেহ কপিশ দুটি মণির আকার নিয়ে স্থির হয়ে আছে। সেঙাই ভাবছে, কোন অনাচার করে নি তো রেঙকিলান কি তার বউ? রেঙকিলান ভাবছে, শিকারে আসার আগে অপবিত্র কোন কাজ করেছে কি সেঙাই? কলুষিত করেছে দেহমনকে? কেউ কোন কথা বললো না। দুজনের দৃষ্টিই বিস্ফারিত। শুধু একটি সন্দেহের ঢেউ ফুলে ফুলে উঠছে দুজনের চেতনায়। সেই সঙ্গে একটা সর্বনাশা ইঙ্গিত মনের মধ্যে চমক দিয়ে উঠেছে। তবে কি, তবে কি রিখুস প্রেতাত্মা ময়াল সাপের মূর্তি ধরে এসেছিল!

কয়েকটি মুহূর্ত। আবার এক সময় টিজু নদীর দিকে পা বাড়িয়ে দিল সেঙাই। তার পেছন পেছন রেঙকিলান। একটি কথাও বলছে না কেউ। সেঙাইও নয়, রেঙকিলানও নয়। শুধু অজানা জলপ্রপাতের অবিরাম কলকল শব্দ শোনা যাচ্ছে। দুজনে ভাবছে, আজ রাত্রেই আনিজার নামে মুর্গী জবাই করে উৎসর্গ করতে হবে।

এক সময় মাথার উপর ঘন পাতার ছাদ শিথিল হয়ে এলো। এবার টুকরো টুকরো আকাশের নীলাভা নজরে আসছে। বাঘনখের আঁচড়ের মত ফালি ফালি পথে, কোমরসমান পাহাড়ী ঘাসের ওপর জাফরিকাটা রোদ এসে পড়েছে।

অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে দুজনে। এখান থেকে টিজু নদীর খরধারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। শীতের টিজুতে বর্ষার সেই দুর্বার যৌবন নেই। এখানে সেখানে রাশি রাশি পাথরের কঙ্কাল আত্মপ্রকাশ করেছে। তবু ভৈরব গর্জনে পাথরের চাঁইগুলোর ওপর আছড়ে আছড়ে পড়ছে ঘন নীল জল। আক্রোশের মত ছিটকে ছিটকে বেরুচ্ছে ফেনার ফুলকি।

বিশাল একটা নিখাঙি গাছের তলা দিয়ে টিজু নদীর কিনারায় চলে এলো সেঙাই আর রেঙকিলান। সামনে রোদমাখা উপত্যকাটা নজরে আসছে। টিজু নদীর খরনীল দেহে সোনার রেখার মত এসে পড়ছে শীতের রোদ।

শেষবারের মত বাঁশের চাঁচারিতে শব্দ তুললো রেঙকিলান। আর সঙ্গে সঙ্গে ওঙলেদের উত্তর ভেসে এলো।

সহসা আনন্দিত একটা আওয়াজ করে উঠলো রেঙকিলান, "হুই—হুই—দেখ। দেখেছিস?"

"কী? কোথায়?" ফিরে তাকালো সেঙাই।

"হুস্-স্-স্-স্, আস্তে।" সেঙাই-এর সরব কৌতূহলের ওপর যতি টানলো রেঙকিলান, "সম্বর। কানা না কী! হুই যে নদীর ওপারে।"

এবার সত্যিই দেখলো সেঙাই। একটা মেশিহেঙ ঝোপের আবডাল থেকে টিজু নদীর দিকে মাথাটা প্রসারিত করে দিয়েছে সম্বরটা। চলমান জলের আয়নায় নিজের রূপ দেখতে দেখতে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রাণীটা। বাঁকা বাঁকা শিঙ; শান্ত, স্নিগ্ধ দুটি চোখ। খয়েরী দেহে সাদা সাদা চক্র।

সেঙাই বললো, "আস্তে। একটা শিকার ফসকেছে। খুব সাবধান। এটাকে মারতেই হবে। দূরের বাঁকটা ঘুরে নদী পার হই আয়।"

"দূরের বাঁকে যাবো কেন?"

"সাধে কি বলি, বিয়ে করে একেবারে ছাগী হয়ে গেছিস! এখান দিয়ে পার হলে দেখতে পাবে না! আমাদের দেখলে তোর বাড়ি ভোজের নেমন্তন্ন নেবার আশায় বসে থাকবে! খুব বাহাদুর! এই বুদ্ধিতে শিকারী হয়েছিস!" কণ্ঠ থেকে তাচ্ছিল্য ঝরলো সেঙাইর।

"হয়েছে, হয়েছে। ফ্যাকফ্যাক করিস না। চল্ হুই বাঁকের দিকে।" নরম গলায় বললো রেঙকিলান। আর মনে মনে সেঙাই-এর খাসা বুদ্ধির তারিফ করলো। সত্যিই তো! এ কথাটা তো তার মগজে উঁকি মারে নি!

বাঁকের মুখ অনেকটা সমতল। টিজু নদী এখানে অনেকটা শান্ত। কাঁচের মত স্বচ্ছ জলে নানা রঙের রাশি রাশি পাথর। কোমরসমান স্রোত ডিঙিয়ে ওপারে চলে এলো দুজনে। তারপর আখোকিয়া গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে মেশিহেঙ ঝোপটার পাশে এসে দাঁড়ালো।

সেঙাই তাকালো রেঙকিলানের দিকে। আর সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত টিজু নদীর উদ্দাম নীল স্রোতকে চমকিত করে মেঘ গর্জন করে উঠলো। টিজু নদীর আর্শিতে শিউরে উঠলো সম্বরের মুগ্ধ ছায়া। মেঘ গর্জায় নি, বাঘ ডেকেছে।

চকিত গলায় রেঙকিলান বললো, "চিতাবাঘ।"

হিসহিস করে উঠলো সেঙাই, "খুব সাবধান।"

তার পরেই পলকপাতের মধ্যে ঘটে গেল ঘটনাটা। এক ঝলক বিদ্যুতের মত সম্বরটার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো একটা চিতাবাঘ। সঙ্গে সঙ্গে বর্শাটা আকাশের দিকে তুলে ধরলো সেঙাই। তীক্ষ্মমুখ ফলাটায় মৃত্যু ঝিলিক দিয়ে উঠলো। পেশীর সমস্ত শক্তি কব্জির মধ্যে কেন্দ্রিত করে বর্শাটা ছুঁড়ে মারলো সেঙাই। কিন্তু তার আগেই সম্বরটাকে পিঠের ওপর তুলে মেশিহেঙ ঝোপের আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে চিতাবাঘটা। আর সেঙাই-এর বর্শাটা সাঁ করে একটা খাটসঙ গাছের কাণ্ডে গেঁথে গিয়েছে।

তীব্র গতিতে ঘুরে দাঁড়ালো সেঙাই, "কী রে, বর্শা লাগলো না যে চিতাবাঘের গায়ে!"

"তার আমি কী জানি। লাগাতে পারিস নি, তাই বল।"

"কাল রাত্রে বউর কাছে শুয়েছিস, আর সেই কাপড়ে নিশ্চয়ই উঠে এসেছিস! তা না হলে শিকার ফসকে যাচ্ছে কেন?" সেঙাইর দু চোখে কুটিল সন্দেহ, "ইজা রামখো!"

"বাজে কথা। কাল তো আমি মোরাঙে গিয়ে শুয়েছিলাম। এক কাজ করি আয়, চিতাবাঘটা বেশী দূর যেতে পারে নি এখনও। আশেপাশেই আছে। সাবধানে খুঁজে বের করি চল্।" একটু থামলো রেঙকিলান। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, "আমার একটা সন্দেহ হচ্ছে, কাল শুয়োর মারিস নি তো সেঙাই?"

"কী বললি?" গর্জন করে উঠলো সেঙাই, "নে রিহুগু (তোকে বাঘে খাক), কাল সারাদিন আমি মোরাঙ থেকে বেরিয়েছি?"

শিকারের আগের রাত্রে নাগারা স্ত্রীর সঙ্গে সহশয্যা রচনা করে না। যারা

অবিবাহিত, তারা শুয়োর হত্যা করে না। এ রাত্রিটা তাদের কঠোর শুচিতা দিয়ে ঘেরা। শিকারীরা এ রাত্রে গ্রামের মোরাঙে এসে বিছানা বিছায়। তাদের বিশ্বাস, কলুষিত দেহমন নিয়ে শিকারে বেরুলে অসফল হয়ে ফিরতে হয়। বনদেবীর অভিশাপ এসে পড়ে। রিখুস প্রেতাত্মা কুপিত হন তাদের ওপর। বনদেবীর অভিশাপ আর রিখুস প্রেতাত্মার কোপ বড় ভয়াল। সে অভিশাপ আর কোপ পাহাড়ে পাহাড়ে দাবাগ্নি ছড়িয়ে দেয়। তাতে ছারখার হয়ে যায় সমস্ত নাগা পৃথিবী।

এক সময় রেঙকিলান বললো, "দেরি করতে হবে না। চল্। আবার চিতাটা না ভেগে পড়ে।"

"চল্।"

খাটসঙ্ গাছের কাণ্ড থেকে বর্শাটাকে খুলে নিল সেঙাই। কোমরে বাঁশের লম্বা খাপ ; তার মধ্যে ফলাটাকে ঢুকিয়ে দিল সে। তারপর মেশিহেঙ ঝোপটাকে পাশে রেখে পাহাড়ী ঘাসের ওপর নিঃশব্দ পা ফেলে এগিয়ে যেতে শুরু করলো। সামনে সেঙাই। পেছনে রেঙকিলান। তাদের দেহ-মনের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো ধনুকের ছিলার মত প্রখর হয়ে উঠেছে। তাদের ঘ্রাণ-কান-দৃষ্টি আর স্নায়ুরা অতিমাত্রায় সচেতন। সন্দেহজনক একটুমাত্র শব্দে চমকে উঠছে দুজনে।

সহসা থমকে দাঁড়ালো রেঙকিলান। তারপর জঙগুপি কাপড়ের গ্রন্থি থেকে বাঁশের চাঁচারি বের করে তীক্ষ্ণ শব্দ করে উঠলো। সে শব্দটা টিজু নদীর ওপারে বনময় উপত্যকাটার ওধারে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়লো! কিন্তু আশ্চর্য! ওঙলেদের উত্তর এবার ভেসে এলো না। আবারও শব্দ করলো রেঙকিলান। এবারও ওঙলেরা নিরুত্তর।

রেঙকিলান তাকালো সেঙাইর দিকে। দেখলো, সেঙাই তারই দিকে তাকিয়ে রয়েছে। তার পিঙ্গল চোখে এবার আর বিদ্যুৎ নেই। কেমন যেন নিভন্ত দেখাচ্ছে সেঙাইকে।

আচমকা রেঙকিলান চিৎকার করে উঠলো ; আতঙ্কে তার গলাটা থর-থর করে কাঁপছে, "কী সর্বনাশ! হাঃ—আঃ—আঃ—।"

"চুপ, একেবারে চুপ। আমিও দেখেছি। আয়, দুই আড়ালে লুকোই।" রেঙকিলানকে টানতে টানতে একটা কাঁটাময় খেজাঙ ঝোপের মধ্যে চলে এলো সেঙাই। খেজাঙ পাতার জানালা দিয়ে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে এবার।

বুকসমান পাহাড়ী ঘাস সরিয়ে ভেরাপাঙ্‌ গাছের ফাঁক দিয়ে ত্বলতে ত্বলতে এগিয়ে আসছে একদল নাগা। মাথায় হুণ্টসিঙ পাখির পালক গোঁজা। ত্বচোখে আদিম হিংস্রতা। মুঠিবদ্ধ বর্শার ফলাগুলো পাহাড়ী ঘাসের ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে এসেই আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। এরা সব সালুয়ালাঙ গ্রামের মানুষ। সেঙাইদের শত্রুপক্ষ।

খেজাঙের কাঁটাঝোপে নিঃশ্বাস রুদ্ধ করে উবু হয়ে বসেছে সেঙাই আর রেঙকিলান। তামাভ দেহ খরকাঁটার আঘাতে আঘাতে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে। চিতাবাঘের সন্ধানে কখন যে একেবারে সালুয়ালাঙ গ্রামের মধ্যে এসে পড়েছে ত্বজনে, খেয়াল ছিল না। সারা দেহের ওপর রাশি রাশি সরীসৃপ কিলবিল করছে। এতটুকু নড়ছে না কেউ। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন পর্যন্ত থেমে গিয়েছে যেন। নিথর হয়ে গিয়েছে ত্বজনে। শরীরী নিশ্চেতনার মত দাঁড়িয়ে রইল ত্বটি তামাভ পাহাড়ী মানুষ।

খেজাঙ ঝোপের কাছাকাছি এসে পড়েছে মানুষগুলো। হাতের মুঠিতে তীক্ষ্ণধার বর্শা। পরনে সকলেরই পী ম্যুঙ্‌ কাপড়। কৌমার্যের নির্দেশ। সহসা দাঁড়িয়ে পড়লো মানুষগুলো। তারপর অনাবৃত বুকের ওপর চাপড় মেরে চিৎকার করে উঠলো একসঙ্গে, "হো-হো-ও-ও-ও-ও—"

"হো-ও-ও-য়া-য়া-য়া—"

সে চীৎকারে পাহাড়ী অরণ্য চমকে উঠলো। শিউরে উঠলো টিজু নদীর নীল ধারা। আর খেজাঙের ঝোপে ত্বটি হৃৎপিণ্ডে তীব্র আতঙ্কে রক্ত ফেনিয়ে ফেনিয়ে উঠতে লাগলো। নিঃশ্বাস জলদ্‌ হয়ে বাজতে লাগলো।

"হো-ও-ও-ও-ও—" স্বরগ্রাম আরো তীক্ষ্ণ হচ্ছে, প্রখর হচ্ছে।

এই মানুষগুলোও শিকারে বেরিয়েছে। তাদের চীৎকারে ভীত শব্দ করে উড়ে যাচ্ছে খুণ্ড পাখির ঝাঁক, উড়ে যাচ্ছে লোটেম্যু আর শানিলা পাখির দল।

এখনও সেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে সালুয়ালাঙের মানুষগুলো। মাঝে মাঝে সতর্ক চোখে এদিক সেদিক তাকাচ্ছে। আর সহসা, সহসাই সেঙাইর অস্ফুট স্মৃতির মধ্যে দোল খেয়ে উঠলো একটা রক্তাক্ত অতীতের কাহিনী। যে অতীতের বর্শা এই সালুয়ালাঙ আর তাদের কেলুরি গ্রাম ত্বটিকে টিজু নদীর ত্ব-পারে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছে। যে অতীত টিজু নদীর ত্বদিকে একটি অনিবার্য শত্রুতার জন্ম দিয়েছে।

কিংবদন্তীর মত অসত্য। তবু টিজু নদীর দু-পারে সালুয়ালাঙ আর কেলুরি—এই পাহাড়ী জনপদ দুটির প্রতিটি মানুষের ধমনীতে একটা বিষাক্ত রক্তকণার মত মিশে রয়েছে সে অতীত। সে অতীতের কাহিনী সেঙাই শুনেছে কেলুরির প্রাচীনতম মানুষটির মুখে। শীর্ণ দুটি হাঁটুর মধ্যে ধূসর মাথাখানা গুঁজে বুড়ো খাপেগা বলেছিলো। আর মোরাঙের জোয়ান ছেলেরা খাপেগার চারপাশে বৃত্তাকারে ঘন হয়ে বসে ছিলো।

বুড়ো খাপেগা কেলুরি গ্রামের সর্দার। আশ্চর্য মনোরম তার গল্প। কথার সঙ্গে উত্তেজনার মদ মিশিয়ে সে মোরাঙের জোয়ান ছেলেদের মাতাল করে তুলেছিলো। সেদিন আকাশে ছিলো ক্ষয়িত চাঁদ। নাগা পাহাড়ের খাড়া উপত্যকায় রহস্যময় জ্যোৎস্না ছড়িয়ে পড়ছিলো। সেই জ্যোৎস্নার সঙ্গে খাপেগার কাহিনী মিশে এক বিচিত্র প্রতিক্রিয়া ঘটে গিয়েছিলো সেঙাইয়ের চেতনায়। সেই সঙ্গে বোধ হয় আর সব কঠিনপেশী জোয়ানদেরও।

খাপেগা সর্দার বলতে শুরু করেছিলো, "সেই দিনটা এমনই ছিলো সু খুঙতার (ক্ষয়িত চাঁদের) রাত্রি। হু, হু, তা কত বছর আগের ব্যাপার ঠিক মনে নেই। তবে সেদিন আমার চুল এমনি আখুশি পাতার মত হেজে যায় নি। গায়ে জোর ছিলো বাঘের মত। সেই রাত্তিরে হুই সেঙাইর ঠাকুরদা এসে ডাকলো আমাকে। তখন এই মোরাঙ ছিল টিজু নদীর কিনারে। রাত্রে শুয়ে ছিলাম। এদিকে সেদিকে চিতার ডাক। বুনো মোষের ঘোঁতঘোঁতানি। টানডেন্‌লা পাখির চিৎকার। পেছনের খেজাঙ ঝোপ থেকে জেভেথাঙ ফিস-ফিস করে ডেকেছিলো আমাকে।..."

রূপকথার মত অপরূপ সে কাহিনী। খাপেগার গল্প মোটামুটি এইরকম।

টিজু নদীর দু-পাশে ওক্ বন আর ভেরাপাঙের ছায়ায় সেদিন সালুয়ালাঙ কি কেলুরি গ্রামের চিহ্নমাত্র ছিলো না। এই দুটি গ্রাম মিলিয়ে সেদিন ছিলো এক অখণ্ড জনপদ। তার নাম ছিলো কুরগুলাঙ। টিজু নদীর দুধারে এক উপত্যকা থেকে দূরের পাহাড়চূড়া পর্যন্ত ছিলো কুরগুলাঙের বিস্তার।

নদীর এপারে ছিলো জোহেরি বংশ। ওপারে পোকরি বংশ। দুটি বংশই সমাজকে সবগুলো ভোজ খাইয়েছে। নগদা উৎসবে মোষ বলি দিয়েছে। ভাল্লুক উৎসর্গ করেছে টেটুসে দেবতার নামে। দু বংশের প্রাচীনতম মানুষ দুইটি গ্রামের পেনেসেঙ্গু (পুরোহিত)। এই দুই বংশের বর্শার প্রতাপে সমস্ত গ্রামের সম্মান নির্বিঘ্ন। সমস্ত গ্রামের ইজ্জত অক্ষুণ্ণ। দু বংশের মধ্যেই

একটা আন্তরিকতার সেতু পাতা রয়েছে। সেই সেতু টিজু নদীর দুটি কিনারাকে যুক্ত করে দিয়েছিল। সেই সেতু টিজু নদীর দু-পারে দুটি বংশের হৃদয়ে পারাপার হবার অন্তরঙ্গ যোগপথ। জোহেরি আর পোকরি বংশ। দুইয়ে মিলিয়ে এক অখণ্ড সত্তা।' একটি বংশ আর একটি বংশের সম্পূরক। জা কুলি উৎসবের দিনে কি নতুন ফসল তোলার মরসুমে টিজু নদী পার হয়ে আসত পোকরি বংশের প্রাচীনতম মানুষটি। জোহেরি বংশের প্রবীণ মানুষটির পাশে নিবিড় হয়ে বসে পরামর্শ করতো। বাঁশের পানপাত্রে রোহি মধু। কাঠের বাসনে ঝলসানো বনমুরগী আর একমুঠো নুন। আর বড় টঘুটুঘোটাঙ পাতায় কাঁচা তামাক দিয়ে তাকে অভ্যর্থনা করা হতো পাহাড়ী প্রথামত। আবার গ্রামে নতুন মোরাঙ রচনার দিনে জোহেরি বংশের প্রবীণ মানুষটি নদী পার হয়ে ওপারে যেতো। বাইরের ঘরে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে মনের কপাট খুলে দিতো। ফিসফিস গলা। কিন্তু একটিমাত্র স্থির লক্ষ্য। কুরগুলাঙ গ্রামের মোরাঙ যেন দু বংশের আভিজাত্যে আর মহিমায় অপরূপ হয়ে উঠতে পারে। মোরাঙই হলো গ্রামের মর্যাদা, গ্রামের প্রতিষ্ঠার স্বাক্ষর। বাঁশের পানপাত্রে তামাটে ঠোঁট ঠেকিয়ে দুজনেই ধূসর মাথা নাড়াতো।

আকাশে বিলীয়মান পূর্ণিমার ক্ষয়িত চাঁদ। খাপেগার কণ্ঠ পর্দায় পর্দায় চড়ছিল। আশ্চর্য উত্তেজক এক প্রতিক্রিয়া ছড়িয়ে ছড়িয়ে দিচ্ছিলো তার কথাগুলি। সুদূর উপত্যকায় ভেরাপাঙের বনকে ভৌতিক মনে হয়েছিলো। ঘন কুয়াশার স্তর নেমে এসেছিলো দূরতম আকাশ থেকে, থরে থরে ঝরছিলো পাহাড়ী অরণ্যে। সব মিলিয়ে সেঙাইএর অর্ধস্ফুট পাহাড়ী মনটা একটু একটু করে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছিলো।

খাপেগা বলেছিলো, "হালচাল ভালোই চলছিলো। আচমকা যেন পাহাড়ের তলায় ভূমিকম্প শুরু হলো। জোহেরি আর পোকরি—দু বংশের যে এত পিরীত, সব সেই ভূমিকম্পের দোলায় একশ ফালা হয়ে গেলো। এই যে সেঙাই, ওর ঠাকুরদা ছিলো আমার স্যাঙাৎ। তার নাম জেভেথাঙ। সে এই জোহেরি বংশের ছেলে। আর নদীর ওপারে পোকরি বংশের মেয়ে নিতিৎসু। এই দুজনকে নিয়েই ফাটল ধরলো দু বংশে······"

জোহরি বংশের ছেলে জেভেথাঙ। মাথার চারপাশ দিয়ে গোলাকার আর নিখুঁত করে কামানো চুল। কানের লতায় পিতলের নিয়েঙ্ গয়না; সেই গয়না থেকে লাল রেশমের গুচ্ছ দোদুল দুলছে। উজ্জ্বল তামাভ দেহে থরে থরে

পেশীভার। পরনে ওক্ ছালের লেঙ্‌তা। কড়ির বাজুবন্ধ। ছোট ছোট চোখে নিশ্চিত ঘাতনের ঝিলিক। হাতের থাবায় হাতখানেক লম্বা বর্শার ফলা। আর পোকরি বংশের মেয়ে নিতিৎস্থ। গলায় ছোট ছোট শঙ্খের মালা। মণিবন্ধে কড়ির কঙ্কণ। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। সোনালী স্তনচূড়া। পিঙ্গল চুলের গুচ্ছে টঘুটুঘোটাঙ ফুল। কোহিমা থেকে তার বাপ এরি কাপড় এনে দিয়েছিল। কোমরের চারপাশ ঘিরে জঙ্ঘার ওপর পর্যন্ত সেই শৌখিন আবরণ ঝিকমিক করে।

জেভেথাঙ আর নিতিৎস্থ। জোহেরি আর পোকরি বংশ। টিজু নদীর এপার আর ওপার। গ্রীষ্মের এক নির্জন দুপুর। মেশিহেঙ্‌ ঝোপের পাশ দিয়ে নিয়তবাহী এক ঝরনা। নিঃশব্দ। শুধু আশ্চর্য করুণ আর ছলছল এক জলধারা। তার পাশেই জোহেরি আর পোকরি বংশের দুই যৌবন প্রথম মুখোমুখি হলো। জেভেথাঙ দেখলো নিতিৎস্থকে। নিতিৎস্থর পিঙ্গল চোখের মণিতেও একটি পরিপূর্ণ পাহাড়ী যৌবনের ছায়া পড়েছে। সে ছায়ার নাম জেভেথাঙ।

আবিষ্ট চোখে তাকিয়ে ছিলো জেভেথাঙ। তার বন্য চোখ দুটিতে এক মুগ্ধ আনন্দ ঝিলিক দিয়ে দিয়ে যাচ্ছিলো। আর নিতিৎস্থর দৃষ্টি একটু একটু করে ক্রূর হয়ে উঠছিলো।

এক সময় পুলকিত গলায় জেভেথাঙ বলেছিলো, "কী নাম তোর?"

"নিতিৎস্থ। নাম বললাম, যা এবার ভাগ্।"

"আজ থেকে তুই আমার আসাহোয়া (বন্ধু) বনে যা।"

"কী?" ময়াল সাপের মত নির্মম চোখে তাকালো নিতিৎস্থ, "জানিস, আমি পোকরি বংশের মেয়ে?"

"আমিও জোহেরি বংশের ছেলে। আমার নাম জেভেথাঙ।"

এবার নরম হলো নিতিৎস্থ। কোমল গলায় বললো, "না, তা হবে না। আমার সোয়ামী ঠিক হয়ে গিয়েছে। ছুই নান্‌কোয়া বস্তী। পাহাড়ের ছুই উধারে। সেই বস্তীর মেজুর বংশের ছেলে রিলোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। আর কোনো মরদের সঙ্গে আমি বন্ধুত্ব পাতাবো না। তাহলে আনিজা গোঁসা হবে। যা, এবার ভাগ্।"

"ইস্, ভাগলেই হলো!" নিশ্চিন্ত পদক্ষেপে পাহাড়ের উতরাই বেয়ে নেমে আসতে শুরু করলো জেভেথাঙ, "আয়, আয়। বিয়ে হলেই হলো রিলোর

সঙ্গে! আমি থাকতে রিলো কেন? এই কুরগুলাঙে এলে রিলোর মাথা নিয়ে নেবো। বর্শা দিয়ে সেই মাথা ফুঁড়ে মোরাঙে নিয়ে ঝোলাবো। হু-হু।"

সাঁ করে একটা খর দামিনীর মত ঘুরে দাঁড়িয়েছিলো নিতিংস্থ। ঝরনার পাশেই পড়ে ছিলো একটা লোহার মেরিকেতসু, (নাগা রমণীর অস্ত্র)। চকিতে তুলে নিয়ে সেটা ছুঁড়ে মারলো জেভেথাঙের দিকে। মেরিকেতসুর আঘাতে কপালটা চৌফালা হয়ে গেলো জেভেথাঙের। ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো খানিকটা তাজা পাহাড়ী রক্ত।

"আ-উ-উ-উ—" আর্তনাদ করে মেশিহেঙ ঝোপের ওপরে লুটিয়ে পড়লো জেভেথাঙ। কপিশ ভ্রূদুটোকে ভিজিয়ে রক্তের ধারা বুকের দিকে নেমে গেলো তার।

কয়েকটি মুহূর্ত। চেতনাটা কেমন শিথিল হয়ে গিয়েছিলো। স্নায়ুর ওপর দিয়ে গুটস্থঙ পাখির ডানার মত একটা কালো পর্দা নেমে এসেছিলো। অন্ধকার সরে গেলো। লাফিয়ে উঠে পড়লো জেভেথাঙ। একহাত লম্বা বর্শাটা মুঠোর ওপর তুলে নিলো সে। তারপর চনমন চোখে চারিদিকে তাকালো। শব্দহীন ঝরনার কিনারায় নিতিংস্থ নামে কোন যুবতীর ছবি নেই। একটা পাহাড়ী বনবিড়াল হয়ে সে যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। একটা খ্যাপা বাঘের মত গর্জন করে উঠলো জেভেথাঙ, "আচ্ছা, আবার দেখা হবে।"

জোহেরি আর পোকরি বংশের যৌবন প্রথম দিনের শুভদৃষ্টি শেষ করেছিল এইভাবে। সেই শুভদৃষ্টি নির্মম স্বাক্ষর এঁকে রেখে গিয়েছিলো জেভেথাঙের কপালে। তার স্মৃতিকে অক্ষয় করে রেখেছিলো সেই ক্ষতচিহ্ন।

আশ্চর্য রহস্যময় গলায় খাপেগা বলেছিলো, "রাত্রে মোরাঙে শুতে এলো জেভেথাঙ। তামুন্যুর (চিকিৎসক) কাছ থেকে কপালে আরেলা পাতার প্রলেপ দিয়ে এসেছে। সকলে চমকে তাকালাম। ব্যাপারখানা কী?"

জেভেথাঙ আস্তে আস্তে বলেছিলো, "একটু বাইরে আয় তো খাপেগা। আচ্ছা থাক। তোরা সবাই শোন্।"

জেভেথাঙের চারপাশে ঘন হয়ে বসেছিলো সকলে।

এই মোরাঙ। গ্রামের সব অবিবাহিত জোয়ান ছেলেদের শোয়ার ঘর। কুরগুলাঙ গ্রামে দুটো মোরাঙ ছিলো। একটা টিজু নদীর ওপারে। আর একটা এপারে।

উত্তেজিত গলায় নিঃশব্দ ঝরনার পাশে নির্জন দুপুরের সেই কাহিনীটি

বলে গিয়েছিলো জেভেথোঙ। একটি নিথর মুহূর্ত। তারপরেই মোরাঙ কাঁপিয়ে শোরগোল উঠেছিলো। পাহাড়ের উপত্যকায় সে শোরগোল ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রির হৃৎপিণ্ডকে ফালা ফালা করে দিয়েছিলো। আকাশে হয়ত চমকে উঠেছিল মীনপুচ্ছ উল্কারা, শিউরে উঠেছিলো নির্বাসিত ছায়াপথের রেখা।

খাপেগা বলেছিলো, "লাফিয়ে উঠলাম আমি। সারা কুরগুলাঙ বস্তির মধ্যে সবচেয়ে তাগড়া জোয়ান ছিলাম আমিই। সে সব দিন আর নেই আমার। মানুষের মাথা কেটে এই মোরাঙের দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখাই ছিলো আমাদের সবচেয়ে বড় খেলা। সে সব খেলার রেওয়াজ আজকাল উঠে যাচ্ছে। বড় আপসোস হয়।" জীর্ণ দেহটা কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এসেছিলো প্রাচীন মানুষ খাপেগার, "যাক্ সে কথা। আমার নাম খাপেগা। জানিস তোরা আমার নামের মানে?"

সেঙাই বলেছিলো, "জানি। খাপেগা মানে যে মানুষ দুটো শত্রুর মাথা কেটেছে।"

"ঠিক তাই। যেতে দে ও কথা। তারপর কী হলো বলি।" খাপেগা আবার বলতে শুরু করেছিলো, "তখন আমাদের জোয়ান রক্ত। চারদিকে একবার তাকালাম। জেভেথোঙের ফাটা মাথার চারপাশে উবু হয়ে বসেছে নিয়োনো, নড্রিলো, গ্যিহেনি, এমনি অনেকে। আমি বললাম, ঠিক আছে। জেভেথোঙের ফাটা মাথার বদলা পোকরিদের তিনটে মাথা চাই।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ। তারপরেই মোরাঙ-ফাটানো চিৎকার উঠেছিলো। নড্রিলোরা একসঙ্গে স্বরগ্রাম মিলিয়েছে, "হু—উ—উ—উ—য়া—য়া—আ—আ—পোকরিদের তিন মাথা চাই।"

সে চিৎকার টিজু নদীর নীল ধারার ওপারে বনময় পাহাড়ে ধেয়ে গিয়েছিল।

কিন্তু আশ্চর্য! শান্ত গলায় জেভেথোঙ বলেছিলো, "তিনটে মাথা নিশ্চয়ই নেবো। কিন্তু তার আগে নিতিৎসুকে চাই।"

খাপেগা বলেছিলো, "কী সর্বনাশ! ওই শয়তানীকে নিয়ে কী করবি?"

"বিয়ে করবো।"

মোরাঙের নীচে পাহাড়ী পৃথিবীটা যেন আর একবার দুলে উঠেছিলো।

আবার খানিকটা চুপচাপ। তারপরেই সকলের টুকরো টুকরো কথা মিলে একটা জটিল স্বরজাল বোনা হয়েছিল, "হু—উ—উ—উ—য়া—আ—আ—হু-হু; হুই শয়তানীকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে নিয়ে আসবো। বিয়ে হবে তারপর।"

তীব্র শোরগোল, "হু-হু, একটা পেত্নী, নিতিৎসুটা একটা পেত্নী।"

নড্রিলো বলেছিল, "তোর বাপ এই বস্তির পয়লা সর্দার। তাকে একবার জানানো দরকার ; কী বলিস জেভেথাঙ?"

"হু হু।" গোল করে কামানো মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিয়েছিলো সকলে।

পরের দিনের সকাল। রাশি রাশি পাহাড়ের ওপারে, বর্মার চেন্দুইন থেকে সূর্য উঠেছে। তার কনক রোদ থরে থরে ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ী উপত্যকায়।

খাপেগা আর জেভেথাঙ মোরাঙ থেকে বেরিয়ে চলে এসেছিলো টিজু নদীর পারে। সরাসরি চোখে জেভেথাঙ তাকিয়েছিলো খাপেগার দিকে, "কী রে, আমি যাবো নিতিৎসুদের বস্তীতে?"

"তুই একটু দাঁড়া। আমি নিতিৎসুর শোয়ার ঘরখানা দেখে আসি। রাত্তিরে তুই সেই ঘরে যাবি। যদি রাজী না হয়, বর্শা দিয়ে গেঁথে নিয়ে আসবো।" টিজু নদীতে চমক দিয়ে তীব্র গলায় হেসে উঠেছিলো খাপেগা, "কী রে, সাহসে কুলোবে তো! না, আমাকেও তোর সঙ্গে নিতিৎসুর ঘরে যেতে হবে রাত্তিরে! আমি গেলে কিন্তু বখরা দিতে হবে।"

"থাম থাম। মেলা বকর বকর করতে হবে না। যাবি আর আসবি।"

একটু পরেই ফিরে এসেছিলো খাপেগা। মুখখানা তার ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে। চোখের কোণে কোণে ঝিলিক মেরে যাচ্ছে একটা অনিবার্য পূর্বাভাস ; একটা সর্বনাশা ইঙ্গিত।

একটা খাশেম গাছের আড়াল থেকে রুদ্ধশ্বাসে দৌড়ে এসেছিলো জেভেথাঙ, "কী রে, কী ব্যাপার? দেখে এসেছিস?"

"হু।" মাথা নেড়েছিলো খাপেগা, "কিন্তু সাবধান! ওপারের মোরাঙে জোয়ানরা বর্শায় শান দিচ্ছে, দেখে এলাম। আমি যেতে কটমট করে তাকালো।"

"আচ্ছা"—

অসহ্য উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠেছিলো খাপেগা, "মাগী একটা টেফঙের বাচ্চা, একটা পাহাড়ী পেত্নী। সব বলে দিয়েছে নিতিৎসু। আগে থেকে ওরা তৈরী হচ্ছে। কিন্তু আমাদের মোরাঙের মান রাখতে হবে। নদীর ওপার থেকে

মাথা আমাদের চাই-ই। আর, আর আজ রাত্তিরেই নিতিৎসুর শোয়ার ঘরে তোর যেতে হবে।"

"যাবো।" শরীরের সমস্ত পেশীগুলো ধনুকের ছিলার মত টঙ্কার দিয়ে উঠেছিলো জেভেথাঙের। তীক্ষ্ণ গলায় সে বলেছিলো, "হু-হু, এপারের মান রাখতেই হবে।"

বুড়ো খাপেগা একমুঠো কাঁচা তামাকপাতা মুখে পুরে, খকখক কেশে আবার শুরু করেছিলো, "এর আগেই জেভেথাঙ বিয়ে করেছে। একটা ছেলে হয়েছে। সেই ছেলেই সেঙাইর বাপ। কিন্তু নিতিৎসুকে দেখে মজে গিয়েছিলো জেভেথাঙ। তাই এই বিপত্তি। জানিস তো ; পাহাড়ী মানুষ আমরা, হাতের মুঠোয় লম্বা বর্শাটা যার ধরা রয়েছে শক্ত করে; এই পাহাড় আর এই জোয়ান মেয়েমানুষের দুনিয়াদারি তারই। যাক, সে কথা এখন নয়। আসল গল্প শোন্—"

দুপুরের দিকে নড্রিলো গিয়েছিলো জেভেথাঙের বাপের কাছে। তারপর রসিয়ে রসিয়ে নিতিৎসু-জেভেথাঙের কাহিনীটা বলে তার মুখের দিকে তাকিয়েছিলো, "এবার তুই কী করতে বলিস সর্দার ?"

ভারি তরিবতের লোক। একটা হুজুগের আমোদ পেলে আর রেহাই নেই। জেভেথাঙের বাপ বলেছিলো, "ঠিক আছে। ওই মেয়েই চাই। আর একটা ছেলের বউ আসবে ঘরে। এ বেলাই আমি মেয়ের পণ পাঠিয়ে দিচ্ছি।" বিকেলের দিকে জেভেথাঙের পিসী বউ-পণ দেবার জন্যে একশটা বর্শা, পিতল আর কড়ির শৌখিন গয়না, কোহিমা থেকে কেনা এণ্ডি কাপড় নিয়ে টিজু নদীর ওপারে চলে গিয়েছিলো। সঙ্গে চলনদার গেলো নড্রিলো আর গ্যিহেনি। জোহেরি আর পোকরি বংশের মধ্যে একটা মনোরম সেতুযোগের প্রস্তুতি। কিন্তু সন্ধ্যার একটু আগে, বেলাশেষের আকাশ থেকে যখন রাশি রাশি সোনালী কুহক ছড়িয়ে পড়েছে পাহাড়ী উপত্যকায়, ঠিক সেই সময় ফিরে এলো জেভেথাঙের পিসী। নড্রিলো আর গ্যিহেনির কাছ থেকে কন্যাপণের বর্শা আর শৌখিন গয়না সব ছিনিয়ে রেখে দিয়েছে, টিজু নদীর ওপারের মানুষগুলো। আর নিতিৎসুর জ্যেঠা শাসিয়ে দিয়েছে, এপারের লোক ওপারে গেলে আস্ত মুণ্ড নিয়ে ফিরে যেতে হবে না। ধারালো নখের তর্জনীটা তুলে সে হিসহিস করে উঠেছিলো, "খুব সাবধান, নিতিৎসুর

সঙ্গে তোদের জেভেথাঙ কথা বলেছে, এই বর্শা আর কাপড়-গয়না রেখে তার দাম নিলাম। রামখোর বাচ্চারা, এদিকে আর আসিস না জানের মায়া থাকলে।”

সব শুনে গর্জন করে উঠেছিলো জেভেথাঙের বাপ। সে গর্জনে শিউরে উঠেছিলো কুরগুলাঙ গ্রামের হৃৎপিণ্ড। একটা উদ্দাম তুফানের মত ছুটে এসেছিলো সে মোরাঙে। তারপর বুকের ওপর প্রচণ্ড একটা চাপড় মেরে চিৎকার করে উঠেছিলো, “ইজাহাণ্টসা সালো! আ—ও—ও—ও—ও—য়া—আ—আ—আ—”

পরিচিত সঙ্কেত। ওক্ বন, ভেরাপাঙের জঙ্গল, মেশিহেঙের ঝোপ—পাহাড়ী অরণ্যের দিগ্‌দিগন্ত থেকে ঝড়ের মত ছুটে এসেছিল জোয়ান পুরুষেরা। ঐ চিৎকারের মধ্যে একটা অনিবার্য ইঙ্গিত রয়েছে। জোয়ান ধমনীতে ধমনীতে পাহাড়ী রক্ত দাবাগ্নির মত জ্বলে উঠেছিল। আদিম অরণ্যের আহ্বান। হত্যা তাদের ডাক দিয়েছে। বর্শার ফলায় ফলায় এই হত্যার ঘোষণাকে তারা ছড়িয়ে দেবে টিজু নদীর ওপারে।

জেভেথাঙের বাপের চোখ দুটো যেন দু টুকরো আগ্নেয় অঙ্গার, “শোন্ জোয়ানের বাচ্চারা। কতকালের বনেদী আমাদের এই জোহেরি বংশ। ওপারের ছুই পোকরি বংশ আজ আমাদের অপমান করেছে। এর শোধ তুলতে হবে। মোরাঙ থেকে বর্শা, তীর-ধনুক, কুড়াল বের করে নিয়ে যা।”

জোয়ান ছেলেরা এতক্ষণ উৎকর্ণ হয়ে শুনছিলো। এবার তাদের কোলাহল উদ্বেল হয়ে উঠলো। অনেকগুলো শান্ত, শিষ্ট, সভ্য দিনের পর এই আদিম আহ্বানে তারা রীতিমত পুলকিত হয়ে উঠেছিলো। পাহাড়ী বনের হিংস্র আত্মা যেন ঘুমিয়ে পড়েছিলো। জেভেথাঙের বাপের এই ডাকে আবার নতুন করে তার ঘুম ভেঙেছে।

জেভেথাঙের বাপ বলেছিলো, “হু-হু, খাপেগার ওপর সব ভার দিলাম। আজ রাতের মধ্যে পোকরি বংশের তিনটে মাথা চাই। যা মরদের বাচ্চারা। এই মোরাঙের দেওয়াল চিত্তির করবো পোকরি বংশের রক্ত দিয়ে। মনে থাকে যেন।”

একটু পরেই পঞ্চাশটা জোয়ানের মুঠিতে তীক্ষ্ণধার বর্শা উঠলো। বেলাশেষের রোদে ঝকমক করে উঠেছিলো ফলাগুলো। একটা রক্তাক্ত প্রতিজ্ঞার আগুন নেচে নেচে যাচ্ছিলো জোয়ান চোখের মণিতে মণিতে।

"আ—ও—ও—ও—য়া—আ—আ—আ—" টিজু নদীর দিকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো জোয়ানেরা।

"আ—ও—ও—ও—য়া—আ—আ—আ—" ওপার থেকেও চিৎকার ভেসে আসছিলো। আদিম পৃথিবীর এই আহ্বানে তারাও সাড়া দিয়েছে। তাদের বর্শার ফলায় ফলায়, তাদের তীরের ঝকমক দ্যুতিতে একই মৃত্যুর শপথ।

এক সময় টিজু নদীর দুপারে মুখোমুখি হয়েছিলো জোহেরি আর পোকরি বংশের বর্শারা। কোন কথা নয়। তীর আর ধনুকের মুখে মুখে প্রশ্ন ছুটবে, উত্তর জ্বলবে।

নাগা যুদ্ধের নিয়ম অনুযায়ী দু দল দুপাশের কিছুটা জঙ্গল পরিষ্কার করলো। তারপর দুদিকেই দুটো অগ্নিমুখ মশাল জ্বালিয়ে পুঁতলো। তারও পর যুদ্ধ আরম্ভের প্রাথমিক রীতি মেনে দু দলই পরস্পরের দিকে ডিম ছুঁড়লো। এই ডিম ছোঁড়া ভয়ানক অসম্মানের চিহ্ন। টিজু নদীর দুপারে দুই প্রতিপক্ষ। কারো মাথায় মোষের শিঙের বাহারী মুকুট। হাতের মুঠোয় ভয়াল কুড়ালের মত দা, কাঁধের বেতের তূণে রাশি রাশি তীর। বুকের সামনে খাসেম গাছের ছাল দিয়ে বানানো ঢাল। মাথায় মোষের ছালের পেরুঙ (শিরস্ত্রাণ), তাতে পিতলের কারুকাজ। তলপেটে গুঙ থেকঙ (লোহার আবরণ) আর বাহুসন্ধি পর্যন্ত বাঘছালের আমেজঙ থেকঙ (ঢাকনা)।

পাহাড়ী উপত্যকার চড়াই-উতরাই কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে দু-দল হিংস্র চীৎকার করে উঠেছিলো—

"আ—ও—ও—আ—আ"

"হো—ও—ও—ও—আ—আ—আ—"

এক সময় পাহাড়ের চূড়া থেকে বেলাশেষের রঙ মুছে গিয়েছিল। আবছায়া রঙের রহস্য ছড়িয়ে ছড়িয়ে নেমে এসেছিলো ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রি। আকাশে মিটিমিটি তারা ফুটেছে। অস্ফুট চাঁদের আভাস দেখা দিয়েছে। নদীর দু-পারে শোরগোল উদ্দাম হয়ে উঠেছে। সমস্ত আকাশ-বাতাস-উপত্যকা যেন খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে সে চিৎকারে। টুকরো টুকরো হয়ে ছড়িয়ে পড়বে মহা শূন্যে। এই অরণ্য, এই দিনরাত্রির অস্তিত্বে ঘেরা পাহাড়ী পৃথিবী এই প্রচণ্ড কোলাহলে যেন চিহ্নহীন হয়ে যাবে।

"আ—ও—ও—ও—আ—আ—এদিকে আয় দেখি মরদের বাচ্চা হলে!"

"হো-ও-ও-আ-আ-আ—জানের মায়া থাকলে ঘরের ছা ঘরে যা!"

ছুপারে এক সময় মশাল জলে উঠলো। টিজু নদীর খরধারায় কয়েকটি অগ্নিবিন্দুর প্রতিচ্ছায়া পড়লো। কিন্তু ছু ধারের একটি মানুষও নদী পার হলো না। পার হওয়ার নিশ্চিন্ত পরিণতি ঘাড়ের ওপর ছু-হাত-লম্বা একটা কুড়ালের কোপ এসে পড়া। কিংবা জীমবো পাতার মত বাঁকা বর্শায় হৃৎপিণ্ডটা এ-ফোঁড় ও-ফোঁড় হয়ে যাওয়া।

একসময় খাসেম কাঠের ঢালটা তুলে গর্জন করে উঠেছিলো খাপেগা, "ছাগীর মত এপারে বসে থাকলে নিতিৎসুকে পাবি নাকি, কি রে জেভেথাঙ! ওপারের ছাগীরা এগিয়ে আসবে না আগে। আমাদেরই ছই পেত্নীটাকে ছিনিয়ে আনতে হবে। জোহেরি বংশের মান খোয়াস নি জেভেথাঙ। সর্দার বলে দিয়েছে, অন্তত তিনটে মাথা চাই পোকরি বংশের—"

সহসা টিজু নদীর গর্জিত স্রোতকে স্তব্ধ করে চিৎকার করে উঠলো জেভেথাঙ। খাপেগার কথাগুলো থেকে আদিম প্রেরণা পেয়েছে সে, "আ—ও—ও—"

টিজু নদীর যৌবন বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে মুছে গিয়েছে। গ্রীষ্মের টিজুতে রাশি রাশি হাড়ের মত নানা রঙের পাথর ফুঁড়ে বেরিয়েছে। চিৎকারের সঙ্গে সঙ্গে একটা পাথরের ওপর লাফিয়ে পড়েছিলো জেভেথাঙ। উত্তেজনায় ঢালটা তুলে নিতে ভুলে গিয়েছিলো সে। শুধু ডান হাতের মুঠোতে একটা অতিকায় বর্শা মাত্র ধরা ছিলো। মশালের পিঙ্গল আলোতে ভয়ঙ্কর হিংস্র হয়ে গিয়েছে জেভেথাঙের দৃষ্টি। তামাটে মুখখানা অস্বাভাবিক রক্তাভ দেখাচ্ছে। "আ—ও—ও—ও—আ—আ—"

কিন্তু টিজু নদী আর পার হতে হলো না জেভেথাঙকে। আচমকা একটা বিশাল বর্শার ফলা কণ্ঠার মধ্যে এসে ফুঁড়ে গেলো তার। মশালের পিঙ্গল আলোতে শুধু পাহাড়ী রক্তের একটা তীব্র ফিন্‌কি তীরের মত বেরিয়ে টিজু নদীর নীলধারার সঙ্গে মিশে গেলো।

"আ—ও—ও—ও—উ—উ" আর্তনাদ করে আছড়ে পড়লো জেভেথাঙ। টিজু নদীর ওপারে নিতিৎসু নামে এক আদিম কামনা তার অধরাই রইলো। বর্শার ফলা তার উন্মাদ আকাঙ্ক্ষা থেকে চিরকালের জন্য একটি বন্য স্বপ্নকে মুছে নিয়ে গেলো।

জেভেথাঙের দেহটা স্রোতের আঘাতে আঘাতে ওপারে গিয়ে ভিড়েছিলো। চকিতে একটা কুড়ালের কোপ দিয়ে ওপারের কে একজন মুণ্ডটা ছিন্ন করে তুলে নিয়েছিলো।

তারপর টিজু নদীর ওপারটা আনন্দিত কোলাহলে প্রমত্ত হয়ে উঠেছিলো। জোহেরি বংশের অন্যায় কামনার ন্যায্য উত্তর তারা দিয়েছে।

প্রথমটা ঘটনার আকস্মিকতায় স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিলো খাপেগারা। তার-পরেই পঞ্চাশটা জোয়ান ভৈরব গর্জনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলো টিজু নদীর ওপারে। "আ—ও—ও—আ—আ—আ—"

সেই ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রিতে গলাটা মন্থর হয়ে গিয়েছিলো বুড়ো খাপেগার, "তারপর টিজু নদীর নীল জল লাল হয়ে গেলো। অনেক রাত্তিরে ওপারের দশটা মাথা নিয়ে মোরাঙে ফিরে এলাম। আমার উরুটা বর্শার ঘায়ে তুফালা হয়ে গিয়েছিলো। যাক সে কথা, কিন্তু আপশোস রয়ে গেলো বড়। দশটা মাথা আনলাম বটে, কিন্তু পোকরি বংশের একটা মাথাও আনতে পারি নি। আর জোহেরি বংশের আসল মাথাটাই ওরা নিয়ে গিয়েছিলো। যে মাথাগুলো এনেছিলাম, সবই ওপারের অন্য বংশের।"

মন্থর হতে হতে এক সময় থেমে গিয়েছিলো খাপেগার কণ্ঠ। তারপর সেঙাইর দিকে তাকিয়ে সে বলেছিলো, "আমাদের দিন তো শেষ। শরীরে সে তাগদ্ আর নেই। তোর ঠাকুরদা জেভেথাঙকে ওরা মেরেছে সেঙাই। দশটা অন্য বংশের মাথায় তার দাম ওঠে না। তোর বাপ তো আবার সাহেব সাধুদের ল্যাজধরা। তুই এর শোধ তুলিস সেঙাই। তুই পোকরি বংশের তিনটে মাথা নিতেই হবে। সেদিন ওদেরই জিত হয়েছিলো। দশটা মাথা আনলেও আমরা হেরে গেছলাম। সে হারের বদলা জিত এখনও আমাদের হয় নি।"

এই হলো সেই রক্তাক্ত অতীতের কাহিনী। এই ভয়ঙ্কর অতীত সেদিন টিজু নদীর তুপারে জোহেরি আর পোকরি বংশকে চিরকালের জন্য বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছিলো। বিশাল এক পাহাড়ী ময়ালের মত টিজু নদীর আঁকাবাঁকা স্রোত। এই স্রোতের ওপর আর কোনদিনই অন্তরঙ্গতার সেতুবন্ধ হয় নি। সেই সেতুর ওপর দিয়ে তু বংশের হৃদয়ের দিকে একটি পদক্ষেপও আর হয় নি। শুধু টিজু নদীর তুপার থেকে একদিন কুরগুলাঙ গ্রাম মুছে গেল। তার প্রেতাত্মার ওপর জন্ম নিল আজকের এই সালুয়ালাঙ আর কেলুরি। নিতিংসু আর জেভেথাঙকে নিয়ে টিজু নদীর তুপারে যে আগুন জ্বলে উঠেছিলো, কালের অনিবার্য প্রভাবে তার ওপর খানিকটা বিস্মৃতির ভস্ম জমেছে। কিন্তু সে

আগুন এখনও নেভে নি। শুধু মাত্র একটি ফুৎকারের প্রয়োজন, যে ফুৎকারে ধিকিধিকি অগ্নিলেখা দাবদাহ্ হয়ে জ্বলে উঠবে।

খেজাঙের ঝোপ থেকে খানিকটা দূরে সালুয়ালাঙের মানুষগুলো এখনও চিৎকার করছে। কপিশ চোখে তাদের শিকারের সন্ধান।

খেজাঙ ঝোপের মধ্যে একটা ক্ষিপ্ত বাঘের মত এবার শরীরটা ফুলে ফুলে উঠছে সেঙাইর। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। বুকের কঠিন পেশীগুলো উঠছে, নামছে। তার চেতনার মধ্যে কয়েকদিন আগে শোনা খাপেগার কাহিনীটা বিষের জ্বালা ছড়িয়ে দিচ্ছে। খেজাঙের কাঁটায় ফালা ফালা হয়ে যাচ্ছে দেহ, সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই। পায়ের পাতার ওপর দিয়ে পিছলে পিছলে যাচ্ছে সরীসৃপ, সেদিকে একবিন্দু মনোযোগ নেই। শুধু বর্শার বাজুর ওপর হাতের মুঠিটা বজ্রের মত প্রখর হয়ে বসছে সেঙাইএর। আর বর্শার ফলায় যেন প্রতিশোধের দুর্বার স্পৃহা ঝকমক করে উঠছে। দেহমন উত্তেজনায় তরঙ্গিত হচ্ছে সেঙাইর। একটু আগে অপরিসীম ভয়ে কুঁকড়ে গিয়েছিল সে। এখন সে ভয় মুছে গিয়েছে। খাপেগার সেই কাহিনী স্মৃতির মধ্য থেকে এক আদিম প্রেরণায় তাকে ভয়ঙ্কর করে তুলেছে। হ্যা, ঠাকুরদার হত্যার প্রতিশোধ সে নেবে। তাকে নিতেই হবে।

আর সেঙাইর ঠিক পেছনেই উবু হয়ে দাঁড়িয়ে আছে রেঙকিলান। অস্বাভাবিক আতঙ্কে তার হৃৎপিণ্ডটা যেন থেমে থেমে আসছে। রক্ত চলকে ব্রহ্মতালুর ওপর উঠছে যেন। চোখের মণিদুটো এক অব্যক্ত যন্ত্রণায় ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে। মৃত্যু আজ অনিবার্য। অপঘাত আজ নিশ্চিত। সালুয়ালাঙের মানুষগুলো বর্শার মুখে নির্ঘাত তার মুণ্ডটা গেঁথে নিয়ে যাবে।

রেঙকিলান মিথ্যা কথা বলেছে সেঙাইকে। কাল রাত্রে সে মোরাঙে শুতে যায় নি। বউয়ের সঙ্গে এক শয্যায় শীতের রাত্রি উজিয়ে সেই কলুষিত দেহমন আর জঙগুপি কাপড় নিয়েই সে চলে এসেছে শিকারে। শিকারে আসার আগে শুদ্ধাচারের রীতি সে রক্ষা করে নি। সেই পাপে দুর্বার বেগে ধেয়ে আসছে বনদেবীর অভিশাপ। হৃৎপিণ্ডের নিঃশব্দ স্পন্দনের সঙ্গে মিলিয়ে মিলিয়ে সে শুনতে পাচ্ছে আনিজার অট্টহাসি। মৃত্যু আজ নিশ্চিত। অবধারিত। আর ভাবতে পারছে না রেঙকিলান। সমস্ত দেহের পেশীগুলো তার থরথর করে কাঁপছে। সমস্ত চেতনাটা আলোড়িত করে একটি চিন্তাই

তাকে আচ্ছন্ন করে ফেলেছে। সে চিন্তা মৃত্যুর চিন্তা। তার নিভন্ত দৃষ্টির সামনে যেন নাচতে শুরু করেছে সালুয়ালাঙের মৃত্যুমুখ বর্শারা।

এতক্ষণ একাগ্র নজরে লক্ষ্য করছিলো সেঙাই। পাহাড়ী ঘাসের ফাঁক দিয়ে বার বার মাথাটা বেরিয়ে এসেই আবার অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। এবার মানুষটার মুখ দেখতে পেলো সেঙাই। এর আগে টিজু নদীর ওপার থেকে আরো বার-কয়েক লোকটাকে দেখছিলো সে। ওঙলে বলেছিলো, "ও লোকটার নাম খোন্‌কে। হুই পোকরি বংশের ছেলে।"

ঘন ঘাসের আড়ালে খোন্‌কের মুখটা ডুবে ছিলো। খোন্‌কে! রক্তকণা-গুলো রাশি রাশি সরীসৃপের মত কিলবিল করে উঠলো সেঙাইর শিরায় শিরায়। খোন্‌কে! পোকরি বংশের ছেলে। এই খোন্‌কের কোন প্রাক্‌পুরুষ তার ঠাকুরদাকে হত্যা করেছিলো। সহসা কর্তব্য স্থির করে ফেললো সেঙাই। বহুকাল আগে এক ক্ষয়িত চাঁদের রাত্তিরে টিজু নদীর নীল ধারায় জোহেরি বংশের অপমান মিশে গিয়েছিলো। আজ শীতের দুপুরে খেজাঙের কাঁটাঝোপে এক উত্তরপুরুষের ধমনীতে বহু বছর পর সেই অপমান যেন জ্বালা ধরিয়ে দিলো।

পাহাড়ী ঘাসের বন থেকে খোন্‌কের মাথাটা বেরিয়ে এসেছিলো। খোন্‌কের মাথা নয়, যেন পোকরি বংশের গর্বোদ্ধত মুকুট। আকাশছোঁয়া চূড়া।

আচমকা রেঙকিলানের পাঁজরায় কনুই দিয়ে একটা খোঁচা দিলো সেঙাই। তারপর রক্তচোখে তাকালো, "এই রেঙকিলান, হুই খোন্‌কেকে আমি বর্শা দিয়ে ফুঁড়বো। তারপর পেছনের খাসেম বন দিয়ে একেবারে নদীর বাঁকে পালাব। ঠিক হয়ে থাক।"

বুকের মধ্য থেকে একদলা আতঙ্ক কথার রূপ নিয়ে উঠে আসতে চাইলো রেঙকিলানের। কিন্তু তার কিছু বলার আগেই সহসাই ঘটে গেলো ঘটনাটা। সেঙাইর মুঠি থেকে অতিকায় বর্শাটা উল্কার মত ছুটে গিয়েছে। নির্ভুল লক্ষ্য। তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ করে পাহাড়ী ঘাসের বনে লুটিয়ে পড়লো খোন্‌কে, "আউ-উ-উ-উ-উ-উ—"

এক মুহূর্ত দাঁড়িয়ে খোন্‌কের আর্তনাদটা উপভোগ করলো সেঙাই। অনেক কাল আগে এক ক্ষয়িত চাঁদের রাত্তিরে তার ঠাকুরদা জেভেথাঙও হয়তো এমনি করেই ককিয়ে উঠেছিলো। খোন্‌কের গোঙানি শুনতে শুনতে মনটা আদিম উল্লাসে উদ্বেল হয়ে উঠছে সেঙাইয়ের। আজ এমন একটা

অপরূপ শিকার তার বরাতে যে নির্দিষ্ট হয়ে ছিল, তা কী সে জানতো! অনেক বছর ধরে প্রতিশোধের গোপন স্পৃহার গুহায় যে শিকারকে লালন করে এসেছে জোহেরি বংশ, সে শিকারের দিকে অব্যর্থ বর্শা ছুটে গিয়েছে সেঙাইর। আজ উল্লাসের দিন বৈ কি!

ঘটনার আকস্মিকতায় কিছু সময় একেবারেই হতবাক্ হয়ে গিয়েছিল সালুয়ালাঙের মানুষগুলো। এমন কি খেজাঙ ঝোপে রেঙকিলানও সেঙাইর পাশে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

আকস্মিকতার চমক সরে গেলো। তারপরেই পাহাড়ী অরণ্য কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলো সালুয়ালাঙের মানুষগুলো। শিকারে আসার আগে তাদের একজন যে এমন শিকার হয়ে যাবে, তা কি তারা ভাবতে পেরেছিলো!

"হো-ও-ও-ও-ও—"

চারদিকে বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়ছে মানুষগুলো। খোন্‌কেকে শিকার করেছে যে শিকারী, তার সন্ধান চাই। তার মুণ্ডটা ছিঁড়ে নিয়ে মোরাঙে ঝোলাতে না পারলে সালুয়ালাঙের মর্যাদা চুরমার হয়ে যাবে। পোকরি বংশের সম্মান ধ্বংস হয়ে যাবে।

"হো-ও-ও-ও-ও—" ভৈরব গর্জন ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে পাহাড়ী উপত্যকার দিকে দিকে। মানুষগুলো হিংস্র চোখে সন্ধান করছে এদিক সেদিক।

আর খেজাঙ ঝোপে আরেলা পাতার মত সাদা হয়ে গিয়েছে রেঙকিলানের মুখখানা। তীক্ষ্ণ অপরাধ-বোধে সমস্ত মনটা তার নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। শিকারে এসেছে সে অশুচি দেহমন নিয়ে। আর উপায় নেই। আর রেহাই নেই। মৃত্যুর পাত্র ষোলোকলায় পূর্ণ হয়েছে তার। ভাবতে ভাবতে একেবারেই নিথর হয়ে গিয়েছে রেঙকিলান।

আচমকা সেঙাইর থাবা এসে পড়লো মণিবন্ধের ওপর। তারপর সেই থাবাটা একটা লঘুভার পাখির মত রেঙকিলানের দেহটাকে উড়িয়ে নিয়ে চললো যেন। অস্ফুট চেতনার মধ্যে রেঙকিলান একটু একটু বুঝতে পারছে, একটু একটু ভাবতে পারছে। পায়ের তলা দিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে ঝোপ-ঝাড় আর পাহাড়ী ঘাসের বন। মাথার ওপর থেকে সরে সরে যাচ্ছে খাসেম পাতার ছাদ, ভেরাপাঙের নিশ্ছেদ ডালপালা। এক সময় টিজু নদীর দূরতম একটা বাঁকে এসে থামলো সেঙাই। হাতের বজ্রমুঠি থেকে ছেড়ে দিলো

রেঙকিলানকে। তারপর কদর্য গালাগালি দিয়ে উঠলো, "ইজা হাণ্ট্সা সালো! একটা কুত্তী হয়ে গেছিস একেবারে।"

পাহাড়ী শীতের দুপুরেও দরধারায় ঘাম নেমে আসছে রেঙকিলানের। আশ্চর্য! সে তো ভীরু নয়! বর্শার ফলা হাতের থাবায় ধরা থাকলে রক্তে রক্তে সে-ও তো আদিম অরণ্যের আহ্বান শোনে, আদিম হত্যার প্রেরণা পায়। এর আগে অনেকবার সে এসেছে শিকারে। তবে আজ, আজ কেন তার পেশীগুলো এমন শিথিল হয়ে আসছে! বার বার চেতনার দিগন্ত থেকে উঁকি দিচ্ছে একটা ভয়ঙ্কর আনিজার মুখ!

সেই অপরাধ। স্ত্রীর সঙ্গে এক বিছানায় শুয়ে অপবিত্র দেহমন নিয়ে শিকারে আসা। পাপবোধটা যেন শ্বাসনালীর ওপর চেপে চেপে বসছে রেঙকিলানের। নির্বোধ চোখে সে তাকালো সেঙাইর দিকে।

সেঙাই আবার হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "তোকে নিয়ে শিকারে আসাই আমার ভুল হয়েছে। সাধে কি বলি, বিয়ে করে একটা ছাগী হয়ে গেছিস তুই।"

একটি শব্দও করলো না রেঙকিলান। প্রতিবাদের একটি উত্তরও জুগিয়ে এলো না তার ঠোঁটে।

টিজু নদীর এই বাঁক থেকে সালুয়ালাঙের মানুষগুলোর চিৎকার ক্ষীণতম একটা রেশের মত শোনাচ্ছে। আর ভাবনার কোন কারণই নেই। নিরাপদ ব্যবধানে সরে আসতে পেরেছে তারা। তবু রেঙকিলানের সারা দেহমনের স্নায়ুগুলো থরথর করে কাঁপছে।

দুপুরের ঝকঝকে রোদ এখন গেরুয়া হয়েছে। পশ্চিম পাহাড়ের চূড়াটার ওপর সূর্য এখন স্থির হয়ে রয়েছে। উতরাইএর দিকে এখনই ছায়া-ছায়া অন্ধকার। চড়াই উপত্যকার দেহ বেয়ে রোদের নিস্তেজ রঙ পাহাড়ী বনের কুটিল সবুজের সঙ্গে মিশতে শুরু করেছে।

ঘন ঘন কয়েকটা নিশ্বাস ফেললো সেঙাই। তারপর খানিকটা জিরিয়ে রেঙকিলানকে নিয়ে টিজু নদী পার হয়ে ওপারে চলে গেলো।

দুই

শীতের রোদের মধুর আমেজটুকু গায়ে এসে লাগছে স্নিগ্ধ মমতার মত। এই প্রথম বিকেলেই বাতাস হিমাক্ত হয়ে উঠেছে।

রেঙকিলান আর সেঙাই শ্রান্ত শরীর টানতে টানতে একটা বড় ভেরাপাঙ গাছের নীচে এসে বসলো। অনাবৃত দেহে অনেকগুলো রক্তাক্ত আঁচড়ের দাগ ফুটে বেরিয়েছে।

সেঙাই বললো, "বড় ক্ষিদে পেয়েছে। ওঙলেদের খবরটা জানিয়ে দিতে হবে।"

কোমরের গোপন গ্রন্থি থেকে বাঁশের চাঁচারি বের করে সেঙাইর হাতে দিলো রেঙকিলান। চাঁচারিটা দুই ঠোঁটের ওপর আড়াআড়ি রেখে তীক্ষ্ণ শব্দ করে উঠলো সেঙাই। একটু পরেই সে শব্দের উত্তর ভেসে এলো। এবার ওঙলেরা সাড়া দিয়েছে। উৎকর্ণ হয়ে সেঙাই শব্দটার উৎস লক্ষ্য করতে লাগলো। পাহাড়টা যেখানে একটা খাড়াই বাঁক নিয়ে উত্তর দিকে নেমে গিয়েছে, ঠিক সেখান থেকেই শব্দটা তরঙ্গিত হতে হতে ভেসে আসছে।

সেঙাই বললো, "উত্তরের পাহাড়ে রয়েছে ওঙলেরা। চল্ যাই।"

"চল্।" উঠে দাঁড়ালো রেঙকিলান।

টিজু নদীটা পিছনে রে:খ ঘনবনের মধ্য দিয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে চললো দুজনে। এক অপরিমেয় পুলকে মনটা কানায় কানায় ভরে গিয়েছে সেঙাইর। আর এক অস্বাভাবিক আতঙ্কে নির্বাক হয়ে পথ চলছে রেঙকিলান। অশুচি দেহমন। একটু আওয়াজেই চমকে চমকে উঠছে সে। কখন কী ভাবে যে আনিজার আবির্ভাব হবে কে বলতে পারে?

চড়াইয়ের দিকে উঠতে উঠতে একটা অতিকায় ন্যাড়া পাথরের পাশে এসে থমকে দাঁড়ালো সেঙাই। তার পেছনে রেঙকিলান।

পাথরের চাঁইটার ঠিক পাশ দিয়েই একটা নিঃশব্দ ঝরনা। দুপাশ থেকে বিশাল বিশাল গাছের নিবিড় ছায়া ঝুঁকে পড়েছে নিরীহ জলধারাটির বুকে। গাছপালার ফাঁক দিয়ে সোনার তারের মত দু-একটি রোদের রেখা এসে পড়েছে। জলধারাটি চিকচিক করছে সেই রোদের বিন্দুগুলিতে।

ঝরনার ঠিক পাশেই এক অপরূপ পাহাড়ী রূপ দেখলো সেঙাই। একটি অপূর্ব নারীতনু। উর্ধ্ব দেহ অনাবৃত। সোনালী স্তন। তীক্ষ্ণ বৃন্তটি ঘিরে গাঢ় খয়েরী রঙের বৃত্ত। উজ্জ্বল তামাভ দেহ থেকে খরদ্যুতি ঠিকরে বেরুচ্ছে। খাসেম ফুল আর কড়ির অলঙ্কার দিয়ে কেশসজ্জা রচনা করা হয়েছে। নাভিমূলের নীচ থেকে জঙ্ঘার ওপর পর্যন্ত লাল রঙের 'কুমারী' কাপড়। চারদিকে একবার তাকালো মেয়েটি। তারপর একটানে কাপড়টি খুলে ফেললো। একেবারে নগ্ন সৌন্দর্য। বন্য পাহাড়ের এক মাদক মাধুর্য। সুডৌল উরু, নিটোল নিতম্ব, ছোট ছোট পিঙ্গল চোখ। বুকের যুগলকুম্ভের মধ্যবিন্দুতে শঙ্খের হার। কিছু সময় নিজের দিকে মুগ্ধ চোখে তাকিয়ে রইলো মেয়েটি। তারপর ঝরনার পাশে একটি শাদা পাথরের ওপর বসলো।

চারপাশে নিবিড় বন। খাড়াই উপত্যকা থেকে বয়ে এসেছে নিঃশব্দ এক ঝরনা। পাহাড়, অরণ্য, নির্ঝর—এর পটভূমিতে নগ্ন নারীতনুটি আশ্চর্য ছন্দিত মনে হয়। অরণ্যময় এই পাহাড় যেন রমণীয় হয়ে উঠেছে। সেঙাইএর বন্য মনও কিছু সময়ের জন্য আবিষ্ট হয়ে রইলো। বনকন্যার এই অনাবৃত দেহ তার মোহিত চেতনা থেকে সমস্ত পৃথিবীকে যেন মুছে নিয়ে গিয়েছে। একটু আগে খোন্‌কেকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে এসেছে সে। ঘাতনের এক আদিম উল্লাসে মনটা তার পূর্ণ হয়ে গিয়েছিলো। সেই উল্লাসের ওপর অনাবরণ পাহাড়ী কুমারীর রূপ মদের নেশার মত মিশে অপূর্ব মৌতাত জমিয়ে তুললো দেহমনে।

টানডেন্‌লা পাখির মত জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে গায়ে দিচ্ছে মেয়েটি। ছপ-ছপ শব্দে গানের ঝঙ্কার শুনতে পাচ্ছে সেঙাই। তার আঠারো বছরের যৌবন। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন টঙ্কার দিয়ে উঠছে। তাদের কেলুরি গ্রামে অজস্র কুমারী মেয়ের নগ্ন দেহ সে দেখেছে। কিন্তু এমন করে তার স্নায়ুরা কোন-দিনই ব্যগ্র হয়ে ওঠে নি। কোনদিনই তার কামনা এমন ভয়ঙ্কর হয় নি। এ মেয়েটি তার অজানা। একে সে কোনদিনই দেখে নি। তবু এক বিচিত্র আকর্ষণের উত্তেজনায় দেহটা ছিটকে যেতে চাইছে মেয়েটির কাছে। শিরায় শিরায় রক্তের মাতামাতি উদ্দাম হয়ে উঠেছে। নাকের মধ্যে নিশ্বাস গরম হয়ে উঠছে। টিজু নদীর মত বুক তরঙ্গিত হচ্ছে। চোখের পিঙ্গল মণি দুটো অপলক হয়ে রয়েছে মেয়েটির দেহের ওপর।

সেঙাইর পাশ থেকে এবার রেঙকিলান দেখে ফেলেছে, "আরে এ যে মেহেলী!"

সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো সেঙাই। তার গলায় অসহ্য কৌতূহল, "মেহেলী! সে কে? আমাদের বস্তির মেয়ে তো নয়।"

"না। ও সালুয়ালাঙের মানুষ। পোকরি বংশের মেয়ে।"

"পোকরি বংশের মেয়ে!"

"হু-হু! যে বংশ তোর ঠাকুরদার মাথা নিয়েছিলো।"

পোকরি বংশ! প্রচণ্ড ক্রোধে সমস্ত দেহটা দুঃসহ হয়ে উঠলো সেঙাইএর। ভুলে গেলো, মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগে তার কামনার প্রতিটি অগ্নিকণা দিয়ে মেয়েটির দেহ ঝলসে ঝলসে সে আস্বাদ নিতে চেয়েছিলো।

প্রতিশোধ! সেঙাইর চোখদুটো জ্বলে উঠলো। কোন ক্ষমা নেই। কোন করুণা নেই। এ তার কর্তব্য। পূর্বপুরুষের প্রতি উত্তরপুরুষের দায়িত্ব। শ্বাপদের মত হাতের থাবা হিংস্র হয়ে উঠলো সেঙাইর। তারপর পাহাড়ের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলো সে।

"এই, কে তুই?" কঠিন হলো সেঙাইর গলা।

পাহাড়ী ঝরনার পাশে এক রমণীয় বিবস্ত্র সৌন্দর্য চমকে উঠলো। মাথার রাশি রাশি চুল থেকে কণায় কণায় জল ঝরছে। ছোট ছোট পিঙ্গল চোখে অসহায় দৃষ্টি। সারা দেহে শুধু ঝরনার জলের আবরণ।

মেয়েটি আশ্চর্য শান্ত গলায় বললো, "আমি মেহেলী, পোকরিদের মেয়ে। নদীর ওপারে সালুয়ালাঙ বস্তিতে আমাদের ঘর। আমি রোজ বিকেলে এই ঝরনায় চান করতে আসি। কিন্তু তুই কে?"

"আমি কে?" সেঙাইর হাতটা বর্শাসমেত আকাশের দিকে উঠে গেল। আর বর্শার ফলায় নিশ্চিত মৃত্যুর প্রতিচ্ছায়া পড়লো। "বর্শা দিয়ে তার জবাব দেবো।"

মাথার ওপর উদ্যত বর্শা। সহসা ঝরনাপারের সাদা পাথরটার ওপর থেকে উঠে দাঁড়ালো অনাবৃত পাহাড়ী মাধুর্য। মেহেলী। তারপর আখুশু ঝোপ থেকে একমুঠো পাতা ছিঁড়ে সেঙাইর দিকে ডান হাতখানা প্রসারিত করে দোলালো। তার পর সাদা পাথরের ওপর সেই পাতাগুলো বিছিয়ে বসে পড়লো মেহেলী।

বর্শাসহ হাতখানা নেমে এলো সেঙাইর। নাগাদের প্রথা অনুযায়ী মেহেলী তার কাছে সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেছে। পাতা নাড়িয়ে তার ওপর বসার পর হত্যা করা রীতিমত অপরাধের। অতএব, অনিচ্ছা থাকলেও বর্শাটাকে শান্ত করতে হলো সেঙাইএর; তার ফলা থেকে অনিবার্য মৃত্যুকে মুছে দিতে হলো।

এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে মেহেলী। তার দুটি ছোট ছোট চোখে আশ্চর্য অসহায়তা।

সেঙাই-ও তাকিয়ে ছিলো। তার সারা মুখে একটা বিরক্ত ভ্রূকুটি ফুটে রয়েছে। থাবার সীমানায় শিকার। অথচ, অথচ তাকে বিন্দুমাত্র আঘাত হানা এক নিকৃষ্ট পাপাচরণ। কোনমতেই তার অনিষ্ট করা চলবে না। দেহমন নিবেদন করে বশ্যতা স্বীকার করেছে মেহেলী।

ঋজু পদক্ষেপে সামনের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে থমকে দাঁড়ালো সেঙাই। মনের মধ্যে অনেক দিন আগে শোনা খাপেগার কাহিনী বিদ্যুতের ক্রিয়া করে গেলো সহসা। এমনি নিঃশব্দ আর নির্জন এক ঝরনাধারার পাশে বহুকাল আগে মুখোমুখি হয়েছিলো নিতিৎসু আর জেভেথাঙ। পোকরি আর জোহেরি বংশ। আশ্চর্য সঙ্গতি! আশ্চর্য যোগাযোগ! এত বছর পর দুই বংশের উত্তরকাল আবার সেই ঝরনার পারেই মিলিত হয়েছে। সেঙাই আর মেহেলী। টিজু নদীর এপার আর ওপার। অনেক বছর আগে দু বংশের যে দুই যৌবন এক রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের যবনিকা তুলে দিয়েছিলো, কালের অমোঘ প্রভাবে তারা পৃথিবী থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। নতুন কালে মেহেলী আর সেঙাই, দুই বংশের নতুন যৌবন আবার আর-এক সংগ্রামের নায়ক-নায়িকা হয়ে এলো কি না, কে বলতে পারে?

চারদিকে একবার সতর্ক চোখে তাকালো সেঙাই। কিছু বিশ্বাস নেই শত্রুপক্ষের কুমারী যৌবনকে। হয়তো আশেপাশে কোথাও লুকিয়ে রেখেছে লোহার মেরিকেতসু কি একখানা তীক্ষ্ণধার থেনি মী (স্ত্রীলোকের বর্শা)। একটু অসাবধান হলেই সাঁ করে ছুঁড়ে মারবে নির্ঘাত। নাঃ, তেমন সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলো না সেঙাই।

রেঙকিলান আসে নি। অতিকায় ন্যাড়া পাথরটার ওপাশ থেকে সে সেঙাই আর মেহেলীর ভাবগতিক লক্ষ্য করছিল কি করছিল না। এক ভয়াল ভাবনা তাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। আনিজার কবল থেকে অশুচি দেহমন আর ভাবনাটাকে কিছুতেই মুক্ত করতে পারছে না রেঙকিলান। নিজের দেহটাকে অস্বাভাবিক ভারী মনে হচ্ছে তার। বিশাল পাথরটার ওপর শরীরটাকে হেলিয়ে দিয়ে নির্জীবের মত দাঁড়িয়ে আছে সে।

আরো একটু এগিয়ে এসেছে সেঙাই। এবার তার মুখচোখ থেকে ক্রূর ভ্রূকুটিটা সরে গেল। তার বদলে এক বিস্মিত কৌতূহল ফুটে বেরিয়েছে

"হু-হু তোর আচ্ছা সাহস তো! হুই বস্তি থেকে রোজ এ বস্তির ঝরনায় আসিস চান করতে! ভয়-ডর নেই একটু?"

"চারদিক দেখে আসি। এই ঝরনায় চান করতে আমার বড় আরাম লাগে।"

"কিন্তু কেউ যদি দেখে ফেলে?"

"না, কেউ দেখবে না।" নিশ্চিন্ত আনন্দে ঝরনার হিমাক্ত জল গায়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিতে লাগলো মেহেলী।

"এই যে আমি দেখে ফেললুম।"

"তুই তো আমাকে মারলি না। আর কেউ এলে পাতা নেড়ে নেড়ে তার ওপর বসে পড়বো। আমার বাপ বলে দিয়েছে। তা হলে আর কেউ মারবে না।" শান্ত মুখে এতটুকু ভাবনার লেশ নেই মেহেলীর। মধুর রহস্যের মত হাসির আঠা লেগে রয়েছে শুধু।

"জানিস, আমাদের আর তোদের বস্তিতে ভীষণ ঝগড়া!"

"জানি তো।" অপরূপ সরল চোখে তাকালো মেহেলী।

"তবু তোর ভয় নেই?"

"ভয়ের কী আছে? আমি পাহাড়ী মেয়ে না!" খিলখিল করে হেসে উঠলো মেহেলী।

আশ্চর্য মেয়ে! এই নগ্ন সৌন্দর্যের মধ্যে শুধু রূপই নয়, শুধু একটা আদিম আকর্ষণই নয়, আরও কিছুর সন্ধান পেলো সেঙাই। একটা বিচিত্র ভাবনার দোলা লাগলো অস্ফুট পাহাড়ী যৌবনের চেতনায়। সে ভাবনার স্পষ্ট কি প্রত্যক্ষ কোন ব্যাখ্যা দিতে পারবে না সেঙাই। তবু দেহ নয়, শুধু রূপগত নয়, যেন আরো অভিনব কিছু আছে মেহেলীর কাছে। ভয়ের লেশ নেই, ভাবনার এতটুকু রেশ নেই, পরম নিশ্চিন্তে সে পার হয়ে এসেছে টিজু নদীর ভয়ঙ্কর সীমানা। এমন মেয়ে নিঃসন্দেহে বিচিত্র; অদ্ভুত। সেঙাইর বন্য পাহাড়ী মন তার অর্ধস্ফুট বুদ্ধি দিয়ে পাহাড়ী কুমারীর এই বিচিত্রতা ধরতে পারে না। তবু নেশার মত এক আন্দোলন জেগেছে শিরায় শিরায়, স্নায়ুতে স্নায়ুতে।

একসময় সেঙাই বললো, "তুই চান কর। আমাদের ক্ষিদে পেয়েছে। আমরা যাই।"

সত্যি! পেটের মধ্যে ক্ষুধার ময়াল ফুঁসছে। ক্লান্ত দুটি পা রেঙকিলানের দিকে বাড়িয়ে দিলো সেঙাই।

তিন

উত্তরের পাহাড়টা যেখানে একটা খাড়াই বাঁক ঘুরে নীচের মালভূমিতে নেমে গিয়েছে, ঠিক সেইখানেই একটা বড় আরেলা ঝোপের পাশে বসে আছে ওঙলে আর পিঙলেই ; পড়ন্ত বেলার নিভু-নিভু রোদের রঙটুকু ছায়া ছায়া অন্ধকার নিঃশেষে শুষে নিয়েছে। এখন প্রাক্‌সন্ধ্যা। পশ্চিম পাহাড়চূড়ার আড়ালে হারিয়ে গিয়েছে দিনান্ত সূর্য। শুধু সেই আকাশ-ছোঁয়া চূড়াটা ঘিরে এখনও নিস্তেজ কিরণলেখা ছড়িয়ে রয়েছে।

গোটা পাঁচেক ঝরনা, দুটো জলপ্রপাত আর বনময় বিরাট মালভূমিটা ডিঙিয়ে উত্তরের পাহাড়ে চলে এলো সেঙাই আর রেঙকিলান।

ওঙলে বড় বড় টঘুটুঘোটাঙ পাতার ওপর কাঁচা চাল, ঝলসানো বাসি মাংস, কাঁচা লঙ্কা আর আদা সাজিয়ে বসে রয়েছে। বাঁশের চোঙায় ভর্তি রয়েছে উত্তেজক পানীয়। হলদে রঙের রোহি মধু।

একটি কথা বললো না সেঙাই। খাবারগুলোর দিকে তাকিয়ে একটা অস্ফুট উল্লাসের শব্দ উঠলো মাত্র। তারপর টঘুটুঘোটাঙ পাতার ওপর ক্ষুধার্ত শ্বাপদের মত ঝাঁপিয়ে পড়লো।

থাবায় থাবায় কাঁচা চাল মুখে তুলছে সেঙাই। সেই সঙ্গে আদা, কাঁচা লঙ্কা, আর খণ্ড খণ্ড মাংস। একসময় খাদ্য নিঃশেষ হয়ে গেলো। তারপর বাঁশের বিশাল পানপাত্রটা ঠোঁটের ওপর তুলে নিলো সে। একটি মাত্র রুদ্ধশ্বাস চুমুক। রোহি মধুর শেষ বিন্দুটি পর্যন্ত শুষে নিয়েছে সে।

খাওয়ার পর্ব সমাপ্ত হলো। পরিতৃপ্তির একটা ঢেকুর তুললো সেঙাই।

আচম্‌কা ওঙলেদের দৃষ্টি পড়লো রেঙকিলানের দিকে। মোটা মোটা আঙুলগুলো দিয়ে টঘুটুঘোটাঙ পাতার খাবারগুলো সে নাড়াচাড়া করছে। মাংস আর রোহি মধুর পাত্র তেমনি পড়ে রয়েছে। একটি বিন্দুও সে স্পর্শ করে নি। পিঙ্গল চোখদুটো অস্বাভাবিক লাল হয়ে উঠেছে রেঙকিলানের। হাত-পা থরথর করে কাঁপছে।

সন্ত্রস্ত গলায় ওঙলে বললো, "কী রে রেঙকিলান, কী হয়েছে তোর? খাচ্ছিস না যে। শরীর খারাপ না কি?"

এবার সেঙাইর গলা থেকে বিন্দু বিন্দু বিরক্তি ঝরলো, "কী জানি কী হয়েছে? বিয়ে করে একটা ছাগী হয়ে গিয়েছে ওটা। ওকে নিয়ে শিকারে গিয়ে একটা ভুলই করে ফেলেছি। কুত্তাটা একেবারে ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছে।"

একেবারে নিরুত্তর রইলো রেঙকিলান। শুধু আশ্চর্য নিহত দৃষ্টিতে সকলের দিকে তাকাতে লাগলো সে। কিছুই যেন সে শুনতে পাচ্ছে না। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কতকগুলো ছায়া-ছায়া কথা, কতকগুলো ছায়া-ছায়া মুখ তার নিশ্চেতন দৃষ্টি আর শ্রুতির ওপর দিয়ে ভেসে বেড়াচ্ছে। মনের ওপর ক্ষীণ রেখাপাতও হচ্ছে না।

হা হা করে প্রচণ্ড অট্টহাসির লহর তুললো সেঙাই,. "একেবারে বোবা মেরে গেছে রে ছাগীটা। কেলুরি বস্তির মোরাঙের নাম ডোবাবে। থুঃ—থুঃ—থুঃ—"

একদলা থুথু রেঙকিলানের সারা গায়ে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দিলো সেঙাই, "থুঃ—থুঃ—থুঃ।"

বিস্মিত গলায় ওঙলে বললো, "কী হলো রে সেঙাই?"

"কী হয় নি বল্? ছাগীটাকে নিয়ে একটা সম্বরের খোঁজে নদীর ওপারে গেছলাম।"

"কোথায়? সালুয়ালাঙ বস্তিতে?" চীৎকার করে উঠলো ওঙলে। আতঙ্কে চোখদুটো ঠিকরে বেরিয়ে আসবে যেন তার।

"হু-হু। তা কী হয়েছে? তুইও দেখি রেঙকিলানের মত ভীতু মেরে যাচ্ছিস!" সেঙাইর কণ্ঠ থেকে অবজ্ঞা ঝরলো।

"আরে না, না, তেমন বংশের ছেলে আমি না। আমিও খোখিকেসারি বংশের ছেলে। আমার জেঠা হলো খাপেগা। মুখ সামাল দিয়ে কথা বলবি সেঙাই।" গর্জে উঠলো ওঙলে। ভীরু! এই অন্যায় অপবাদ তার বন্য পৌরুষকে রীতিমত আহত করেছে।

ওঙলের দিকে একবার তির্যক চোখে তাকালো সেঙাই। একটা ক্ষ্যাপা চিতাবাঘের মত দুর্বার আর ভয়ঙ্কর ওঙলে। ওকে ঘাঁটানো সুবিধের হবে না। সাঁ করে একটা বর্শা নির্বিকার ছুঁড়ে বসতে পারে ওঙলে।

দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ করে উঠলো সেঙাই। তারপর চাপা গলায় বললো, "আচ্ছা কেমন মরদ, কাজের সময় দেখা যাবে।"

"দেখিস্।"

"আচ্ছা যেতে দে ও কথা।" সেঙাই নিজে থেকেই সন্ধি পাতালো, "তারপর যা বলছিলাম। সম্বরটার তল্লাসে তো গেলাম সালুয়ালাঙে। আমি বর্শা দিয়ে ফুঁড়বার আগে একটা চিতাবাঘ এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো সম্বরটার ঘাড়ে।"

"তাই বলি তুপুরবেলা বাঁশের চাঁচারিতে শব্দ করলাম কতবার। তোদের কোন সাড়াই নেই। ভাবলাম, ব্যাপার কী?" আরেলা ঝোপটার পাশ থেকে বলে উঠলো পিঙলেই, "আবার তুপুর পেরিয়ে যখন বিকেল হলো, তখন চাঁচারি বাজালাম। তোদের সাড়া নেই, শব্দ নেই। আমরা তো ঘাবড়েই গেছলাম। ওঙলে আর আমি ঠিক করলাম, তোদের তল্লাসে বেরুবো। তারপর ঠিক পড়ন্ত বেলায় বস্তির ছেলেরা যখন গোরু-ছাগল-মোষ নিয়ে ঘরে ফিরছে, ঠিক তখন তোদের চাঁচারির শব্দ পেলাম।"

"আরে যেতে দে, যেতে দে ওসব কথা। একটা কাণ্ড হয়েছে। সে কথা শোন্। আমার যা আনন্দ হচ্ছে, তা কী আর বলবো?" তুটো পা ছড়িয়ে বেশ তরিবত করে বসলো সেঙাই।

"না, না এখন না। এখন গল্প বললে হবে না। মোরাঙে গিয়ে তোর গল্প শুনবো সকলে মিলে। বড় শীত করছে সেঙাই। তা ছাড়া সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে। চড়াই-উতরাই ডিঙিয়ে, বনবাদাড় ঠেঙিয়ে যেতে যেতে রাত্তিরে খাবার সময় পার হয়ে যাবে। বড় শীত সেঙাই।" হি হি করে কাঁপা গলায় বললো ওঙলে।

শীতের সন্ধ্যা। বাতাসে যেন গুঁড়ো গুঁড়ো হিম উড়ছে। মহাশূন্যের অন্ধকার ঘন থেকে ঘনতর হয়ে নামছে নাগা পাহাড়ের ওপর।

সেঙাই বললো, "তাই ভালো। বড় শীত করছে। মোরাঙে ফিরে আগুনের ধারে বসে বসে গল্প বলবো'খন।"

শীতের বাতাসে যেন তীক্ষ্ণধার দাঁত বেরিয়েছে। অনাবৃত দেহের ওপর কেটে কেটে বসছে তার নির্মম দংশন। আকাশে একটা একটা করে বিবর্ণ তারা ফুটতে শুরু করেছে। আর মাঝে মাঝে দমকা বাতাস সাঁ সাঁ করে আছড়ে পড়ছে নিবিড় বনদেহে।

তিনজনে আরেলা ঝোপটার পাশ থেকে উঠে দাঁড়ালো। একটা নিষ্প্রাণ শিলামূর্তির মত এখনও স্থির হয়ে বসে রয়েছে রেঙকিলান। এক কণা খাদ্যও সে জিভ দিয়ে স্পর্শ করে নি। রোহি মধুর পাত্রটা তেমনি অবজ্ঞাত হয়ে পড়ে রয়েছে।

সেঙাই বললো, "কী রে, কী হলো তোর? বস্তিতে ফিরবি না!"

নির্ভাব চোখে তাকালো রেঙকিলান। কিছু সময় তাকিয়েই রইলো। তারপর ফিসফিস গলায় বললো, "আমি উঠতে পারছি না সেঙাই। শরীরটা বড় ভারী লাগছে। আমাকে টেনে তোল তোরা।"

হো হো করে শীতের সন্ধ্যাকে কাঁপিয়ে, নাগা পাহাড়ের উপত্যকাকে দুলিয়ে দুলিয়ে হেসে উঠলো ওঙলে, সেঙাই আর পিঙলেই। "নাঃ, একেবারেই আনিজাতে পেয়েছে ছাগীটাকে।"

"আনিজা!" আর্তনাদ করে উঠলো রেঙকিলান, "আনিজা!" গলাটা শুকিয়ে উঠছে। বুকের মধ্যটা যেন জ্বলতে জ্বলতে খাক হয়ে যাচ্ছে।

রেঙকিলানের আর্তনাদে স্তব্ধ হয়ে গেলো তিনজন। সেঙাই, পিঙলেই আর ওঙলে। তারপর নিঃশব্দে তিনখানা হাত বাড়িয়ে দিলো। তিনটে হাতের আশ্রয়ে নিজেকে ঢেলে দিলো রেঙকিলান। তারও পর খাড়াই পাহাড়ের ঢালু বেয়ে বেয়ে নিচের দিকে নামতে লাগলো।

নিচের মালভূমিতে এখন গাঢ় অন্ধকার। জটিল বনের আঁকিবুকি। এই মালভূমি পেরিয়ে দক্ষিণের পাহাড়। সেই পাহাড়ের চড়াইতে সেঙাইদের গ্রাম।

এর মধ্যে কুয়াশা ঝরতে শুরু করেছে থরে থরে। অবিরাম। অবিশ্রাম। আর এই কুয়াশার স্তরের নীচে হারিয়ে গিয়েছে নাগা পাহাড়। কদাচিৎ দু একটা মিটমিট তারার চোখ নজরে আসে।

বনের মধ্যে চারদিকে জোড়া জোড়া নীল আগুন ঘুরপাক খাচ্ছে। বাঘের চোখ, ময়ালের দৃষ্টি। কখনও মুমূর্ষু গলায় আর্তনাদ করে উঠছে একটা নিরীহ হরিণ। নির্ঘাত তার ঘাড়ের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে কোন হিংস্র জানোয়ার। টানডেন্‌লা পাখি এই নিবিড় অন্ধকারে, নাগা পাহাড়ের এই ভয়াল শীতের রাত্রে প্রেতকণ্ঠে ককিয়ে উঠছে।

উপত্যকাকে মাতিয়ে মাতিয়ে কলোল্লাসে নামছে জলপ্রপাত। গমগম শব্দ বিভীষিকার মত ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

নীরন্ধ্র অন্ধকার। যেন কঠিন হিমস্তূপের মধ্য দিয়ে পথ কেটে কেটে এগিয়ে চলেছে চারটে পাহাড়ী মানুষ। মাঝে মাঝে বাঘ গর্জাচ্ছে। সাঁ করে উল্কার মত সরে সরে যাচ্ছে বন্য সাপ। অনাবৃত শরীরের ওপর উড়ে উড়ে বসছে বিষাক্ত পতঙ্গ। তাদের তীক্ষ্ণ হুলে জ্বলে জ্বলে যাচ্ছে বুক-পিঠ, হাত-পা।

এক সময় মালভূমিটা পার হয়ে এলো চারজনে। মাঝখানে রেঙকিলান, সামনে সেঙাই, পেছনে ওঙলে আর পিঙলেই।

চাপা গলায় সেঙাই বললো, "আরো আগে বস্তিতে আসা উচিত ছিলো। বড় দেরি হয়ে গেছে।"

"হু, হু।" ওঙলে মাথা নাড়িয়ে সায় দিলো।

আবার কিছুক্ষণ চুপচাপ। শুধু পাহাড়ী ঘাসের ওপর দিয়ে চার জোড়া পায়ের সন্ত্রস্ত পদধ্বনি বাজতে লাগলো।

এক সময় রেঙকিলান ফিসফিস গলায় বললো, "আমার বড় ভয় করছে সেঙাই। বড় ভয় করছে। আরো জোরে আমাকে চেপে ধর।"

আগের মত সেঙাই এবার আর মস্করা করলো না। কণামাত্র ব্যঙ্গ কি ঠাট্টা নয়। চকিত গলায় সে বললো, "কী ব্যাপার রেঙকিলান?"

"আমি একটা মিছে কথা বলেছিলাম তোকে!" অস্ফুট শোনালো রেঙকিলানের কণ্ঠ। অস্বাভাবিক আতঙ্কে গলাটা যেন বুজে বুজে আসছে তার।

"কী মিছে কথা বলেছিলি?"

প্রায় স্বগতোক্তি করলো রেঙকিলান, "সে কথা আমি বলতে পারবো না। সে কথা বললে তোরা আমাকে মেরে ফেলবি।"

রেঙকিলানের ফিসফিসানি কেউ শুনতে পেলো না। ওঙলে না, সেঙাই না, পিঙলেই না। এমন কি রেঙকিলান নিজেই হয়তো শোনে নি। শুধু তার মর্মের তারে তারে এক তীব্র তীক্ষ্ণ আতঙ্কের ধ্বনি তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে। আনিজা! আনিজা! দূর পাহাড়চূড়া থেকে বনদেবীর অভিশাপ তাকে লক্ষ্য করে যেন উদ্যত হয়ে রয়েছে।

আচমকা দক্ষিণ পাহাড়ের খাড়াই উতরাই থেকে একটা সুতীক্ষ্ণ শব্দ ভেসে এলো। শব্দটা ঘনবনের পাতায় পাতায় স্পন্দিত হচ্ছে। উৎকর্ণ হয়ে চারটে পাহাড়ী মানুষ শুনলো।

শেষমেষ চমকে উঠলো রেঙকিলান। নাঃ, এতটুকু ভ্রান্তি নেই, এতটুকু বিভ্রম নেই। একেবারেই নিঃসংশয় হলো রেঙকিলান। এ শব্দে বাতাসের কারসাজি নেই, এ শব্দ একটি মানবীর কণ্ঠ। সে মানবীর নাম সালুনারু। সালুনারু তার বউ। এই মুহূর্তে ঐ শব্দের মধ্যে সালুনারুর কণ্ঠ আবিষ্কার করে চকিত হয়ে উঠলো রেঙকিলান।

আবার সেই তীক্ষ্ণ অথচ করুণ আওয়াজ ভেসে এলো। পাহাড়ী উপত্যকায় উপত্যকায় সে আওয়াজ একটা আর্ত গানের মত ছড়িয়ে পড়লো।

সেঙাই বললো, "কে যেন ডাকছে?"

"হু-হু—ও নির্ঘাত সালুনারু।" রেঙকিলান বললো।

সকালে শিকারে বেরুবার পর থেকে সালুয়ালাঙ গ্রামে গিয়ে একটু আগ পর্যন্ত একেবারে নিভে ছিলো রেঙকিলান। তার ধমনীতে রক্ত আবার উত্তরঙ্গ হয়ে উঠলো। সতেজ হলো রেঙকিলান। আজ সকাল থেকে অস্বাভাবিক এক অপঘাতের পর নতুন জীবনের অঙ্গীকার সে পেয়েছে এইমাত্র। সেঙাইরা আছে পাশে। কিন্তু তাদের বিশ্বাস নেই। কাল রাত্রির অনাচারের কথা জানামাত্র তাকে বর্শা দিয়ে চৌফালা করে ফেলবে তারা। একমাত্র সালুনারু নিরাপদ; তার আশ্রয়ে উষ্ণ আশ্বাস আছে। সালুনারু নির্বিপদ, নির্বিপাক। সেই সালুনারুই তাকে পাহাড়ের চড়াই-উতরাইতে ডেকে ডেকে ফিরছে। দেহমন থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের মত সব ভয়, সব আতঙ্ক ঝরে গেলো এক ঝাঁকানিতে। পুনর্জীবনে ফিরে এলো রেঙকিলান।

সেঙাই বললো, "কী রকম একটা শব্দ, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে ওটা মানুষের গলাই। ও কি সালুনারু?"

"হু-হু, ও সালুনারু। আমি যাচ্ছি। তোরা বস্তিতে যা, আমি বউকে নিয়ে ফিরবো।" রেঙকিলানের গলাটা খুশী-খুশী হয়ে উঠেছে।

"ভয় করবে না তো! কী রে ছাগী!". সেঙাইর গলায় কৌতুক রয়েছে, "খুব সোয়ামী হয়েছিস বটে!"

"যা যা, বেশী ফ্যাকফ্যাক করতে হবে না।" এক সময় স্বগতের মত অস্পষ্ট হয়ে এলো রেঙকিলানের কণ্ঠ, "গলাটা সালুনারুর তো!"

তারপর তীরের মত দক্ষিণ পাহাড়ের খাড়া উতরাইএর দিকে মিলিয়ে গেলো সে।

পেছনে তিনটি বন্য গলায় উৎকট অট্টহাসি বেজে উঠলো। ওঙলে, সেঙাই আর পিঙলেই—তিনজনেই সারা দেহ দুলিয়ে দুলিয়ে হাসছে।

চার

আকাশ থেকে শীতের বিকেল তখনও খানিকটা আলো দিচ্ছিল। এই পাহাড়ে, এই উপত্যকায়, এই মালভূমির ওপর রোদের সোনা ছড়াচ্ছিল। নিঃশব্দ ঝরনা-রেখাটির পাশে বসে বসে আজকের এই পাহাড়ী পৃথিবীটাকে বড় মধুর লাগছিল মেহেলীর। এই নিবিড় বন, সাপেথ কুঞ্জের পাশ দিয়ে এই নিরুচ্ছ্বাস জলধারা, বিকেলের মোহন রোদ—সব যেন আশ্চর্য রূপময় হয়ে উঠেছে।

একটু আগে তার দিকে বর্শা উঁচিয়ে ধরেছিলো সেঙাই ; তাদের শত্রু-পক্ষের ছেলে। জোহেরি বংশের উদ্ধত যৌবন। তামাভ দেহ. কানে নীয়েঙ গয়না। পিঙ্গল চোখে ভয়াল সৌন্দর্য। সেঙাইএর সম্বন্ধে অনেক গল্প সে শুনেছে লিজোমুর কাছে, পলিঙার কাছে। তাদের ছোট পাহাড়ী জনপদ সালুয়ালাঙের অনেক কন্যাকুমারী সেঙাইএর রূপে মাতাল। দূর থেকে দেখেই একেবারে মজে গিয়েছে তারা। তাদের মুখে সেঙাইএর গল্প শুনে শুনে কামনায় আর চেতনায় একটা রমণীয় ছবি এঁকেছে মেহেলী। আজ প্রথম সে দেখলো শত্রুপক্ষের যৌবনকে। সেঙাইকে। তার কামনার মানুষটিকে।

চারদিকে একবার চনমন চোখে তাকালো মেহেলী। আশ্চর্য! সেঙাই নেই। একটু আগে এই নিঝুম ঝরনা, এই নিবিড় বন, এই খাড়াই উপত্যকার পটভূমি থেকে কী এক কুহকে যেন মুছে গিয়েছে সে। যে পথ দিয়ে সেঙাই চলে গিয়েছে, সেদিকে অনেক, অনেকক্ষণ আবিষ্ট নজরে তাকিয়ে রইলো মেহেলী। তারপর একটা পাহাড়ী ময়ালের মত ফোঁসফোঁস করে ঘন ঘন কয়েকটা নিঃশ্বাস ফেললো।

বিকেলের রঙ পাণ্ডুর হয়ে আসছে। আর একটু পরেই শীতের সন্ধ্যা নামবে এই পাহাড়ে। এইবার উঠতে হবে। টিজু নদীর ওপারে তারই জন্যে অপেক্ষা করছে পলিঙা আর লিজোমু।

টানভেন্‌লা পাখির মত আরো কিছুক্ষণ ছিটিয়ে ছিটিয়ে সারা শরীরে জল মাখলো মেহেলী। তারপর পাথরের ওপর থেকে লাল রঙের 'কুমারী' কাপড়টা

তুলে কোমর থেকে জঙ্ঘা পর্যন্ত ঝুলিয়ে দিলো। তারও পর সাপেথ কুঞ্জের কিনার দিয়ে দুলতে দুলতে টিজু নদীর দিকে পা চালিয়ে দিলো।

টিজু নদী পেরিয়ে বাঁ দিকের বিশাল উপত্যকায় পলিঙাদের সঙ্গে মুখোমুখি হলো মেহেলী। পলিঙা আর লিজোমু পাহাড়ী অরণ্য থেকে অজস্র টঘু টুঘোটাঙ ফুল তুলে এনেছে। আতামারী লতায় বুনে বুনে সেই ফুল দিয়ে ঘাগরা বানিয়ে পরেছে। কানে, চুলে খুশিমত সেই বাহারী ফুল গুঁজে গুঁজে নিজেদের রূপবতী করে তুলেছে।

পলিঙা বললো, "কী লো মেহেলী, তোর চান হলো।"

"হলো তো।"

"রোজ রোজ তুই কেলুরি বস্তির ঝরনায় চান করতে যাস। কী মজা আছে সেখানে? কারুকে লগোয়া পন্যু (প্রেমিক) পেয়েছিস না কি?" তির্যক চোখে তাকালো লিজোমু।

মিটিমিটি হাসলো মেহেলী; দু চোখের পিঙ্গল মণিতে খুশির আলো জ্বলছে। প্রথমে কোন কথা বললো না সে। একেবারেই নিরুত্তর রইলো।

"হাসলে চলবে না মেহেলী, ওপারে তুই মনটা হারিয়ে ফেলেছিস, মনে লাগছে। কিন্তু সাবধান, ওরা এ বস্তির শত্রুপক্ষ। একবার দেখলে একেবারে ফুঁড়ে ফেলবে বর্শা দিয়ে।"

"ফুঁড়বে কেন? পিরীত করবে।" রহস্যময় গলায় খিকখিক করে হেসে উঠলো মেহেলী।

সংশয়ের চোখে তাকালো লিজোমু, "পিরীত করবে!"

"করবে লো, করবে। আমার সঙ্গে একদিন ওপারে গিয়ে দেখিস। তোরও একটা লগোয়া পন্যু (প্রেমিক) জুটিয়ে দেবো।" পাহাড়ী মেয়ে মেহেলী; তার চোখ দুটো আতামারী ফলের দানার মত চকচক করে উঠলো, "সত্যি বলছি, কেলুরি বস্তির ছোঁড়ারা বড় ভালো।"

"কেন? আমার লগোয়া পন্যু (প্রেমিক) নেই? খোন্‌কে আছে না? তোর দাদা লো তোর দাদা! তোর দাদাকে আমি পিরীত করি জানিস না?" ফোঁস করে উঠলো লিজোমু।

"খোন্‌কেকে পিরীত করিস, তা তো জানি। পাহাড়ী মাগী তুই; মাত্র একটা পুরুষকে নিয়ে খুশী থাকতে পারবি?" বাঁকা চোখে তাকালো মেহেলী; তারপর আউ পাখির মত ঘাড় কাত করে খিকখিক শব্দে হেসে উঠলো,

"অনেক পুরুষকে একসঙ্গে মাতিয়ে দিবি। মজাবি। তারপর এক পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখবি। তু বস্তিতে দাঙ্গা বাধাবি, রক্তে লাল হয়ে যাবে পাহাড়। তা না হলে কী জোয়ান মাগী হলি!"

সাঁ করে একটা লোহার মেরিকেতসু তুলে ধরলো লিজোমু, "মাথা একেবারে ছেঁচে দেবো মাগী; তেমন লগোয়া লেন্যু (প্রেমিকা) আমাকে পাস নি মেহেলী। তোর দাদা ছাড়া আর কোন ছোঁড়ার সঙ্গে আমি পিরীত করেছি? এত ছোঁড়া তো আছে আমাদের সালুয়ালাঙ বস্তিতে!"

"আরে যেতে দে ওসব কথা। আচ্ছা মেহেলী, নদীর ওপারে রোজ রোজ কী স্বোয়াদ পেতে যাস বল্ দিকি, শুনি।" শান্ত মেয়ে পলিঙা সন্ধি পাতালো।

"হু-হু", একবার ধারালো চোখে লিজোমুর দিকে তাকিয়ে নিলো মেহেলী। তারপর বললো, "তোরা যার গল্প করিস, আজ তার দেখা পেয়েছি। সেঙাইকে দেখলুম আজ ঠিক হুই ঝরনাটার পাশে।"

"বলিস্ কী?"

এবার অন্তরঙ্গ হয়ে বসলো পলিঙা।

"তারপর?" লিজোমুও মেরিকেত্সুটা এক পাশে রেখে ঘনিষ্ঠ হয়ে এলো।

একটু আগের সমস্ত কাহিনী বললো মেহেলী, "সত্যি ভাই, দেখেই আমার মন মজে গেছে। ওকে ভাই পেতেই হবে। একটা বুদ্ধি দে তোরা।"

লিজোমু বললো—চোখ দুটো তার ঝকঝক করছে—, "আচ্ছা, সেঙাই একবার ছুঁয়েও দেখলো না তোকে? তোর স্বোয়াদ একটু চেখেও নিলো না?"

"চেখে দেখলে তো মনের জ্বলুনি কমতো। ওকে না পেলে সারা দিনরাত জ্বলে মরবো। মনে হচ্ছে, সেঙাইকে জড়িয়ে ধরি, আঁচড়াই, কামড়াই। তোরা বল্ তো কী করি?" ব্যাকুল দুটি চোখ তুলে তাকালো মেহেলী, "আমার সঙ্গে যাবি কাল ঝরনাটার পাশে? কী লো লিজোমু? কী লো পলিঙা, যাবি?"

"না, যাবো না। আমাদের অত সাহস নেই। আচমকা বর্শা ছুঁড়লে নির্ঘাত মরে যাবো। জোয়ান বয়স, এখন তোর জন্যে মরবার ইচ্ছা নেই। ঘর বাঁধবো, পুরুষ চাখবো, ছেলেপুলে হবে। এমনি এমনি ভাই মরতে সাধ হয় না।" নিস্তেজ গলায় বলে উঠলো লিজোমু, "তবে সেঙাই বড় খাসা পুরুষ—"

"কী করি বল্ তো? এখন আমি কী করি?" অথৈ হতাশা থেকে মেহেলীর কথাগুলো যেন ভেসে উঠলো।

সহসা পলিঙা বললো, "উত্তর পাহাড়ে এক বুড়ী ডাইনী আছে। সে অনেক ওষুধ জানে, পুরুষ বশ করার অনেক মন্তর জানে। তার কাছে চল্। সে ঠিক বলে দেবে, কী করতে হবে!"

ছিলাকাটা ধনুকের মত উঠে দাঁড়ালো মেহেলী, "চল্, এখুনি যাবো।"

লিজোমু আর পলিঙাও উঠে দাঁড়িয়েছে। লিজোমু বললো, "তোরা যা, আমি যেতে পারবো না। সারাদিন খোন্‌কের দেখা পাই নি। এখন তার খোঁজে যাবো। সেঙাইকে তুই পেলি মেহেলী, বড় তাগড়া জোয়ান সে—"

"বস্তিতে যা তুই। আমরা উত্তর পাহাড়ে ডাইনী বুড়ীর খোঁজে যাবো।"

সালুয়ালাঙ গ্রামের দিকে চলে গেল লিজোমু। আর উত্তর পাহাড়ের নিবিড়-বন চড়াইর দিকে পা বাড়িয়ে দিল মেহেলী আর পলিঙা। দুটি পাহাড়ী যুবতী। দুটি বন্য আপোজি (বান্ধবী)।

বাদামী পাথরের মধ্যে ছোট্ট একটি সুড়ঙ্গ। চারপাশে উদ্দাম বন। সুড়ঙ্গের মুখ থেকে স্বচ্ছন্দে প্রবেশের জন্য বন সংহার করা হয়েছে অনেকটা। জনপদ থেকে অনেক, অনেক দূরে এই সুড়ঙ্গ হলো ডাইনী নাকপোলিবার আস্তানা।

সুড়ঙ্গের মুখে এসে থমকে দাঁড়ালো পলিঙা আর মেহেলী। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন থরথর করে কেঁপে উঠলো। তীব্র আতঙ্কে চেতনাটা যেন ছম-ছম করছে। আকাশ থেকে শীতের অসহ্য সন্ধ্যা নামছে থরে থরে। দাঁড়িয়েই রইলো দুজনে। একেবারেই নিথর। একেবারেই নিস্পন্দ।

সুড়ঙ্গের মুখে কপিশ রঙের আলো এসে পড়েছে ভেতর থেকে। সমস্ত পরিবেশটা আশ্চর্য ভৌতিক। চারপাশে ছায়ারা কাঁপছে। খাসেম বন আর বুনো কলার পাতারা দুলছে প্রেতের মত। পালিয়েই আসতো পলিঙা আর মেহেলী।

আচমকা সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে একটি কর্কশ কণ্ঠ ছিটকে বেরিয়ে এলো, "কে? কে ওখানে?"

"আমরা পিসী। মেহেলী আর পলিঙা এসেছি।" থরথর করে কেঁপে উঠলো পলিঙার গলা, "তোর সঙ্গে দরকার আছে।"

"ভেতরে আয় শয়তানের বাচ্চারা।" সুড়ঙ্গের মধ্যে গলাটা এবার মোলায়েম হলো।

হামাগুড়ি দিয়ে সুড়ঙ্গপথ ধরে ভেতরে চলে এল মেহেলী আর পলিঙা।

ভেতরটা একটা প্রশস্ত গুহার মত। তিনদিকে নিশ্ছেদ পাথরের দেওয়াল। অমসৃণ মেঝে। আর সামনের দিকে সুড়ঙ্গপথ। মেঝের এদিক-সেদিক ইতস্তত ছড়ানো শুষ্ক পাতা, মানুষ আর মোষের হাড়। যুচোঙস্যু গুটসুঙ পাখির বাদামী রঙের কঙ্কাল। বাঁশের পাত্র, কাঠের মাচান। পাথরের খাঁজে খাঁজে আগুন জ্বালিয়ে এই ভয়ঙ্কর পাহাড়ী গুহায় খানিকটা উত্তাপ সৃষ্টি করেছে ডাইনী নাকপোলিবা।

এক পাশে একটা কপিশ রঙের পাথরের ওপর বসে ছিলো নাকপোলিবা। কাছাকাছি একটা পেন্যু কাঠের মশাল জ্বলছে। স্তিমিত আর স্নিগ্ধ আলোতে রহস্যময় হয়ে উঠেছে গুহাটা। সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে নাকপোলিবার নগ্ন দেহে, ছড়িয়ে পড়েছে কুঞ্চিত মুখের ভাঁজে ভাঁজে, একমাথা রুক্ষ চুলে। সাপের জিভের মত লিকলিক করছে জটিল চুলগুলো।

নাকপোলিবার বয়স যে কত, তার হিসাব আশেপাশের তিনটে পাহাড়ের এতগুলি জনপদের প্রাচীনতম মানুষটাও জানে না। সকলেই তাদের ঠাকুরদা কি ঠাকুরমার কাছে তার গল্প শুনেছে।

গালের মাংস ঝুলে পড়েছে নাকপোলিবার, কোমরটা বেঁকে গিয়েছে ধনুকের মত। কিছুক্ষণ দপদপ চোখে মেহেলী আর পলিঙার দিকে তাকিয়ে রইলো সে। তারপর কদর্য গলায় বললো, "নির্ঘাত তোরা পিরীতের ওষুধ নিতে এসেছিস ?"

"হু-হু।" মেহেলী আর পলিঙা মাথা ঝাঁকালো।

হিসহিস করে উঠলো নাকপোলিবা, "পুরুষ মানুষ বশ করতে পারিস না তো কী পাহাড়ী মাগী হয়েছিস ? মরদ মজাতে ওষুধ লাগে ! ইজা রামখো !"

একটা নিরাপদ ব্যবধান রেখে বসেছে মেহেলী আর পলিঙা। পাণ্ডুর গলায় মেহেলী বললো, "কী করবো ? আজ প্রথম দেখলাম। হুই কেলুরি বস্তির ছেলে সেঙাই। ওকে আমার চাই। আমাকে ওষুধ দে তুই। কী করবো বল্ ?"

"কেলুরি বস্তির ছেলে সেঙাই, আর তুই কোন বস্তির ?"

"আমি সালুয়ালাঙের মেহেলী।"

"তোদের দু বস্তিতে তো খুব ঝগড়া। খিক—খিক—খিক—" বিচিত্র গলায় হেসে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা। তার হাসি এই পাহাড়ী গুহায় অত্যন্ত ভয়ানক শোনালো।

"পিরীত তো করলি শত্রুদের জোয়ানের সঙ্গে! তা রোজ দেখা হবে তো?" বাদামী একটি করোটিতে হাত বুলোতে বুলোতে বললো ডাইনী নাকপোলিবা। তার চোখ দুটো ধিকিধিকি জ্বলছে।

মেহেলী তাকালো পলিঙার দিকে। মেহেলীর চোখের ইঙ্গিতটুকু বুঝলো পলিঙা। সে বললো, "যাতে মেহেলীর সঙ্গে সেঙাইর রোজ দেখা হয়, সেই ব্যবস্থাটা করে দে। সেই জন্যই তো এলুম তোর কাছে।"

"আমার ওষুধে এমনি কাজ হবে না। সেঙাইর গায়ে আমি যে ওষুধ দেবো, তা যদি ছোঁয়াতে পারিস, তবে বশ হবে। তাকে আটক করে আমার কাছে আসবি। বুঝেছিস?" রুক্ষ চুলের গোছা দোলাতে দোলাতে সামনের দিকে চলে এলো বুড়ী ডাইনী নাকপোলিবা। তারপর কঙ্কাল হাতখানা মেহেলীর গালের ওপর বিছিয়ে দিলো, "কী লো পাহাড়ী জোয়ানী, মনটা বড় জ্বালা-পোড়া করছে? আচ্ছা, আচ্ছা, আগে তো সেঙাইকে আটক কর, তারপর এমন ওষুধ দেবো, তোর গায়ে একেবারে জোঁকের মত সেঁটে থাকবে সে। আর একটা কথা, ওষুধের দাম আনবি চারটে বর্শা আর দু খুদি (আড়াই সেরের মত) ধান। খিক—খিক—" আবারও সেই বিচিত্র হাসিতে এই নিভৃত গুহাটিকে ভয়ঙ্কর করে তুললো ডাইনী নাকপোলিবা।

খানিকটা পর সালুয়ালাঙ গ্রামে এসে পড়লো মেহেলী আর পলিঙা। এখান থেকেই মোরাঙের চারপাশে উদ্দাম শোরগোল শোনা যাচ্ছে।

আকাশ থেকে শীতরাত্রির ঘন অন্ধকার ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়েছে নীচের অরণ্যে।

মেহেলী ভীত গলায় বললো, "কী ব্যাপার লো পলিঙা?"

"কী জানি।"

দ্রুত পা চালিয়ে খোখিকেসারি কেসুঙের কাছাকাছি চলে এলো দুজনে। ঘর থেকে একটা মশাল নিয়ে বেরিয়ে আসছে লিজোমু।

মেহেলী বললো, "এই লিজোমু, কী হয়েছে লো? এত হল্লা হচ্ছে কেন মোরাঙে?"

"খোন্‌কেকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়েছে।"

"দাদাকে ফুঁড়েছে কে?" গলাটা কেঁপে উঠলো মেহেলীর।

"কে আবার? নির্ঘাত হুই কেলুর বস্তির লোক। যাদের সঙ্গে তোর এত পিরীত।" মশালের আলোতে পাহাড়ী মেয়ে লিজোমুর চোখ দুটো জ্বলে উঠলো।

শিউরে উঠলো মেহেলী, "বলিস কী? কে বললে কেলুরি বস্তির লোকেরা দাদাকে ফুঁড়েছে?"

ভয়ঙ্কর চোখে মেহেলীর দিকে তাকিয়ে ফুঁসে উঠলো লিজোমু, "কে আবার বলবে রে শয়তানের বাচ্চা, সদ্দার বলেছে। এ কাজ নির্ঘাত হুই কেলুরি বস্তির রামখোদের। আহে ভু ঠেলো! আখ্‌, গিয়ে, মোরাঙের ওপাশে বসে আমাদের বস্তির জোয়ানেরা বর্শা শানাচ্ছে।"

"কেন?"

"সদ্দার হুকুম দিয়েছে কেলুরি বস্তির শয়তানগুলোকে বাগে পেলে সাবাড় করতে। হু-হু—"

কোন কথা বললো না মেহেলী। তার পাশে নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলো পলিঙা।

একটু পরেই ডুকরে উঠলো লিজোমু, "আপোটিয়া! হু-হু, এবার আমার কী হবে? খোন্‌কে যদি হুই বর্শার খোঁচায় সাবাড় হয়ে যায়, তা হলে আমি কোথায় পিরীতের জন্যে মরদ পাবো? তুই তো কেলুরি বস্তির সেঙাইকে বাগিয়ে নিলি মেহেলী—"

লিজোমুর কান্না একটু একটু করে উত্তাল হয়ে উঠতে লাগলো। তার সারাটি দেহ ফুলছে। কাঁপছে।

লিজোমুর কান্না শুনতে শুনতে একেবারে শিলীভূত হয়ে গেলো মেহেলী আর পলিঙা।

পাঁচ

এই মোরাঙ।

মোরাঙ মানেই গ্রামের প্রতিষ্ঠা। গ্রামের মর্যাদা। গ্রামের কৌলীন্য।

কেলুরি গ্রামে তিনটে মোরাঙ। সেগুলোর মধ্যে এই মোরাঙটাই সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে কুলীন। সামনের দিকে অর্ধবৃত্তের আকারে বাঁশের দরজা। দরজার দুধারে অতিকায় দুটো মোষের মাথা বর্শার ফলায় গাঁথা রয়েছে। ওপরে সোনালী খড়ের নতুন চাল। চালের দুপাশে খড়ের গুচ্ছ দুলছে। দেওয়ালে দেওয়ালে অজস্র আঁকিবুকিতে মোষের রক্তের মাঙ্গলিক চিহ্ন। পৃথিবীর আদিমতম শিল্পলেখা।

দু পাশে হাত তিরিশেক লম্বা পাহাড়ী বাঁশের দেওয়াল। দেওয়ালের গায়ে বর্শায় ফোঁড়া রয়েছে বাঘের মুণ্ড, সম্বরের লেজ, মানুষের করোটি, হরিণ আর মোষের ছাল।

দরজা দিয়ে ঢুকেই বসার ঘর। তারপরেই প্রশস্ত পথরেখা চলে গিয়েছে প্রান্ত পর্যন্ত। সে পথের দু ধারে সারি সারি বাঁশের মাচান। গ্রামের অবিবাহিত ছেলেদের রাত্রির বিছানা এই মাচানগুলোর ওপর পাতা হয়। মাচানগুলোর নীচে রাশি রাশি বর্শা, তীর-ধনুক, ঢাল, মেরিকেতসু। নানা আকারের, নানা নামের ভয়াল-দর্শন সব অস্ত্রশস্ত্র। শত্রুর বর্শামুখ থেকে গ্রামরক্ষার সুনিপুণ আয়োজন। ত্রুটিহীন বন্দোবস্ত।

মোরাঙের বসার ঘরে একখানা বাদামী পাথরের আসনে বসে রয়েছে বুড়ো খাপেগা। তার পাশে সেঙাই, ওঙলে, পিঙলেই। সামনের দিকে গ্রামের জন পনেরো মানুষ।

সেঙাইরা শিকারে বেরিয়েছিলো রক্তলাল সকালে। নিশ্চয়ই তারা বল্লমের মাথায় পাহাড়ী জানোয়ার ফুঁড়ে নিয়ে আসবে। সেই আশায় আশায় বিকেল থেকে গ্রামের লোকেরা মোরাঙে জমায়েত হতে শুরু করেছিলো। কিন্তু কয়েক খণ্ড মাত্র মাংসের প্রত্যাশা তাদের নির্মমভাবে ব্যর্থ হয়েছে।

শীতের রাত্রি এই পাহাড়ের ওপর গহন হয়েছে, গভীর হয়েছে। মাংস-

লোভীরা অনেকেই উঠে চলে গিয়েছে যার যার ঘরের কবোষ্ণ শয্যায়। কার্পাস তুলোর দড়ি-পাকানো লেপের নীচে স্ত্রীর বুকের উত্তাপ দিয়ে রাত্রিটাকে মধুময় করে তোলার কামনায় অনেকে ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলো।

বাকী যারা, তাদের মাংসের চেয়েও বড় নেশা আছে। সে নেশা গল্পের নেশা। সে নেশা খাটসঙ কাঠের অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে তার চারপাশে নিবিড় হয়ে বসে আড্ডা জমাবার নেশা। আড্ডা আ॰ গল্পের আমেজে এক অপরূপ মৌতাত খুঁজে পায় পাহাড়ী মানুষেরা। সেই মৌতাত আরেলা ফুলের মত রঙদার হয়ে ওঠে দু-এক চুমুক রোহি মধুর প্রসাদ পেলে।

মা গি কাঠির পাথরে চকমকি ঠুকে আগুন জ্বালিয়েছে বুড়ো খাপেগা। তারপর দুটো পেন্স্যু গাছের ডালে সেই আগুন দিয়ে মশাল তৈরী করেছে। সমস্ত মোরাঙটা আলোর বন্যায় কানায় কানায় ভরে গিয়েছে। পেন্স্যু গাছের শাখায় স্নেহরস আছে। তাই তার আলো উগ্র নয়। সে আলো আশ্চর্য স্নিগ্ধ, আশ্চর্য শান্ত।

পেন্স্যু গাছের মশাল দুটির চারপাশে বৃত্তাকারে বসেছে অনেকগুলো পাহাড়ী মানুষ। সকলের সামনেই বাঁশের চোঙায় রোহি মধু। মাঝে মাঝে তরিবত করে সেই পানপাত্রে সুখী সুখী চুমুক দিচ্ছে কেউ কেউ। মশালের এই মনোরম আলো, মাঝখানে খাটসঙের অগ্নিকুণ্ড থেকে মধুর উত্তাপ, আর রোহি মধুর আস্বাদ—সব মিলিয়ে শীতের রাত্রিটা বড় উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

একজন দুজন করে খাওয়ার পালা চুকিয়ে অবিবাহিত ছেলেরা মোরাঙে ফিরে আসতে শুরু করেছে। বাইরে শীতের রাত্রি নির্মম হয়ে উঠছে।

বাদামী পাথরের রাজাসন থেকে খাপেগা বললো, "আজ রাতে বরফ পড়বে মনে হচ্ছে।"

সকলে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সমর্থন জানালো. "হু-হু, ঠিক।"

খাপেগা আবারও বললো, "আজ শিকার করে কিছুই আনলি না যে সেঙাই? মানুষগুলো এতক্ষণ মাংসের আশায় বসে ছিলো। এর শোধ কিন্তু ওরা অন্যভাবে তুলবে। বিয়ের পর তোর প্রথম আওশে ভোজে একটার বদলে তিনটে সম্বর বলি দিতে হবে।" একটু থামলো খাপেগা। তারপর আবার শুরু করলো, "তোরা আজকালকার ছেলেরা হলি কী? শিকারে বেরিয়ে খালি হাতে ফিরে আসিস! থুঃ-থুঃ থুঃ।"

অপরাধী গলায় সেঙাই বললো, "কী করবো বল্। বর্শা দিয়ে ফুঁড়তে পারলাম না একটা জানোয়ারও। তার কী করবো? জুতমত একটা হরিণও যদি বাগে পেতাম। হুই শয়তান রেঙকিলানটার জন্যে যদি শিকার করা যায়! একটা ভীতু কুত্তী কোথাকার!"

"বুঝেছি, বুঝেছি! থুঃ-থুঃ-থুঃ—" মাঝখানের অগ্নিকুণ্ডটার ওপর রাশি রাশি থুথু ছিটিয়ে দিলো বুড়ো খাপেগা, "তোদের একালের জোয়ানদের মুরোদ জানতে তো আর বাকি নেই। শিকারে গিয়ে খালি হাতে ফিরে আসিস! আমাদের কাল হলে মোরাঙে শুধু হাতে ফিরলে সর্দারই আমাদের বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলতো। তাই তো ভাবি, সে সব দিন গেলো কোথায়?"

স্মৃতির মধ্য দিয়ে ধূসর অতীতের দিকে একবার তাকালো বুড়ো খাপেগা। সেই অপরূপ দুঃসাহসী জীবনের অধ্যায়! আজও সেই যৌবনের দিনগুলোকে পরিষ্কার দেখতে পায় খাপেগা। রাত নিশীথে অতিকায় বর্শা নিয়ে শত্রুপক্ষের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়া। তারপর ধারালো নখের ফলা দিয়ে মুণ্ডু ছিঁড়ে মোরাঙে নিয়ে আসা। শত্রুর রক্ত দিয়ে দেওয়ালে চিত্তির করা। নাগা পাহাড়ের সেই আশ্চর্য উত্তেজিত দিনগুলি খাপেগার বুকের মধ্যে হাহাশ্বাস করে বেড়ায়। একটা বিরাট দীর্ঘশ্বাস ফেললো বুড়ো খাপেগা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। এক সময় খাপেগাই বলতে শুরু করলো, "মোরাঙের দেওয়ালে কী ঝুলিয়ে রেখেছিস তোরা?"

সকলে সমস্বরে বললো, "কেন মোষের মাথা, সম্বরের ছাল, বাঘের মুণ্ডু।"

"ওয়াক থুঃ-থুঃ-থুঃ", অগ্নিকুণ্ডটার দিকে আবার একদলা থুথু ছুঁড়ে দিলো খাপেগা। ঘৃণায় তার নির্লোম মুখখানা কুঁচকে গিয়েছে। জীর্ণ মুখখানায় অজস্র কুঞ্চন-রেখা। এই মুহূর্তে খাপেগাকে ভারি কদর্য দেখাচ্ছে। অতীতের জন্য ব্যগ্র মমতা আর বর্তমান কালকে অক্ষম ঘৃণা—এই দুইয়ের মাঝে খাপেগা অসহায় নিরালম্বের মত ঝুলছে। বিস্বাদ গলায় সে বললো, "জানিস, আগে আমরা জানোয়ার শিকারে যেতাম না। মানুষ শিকারে যেতাম। তারপর সেই মানুষের মুণ্ডু এই মোরাঙের দেওয়ালে দেওয়ালে বর্শায় গেঁথে রাখতাম। আজ যেখানে তোরা মোষের মুণ্ডু রাখিস, সেখানে আমরা রাখতাম শত্রুর মুণ্ডু।"

"আজ আমিও মানুষ শিকার করেছি।" পুলকিত গলায় ঘোষণা করলো সেঙাই।

"হতেই পারে না! অসম্ভব। হু-হু, তোরা করবি মানুষ শিকার! আরে থুঃ-থুঃ-থুঃ"—আবার থুথ্ ছিটালো খাপেগা, "এ আমি বিশ্বাসই করি না।"

অতীতের সেই সগৌরব বীরত্বের সঙ্গে বর্তমান পাল্লা দিচ্ছে! এ অসম্ভব। অসম্ভবই নয় শুধু, একেবারেই অবাস্তব। বুড়ো খাপেগার মুখখানা ভয়ানক হয়ে উঠলো। তার নিশ্বাস দ্রুততালে বইছে। ঘোলাটে চোখের ওপর মশালের আলো প্রতিফলিত হয়ে হিংস্র দেখাচ্ছে। মনে হলো, খাপেগা এখন হত্যা পর্যন্ত করতে পারে। বার বার মাথা দুলিয়ে সে বললো, "অসম্ভব। অসম্ভব। এ হতে পারে না।"

ইতিমধ্যে রাত্রির খাওয়া চুকিয়ে সব অবিবাহিত ছেলেরা মোরাঙে ফিরে এসেছে। তারা এবার আগুনের কুণ্ডটার চারপাশে শোরগোল করে উঠলো। এতগুলি জোয়ান গলার সম্মিলিত প্রতিবাদ উচ্চকিত হয়ে উঠলো, "কেন অসম্ভব শুনি?"

সে শোরগোলে মনে হলো, মোরাঙটা টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

আচমকা সেই চিৎকারকে চমকিত করে গর্জন করে উঠলো সেঙাই, "আমার কথাটা আগে শোন্ সর্দার। তারপর কথা বলিস।"

"হু-হু, তোর কথা বল্।" অনেকগুলো জোয়ান কণ্ঠ সমস্বরে সায় দিলো।

অনিচ্ছুক গলায় খাপেগা বললো, "বল্ শুনি।"

শোরগোলটা উচ্চ গ্রাম থেকে নেমে এখন মৃদু গুঞ্জনে রূপ নিয়েছে।

সেঙাই বলতে শুরু করলো, "আজ দুপুরে একটা সম্বরের তল্লাসে সালুয়ালাঙ বস্তিতে চলে গেছলাম। সেখানে বর্শা দিয়ে পোকরি বংশের খোন্‌কেকে ফুঁড়ে এসেছি…।"

আজ শিকারে যাওয়ার আদি-শেষ সমস্ত ঘটনা বলে গেলো সেঙাই। এমন কি তার কাহিনী থেকে মেহেলীও বাদ গেলো না।

মোরাঙ কাঁপিয়ে উল্লসিত শব্দ করে উঠলো জোয়ান ছেলেরা, "হু-হু, অনেকদিন পরে জোহরি বংশের অপমানের শোধ তুলতে পেরেছি।"

"হো-ও-ও-ও-ও—" শীতের রাত্রি চমকে উঠলো। নাগা পাহাড়ের হৃৎপিণ্ড বুঝি শিউরে উঠলো সে চিৎকারে।

এক সময় উল্লাসের রেশ ঝিমিয়ে এলো।

এতক্ষণ বাদামী পাথরের রাজাসনে বসে বসে একালের জোয়ান ছেলেদের ভাবগতিক লক্ষ্য করছিলো বুড়ো খাপেগা। অতিকায় একটা গুটসুঙ পাখির মত

গলাটা বাড়িয়ে শুনছিলো সে। এবার সে বললো, "শত্রুকে মারলি তো বুঝলাম। কিন্তু খোন্‌কের মাথা কোথায় ?"

"মাথা আনতে পারি নি। সালুয়ালাঙের অতগুলো মানুষ। মাথা আনতে গেলে মাথা রেখে আসতে হতো।" ধীরে ধীরে বললো সেঙাই।

"এ গল্প আমি বিশ্বাস করি না রে টেফঙের বাচ্চা।" আশ্চর্য হিমাক্ত শোনালো খাপেগার কণ্ঠ। এত শীতল সে স্বর যে জোয়ান ছেলেরা এক নিমেষে একেবারে নিভে গেলো কিছু সময়ের জন্য।

বিব্রত গলায় সেঙাই বললো, "বিশ্বাস না হয় রেঙকিলানকে জিগ্যেস করিস্। রেঙকিলান আমার পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো।"

"কোথায় রেঙকিলান ?" চারদিকে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিলো বুড়ো খাপেগা।

"তার বউর সঙ্গে পাহাড় থেকে বস্তিতে ফিরে এসেছে। সে মোরাঙে আসে নি।" খাপেগার পাশ থেকে বলে উঠলো ওঙলে।

খাপেগা বললো, "বেশ তো, কালকেই জিগ্যেস করবো রেঙকিলানকে। অনেক রাত্তির হয়েছে। এখন বোধ হয় মাঝরাত পার হয়ে গেছে। যা শয়তানেরা, এবার শুতে যা।"

হাতের থাবায় এক মুঠো কাঁচা তামাকপাতা ছিল। সরাসরি মুখের মধ্যে চালান করে উঠে দাঁড়ালো খাপেগা। তারপর ফিসফিস গলায় বললো, "এ ব্যাপার নিয়ে বেশী চেঁচামেচি করিস নি। সায়েবরা এদিকে ঘোরাফেরা করছে। সে দিন না কী সেঙ্কাঙ বস্তি থেকে মানুষ মারার জন্যে দুজনকে ধরে নিয়ে গেছে। ওদের কাছে কী সব অস্তর আছে, দূর থেকে তাক করে মানুষ মারতে পারে। দিনকাল কী যে পড়লো!" হতাশায় বিরাট একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো খাপেগার।

অনেকগুলো গোঁয়ার মাথা ঋজু হয়ে উঠলো অগ্নিকুণ্ডটার চারপাশে, "হুই সব এ গাঁয়ে চলবে না, সিধে কথা। আমাদের বস্তিতে ও সব সাহেব ঢোকা চলবে না। হু-হু, এদিকে এলে মোরাঙে মাথা রেখে যেতে হবে তাদের।"

একজন সরস টিপ্পনী কাটলো, "কী গো সদ্দার, আমাদের ভীতু বলো। এইবার ? ভয়টা কাকে ধরেছে শুনি!"

মোরাঙ কাঁপিয়ে অনেকগুলো জোয়ান গলায় অট্টহাসি বাজলো।

সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো বুড়ো খাপেগা, "ভয় পেয়েছে কে ? আমি ? কক্ষনো না। খালি সায়েবের কথাটা বলছিলাম রে টেফঙের বাচ্চারা।"

ভারী আপসোস হচ্ছে। অসাবধান মুহূর্তে কথাটা বেরিয়ে এসে অতীতের পরাজয়কে যেন চিহ্নিত করে গিয়েছে। নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো খাপেগা। তার চোখ ছুটি যেন জ্বলছে।

সারি সারি বাঁশের মাচানে অনেকগুলো বিছানা। দড়ির লেপের নীচে মধুর উত্তাপে ঘুমের সাধনা শুরু করেছে জোয়ানেরা। একটি নিটোল পরিতৃপ্ত ঘুমের সওয়ার হয়ে রাত্রিটুকু পাড়ি দেবার সঙ্কল্পে সকলে নিঝুম হয়ে গিয়েছে।

বাঁশের মাচানের নীচে খাটসঙ কাঠের অগ্নিকুণ্ডগুলো এখন নির্জীব হয়ে এসেছে। বাঁশের বেড়ার ফাঁক দিয়ে শীতরাত্রির হিম সাদা ধোঁয়ার আকারে অবিরাম ঢুকছে। আজ নির্ঘাত বরফ পড়বে বাইরের পাহাড়ে পাহাড়ে, উপত্যকায় উপত্যকায়।

দড়ির লেপের নীচে শরীরটা কুণ্ডলী পাকিয়ে গেল সেঙাইএর। এখনও ঘুম আসছে না ছু চোখের পাতা ভাসিয়ে দিয়ে। শুধু তন্দ্রার আঠায় জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে চোখের পল্লবছুটো। আর সেই তন্দ্রা অপরূপ হলো একটি নগ্ন নারীতনুর রূপে। সে তন্দ্রা মধুর হলো আজ বিকেলের সেই নিঃশব্দ ঝরনার পাশে অনাবৃত এক আদিম সৌন্দর্যের স্বপ্নে। সে রূপের নাম, সে স্বপ্নের নাম,—মেহেলী। সালুয়ালাঙ গ্রামের মেয়ে সে। তার শত্রুপক্ষ। রোজ এ পারের ঝরনার জলে তার কমনীয় অঙ্গশ্রীকে স্নিগ্ধ করে যায় মেহেলী।

একবার পাশ ফিরলো সেঙাই। বাঁশের মাচানটা মচমচ করে উঠলো। তারপর লেপের মধ্য থেকে কচ্ছপের মত মাথাটা একবার বাড়িয়ে দিল সে। বাঁশের দেওয়ালের ফাঁক দিয়ে এবার হিমের রেখা ঘনতর হয়ে ঢুকছে। আগুনের কুণ্ডগুলো নিভু-নিভু। তাদের স্তিমিত আলোতে বর্শা-গাঁথা মোষের মুণ্ডু আর বাঘের মাথাগুলো রহস্যময় মনে হয়। এক ভৌতিক আতঙ্কে চেতনাটা আচ্ছন্ন হয়ে আসে। এর চেয়ে লেপের মধ্যে উত্তপ্ত অন্ধকারটুকু অনেক বেশী নিরাপদ, অনেক বেশী আরামের। এই অন্ধকারের স্নায়ুতে একটি নগ্ন নারীতনুর স্বপ্নকে সঞ্চারিত করা যায়। তন্দ্রাটাকে উপভোগ্য করে তোলা সম্ভব হয়। অতএব, মাথার ওপর দিয়ে লেপটাকে আবার টেনে দিলো সেঙাই।

মেহেলী! মেহেলী! মেহেলী! ঘুম আসছে না সেঙাইর। শত্রুপক্ষের মেয়ে সে। সালুয়ালাঙের মেয়ে সে। পোকরি বংশের মেয়ে সে। বন্য রক্ত

কেমন যেন বিদ্রোহী হয়ে ওঠে সেঙাইর ধমনীতে। এই পোকরি বংশই তার প্রাক্‌পুরুষের মাথা ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছে। তারপর বর্শায় গিঁথে মোরাঙের সামনে ঝুলিয়ে রেখেছে। সেই বংশের মেয়ে মেহেলী। তবু কত তফাত! কত ব্যতিক্রম! এর সঙ্গে যেন নিঃসন্দেহে মিতালি পাতানো চলে! মেহেলীর সঙ্গে বর্শার মুখে মুখে কথা বলতে মন সায় দেয় না। নির্জন ঝরনার পাশে তাকে সহচরী হিসেবে পেতে কামনারা ব্যগ্র হয়ে ওঠে।

আঠারো বছরের যৌবনে অনেক অনাবৃত কুমারীদেহ দেখেছে সেঙাই। অহরহ দেখছে। কিন্তু তার পাহাড়ী মনে এমন দোলা আর লাগে নি। এমন মাতলামি আর জাগে নি।

কঠিন পাথরের ওপর শিলালিপি পড়েছে। সে শিলালিপি মেহেলী। অক্ষয় তার দাগ। গভীর তার রেখা। স্মৃতির মধ্যে, চেতনার মধ্যে, তন্দ্রার মধ্যে মেহেলীর উজ্জ্বল শ্রীঅঙ্গ, সোনালী স্তনচূড়া, নিটোল নিতম্ব, মসৃণ উরু চমক দিয়ে দিয়ে উঠছে সেঙাইর। এই বিছানাটা এক মৃত ময়ালের শীতল আলিঙ্গনের মত মনে হচ্ছে সহসা। অতিকায় দুটো থাবার বন্ধনে পেতে ইচ্ছা করছে মেহেলীকে।

সাঁ করে বাঁশের মাচানের ওপর উঠে বসলো সেঙাই। তারপর দড়ির লেপটা গায়ের ওপর জড়িয়ে অতিকায় একটা বর্শা টেনে নিল মোরাঙের দেওয়াল থেকে। এই মুহূর্তে সালুয়ালাঙ থেকে সে কি মেহেলীকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতে পারে তার বিছানায়! এই হিমাক্ত বিছানাকে মধুর উত্তাপে রমণীয় নারীদেহের কামনায় উদ্বেল করে তুলতে পারে না!

হ্যাঁ! এই বর্শার মুখে সব বাধা, সব প্রতিরোধ চুরমার করে মেহেলীকে সে নিয়ে আসবে। মোরাঙের দরজার দিকে ছুটে গেলো সেঙাই। বাঁশের দরজাটা খোলার সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুর আঘাতের মত আছড়ে পড়লো পাহাড়ী শীতের বাতাস! সঙ্গে সঙ্গে পাল্লাটা বন্ধ করে দিলো সেঙাই। মুখের ওপর থেকে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ মুছে নিল সে হাতের পাতা দিয়ে।

বাইরের পাহাড়-চূড়ায় বরফ পড়তে শুরু করেছে। কোন উপায় নেই বেরুবার। বুকের মধ্যে, প্রতিটি রক্তকণার মধ্যে কামনার যে আগুন জ্বলছে, তা দিয়ে নাগা পাহাড়ের শীতরাত্রির হিমকে পরাজিত করে পথ করে নেওয়া যাবে না। আজকের রাত্রিটা সেঙাইএর বিপক্ষে। সালুয়ালাঙ আজ আকাশের মত সুদূর। আর একটি সন্ধ্যাতারার মত মেহেলী ধরা-ছোঁয়ার

অনেক, অনেক বাইরে। আজকের রাত্রিতে মেহেলীর স্বপ্ন নিয়ে একটি আগ্নেয় কামনার মধ্যে একটু একটু করে দগ্ধ হওয়া ছাড়া আর কোন উপায়ই নেই সেঙাইর।

ক্ষ্যাপা একটা বাঘের মত নিরুপায় ক্রোধে ফুলে ফুলে উঠলো সেঙাই। তারপর বর্শাটাকে একদিকে ছুঁড়ে ফেলে বাঁশের মাচানটার দিকে পা বাড়িয়ে দিলো।

অনেক কাল আগে পোকরি বংশের মেয়ে নিতিৎসুর জন্য কি তারই মত তার ঠাকুরদা জেভেথাঙের বুকে এমনি আগুন জ্বলেছিলো? চেতনার মধ্যে এমনই মাতামাতি শুরু হয়েছিলো?

মাচানের ওপর শুয়ে শুয়ে সেঙাই ভাবতে লাগলো, যে পাহাড়ী কুমারী তার আঠারো বছরের যৌবনকে এমন অস্থির করে তুলেছে, তার চোখ থেকে রাত্রির ঘুম ছিনিয়ে নিয়েছে, তাকে পেতে হবে। পেতেই হবে।

অস্ফুট মন। অপরিণত ভাবনা। পেশীময় সবল দেহে চিন্তাগুলি শ্লথ গতিতে ক্রিয়া করে। তবু মেহেলীর ভাবনা উল্কাবেগে ক্রিয়া করছে সেঙাইর মনে। আঠারো বছরের বন্য যৌবনের কাছে রাশি রাশি খাদ্য আর নারীদেহের মত অমোঘ সত্য আর কী আছে?

ঘুম আসছে না। বাইরের উপত্যকায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ ঝরছে আর মোরাঙের মাচানে তুলোর দড়ির লেপ, খড়ের বিছানা আর আগুনের কুণ্ড রয়েছে। একটি নিটোল ঘুমের এত উপকরণ থাকা সত্ত্বেও আজ রাত্রে সেঙাইর ঘুম আসবে না।

ছয়

পাহাড়ী গ্রামটা একটু একটু করে জেগে উঠেছে। অনেক উঁচুতে দক্ষিণ পাহাড়ের শীর্ষে এখনও শুভ্র তুষারের একটা প্রলেপ পড়ে রয়েছে। তার ওপর কুয়াশা ভেঙে ভেঙে সোনালী সূর্যের দু-একটা জ্যোতির্ময় রেখা এসে পড়েছে। চারদিকে শুধু মালভূমি আর উপত্যকা। আর তরঙ্গিত পাহাড়ের চড়াই-উতরাই। দিগন্তটা ঘিরে সাদা কুয়াশার ঘন স্তর স্থির হয়ে রয়েছে। অপরূপ এই নাগা পাহাড়। শিরশির করে বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ী বাতাস। সে বাতাসে শীতের হিম মিশে ভয়ানক হয়ে উঠেছে। শরীরের অনাবৃত চামড়ার ওপর কেটে কেটে বসে পাহাড়ী শীতের দাঁত। মেরুদণ্ডের মধ্য দিয়ে অসহ্য তুষার-ধারা নামতে শুরু করে যেন। হৃৎপিণ্ডের ভেতর সঞ্চারিত হয়ে যায় একটা তীব্র-তীক্ষ্ণ কনকনানি।

কেলুরি গ্রাম জাগছে। শীতের রাত্রির সুখনিদ্রার পর সোনালী প্রভাতের ডাক এসেছে। কোথাইওরা জেগেছে। যাসেমুদের ঘরে ঘরে ঘুম ভাঙার প্রাথমিক প্রস্তুতি। এর মধ্যেই রোদের প্রার্থনায় ঘরের পেছনে বৃত্তাকার পাথরখানার ওপর এসে বসেছে ফামুসা, ওয়াটেপা। শরীরের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ করে জড়িয়ে নিয়েছে কার্পাস তুলোর দড়ির লেপ।

এলোমেলো ছড়ানো ঘর। নীচু নীচু। ওপরে নতুন খড়ের চাল। চারপাশে কাঁচা বাঁশের দেওয়াল। সাঙলিয়া লতা আর বাঁশের ছিলার কঠিন বাঁধন। বৃষ্টির বর্শা থেকে ঘরকে বাঁচাবার জন্য চালাটাকে সামনের দিকে প্রসারিত করে রাখা হয়েছে।

পাহাড়ের খাঁজে খাঁজে, ওপরে-নীচে ইতস্তত বিক্ষিপ্ত সব ঘর। ঘন অরণ্য সংহার করে টঘুটুঘোটাঙ ফুলের মত ফুটে উঠেছে এই নগণ্য পাহাড়ী জনপদ ; বন্য মানুষের এই সামান্য উপনিবেশ। গ্রামটি যেন এক টুকরো আদিম কাব্য।

বাড়িগুলোর কোন প্রত্যক্ষ সীমানা নেই। খেয়াল-খুশিমত তারা গড়ে উঠেছে।

চারপাশে আমাদের জমি সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে নীচে নেমে গিয়েছে। মাসখানেক আগে ফসল তুলে গোলাঘরে জমা করেছে পাহাড়ীরা। ফসলের

জমি তাই এখন রিক্ত ; হতশ্রী। শুধু এদিক-সেদিক এখনও ছড়িয়ে রয়েছে কিছু রাহ্‌মু ফল, কিছু পাহাড়ী শশা আর সুপ্রচুর টেরিসা ফল। শীতের মরশুমে পাহাড়ের প্রাণরস শুষে শুষে উদ্দাম হয়ে উঠেছে বনকলার ঝাড়।

জোহেরি বংশের বাড়িটা পাহাড়ের একটা বড় ভাঁজের মধ্যে। গ্রামের মানুষেরা এই বাড়িটাকে বলে 'জোহেরি কেসুঙ'। জোহেরি কেসুঙের ঠিক ওপরেই বিরাট একখানা কপিশ পাথরের আবরণ। বাঁ দিকে বিশাল একটা খাসেম গাছ আকাশের দিকে দুর্বার মাথা তুলে দিয়েছে। জোহেরি বংশের বন্য রুচি ফুটে রয়েছে চারপাশের টঘুটুঘোটাঙ আর নানা রঙের আখুশু ফুলে ফুলে। জোহেরি কেসুঙের ওপরে পাহাড়ের উঁচু টিলায় টিলায় জোরি, নিসুরি আর সোচরি বংশের বাড়ি। আর কেলুরি গ্রামের তিনটি প্রান্তবিন্দুতে তিনটি মোরাঙ। ত্রিকোণ গ্রাম—তাই তিনটি কোণে মোরাঙ বসিয়ে গ্রামরক্ষার পাকাপাকি আয়োজন করে রেখেছে কেলুরি গ্রামের পাহাড়ী মানুষেরা।

কিছুদিন আগে নগদা সু মাসে এদের সবচেয়ে বড় উৎসব নগদা সমাপ্ত হয়ে গিয়েছে। সেই উৎসবের ক্লান্তি আর উল্লাসের রেশ এখনও গ্রামখানার স্নায়ুতে স্নায়ুতে জড়িয়ে রয়েছে। এখন ফসল তোলার তাগাদা নেই, বীজ-দানা বোনার ব্যস্ততা নেই। এখন কেবল অফুরন্ত অবসর। মধুর আলস্যে দিনগুলো ঢিমে-তেতালার ছন্দে গড়িয়ে গড়িয়ে বয়ে চলেছে এই পাহাড়ী জনপদের ওপর দিয়ে।

জোহেরি কেসুঙের ঘুম ভেঙেছে। পেছনে অর্ধবৃত্তাকার পাথরের বেদী। বাইরের দরজা দিয়ে সেই পাথরের বেদীর ওপর এসে বসলো বুড়ী বেঙসানু। অনেক বয়স হয়েছে তার। মুখের কুঞ্চন-রেখায় অনিবার্য বার্ধক্য ফুটে বেরিয়েছে। মাথার চুলগুলো শুকনো তামাক পাতার মত হেজে গিয়েছে। চোখের ওপর পাকা ভ্রূ দুটো ঝুলে পড়েছে। কানে চাকার মত বড় বড় পিতলের গয়না। কানের মধ্যভাগ থেকে কেটে নীচে এসে ঝুলছে। হাঁটু পর্যন্ত ময়লা কোম্ব্যু মেনী কাপড়। সারা গায়ে দড়ির লেপ জড়ানো। দু হাতের মণিবন্ধে হরিণের হাড়ের বলয়। সমস্ত শরীর থেকে উগ্র আর ভ্যাপসা এক দুর্গন্ধ শীতের বাতাসে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে।

বেঙসানুর পাশে এসে বসেছে বছর ছয়েকের একটি ছেলে আর বছর তিনেকের একটি মেয়ে। ফাসাও আর নজলি। দুটি নাতি-নাতনী। বেঙসানু ছেলেমেয়ে দুটিকে কোলের মধ্যে টেনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলো।

ফাসাও বললো, "ঠাকুমা, বড় শীত করছে।"

"হু-হু ; আজ বড্ড শীত। দাঁড়া, এখুনি রোদ উঠবে।"

পাহাড়ের চূড়া ঘিরে যে সাদা কুয়াশার স্তর এতক্ষণ গাঢ় হয়ে ছিল, রোদের অবিরাম শরাঘাতে এখন তা ছিঁড়ে ছিঁড়ে ফালা ফালা হয়ে গিয়েছে। দক্ষিণ পাহাড়র শীর্ষে বরফের যে সাদা প্রলেপটা এতক্ষণ স্থির হয়ে পড়ে ছিলো, এবার তা একটু একটু করে মুছে যেতে শুরু করেছে। নিবিড় বনের সবুজ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হচ্ছে। প্রত্যক্ষ হচ্ছে।

এতক্ষণ নিবিরাম বকর বকর করছিল ফাসাও। কথার পর কথা। সঙ্গতি নেই। একটার সঙ্গে আর একটার সম্বন্ধ নেই। এলোমেলো প্রসঙ্গ। অবান্তর জিজ্ঞাসা। অসঙ্গত কৌতূহল।

শুকনো তামাক পাতার মত ধূসর মাথাটা শুধু নাড়ছিল বুড়ী বেঙসাম্ব। আর মাঝে মাঝে হাতের তালু থেকে কাঁচা তামাক পাকিয়ে জিভের নীচে গুঁজে গুঁজে দিচ্ছিল।

আচমকা ফাসাও বললো, "আচ্ছা ঠাকুমা, সূর্য ওঠে কেন ?"

"হু-হু, বল্ দিকি ঠাকুমা।" জোহেরি কেসুঙের চারপাশে আরো কয়েকটি কৌতূহলী কণ্ঠ শোনা গেল।

চনমন চোখে একবার তাকালো বুড়ী বেঙসাম্ব। গ্রামের কয়েকটি ছেলে-মেয়ে এসেছে। তারা বেঙসাম্বর চারপাশে এসে নিবিড় হয়ে বসলো।

"হু-হু, বল্ দিকি।" বাঁ দিকের পাহাড়ের খাঁজে নিয়ানোদের বাড়ি। সেখান থেকেও দু-একটি গলা বেশ সরব হয়ে উঠেছে।

শীতের সকাল। পাহাড়ী দিগন্ত ঘিরে কুয়াশার ঘেরাটোপ। শীতার্ত বাতাস। গাল-গল্পের উত্তাপ দিয়ে, অলস কথার মৌতাত মেখে শীতের সকালটাকে রমণীয় করে তোলার কামনা সকলের চোখেমুখে, "হু-হু, বল্ দিকি বুড়ী।"

"আরম্ভ কর সেঙাইর ঠাকুমা।" সকলের গলায় সমান কৌতূহল। সমান তাগাদা। সমান ব্যগ্রতা।

আস্তে আস্তে বলতে শুরু করলো বুড়ী বেঙসাম্ব, "শোন্ তবে, সে আর এক কেচ্ছা। আমি শুনেছি আমার মায়ের কাছে। মা শুনেছে তার ঠাকুরদার কাছে।" একটু থামলো বেঙসাম্ব। তারপর সকলের মুখের ওপর দিয়ে ঘোলাটে দৃষ্টিটাকে চক্রাকারে পাক দিয়ে আনলো। তারও পর

যেমন করে মন্ত্র দান করা হয়, ঠিক তেমনি গম্ভীর হয়ে এলো তার কণ্ঠস্বর, "মন দিয়ে শোন্ সবাই—"

বুড়ী বেঙসান্থুর গল্প শুরু হলো, "অনেক কাল আগে, সে কত বছর আগের ব্যাপার, তা বলতে পারবো না। তবে তখন খুব গরম ছিলো। এত গরম যে মানুষেরা একেবারে অতিষ্ঠ হয়ে উঠলো। সূর্য উঠলেই সারা গায়ে জ্বলুনি শুরু হয়। গাছপালা পুড়ে যায়। পাহাড়ের মানুষেরা বলাবলি করলে, নাঃ, এত গরমে একেবারে মরেই যাবো। সূর্য আর না উঠলেই বাঁচোয়া। মনের কথা মনে রাখাই ভালো। মুখ ফসকে বেরিয়ে এলেই বিপদ। মানুষেরা সে কথা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললে। আর যায় কোথায়! সূর্য সে কথা ঠিক ঠিক শুনে ফেলেছে।"

কিছু সময়ের বিরতি। একমুঠো কাঁচা তামাক মুখে পুরলো বুড়ী বেঙসান্থু, তারপর আবার বলতে শুরু করলো, "প্রথম প্রথম যেন এ-সব কথা শোনে নি, এমন ভাব দেখালে সূর্য। শেষে মানুষের মুখে মুখে এক কথা বার বার শুনতে শুনতে সূর্যের ধৈর্য আর রইল না। তার ভারী গোসা হলো। হবার তো কথাই। পাহাড়ী মানুষগুলোকে তো জানিস! একটা কথা পেলে তা নিয়ে ছেলেবুড়োর দিনরাত খালি বকর বকর। যাক সে কথা। তারপর হলো কী, একদিন সূর্য তো ছয় পাহাড়ের নীচে ডুবলো। তারপর দিন সে আর ওঠে না। চারিদিকে অন্ধকার আর অন্ধকার। শীতে মানুষ মরার উপক্রম। সূর্য হলো পুরুষ মানুষ, তার তেজ না থাকলে চলে! চাঁদ ওঠে বটে, কিন্তু সে হলো মাগী। তার গরম নেই। পাহাড়ের মানুষ তখন শীতে কাঠ হয়ে গেলো, তখন সবার টনক নড়লো। জানিস তো ছটা আকাশ আছে। সেই ছটা আকাশ পেরিয়ে সূর্য চলে গেছে। অগত্যা সাধ্যসাধনা শুরু হলো। মানুষেরা সূর্যকে আনার জন্য লোক পাঠালে। সূর্য তার কথা শুনলো না। জানোয়াররা পাঠালে তাদের রাজা বাঘকে। সূর্যের রাগ তাতেও পড়লো না। পাখির রাজ্য থেকে গেলো সবচেয়ে সুন্দর খুগু পাখি। তবুও মন ভিজলো না সূর্যের।

"এদিকে পাহাড়ের মানুষগুলো শীতে প্রায় সাবাড় হয়ে এসেছে। কোন উপায় নেই। তখন এক বুড়ো হুণ্টসিঙ পাখি বুদ্ধি বাতলে দিল। সে বললে, 'সূর্য মুর্গীকে সবচেয়ে বেশী ভালোবাসে। তোমরা সব তাকে গিয়ে ধরো। সে তাকে ফিরিয়ে আনতে পারবে।'

চারপাশের ছেলেমেয়েরা স্তব্ধ হয়ে শুনছে। সকলের চোখেমুখে বিস্ময়ের, ভয়ের, কৌতূহলের সাতরঙা রামধনু খেলে খেলে যাচ্ছে।

বুড়ী বেঙসামু খকখক করে কেশে উঠলো একবার। তারপর বিরাট একটা নিশ্বাস টেনে নিল ফুসফুসের মধ্যে। তারও পর আবার আরম্ভ করলো, "মুর্গী অনেক টালবাহানা করে তো রাজী হলো। সে বললে, তাকে লাল রঙের মুকুট দিতে হবে। মানুষ, পাখি আর জানোয়ার সব ফাঁপরে পড়েছে। তাই কী আর করে! মুকুট দিতে হলো। সেই থেকে মুর্গীর মাথায় লাল টুপি হয়েছে। যাক, যা বলছিলাম। রাতারাতি ছয় পাহাড় আর ছয় আকাশ ডিঙিয়ে তো সূর্যের বাড়ি এলো মুর্গী। একেবারে সেই পাতালে। মাঝ পথে ভামবিড়ালের আস্তানা। তাই ভয়ে ভয়ে, চুপিচুপি পার হতে হয়েছে এতটা পথ।

"মুর্গী সূর্যের হাতে পায়ে ধরে অনেক অনুনয় করলে। কিন্তু সে বড় গোঁয়ার। শত হলেও পুরুষ মানুষ তো। তার মানে লেগেছে। মুর্গী বললে, রোজ ছটা আকাশের দরজা ডিঙিয়ে তোমাকে আমাদের পাহাড়ে যেতে হয়। তুমি যখন আসবে, আর এক-একটা দরজা পার হবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি চিৎকার করে পাহাড়ের লোকদের জানিয়ে দেবো। সে চিৎকার শুনে তারা তোমায় পুজো করবে। তবে খুশী তো! সূর্য তাতেও রাজী নয়।

"অগত্যা মুর্গীকে পাহাড়ে ফিরতে হবে। কিন্তু পথে সেই ভামবিড়ালের আস্তানা। বড় ভয় করতে লাগলো মুর্গীর। সে বললে, তুমি তো আমার কোন কথাই রাখলে না সূর্য। কিন্তু একটা কথা তোমাকে রাখতে হবে। আমি এখন পাহাড়ে ফিরে যাবো। ছয় আকাশের আর ছয় পাহাড়ের দরজা ডিঙিয়ে আমাকে যেতে হবে। মাঝখানে এক ভামবিড়ালের আস্তানা আছে। সে আমাকে পেলে মেরে ফেলবে। আমার বড় ভয় করছে। সূর্য বললে, তার আমি কী করবো, বলো? মুর্গী বললে, যখন ভামবিড়ালটা আমার দিকে তেড়ে আসবে, সঙ্গে সঙ্গে আমি ডেকে উঠবো। আর তুমি আমাকে বাঁচাতে যাবে। সূর্য বললে, তাই হবে।

"মুর্গী সূর্যের সেই পাতালবাড়ি থেকে রওনা দিলে। পথে আসতে আসতে এক খাসা বুদ্ধি খেলে গেল তার মাথায়। আকাশের একটা দরজা ডিঙিয়ে সে মিছিমিছি চেঁচিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে সূর্য এসে হাজির। মুর্গী বললে, তুমি এখানে দাঁড়াও। তোমাকে দেখে ভামবিড়ালটা পালিয়ে গেল। আমি যাই এবার।

"এমন করে আকাশের ছটা দরজায় দাঁড়িয়ে ছবার চেঁচিয়ে উঠলো মুর্গী। সঙ্গে সঙ্গে সূর্যও তার প্রতিজ্ঞামত এসে হাজির। একসময়ে পাহাড়ের লোকেরা দেখলে ছয় আকাশ ডিঙিয়ে সূর্য এসে উঠেছে পাহাড়ের ওপর। আলোয় ভরে গিয়েছে চারদিক। শীত পালিয়েছে। সেই থেকে আজও সেই। মুর্গীটা আকাশে ছবার করে ডেকে ওঠে। ছয় আকাশের দরজায় দাঁড়িয়ে ছবার ডাকে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে আমরা শুনি। তারপর এ পাহাড়ে সূর্য আসে। বুঝেছিস এবার।" বুড়ী বেঙসান্থর গল্প শেষ হলো।

"দূর, সায়েবরা তো অন্য কথা বলে।" ওপরের জোরি কেসুঙ থেকে বলে উঠলো সারুয়ামারু। বছর পঁচিশেক বয়স। বছরখানেক আগে বিয়ে করে উঁচু টিলার ওপর নতুন ঘর তুলেছে সারুয়ামারু। সেই ঘরের মধ্য থেকে কথাগুলো যেন ছুঁড়ে মারলো সে।

ঘোলাটে চোখদুটো ধক করে জ্বলে উঠলো বুড়ী বেঙসান্থর, "কী, কী বললি ?"

"কী আবার বলবো! কাঁচা তামাক খাস কি না! নেশার ঘোরে কী যে বলিস, তার ঠিক নেই। সায়েবরা বলে অমন করে সূর্য ওঠে না।" শান্ত গলায় বললো সারুয়ামারু।

"অমন করে ওঠে না!" গর্জন করে উঠলো বেঙসান্থ। তারপরেই তার মুখ থেকে শিলাবৃষ্টির মত কদর্য গালাগালি ঝরতে লাগলো, "ইজাহান্টসা সালো। নে রিহুগু!"

সারুয়ামারুর তূণেও অফুরন্ত গালাগালির তীর আছে। সেও বিচিত্র মুখভঙ্গি করে সে-সব তীর একটির পর একটি ছুঁড়তে লাগলো, "আহে ভু টেলো।..."

অব্যর্থ লক্ষ্য। দু পক্ষই সমান নির্মম হয়ে উঠেছে। যারা চারপাশে জমায়ত হয়েছিলো, তারা সকলেই বেঙসান্থর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের সমবেত গলার চিৎকার শীতের সকালটাকে কুৎসিত করে তুলেছে। যারা অত্যন্ত উৎসাহী, ঘর থেকে সাঁ করে তারা খারে বর্শা নিয়ে এসেছে। আকস্মিক একটা খণ্ডযুদ্ধের প্রস্তুতি। এর মধ্যে বিস্ময়ের কিছু নেই, হতবাক হবার কারণ নেই। পাহাড়ী গ্রামে বিন্দুমাত্র মতান্তর নিশ্চিত মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করে আনে। বর্শার ফলায় ফলায় সমস্ত বিসংবাদের অবসান হয়।

উত্তেজনায় বেঙসান্থ উঠে দাঁড়িয়েছিলো। "কী সব্বনাশ! শয়তানের জন্যে

আনিজার রাগ এসে পড়বে বস্তিতে। সূর্য আর উঠবে না। শীতে সব মরতে হবে। শয়তানের বাচ্চা কোহিমা-মোককচঙ গিয়ে লায়েক হয়ে ফিরেছে। ওরে তোরা সব মুর্গী নিয়ে আয়; সূর্যের নামে বলি দিতে হবে। সূর্যের রাগ এ বস্তির ওপর পড়লে আর উপায় নেই।"

রুদ্ধশ্বাসে কথাগুলো বলে চলেছে বুড়ী বেঙসানু। যতিহীন। ছেদহীন। শুধু কথার পর কথা। স্বরগ্রাম চড়াতালের চূড়ায় পৌছেছে, "সায়েব অন্য কথা বলেছে! ওরে তোরা শয়তানের বাচ্চাটাকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেল। সাবাড় কর। বস্তির সব্বনাশ হয়ে যাবে ও থাকলে।"

এক অপরিসীম আতঙ্কে মানুষগুলো নিষ্ক্রিয় হয়ে গিয়েছে। হাতের থাবার মধ্যে বর্শাগুলো থরথর করে কাঁপতে শুরু করেছে। এই মুহূর্তে একটা অনিবার্য সর্বনাশ এসে পড়বে। সূর্যটা হয়তো এখনিই আবার নেমে যাবে কোন্ অতল পৃথিবীতে। এক ফুৎকারে হয়তো নিভে যাবে সব আলো। মুছে যাবে সমস্ত উত্তাপ। হয়তো এখনি নাগা পাহাড়ের নাভিমূল থেকে কেঁপে কেঁপে উঠবে ভূমিকম্পের তরঙ্গ। প্রচণ্ড গর্জনে এই পাহাড়, এই উপত্যকা উৎক্ষিপ্ত হয়ে যাবে। তারপর খণ্ড খণ্ড হয়ে নীহারিকার মত ছড়িয়ে পড়বে মহাশূন্যে। আলো নেই, উত্তাপ নেই, শুধু নিঃসীম অন্ধকার। আর সেই অন্ধকারের মধ্যে পলে পলে এক নিশ্চিত প্রলয়ের প্রহর গুনতে থাকবে এই পাহাড়ের জীবজগৎ। পশু, পাখি, মানুষ—কেউ বাদ যাবে না। কারো নিস্তার নেই সেই অপমৃত্যুর আলিঙ্গন থেকে।

মেরুদণ্ডের মধ্যে শিহরণ বইছে। মজ্জার ভেতর দিয়ে হিমধারা নামতে শুরু করেছে যেন। পাহাড়ী মানুষগুলো একেবারেই নিশ্চেতন হয়ে গিয়েছে।

এক সময় হাউহাউ করে কেঁদে উঠলো বেঙসানু, "তোরা এখনও দাঁড়িয়ে আছিস। আগে সূর্যের রাগ কমা। মুর্গী নিয়ে আয়। তারপর হুই শয়তানের বাচ্চার মুণ্ডু কাটবি। বস্তিতে এমন লোক থাকলে আর বেঁচে থাকতে হবে না।"

প্রচণ্ড একটা ঝাঁকানি লেগে সমস্ত নিষ্ক্রিয়তা ঝরে গেলো মানুষগুলোর। অনিবার্য অপঘাতের কবল থেকে জীবনের একটা ক্ষীণতম আভাস তারা দেখতে পেয়েছে। চক্ষের পলকে বর্শা নামিয়ে রেখে তীরের মত ছুটে গেলো মানুষগুলো। এই মুহূর্তে এই পাহাড়, এই উপত্যকা আলোড়িত করে, যেখান থেকে হোক মুর্গী সংগ্রহ করে আনতে হবে। আনতেই হবে।

জীর্ণ গলাটা ফুলিয়ে ফুলিয়ে তখনও খেউড় গেয়ে চলেছে বুড়ী বেঙসাহু। আর সেই অপরূপ কণ্ঠসাধনায় তার সঙ্গে গলা মিলিয়েছে তার নাতি আর নাতনী। ফাসাও আর নজলি। অবিরাম, অবিশ্রাম সে কণ্ঠে বাজছে, "ইজাহাণ্টসা সালো—"

আর ওপরের টিলার ওপর দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিরুপায় আক্রোশে একটা ক্ষ্যাপা অজগরের মত ফুলছে সারুয়ামারু। আচ্ছা, সময় এলে সেও দেখে নেবে।

সারুয়ামারুর অপরাধই বা কী? মাঝে মাঝে নুন আনতে রাশি রাশি পাহাড় আর উপত্যকা ডিঙিয়ে তাকে যেতে হয় মোককচঙ। কখনও বা কোহিমায়। সেখানে একদল বিচিত্র মানুষকে সে দেখেছে। বরফের মত সাদা গায়ের রঙ। হুণ্টসিঙ পাখির পালকের মত ধবধবে কাপড়। সে কাপড় একেবারে গলা থেকে পায়ের পাতায় নেমে এসেছে। চোখের মণি কী আশ্চর্য নীল! কী মনোরম তাদের ব্যবহার! তার মত আরো অনেক পাহাড়ী মানুষ গিয়েছিল কোহিমায়। মেলুরি থেকে, টিজু নদীর ওপারের দূরতম উপত্যকা থেকে। রেঙমাপানি আর দোইয়াঙ নদীর পরপারে যে ছোট ছোট জনপদ বিক্ষিপ্ত হয়ে রয়েছে, সেখান থেকেও অনেক মানুষ গিয়েছিল লবণের তল্লাসে।

বিভিন্ন গ্রাম, বিভিন্ন জাতের সব নাগা। তাদের মধ্যে মনান্তর আছে, মতান্তর আছে। বিসংবাদেরও অন্ত নেই। তবু মোককচঙে কি কোহিমায় লবণের সন্ধানে যখন আসে, তখন তারা একান্ত সভ্য, অতিমাত্রায় সংযত।

সেই লবণের সন্ধানে কোহিমায় এসে এক বিচিত্র পৃথিবীর সন্ধান পেয়েছিলো সারুয়ামারু। এক অপূর্ব জীবনের আস্বাদে চমকে উঠেছিলো।

বরফের মত সাদা সব মানুষ। রূপকথার দেশের সংবাদ যেন নিয়ে এসেছে। তাদের পাহাড়ী ভাষা কী চমৎকার করেই না বলতে পারে! এমন একজন বরফসাদা মানুষ তাকে কাছে ডেকে নিয়েছিলো। তারপর অন্তরঙ্গ গলায় বলেছিলো, "আমি তোমার শত্রু নই। আমি তোমার আসাহোয়া (বন্ধু)। আমাকে ভয় পেও না। এই নাও।"

সহসা বরফসাদা মানুষটা সারুয়ামারুর গায়ে একটা গরম চাদর জড়িয়ে দিয়েছিলো। কচি পাতার মত রঙ চাদরটার। শীত ঋতুর দিন। চাদরটা উষ্ণ আমেজের মত সারা শরীরে লেপে রইলো সারুয়ামারুর। চাদরের মনোরম আলিঙ্গনের মধ্যে প্রচুর আরাম রয়েছে। এমন আচ্ছাদন জীবনে

কোনদিন দেখে নি সারুয়ামারু। তার কোমরের চারপাশে একটা হরিণের ছাল জড়িয়ে রয়েছে। তার ওপর কচি-পাতা-রঙ চাদর। ভারী মজা লেগেছিলো সারুয়ামারুর।

তবু সংশয় ছিল পাহাড়ী মানুষ সারুয়ামারুর চোখে। শঙ্কিত দৃষ্টিতে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছিলো সে। হাতের মুঠোতে বর্শাটা শক্ত করে ধরা ছিল তার।

পাহাড়ী টিলায় টিলায় ছোট ছোট বাড়ি। ঢেউটিনের চাল। প্ল্যাস্টারের দেওয়াল। পাহাড় বেয়ে বেয়ে ময়াল সাপের মত চড়াই-উতরাই পথ। এই হলো কোহিমা শহরের চেহারা। শহরের অঙ্গ প্রসাধনের জন্য চারপাশে পাহাড়ী ফুল ফুটেছে রাশি রাশি।

ডানদিকে লবণের বাজারে রীতিমত কোলাহল শুরু হয়েছে। বাঁ দিকে টিনের অনেকগুলো ঘর। সেই ঘরগুলোর সামনে বাঁশের মাচা। মাচাগুলোর ওপর বসে রয়েছে অনেকগুলো বরফসাদা মানুষ। সকলেই এক-একজন নাগার সঙ্গে মিতালি পাতিয়ে নিচ্ছে। এমনি চাদর কি কাপড় জড়িয়ে জড়িয়ে দিচ্ছে সারা দেহে।

চারদিকে ইতস্তত ছড়ানো আরো কয়েকজন লোক। তাদের গায়ের রঙ কালো। একই রঙের, একই আকারের পোশাক তাদের দেহে সাজানো রয়েছে। হাতে বিচিত্র ধরনের লাঠি (এর আগে বন্দুক দেখে নি সারুয়ামারু)। সাদা মানুষগুলো মাঝে মাঝে তাদের সঙ্গে কী এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে। বুঝতে পারে নি সারুয়ামারু।

প্রথমে কোন কথা বলে নি সারুয়ামারু। শুধু সাদা মানুষটা হেসেছিলো। ঝকঝকে সাদা দাঁতের ওপর রোদের আলো ঠিকরে পড়েছিলো তার। সে বলেছিলো, "কেমন লাগছে এই চাদরটা? বেশ আরাম লাগছে তো?"

"হু-হু।" মাথা নেড়েছিল সারুয়ামারু।

"এটা তোমাকে দিলাম। খুশী তো!"

লাল লাল অপরিষ্কার দাঁতের পাটি বের করে হেসে উঠেছিল সারুয়ামারু। এতটুকু সন্দেহ নেই, বিন্দুমাত্র দ্বিধা নেই মনে। ভারি খুশী হয়েছে সে।

সাদা মানুষটা আবার জিজ্ঞাসা করেছিলো, "নাম কী তোমার?"

"আমার নাম সারুয়ামারু।"

"কোন বস্তিতে থাকো?"

"কেলুরি বস্তিতে।"

"বাঃ, বাঃ, ভালো। তোমাদের বস্তিতে আমি গেলে সবাই খুশী হবে?" দুটি চোখের নীল মণি সারুয়ামারুর মুখের ওপর স্থির করে রেখেছিলো সাদা মানুষটা।

এবার সারুয়ামারু বলেছিলো, "আমি কিছু জানি না। আমাদের বস্তির সদ্দার আছে। বস্তিতে ঢুকতে হলে তার কাছে বলতে হবে। নইলে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে দেবে।"

"আচ্ছা, আচ্ছা তাই বলে নেবো।"

কিছুক্ষণ চুপচাপ করে রইলো সাদা মানুষটা। কী একটা অতলান্ত চিন্তায় তলিয়ে যেতে লাগলো সে। তারপর আবার সরব হয়ে উঠলো, "আমি ফাদার। বুঝলে! আমাকে ফাদার বলে ডাকবে।"

সারুয়ামারু মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে স্বীকৃতি জানিয়েছিলো।

সাদা সাহেব আবারও বলেছিলো, "সাত সমুদ্দুর তেরো নদী ডিঙিয়ে তোমাদের দেশে এসেছি। অনেক, অনেক দূরে আমার বস্তি।"

কোহিমার পাহাড়শীর্ষ থেকে ধূ ধূ দিগন্তের দিকে ডান হাতের তর্জনী প্রসারিত করে দিয়েছিলো পাদ্রী সাহেব। অনেক, অনেক দূর। পাহাড়ী নাগা সারুয়ামারুর মন সে দূরত্বের হিসাবে থই পায় নি। শুধু দুটো নির্বোধ চোখে সাহেবের সাদা তর্জনীটার দিকে তাকিয়ে ছিলো সারুয়ামারু। হবেও বা অনেকদূর। ছয় আকাশের দরজা ডিঙিয়ে সন্ধ্যার সময় সূর্যটা যে জগতে চলে যায় বিশ্রামের আশায়, হয়তো সেই জগৎ থেকেই এসেছে এই বরফ-সাদা মানুষটা। বিস্মিত চোখে তাকিয়ে ছিলো বন্য মানুষ সারুয়ামারু। তাকিয়েই ছিলো।

একসময় সাহেবই আবার বলতে শুরু করেছিলো, "কোহিমায় কী নিতে এসেছ?"

"নিমক।"

"নিমকের বদলে কী দেবে?"

"সম্বরের ছাল, টেরোঙ্গু জানোয়ারের শিঙ, বাঘের চোখ।"

"আমি তোমাকে নিমক দেব। একেবারে মাগনা। ও-সব কিছুর সঙ্গে বদল করতে হবে না।"

আশাতীত পুলকে জ্বলে উঠলো সারুয়ামারুর পিঙ্গল চোখ দুটো। সে বললো, "আমাদের পাহাড়ে নিমকের বড় অভাব। এক কণা নিমক নেই।"

"নিমক তোমাকে দেবো, কিন্তু তার বদলে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?" চোখেমুখে সংশয় ফুটে বেরুলো সারুয়ামারুর।

"কঠিন কিছু না। সব সময় কপালে বুকে আর দু হাতের জোড়ের ওপর আঙুল ঠেকাতে হবে।" বুক, কপাল আর বাহুসন্ধিতে আঙুল ঠেকিয়ে ক্রশ আঁকার প্রক্রিয়াটা শিখিয়ে দিয়েছিলো পাদ্রী সাহেব।

রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল সারুয়ামারু, "হু-হু, খুব, খুব পারবো।" সঙ্গে সঙ্গে ক্রশ আঁকার কাজে লেগে গিয়েছিলো সে।

পাদ্রী সাহেব আবারও বলেছিলো, "বুকে-হাতে-কপালে আঙুল ঠেকাবে আর বলবে যীশু, যীশু।"

"যীশু!"

"হ্যাঁ যীশু। পারবে তো!"

"খুব পারবো।"

এবার হুন্টসিঙ পাখির পালকের মত ধবধবে মুখখানার ওপর তৃপ্তির আর সাফল্যের হাসি জ্বলে উঠেছিলো পাদ্রী সাহেবের। পাশের আর একটা সাদা মানুষকে ডেকে দুর্বোধ্য ভাষায় অথচ আনন্দিত কণ্ঠে কী যেন বলে উঠেছিলো সে। সেদিন তা বুঝে উঠতে পারে নি পাহাড়ী মানুষ সারুয়ামারু।

একসময় সম্বরের চামড়ায় নুন ঢেলে দিয়েছিলো সাদা মানুষটা। তারপর অন্তরঙ্গ গলায় বলেছিলো, "আজ থেকে আমরা হলাম ফ্রেণ্ড, মানে তোমাদের নাগা ভাষায় যাকে বলে আসহোয়া (বন্ধু)। কেমন তো! আবার বলছি, আজ থেকে আমাকে তুমি ফাদার বলে ডাকবে।"

গোলাকার কামানো মাথাটা দুলিয়ে সম্মতি জানিয়েছিলো সারুয়ামারু।

পাদ্রী সাহেব আরও বলেছিলো, "তুমি যা চাও সব পাবে। নিমক পাবে, কাপড় পাবে। যা চাও সব পাবে। কিন্তু একটা কথা, যে কাজের কথা বলেছি তা করতে হবে। আর তোমাদের বস্তি থেকে মানুষ সঙ্গে করে আনবে। সর্দারকে নিয়ে আসবে। সকলকে কাপড় দেবো, নিমক দেবো।"

"হু-হু।" জোরে মাথা ঝাঁকিয়ে ঘন ঘন ক্রশ এঁকে, তারস্বরে চিৎকার করে উঠেছিলো সারুয়ামারু, "যীশু, যীশু।"

তারপর অনেকবার কোহিমায় এসেছে সারুয়ামারু। পাহাড় আর উপত্যকা পাড়ি দিয়ে পাদ্রী সাহেবের কাছে আসতে আসতে তার মনে

হয়েছে, একটা রমণীয় নেশার মত তাকে আকর্ষণ করছে কোহিমা। বস্তি থেকে অনেককে অনেকবার কোহিমায় নিয়ে এসেছে সারুয়ামারু। এমন কি বেঙসানুর ছেলে সিজিটো পর্যন্ত তার সঙ্গে এসেছে। পাদ্রী সাহেব নিমক দিয়েছে। কাপড় দিয়েছে। চাদর দিয়েছে। আর সকলের কানে কানে এক আলোকমন্ত্র দিয়েছে। সে আলোকমন্ত্র যীশুর নামজপ আর ক্রুশ আঁকার পবিত্র পদ্ধতি।

বিচিত্র সব কাহিনী বলেছে পাদ্রী সাহেব। অপরূপ সব গল্প। সেই গল্প থেকেই সারুয়ামারু জানতে পেরেছিলো, সূর্য ওঠার আসল কারণটা কী? দিন-রাত্রির নেপথ্যে সত্যের বিজ্ঞানটা কোথায়? একটু আগে সেই সত্য বেফাঁস করতে গিয়ে রীতিমত একটা খণ্ডযুদ্ধকে আমন্ত্রণ করে এনেছে সে।

ইতিমধ্যে অনেক মুর্গী ধরে এনেছে পাহাড়ী মানুষগুলো। প্রত্যেকের হাতের মুঠিতে একটা করে ধরা রয়েছে।

বেঙসানু বললো, "আয় তোরা, বাড়ির সামনা দিকে আয়।"

জোহেরি কেসুঙের অগ্রভাগ। নীচু দোচালা ঘর। সামনের দিকে খড়ের চাল অনেকটা প্রসারিত। রোদবৃষ্টির অবিরাম শরাঘাত থেকে রক্ষার জন্য এই পদ্ধতিতে নাগাদের ঘর তৈরী করতে হয়। দুদিকে বাঁশের দেওয়াল। সামনের দিকে চক্রাকার বাঁশের দরজা। দরজার দু পাশে অতিকায় দুটো বর্শার মাথায় মোষের মুণ্ড গেঁথে রাখা হয়েছে। সরাসরি ঘরের মাঝামাঝি মোষ বলির যূপকাষ্ঠ। খাটসঙ গাছের কাঠ দিয়ে বানানো। পরিষ্কার বোঝা যায়, বাড়ির মালিকেরা জেঙকেসি ভোজ দিয়ে সমাজকে আর প্রিয়জনদের সন্তুষ্ট করতে পেরেছে।

মোষবলির যূপকাষ্ঠের ঠিক পাশেই গোলাকার একটা খয়েরী রঙের,পাথর। এ পাথর অতি পবিত্র। এ পাথর ঘরের চারপাশ থেকে দুষ্ট প্রেতাত্মাকে হাজার পাহাড় ফারাকে নির্বাসিত করে রাখে। পাহাড়ী মানুষগুলোর তাই একান্ত বিশ্বাস। এমনি পাথর প্রতিটি বাড়ির সামনে সযত্নে রক্ষিত রয়েছে।

গোলাকার পাথরটার সামনে এসে দাঁড়ালো বুড়ী বেঙসানু। ইতিমধ্যে সমস্ত গ্রামটা এসে একেবারে মৌচাকের মত জোহেরি কেসুঙে ভনভন করতে শুরু করেছে। প্রায় সকলেই অনাবৃত। দু-এক জনের দেহে স্বল্পতম আচ্ছাদন।

"কী ব্যাপার?"

"কী হলো ?"

যারা পরে এসেছে তারা কিছু জানতো না। তাদের মুখেচোখে আতঙ্ক ফুটে বেরিয়েছে।

"কী আবার হবে ?" কুৎসিত মুখভঙ্গি করে সমস্ত ঘটনাটা বলে গেলো বুড়ী বেঙসানু, "এবার সব যা। সূযের নামে মুর্গী বলি দে। সূর্যকে সন্তুষ্ট কর। তা না হলে বস্তি সাবাড় হয়ে যাবে।"

মুর্গীর সন্ধানে দিগ্বিদিকে ঝড়ের মত ছুটে গেলো পাহাড়ী মানুষগুলো। যারা মুর্গী নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো, তাদের দিকে তাকিয়ে বুড়ী বেঙসানু বললো, "তোরা দাঁড়িয়ে রইলি কেন ? যার যার বাড়ির সামনে গিয়ে সূর্যের নামে বলি দে গিয়ে।"

একে একে সকলে চলে গেলো।

খানিকটা পর কতকগুলো নিরীহ পাখির গলায় মৃত্যুতীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠলো। আর তাদেরই উষ্ণ রক্তের রঙ শীতের প্রভাতের লালিমার সঙ্গে মিশে গেলো। সেই সঙ্গে অনেকগুলো পাহাড়ী কণ্ঠ থেকে এক করুণ আর্তি, এক শঙ্কিত প্রার্থনা উঠে গেলো আকাশের দিকে, "সূর্য, তুমি এই বলি নিয়ে সন্তুষ্ট হও। এই বস্তির ওপর তোমার রাগ যেন না পড়ে।"

আশ্চর্য ! সারুয়ামারুও একটা মুর্গী বলি দিয়েছে সূর্যের নামে। আর সকলের সঙ্গে একই প্রার্থনায় স্বর মিলিয়েছে, "সূর্য, তুমি এই বলি নিয়ে··।"

সূর্যের উদ্দেশে নিরীহ রক্তের উৎসর্গ শেষ হলো।

এতক্ষণে দক্ষিণের পাহাড়চূড়া থেকে সাদা তুষারের আস্তরটা একেবারে মুছে গিয়েছে। একটু একটু করে জ্যোতির্ময় হচ্ছে সূর্য। উপত্যকায় তার উত্তাপ ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। চারপাশের পাহাড়গুলো আরো স্পষ্ট হচ্ছে। নিবিড় অরণ্য প্রত্যক্ষ হচ্ছে। অপরূপ রূপময় এই নাগা পাহাড়। পলে পলে তার রূপবদলের পালা। শীতের সকালের এই নাগা পাহাড়কে আশ্চর্য কমনীয় মনে হয়। তার সব নিষ্ঠুরতা রাত্রির হিমে হিমে মুছে একেবারে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে যেন।

মুর্গী বলি দিয়ে সকলে আবার ছুটে এসেছে বেঙসানুর কাছে। তাদের মুঠিতে মুঠিতে খারে বর্শার ফলা ঝলকাচ্ছে। একটু আগে একটা খণ্ডযুদ্ধের আভাস পেয়েছিলো তারা। সারুয়ামারুকে বর্শায় ফুঁড়ে ফেলার এক হিংস্র

আনন্দে পাহাড়ী মানুষগুলো তুমুল শোরগোল তুলে দিলো। সে শোরগোল বিস্ফোরণের মত আকাশের দিকে দিকে বিদীর্ণ হতে লাগলো।

"হো-ও-ও-ও-য়া-আ-আ—"

"হো-ও-ও-ও-য়া-আ-আ—"

বেঙসানু আবার নতুন উদ্যমে গালাগালি দিতে শুরু করেছে। অফুরন্ত উৎসাহ। আর ভাণ্ডারে তার অশ্রাব্য খিস্তির অন্ত নেই।

ওপরে জোরি কেসুঙে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে আছে সারুয়ামারু। নিশ্চেতন শিলামূর্তির মত। শুধু তার চোখদুটো নিষ্ঠুর আলোককণার মত জ্বলছে। তার থাবাতেও অতিকায় এক বর্শা। এই খণ্ডযুদ্ধ তার ধমনীকেও রক্তে রক্তে ফেনিয়ে তুলেছে। তার চেতনার মধ্যেও গর্জন করে উঠেছে আদিম সংগ্রাম।

সারুয়ামারুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে তার বউ। নাম জামাতসু। উলঙ্গ তামাটে দেহ। শরীরের মধ্যদেশ অনেকটা স্ফীত হয়েছে। গর্ভধারণের পরিষ্কার ইঙ্গিত ছড়িয়ে রয়েছে চোখের কোলের কালো রেখায়, টসটসে স্তনচূড়ার কৃষ্ণাভায়। একটা লোহার মেরিকেতসু নিয়ে স্বামীর পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সে।

সারুয়ামারু ও জামাতসু। আদিম মানব আর আদিম মানবী।

জোরি কেসুঙ থেকে মুর্গীর রক্ত ফোঁটায় ফোঁটায় ঝরছে জোহেরি কেসুঙের ওপর। একটু আগে সূর্যের নামে নির্বিরোধ প্রাণীটাকে উৎসর্গ করেছিলো সারুয়ামারু। সেই মুর্গীর রক্ত। টকটকে লাল। এখনও গোলাকার পাথরের ওপর আতামারী ফুলের মত পড়ে রয়েছে নিহত পাখিটা।

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

জোহেরি কেসুঙে শোরগোলটা এখন উদ্দাম হয়ে উঠেছে। ভয়ানক হচ্ছে। কিছু একটা ঘটে যেতো নির্ঘাত। তার আগেই ঘটলো ঘটনাটা। বুড়ো খাপেগার সঙ্গে জোহেরি কেসুঙে এলো সালুনারু। সালুনারু রেঙকিলানের বউ। তার পেছন পেছন এসেছে সেঙাই, ওঙলে, পিঙলেই। তিনটে মোরাঙ থেকে অজস্র অবিবাহিত জোয়ানরা এসে জোহেরি কেসুঙের চারপাশে চক্রাকারে ভিড় জমালো।

বুড়ো খাপেগা বললো, "এখানে তোরা কেউ রেঙকিলানকে দেখেছিস্ ?"

"না।" অনেকগুলো গলায় একসঙ্গে শব্দটা ধ্বনিত হলো।

সেঙাই বললো, "কী তাজ্জবের ব্যাপার! কাল বাইরের পাহাড় থেকে সালুনারুই তো তাকে ডেকে নিয়ে গেলো।"

"আমি!" সালুনারুর গলায় বিস্ময় চমক দিয়ে উঠলো। সেই সঙ্গে মিশে রয়েছে এক ধরনের বিচিত্র ভয়ের অনুভূতি, "আমি তো কাল সারা দিন ঘর থেকে বের হই নি। আমি আবার কখন গেলাম বাইরের পাহাড়ে!"

"নির্ঘাত তুই! আমরা তিনজনে তোর গলা শুনেছি।" হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সেঙাই।

ওঙলে বললো, "কাল সন্ধ্যের সময় যখন শিকার থেকে আমরা ফিরছিলাম, তখন দুই দক্ষিণের পাহাড়ে আসতে রেঙকিলানকে ডাকলো সালুনারু। পিঙলেই, সেঙাই আর আমি সে ডাক শুনেছি। এর মধ্যে কোন ভুল নেই।"

পিঙলেই বললো, "কাল রেঙকিলানের কী যেন হয়েছিলো! চাল কি রোহি মধু কিছুই খায় নি। এমন যে সম্বরের মাংস, তাও ছোঁয় নি। আমরাই সব খেয়ে ফেলেছিলাম। আর কী জন্যে জানি খুব ভয় পেয়েছিলো সে।"

বুড়ো খাপেগা চোখের ওপর ঝুলে-আসা ভ্রূদুটোকে টেনে তোলার চেষ্টা করলো। তারপর সন্ত্রস্ত গলায় বললো, "এ তো বড় তাজ্জবের ব্যাপার! কেলুরি বস্তি থেকে একটা আস্ত মানুষ একেবারে লোপাট হয়ে যাবে রাতারাতি! আমার মনে হচ্ছে, এ কাজ নির্ঘাত দুই সালুয়ালাঙ বস্তির শয়তানদের। আচ্ছা দেখা যাবে।" ঘোলাটে চোখদুটো জ্বলে উঠতে চাইলো খাপেগার। বিধ্বস্ত দাঁতগুলি কড়মড় করে বাজলো।

ওঙলে বললো, "তা হতে পারে, কাল দুপুরে সেঙাই ওদের খোন্‌কেকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে এসেছিলো। রেঙকিলানকে মেরে হয়তো তার শোধ তুলেছে।"

আচমকা বুড়ো খাপেগা চিৎকার করে উঠলো। একটা দমকা বাতাসের আঘাতে সে যেন ফিরে গেলো অনেকগুলো বছরের নেপথ্যে; তার যৌবন-কালের হিংস্র দিনগুলোতে। বুড়ো খাপেগার চিৎকার এই কেলুরি গ্রামটাকে তটস্থ করে তুললো, "হো-ও-ও-আ-আ—"

"হো-ও-ও-ও-য়া-আ-আ—"

জোয়ান ছেলেদের গলায় গলায় খাপেগার চিৎকার তীব্র প্রতিধ্বনি তুললো। এমন কী সারুয়ামারুও সে চিৎকারে নিজের কণ্ঠ যোগ করেছে। দলপতির এই আদিম আহ্বানে, একই বর্শাফলকের নীচে সব পাহাড়ী মানুষই

এক, অভিন্ন। এখানে কোন বিভেদ নেই, বিচ্ছেদ নেই। একই হত্যার প্রতিজ্ঞা দিয়ে সকলে গ্রথিত।

আকাশ ফাটিয়ে গর্জে উঠলো খাপেগা, "সালুয়ালাঙ বস্তির তিনটে মাথা চাই। এই জোয়ানের বাচ্চারা, তিনদিনের মধ্যে আমাদের বস্তির তিনটে মোরাঙে ওদের তিনটে মাথা ঝোলানো চাই।"

"হো-ও-ও-ও-য়া-আ-আ—"

এই নগণ্য পাহাড়ী জনপদ থেকে অজস্র গলার হুঙ্কার টিজু নদীর দিকে ধেয়ে গেলো।

একটু আগে সারুয়ামারুকে বর্শা দিয়ে গাঁথবার প্রেরণায় সকলে উন্মুখ হয়ে ছিলো। এই মুহূর্তে নতুন প্রসঙ্গ এসেছে। নতুন সংগ্রামের নির্দেশ এসেছে সর্দারের কাছ থেকে। সারুয়ামারুর কথা ভুলে গিয়েছে সকলে। এমন কি সারুয়ামারু নিজে পর্যন্ত। জোরি কেসুঙ থেকে এবার সে নির্দ্বিধায় নেমে এসেছে নীচে, জোহেরি কেসুঙের পাষাণ চত্বরে। সকলের পাশে একটি বিন্দুর মত নিজেকে মিলিয়ে দিয়েছে সে। এমন একটা ভয়াল মুহূর্তে সেও রক্তে রক্তে সকলের সঙ্গে অভিন্ন। অবিচ্ছিন্ন। একই শপথের কঠিন বন্ধনে বাঁধা।

এতক্ষণ বুড়ী বেঙসানু একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সব শুনছিলো। একটি কথাও বলে নি। সহসা একটা ক্লিষ্ট শব্দ করে উঠলো সে, "আনিজা! রেন্‌জু আনিজা! রাত্তিরে অমন নাম ধরে ডেকে পাহাড়ের খাদে ফেলে দেয় মানুষকে।"

"আনিজা!" সবগুলো কণ্ঠে একটা ভীত প্রতিধ্বনি উঠলো।

চকিত হয়ে সকলে তাকালো বেঙসানুর দিকে।

বুড়ী বেঙসানু। অনেক বছরের সংগ্রাম তার বলিরেখার ভাঁজে ভাঁজে লুকিয়ে রয়েছে। এই নগণ্য পাহাড়ী উপনিবেশে অনেক অভিজ্ঞতার সাক্ষী হয়ে রয়েছে সে। সুপ্রাচীন একটা খাসেম গাছের মত। তার রুক্ষ চুলে চুলে অনেক ঝড়তুফানের স্বাক্ষর, তার শিরা-স্নায়ু-অস্থি-মজ্জায় অনেক কাহিনীর, অনেক কথার, অনেক ইতিহাসের আত্মা লুকিয়ে রয়েছে।

বুড়ী বেঙসানু আবারও বললো, "যা শুনলুম, তাতে মনে হচ্ছে সালুয়ালাঙের শত্তুরদের কাজ নয়। হু-হু, এ নির্ঘাত আনিজার কাজ।"

"আনিজা!"

"আনিজা!"

এতক্ষণে সালুয়ালাঙ গ্রামখানা থেকে তিনটে মাথা আনার সঙ্কল্পে যারা ভয়াল চিৎকার শুরু করেছিলো, ঐ একটি নামের মাহাত্ম্যে তারা একেবারে নিভে গিয়েছে। সকলের মুখে চোখে পাণ্ডুর ছায়া নেমে এসেছে। জীবন্ত পাহাড়ী মানুষগুলো পলে পলে মৃত্যুকে অনুভব করছে যেন। এক সাঙ্ঘাতিক অপঘাতের শিহরণ যেন রক্তের কণায় কণায় সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে তাদের। আনিজা!

বুড়ো খাপেগা বুড়ী বেঙসানুর কাছাকাছি অনেকটা সরে এসেছে। ফিস-ফিস গলায় সে বললো, "তা হলে কী করা যায়? তুই কী বলিস বেঙসানু?"

"তোরা একবার বাইরের পাহাড়টা দেখে আয়। এখন দিনের বেলা; আনিজার কোন ভয় নেই। যদি পেয়ে যাস, তবে মড়াটাকে দেখে আসবি। খবদ্দার মড়াটাকে ছুঁবি না কেউ। আগে খুঁজে আয়, যা।"

এতক্ষণ সকলের ভাবগতিক লক্ষ্য করছিলো সালুনারু; রেঙকিলানের বউ। উৎকর্ণ হয়ে সকলের কথাগুলি সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে যেন শুষে শুষে নিচ্ছিলো। আচমকা পাহাড়ী জনপদের এই নিভৃত খাঁজে জোহেরি কেসুঙকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে আর্তনাদ করে লুটিয়ে পড়লো সে।

দক্ষিণ পাহাড়ের খাড়া উতরাইএর কাছে এসে পড়েছে মানুষগুলো। অনেক নীচে গভীর খাদ। পাহাড়ের দেহ বেয়ে বেয়ে গাছপালা আর ঝোপঝাড়ের জটিলতম জাল বুনে বুনে সেই খাদের দিকে নেমে গিয়েছে উদ্দাম অরণ্য। ভয়াল অন্ধকার স্তব্ধ হয়ে রয়েছে সেখানে।

উতরাইএর মাথায় দাঁড়িয়ে সেঙাই বললো, "কাল এই দিকেই দৌড়ে এসেছিলো রেঙকিলান। রাত্তিরবেলা এই দিক থেকেই একটা গলার শব্দ শুনতে পেয়েছিলাম আমরা। রেঙকিলান বলেছিলো, সালুনারু ডাকছে। তারপর দৌড়ে এখানে চলে এসেছিলো।"

বুড়ো খাপেগা বললো, "তাই তো, এক কাজ কর। হুই খাদের মধ্যে তোরা সব খুঁজতে শুরু কর। নিশ্চয়ই আশেপাশে কোথায়ও পড়ে আছে রেঙকিলান।"

গ্রাম থেকে শুধু পুরুষ মানুষই এসেছিলো। সকলের হাতের থাবায় অতিকায় সব বর্শা। তার ওপর শীতের সকালের রোদ এসে পড়েছে।

ঝিকমিকিয়ে উঠছে ফলাগুলো। পূর্ব পাহাড়ের চূড়া ছুঁয়ে মালভূমি আর উপত্যকার মধ্য দিয়ে দোল খেতে খেতে সোনালী রোদ চলে গিয়েছে পশ্চিম পাহাড়ে। সেখান থেকে আছাড় খেয়ে পড়েছে উত্তর আর দক্ষিণের শৈলশিরে। নাগা পাহাড়ের দিকে দিকে রাত প্রভাতের সংকেত। জাগরণের আভাস।

"কী হবে বল্ তো সদ্দার!"

"ও সদ্দার বড় ভয় করছে!"

পাথরপেশী সব জোয়ান। পাহাড়ের চড়াই-উতরাই থেকে, উদ্দাম জলপ্রপাত থেকে, মালভূমি আর উপত্যকার দিগ্‌দিগন্ত থেকে তারা স্বাস্থ্য আহরণ করেছে। এই নিবিড় অরণ্য তাদের দুর্বার সাহস দিয়েছে। চিতার গর্জন থেকে, ডোরাদার বাঘের হুঙ্কার থেকে, ময়াল সাপের ক্রূর দৃষ্টি থেকে তারা পলে পলে সংগ্রামের অধিকার অর্জন করেছে। সর্দারের একটিমাত্র নির্দেশে তারা নখে ছিঁড়ে আনতে পারে শত্রুর মুণ্ড। বর্শা দিয়ে গেঁথে আনতে পারে অতিকায় দাঁতাল হাতির ঝাঁককে। ভিন পাহাড়ের মানুষের হৃৎপিণ্ড ছিঁড়ে আঁজলা আঁজলা রক্ত হিংস্র উল্লাসে ছিটিয়ে দিতে পারে মোরাঙে। সেই রক্ত দিয়ে আঁকতে পারে আদিম পৃথিবীর প্রথম শিল্পলেখা।

সেই সব জোয়ান পুরুষ! সেই সব পাহাড়ী মানুষ! এই মুহূর্তে তারা ভয় পেয়েছে। পাণ্ডুর কণ্ঠগুলো তাদের ফিসফিস করছে অস্বাভাবিক আতঙ্কে, "কী হবে সদ্দার?"

এমন কি কেলুরি গ্রামের প্রাচীন মানুষ খাপেগা পর্যন্ত ভয় পেয়েছে। সে বললো, "আগে তো রেঙকিলানকে খুঁজে বের কর, তারপর বোঝা যাবে।"

জোয়ান পুরুষগুলো দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। গাছের ডাল ধরে ঝুলতে ঝুলতে অনেকে নেমে গেলো গভীর খাদের মধ্যে। আর চড়াইটার চূড়ায় দাঁড়িয়ে রইলো বুড়ো খাপেগা আর সেঙাই।

অনেকটা সময় পার হয়ে গেলো। পাহাড়ী উপত্যকার ওপর রোদের সোনালী রঙ একটু একটু করে গেরুয়া হলো। এখন পাহাড়ী বনভূমি দিকে দিকে সবুজ আগুনের মত লেলিহ হয়ে জ্বলতে শুরু করেছে।

একসময় অতল খাদ থেকে সারুয়ামারুর কণ্ঠ ভেসে এলো। দুদিকের পাহাড়ে সে স্বর প্রতিধ্বনিত হতে হতে উঠে আসছে ওপরে, "সদ্দার, পেয়েছি! এই তো এইখানেই রেঙকিলান, একেবারে মরে পড়ে আছে।"

"হো-ও-ও-ও—"

ঝুপ ঝুপ করে গাছ বেয়ে বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলো জোয়ান ছেলেরা।

পাহাড়ী উতরাইএর চূড়া থেকে চিৎকার করে উঠলো বুড়ো খাপেগা, "খবদ্দার, কেউ মড়া ছুঁবি না।"

পাশেই দাঁড়িয়ে ছিলো সেঙাই। তার দিকে তাকিয়ে খাপেগা আবারও বললো, "একবার বস্তিতে যা সেঙাই। তোর ঠাকুমা আর সালুনারুকে এক্ষুনি এখানে নিয়ে আসবি। বেঙসানু অনেক কিছু জানে। সে যা বলবে তাই করবো। শীগগীর যা।"

খানিকটা পর সালুনারু আর বুড়ী বেঙসানুকে সঙ্গে নিয়ে উতরাইএ চলে এলো সেঙাই। দুজনেই অনাবৃত। রোদ উঠেছে খরধার। প্রকৃতি তাদের উত্তাপ দিয়েছে। কৃত্রিম আবরণের আর প্রয়োজন নেই।

বুড়ো খাপেগা বললো, "রেঙকিলান হুই খাদের মধ্যে মরে পড়ে রয়েছে। এবার কি করতে হবে বেঙসানু?"

"এ ঠিক আনিজার কাজ। আমি আগেই বলেছিলাম। আমার ছোটবেলায় এই কেলুরি বস্তিতে যখন বউ হয়ে এলাম, তখন তিনটে জোয়ানকে রেন্‌জু আনিজা এমন করে সাবাড় করেছিলো। হু-হু। বছর খানেক আগে নগুসেরি বংশের বুড়ো হিবুটাক রেন্‌জু আনিজার ডাকে মরেছিলো। তোদের মনে নেই! এবার মরলো রেঙকিলান। কেন যে আনিজা গোসা হলো আমাদের বস্তির ওপর?" একটু থামলো বেঙসানু। অনেকটা পাহাড়ী চড়াই-উতরাই উজিয়ে এসেছে সে। শুকনো স্তনের নীচে বুকখানা দ্রুততালে উঠছে নামছে। ঘন ঘন কয়েকটা নিশ্বাস ফেলে বেঙসানু আবার বললো, "এ হলো রেন্‌জু আনিজার কাজ। রাত্তিরবেলা মানুষের নাম ধরে ডাকে, তারপর পাহাড়ের খাদের মধ্যে ধাক্কা মেরে ফেলে দেয়।"

আড়ষ্ট চোখে তাকিয়ে ছিলো সালুনারু। কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না সে। কিছুই শুনতে পাচ্ছে না। চেতনা তার নিথর হয়ে গিয়েছে। ঠোঁট দুটি থরথর করে কাঁপছে।

একসময় বুড়ী বেঙসানু আবারও বললো, "নিশ্চয় কিছু অন্যায় করেছিলো রেঙকিলান। না হলে রেন্‌জু আনিজার রাগ কেন তার ওপর পড়বে! কী করেছিলো? কী লো সালুনারু? তুই জানিস?"

বুকের মধ্যটা ধুকধুক করে উঠলো সালুনারুর। আচমকা সে বলে ফেললো, "কাল শিকারে যাবার আগে রাত্তিরে সে মোরাঙে শুতে যায় নি। আমার কাছেই শুয়েছিলো। সকালে সেই কাপড়েই কাল শিকারে চলে গিয়েছিলো।"

"হা-আ-আ—আ"

জীর্ণ বুকখানার ওপর প্রচণ্ড একটা চাপড় মেরে আর্তনাদ করে উঠলো বুড়ী বেঙসান্থ, "কী সব্বনাশ! তুই মাগী এই বস্তিটাকে শেষ করবি। তোর জন্যে আমরা সব সাবাড় হয়ে যাবো। মাগী জানিস না, শিকারে যাওয়ার আগে সোয়ামীর সঙ্গে শুতে নেই। মাগীর ফুর্তি কত! হা-আ-আ-আ—।"

"সদ্দার, ও সদ্দার—" অতল খাদ থেকে জটিল বনের মধ্য দিয়ে প্রতিহত হতে হতে ওপরের দিকে উঠে এলো শব্দগুলো। নীচ থেকে সারুয়ামারুরা ডাকাডাকি করছে।

"দাঁড়া শয়তানের বাচ্চারা।" গর্জে উঠলো বুড়ো খাপেগা।

খিস্তির ভাণ্ডারের ঢাকনা খুলে গিয়েছে বুড়ী বেঙসান্থর। বিধ্বস্ত দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠছে তার। ঘোলাটে চোখদুটো থেকে দুটি অগ্নিপিণ্ড যেন ছিটকে আসতে চাইছে সালুনারুর দিকে। সমানে চেঁচিয়ে চলছে বুড়ী বেঙসান্থ, "ইজা হাণ্টসা সালো। মাগী শয়তানী!"

এতক্ষণ নির্বাক থেকে সব শুনছিলো সালুনারু। এবার সে ফোঁস করে উঠলো, "বুড়ী মাগী চুপ কর্। ইজা রামখো! মরেছে, আমার সোয়ামী মরেছে। তোদের কী?"

বলে কী সালুনারু! বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তো কানদুটো! রেন্‌জু আনিজা। তার কাছে এই কদর্য অপরাধ! এই জঘন্য পাপাচরণ! দেহমন অশুচি করে শিকারে গিয়ে যে অন্যায় করেছে রেঙকিলান, তাতে সমস্ত নাগা পাহাড় রেন্‌জুর ক্রোধাগ্নিতে ছারখার হয়ে যাবে না! খাপেগা তাকালো বুড়ী বেঙসান্থর দিকে। বুড়ী বেঙসান্থ নির্নিমেষ সালুনারুর দিকেই তাকিয়ে ছিলো। হয়তো ভাবছিলো কোথা থেকে পাহাড়ী মেয়ে সালুনারু এতখানি দুঃসাহস সঞ্চয় করলো। রেন্‌জু আনিজা তার স্বামীকে খাদের মধ্যে ফেলে দিয়ে পাপের প্রতিফল দিয়েছে। পাহাড়ের টিলায় টিলায় আঘাত খেতে খেতে অতলে গিয়ে তিলে তিলে মরেছে রেঙকিলান। তবু সালুনারু এতখানি তেজ কোথা থেকে পেলো!

সালুনারুর গলার নীল শিরাগুলি ফুলে ফুলে উঠছে। পিঙ্গল চোখদুটি ধকধক জ্বলছে। আর সমানে গাল দিয়ে চলেছে সে।

আচমকা সেঙাইর থাবা থেকে বর্শাটা কেড়ে নিলো বুড়ো খাপেগা। তারপর বিদ্যুৎ ঝিলিকের মত আকাশের দিকে উঠে গেলো তার হাতখানা। গলাটা চাপা হুঙ্কারে গমগম করে উঠলো, "এ শয়তানী বস্তিতে থাকলে বস্তি জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে। ওর রক্ত দিয়েই রেন্‌জু আনিজার রাগ থামাবো।"

বর্শাটা আকাশের দিকেই রয়ে গেলো বুড়ো খাপেগার থাবায়। তার আগেই পাশের খাসেম ঝোপে লাফিয়ে পড়েছে সালুনারু। সেখান থেকে একটা চকিত চমকের রেখা টেনে একটি উলঙ্গ নারীদেহ উপত্যকার ঘনবনে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

চিৎকার করে উঠলো বুড়ী বেঙসানু, "ধর্ সেঙাই, শয়তানীকে ধর্। বর্শা দিয়ে ফোঁড়। সাবাড় করে ফেল্।"

নিশ্চল শিলামূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে সেঙাই। একেবারেই নিস্পন্দ সে। এতটুকু বিকলন নেই তার সারা দেহে। নিথর দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে সে। তাকিয়েই আছে উপত্যকার দিকে, যে দিকে ঘনবনের মধ্যে সালুনারুর নগ্ন দেহটা মিলিয়ে গিয়েছে।

বর্শাটা নামিয়ে শুধু বুড়ো খাপেগা গর্জে উঠলো, "আচ্ছা মাগী, একবার বস্তিতে এসে দেখিস, টুকরো টুকরো করে কাটবো।"

খাপেগার ঘোলাটে চোখ দুটো দপদপ জ্বলছে।

সাত

আর কয়েকদিন পরেই জা কুলি উৎসব শুরু হবে পাহাড়ী জনপদগুলোতে। তারই প্রস্তুতি চলেছে কেলুরি গ্রামে। গান-বাজনা হবে, মোষ বলি দিয়ে সারা গ্রামের লোক ভোজ খাবে। খুশী-খুশী উল্লাসে, রোহি মধুর মৌতাতে, নাচ-গানের মধুর নেশায় পাহাড়ী মানুষগুলো মাতাল হয়ে যাবে। জা কুলি উৎসবের দিনরাত্রি, প্রতিটি পল-প্রহর এই পাহাড় বুঁদ হয়ে থাকবে।

কাল রাত্রিতে উত্তরের পাহাড়চূড়া ঘিরে বরফ পড়েছিলো। ঘন সবুজ চক্ররেখার ওপর তুহিন তুষারের সাদা একটা স্তর এখনও স্থির হয়ে রয়েছে। তার ওপর এসে পড়েছে জ্যোতির্ময় সূর্যের সোনা।

মোরাঙের বাঁশের মাচানে শুয়ে শুয়ে উত্তরের পাহাড়চূড়া দেখতে দেখতে সেঙাইর মনে আমেজ ঘন হয়। জা কুলি মাসের দিনগুলিতে এখন অখণ্ড অবসর। শুয়ে শুয়ে মধুর আলস্যে দিনগুলো এই পাহাড়ী জনপদের ওপর দিয়ে খুশির মিছিল হয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে।

উত্তর পাহাড়ের বরফ দেখতে দেখতে মেহেলীর কথা মনে পড়ে সেঙাইর। উদ্দাম পাহাড়ী রক্তের ফেনা হয়ে ভাসতে থাকে একটি মুখ। সে মুখ মেহেলীর। সাঁ করে বাঁশের মাচানের ওপর উঠে বসলো সেঙাই। এই একটি মুখ তার বন্য পাহাড়ী মনকে দিনরাত্রি বিব্রত করছে, তার অস্ফুট চেতনাকে অস্থির করে দিচ্ছে বারবার।

ইতিমধ্যে পাশের আর-একটা মাচান থেকে উঠে এসেছে ওঙলে। সারা গায়ে দড়ির লেপ জড়ানো। ওঙলে বললো, "কীরে সেঙাই, কী করছিস?"

"মেহেলীর কথা ভাবছি। সালুয়ালাঙের ছুই ছুঁড়ীটার জন্যে মনটা কেমন জানি করে।"

এর আগেই ওঙলেকে মেহেলীর কথা বলেছে সেঙাই।

"হু-হু—বুঝতে পেরেছি।" ওঙলের মুখখানা গম্ভীর হলো, "পিরীতে পড়েছিস। কিন্তু মোরাঙে বসে এ-সব কথা বলা ঠিক নয়। সদ্দারের কানে গেলে মুশকিলে পড়বো।"

"ঠিক বলেছিস, কিন্তু হুই শয়তানীর জন্যে মনটা বেসামাল হয়ে গেছে। কী করা যায় বল্ তো। একটা বুদ্ধি বাতলে দে। দু-তিন দিন আরো গেলাম হুই ঝরনাটার কাছে কিন্তু ছুঁড়ীটা আজকাল আর আসে না। মনটা খারাপ হয়ে গেছে ওঙলে।" গলাটা ব্যাজার হয়ে এলো সেঙাইর।

"চল্, এখন বাইরে চল্। বাঁশ কাটতে যাবো নদীর কিনারে। আর কদিন পরেই জা কুলির গেন্না শুরু হবে। খুলি (বাঁশি) বানানো দরকার।"

বাঁশের মাচান থেকে নীচে নামলো সেঙাই। তারপর দড়ির লেপটা সারা গায়ে ভালো করে জড়িয়ে মোরাঙের বাইরে চলে এলো। তারও পর ওঙলেকে সঙ্গে নিয়ে জোহেরি কেসুঙের পথে পা বাড়িয়ে দিলো।

সূর্যটা পূর্ব পাহাড়ের ওপর আরো স্পষ্ট হয়েছে। তার সোনালী আলোতে এখন কমলা রঙের আভাস দেখা দিয়েছে। দূরের কেসুঙে কেসুঙে, অমসৃণ পাথরের চত্বরে বসে বসে মেয়েরা লেপ বুনছে, জঙগুপি কাপড়ে রঙ দিচ্ছে, কেউ কেউ হরিণের ছাল ছাড়াচ্ছে বাঁশের ছুরি দিয়ে।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি জোয়ান ছেলে বেরিয়ে এসেছে মোরাঙ থেকে। তাদের মধ্যে একজন বললো, "কী রে সেঙাই, কোথায় যাচ্ছিস ?"

"একটু ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে আসি।"

"যা। আমরা নদীর কিনারে বাঁশ কাটতে যাচ্ছি। খুলি (বাঁশি) আর খুঙ (দোতারার মত বাদ্যযন্ত্র) বানাতে হবে। আর তো মোটে কয়েকটা দিন, তার পরেই জা কুলির গেন্না শুরু হবে।"

"তোরা যা। আমি আর ওঙলে একটু পরেই যাচ্ছি।" সেঙাই বললো।

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

কলরব করতে করতে টিজু নদীর দিকে চলে গেলো জোয়ান ছেলেরা। তাদের হাতের মুঠিতে মৃত্যুমুখ বর্শা রয়েছে। ঝকঝকে দা রয়েছে। তীরধনুক রয়েছে।

জোহেরি কেসুঙের দিকে আসতে আসতে ওঙলে বললো, "কী ব্যাপার রে সেঙাই ? ঘরে যাচ্ছিস যে !"

"হু-হু।" গোলাকার কামানো মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে হাসলো সেঙাই। লাল-লাল অপরিষ্কার দাঁতগুলো ছড়িয়ে পড়লো তার, "বল্ তো ওঙলে, কী জন্যে এলুম ?"

"তা আমি কী করে জানবো ?"

"চল্, দেখেশুনে সব জানবি।"

"এখনি বল, নইলে ভালো লাগে না আমার। আপোটিয়া।" বিন্দু বিন্দু বিরক্তি ক্ষরিত হলো ওঙলের কণ্ঠ থেকে, "যা বলবি, মন সাফ করে বলবি। তা নয়, পরে জানবি! তুই যেন কেমনধারা হয়ে যাচ্ছিস সেঙাই!"

বুড়ী বেঙসানু বাইরের ঘরে বসে বেতের আখুতসা (চাল রাখার পাত্র) বুনছিলো। তার দু পাশ থেকে দুটি কাঁকড়ার দাঁড়ার মত চেপে ধরেছে ফাসাও আর নজলি। দুটি নাতি-নাতনী।

সেঙাই আর ওঙলে বাইরের ঘরে চলে এলো। সেঙাইদের দেখে কলকল করে উঠলো ফাসাও আর নজলি। বুড়ী বেঙসানুকে ছেড়ে দুটি শিশুঝড় এসে ঝাঁপিয়ে পড়লো সেঙাই আর ওঙলের ঘাড়ের ওপর।

ফাসাও বললো, "দাদা, আমাকে এবার জা কুলি গেন্নার দিনে একটা খুলি (বাঁশি) দিবি?"

নজলি বললো, "আমাকে কিন্তু খুঙ (দোতারার মত বাদ্যযন্ত্র) বানিয়ে দিতে হবে। দিবি তো?"

"দেবো, দেবো। এবার সরে বোস্ দুইদিকে।"

কাঁধের ওপর থেকে দুটি শিশুঝড়কে ঝেড়ে ফেললো সেঙাই আর ওঙলে।

বুড়ী বেঙসানু বললো, "কী রে সেঙাই, তোর পাত্তাই নেই। তোর বাপ সিজিটো শয়তানটা সেই যে কোহিমা গেছে, ঘরে আসার আর নাম নেই। ওরে শয়তানের বাচ্চা, ঘরে এক ফোঁটা নিমক নেই। একবার কোহিমায় যেতে হবে। নইলে নিমক ছাড়া ভাত গিলবি কী করে?"

"থাম, থাম ঠাকুমা। দুই সব নিমক আনতে আমি পারবো না।" চোখেমুখে একটা বিরক্ত ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো সেঙাইর, "হরিণের ছাল, মোষের শিঙ, বাঘের দাঁত দুই সারুয়ামারুকে দিয়ে দিস। সে নিমক এনে দেবে।"

"না না, ওর হাতের নিমক খাবো না। শয়তানের বাচ্চা সূর্যের নামে যা-তা বলেছে সেদিন।" বুড়ী বেঙসানু শুকনো তামাকপাতার মত চুলগুলো ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বললো, "ওকে সেদিন বর্শা দিয়ে ফুঁড়লে শান্তি হতো। ও হলো আস্ত শয়তানের বাচ্চা, একট বুড়ো টেফঙের বাচ্চা—"

বুড়ী বেঙসানু শীতের এই হিমাক্ত সকালে কদর্য কতকগুলি গালাগালি আবৃত্তি করে চললো। সে আবৃত্তির বিরাম নেই। বিশ্রাম নেই।

গর্জন করে উঠলো সেঙাই, "থাম্ বলছি বুড়ী মাগী, নইলে গলা টিপে ধরবো। আগে খেতে দে। বড় খিদে পেয়েছে।"

এখনও থামে নি বুড়ী বেঙসানু। জলদ্ তালে এখনও তার মুখখানা সমানে বকবক করে চলেছে। আচমকা বাঁশের দেওয়াল থেকে একটা অতিকায় বর্শা টেনে বার করলো সেঙাই, তারপর সমস্ত কেসুঙটাকে কাঁপিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "থামলি, থামলি! নইলে বর্শা দিয়ে তোকে আজ ফালা-ফালা করবো। থাম শয়তানী।"

এক নিমেষে বুড়ী বেঙসানুর জিভের বাজনা থেমে গেলো। চকিতে শীর্ণ হাতের মুঠি থেকে অসমাপ্ত বেতের আখুতসাখানা নামিয়ে রেখে ভেতর দিকের ঘরে চলে গেলো। একটু পরেই একটা কাঠের বাসনে খানিকটা ঝলসানো বুনো মোষের মাংস আর বাঁশের পানপাত্রে খানিকটা রোহি মধু এনে নামিয়ে রাখলো সেঙাইদের সামনে। তারপর অস্ফুট গলায় তর্জন করে উঠলো বুড়ী বেঙসানু, "আপোটিয়া, আপোটিয়া (মর-মর)—"

পুরোপুরি ঝলসানো নয়, কাঁচা-কাঁচা সেই অদগ্ধ মাংস লাল দাঁতের পাটির ফাঁকে ফেলে পরিত্রাহি চিবাতে লাগলো সেঙাই আর ওঙলে। মাঝে মাঝে দু-এক চুমুক রোহি মধু গিলে রসনাকে বেশ তরিজৃত করে রাখতে লাগলো।

মেজাজটা এবার অনেকটা প্রসন্ন হয়েছে। সেঙাই বললো, "তোর সঙ্গে একটা কথা বলতে এলুম ঠাকুমা।"

"কী কথা রে টেফঙের বাচ্চা?" রক্তচোখে তাকালো বুড়ী বেঙসানু।

"আমি বিয়ে করবো। আমার একটা বউ চাই। না হলে রাত্তিরে মোরাঙে একা একা ঘুম আসে না।" বড় বড় গজদাঁতের ফাঁকে একটি অতিকায় হাড়কে কায়দা করতে করতে বললো সেঙাই।

ইতিমধ্যে আবার বেতের আখুতসাটা হাতের মুঠিতে তুলে নিয়েছে বুড়ী বেঙসানু, "বিয়ে করবি, সে তো ভালো কথা। তোর বাপ কোহিমা থেকে আসুক। তারপর তোর শ্বশুরকে টেনেন্যু মিঙ্গেলু (কন্যাপণ) পাঠিয়ে দেবো।"

"আমার বউ কে? শ্বশুর কে?"

"অনেক ছোটবেলা থেকে তোর বউ ঠিক হয়ে রয়েছে। থেমাকেডিমা

বস্তির মেয়ে লেন্‌টিনোকটাঙের সঙ্গে তোর বিয়ে হবে। ওদের বংশও বেশ বনেদী। নগুসেরি বংশ। আর তোর শ্বশুরের নাম হলো সাঞ্চামবাতা। কী রে, খুশী তো ?" দুটি ধূসর চোখের মণিতে কৌতুকের আলো জ্বালিয়ে তাকালো বুড়ী বেঙসানু। "বউ এলে আর একা একা থাকতে হবে না। তোর বাপ কোহিমা থেকে ফিরলেই তোর বিয়ে দেবো।"

আচমকা এই বাইরের ঘর ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠলো সেঙাই, "না, না, হুই লেন্‌টিনোকটাঙকে আমি বিয়ে করবো না। এই বস্তিতে থেমাকেডিমা বস্তির কেউ এলে একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে মারবো। খুব সাবধান।"

শঙ্কার কয়েকটি রেখা ফুটলো বুড়ী বেঙসানুর মুখেচোখে, "লেন্‌টিনোকটাঙকে বিয়ে করবি না তো, কাকে বিয়ে করবি ?"

"মেহেলীকে বিয়ে করবো।"

"মেহেলী আবার কে ?"

ওঙলে বললো, "সালুয়ালাঙ বস্তির মেয়ে। ওদের বংশ হলো পোকরি।"

ধক করে একটা মশালের মত জ্বলে উঠলো বুড়ী বেঙসানু, "ও, সেই নিতিংসুদের বংশ। সেঙাইর ঠাকুরদাকে যারা মেরেছে, তাদের মেয়ে! কী রে ওঙলে শয়তান ?"

"হু-হু—" মাথা নাড়লো ওঙলে।

"দেখবো কত বড় তাগদ সেঙাইর। হুই বংশের মেয়ে কেড়ে আনতে গিয়ে মরেছে আমার সোয়ামী। তার নাতির আবার শখ হয়েছে। নির্ঘাত মরবে সেঙাই রামখোটা।" বুড়ী বেঙসানু তার একটি গলার তারস্বর চিৎকারে, একটি গলার বাজনা বাজিয়ে বাজিয়ে জোহেরি কেসুঙের সকালটাকে ছত্রখান করে ফেললো।

বর্শার খোঁচা লেগে যেমন করে বুনো মোষ ফুঁসিয়ে ওঠে, ঠিক তেমনি করেই ফুঁসছিলো সেঙাই। লাল লাল দুপাটি দাঁত তার কড়মড় করে উঠলো, "তুই দেখিস বুড়ী মাগী, আমি তোর সোয়ামী জেভেথাঙ না। আমি সেঙাই। হুই পোকরি বংশের মেহেলীকে লড়াই করে এনে আমি বিয়ে করবো। হু-হু।"

ইতিমধ্যে ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে বুড়ী বেঙসানু। চারদিকে ঘুরে ঘুরে সে চিৎকার করতে লাগলো, "এই সারুয়ামারু, এই নড্রিলো, এই গ্যিহেনি, এই ইটিভেন, তোরা সব শোন। টেফঙের বাচ্চা হুই সেঙাই পোকরি বংশের

মেয়ে মেহেলীকে কেড়ে এনে বিয়ে করবে! শোন্ তোরা! শয়তানের মদ্দানীর কথাটা শোন্!"

আশেপাশের কেসুঙ থেকে উলঙ্গ মেয়েপুরুষের মিছিল নেমে এলো জোহেরি কেসুঙে। বুড়ী বেঙসানুর চারপাশে অনেকগুলো কৌতুহলী গলা বাজতে লাগলো, "কী লো, কী হলো আবার? সেঙাইর বিয়ে? বেশ তো।"

"বিয়ের ভোজে সম্বরের মাংস খাওয়াতে হবে কিন্তু।"

"ওরে শয়তানের বাচ্চা, ওরে টেফ্রের বাচ্চারা, ভোজ গিলতে এসেছিস্? ভাগ্, ভাগ্। ইজাহান্টসা সালো।" বুড়ী বেঙসানু নির্বিরাম চিৎকার করে চললো, "ভোজ খাবে সব! খাবি তো। তুই সেঙাইর মাংস খাবি। ওর ঠাকুরদা নিতিৎসুর জন্যে মরেছে। ও আবার যাবে মেহেলীকে আনতে। তুই পোকরি বংশের মাগী! ঠিক মরবে শয়তানটা। তখন ওর মাংস দিয়ে ওর বিয়ের ভোজ খাবি।"

সহসা বাইরের ঘর থেকে একটা বর্শা উল্কাবেগে বেরিয়ে এলো। আর এসে গিঁথলো বুড়ী বেঙসানুর কোমরের ওপর। আর্তনাদ করে অমসৃণ পাথরের উপর লুটিয়ে পড়লো বুড়ী বেঙসানু। খানিকটা লাল টকটকে রক্ত ফিনকি দিয়ে কেসুঙকে স্নান করিয়ে দিলো।

বাইরের ঘরে একটি উত্তেজিত গলা গর্জন করে চললো সমানে। সেঙাই চেঁচাচ্ছে, "দেখিস বুড়ী শয়তানী, তুই মেহেলীকে আমি বিয়ে করতে পারি কি না! আমি জেভেথাঙের মত মাগী না। কুত্তা না। দেখিস্—"

আট

শীতের মাঝামাঝি জা কুলি উৎসব শেষ হলো ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ কেলুরিতে। এই মাসটাকে পাহাড়ী মানুষেরা বলে জা কুলি সু।

শীতের প্রথম দিকে পাহাড়ী জমিগুলোকে রিক্ত করে ফসল উঠেছিলো। সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে আবাদের ক্ষেত। নীরস পাথরের ওপর যেখানেই একটু মাটির স্নেহ রয়েছে, সেখান থেকেই ফসলেরা লক্ষ শিকড় বিস্তার করে প্রাণরস শুষে নেয়। শীতের প্রথম দিকে শস্য উঠে যাবার পর ক্ষেতগুলো অনাবৃত আকাশের নীচে পড়ে পড়ে রোদ পোহায়। সূর্যের উত্তাপে সোনালী খড় শুকিয়ে শুকিয়ে বারুদের মত হয়ে থাকে। জোয়ারের শস্যহীন গোড়াগুলো তীক্ষ্ণধার হয়ে যায়। জমির ফাটলের মুখ থেকে লকলকিয়ে ওঠে পাহাড়ী ঘাসের অঙ্কুর ; উঁকি দেয় বুনো লতার আশ্চর্য সবুজ মাথা।

প্রথম শীতের ফসলবতী জমি মাঘের এই হিমাক্ত দুপুরে আশ্চর্য হতশ্রী। দিকে দিকে তার শ্মশান-শয্যা যেন বিকীর্ণ হয়ে রয়েছে।

দক্ষিণ পাহাড়ের এই উপত্যকাটা অনেকটা সমতল। জমিগুলো বিশাল একটা ঢেউ-এর মত দোল খেয়ে খেয়ে দূরের মালভূমিতে গিয়ে মিশেছে।

সামনের ঘন বন ফুঁড়ে ফসলের ক্ষেতে এসে দাঁড়ালো অনেকগুলো মানুষ। নারী আর পুরুষ, দুই-ই রয়েছে তাদের মধ্যে। কেউ কেউ একেবারেই উলঙ্গ, আর কারুর দেহে স্বল্পতম আচ্ছাদন।

সামনের দিকে রয়েছে সেঙাই, ওঙলে, পিঙলেই এমনি আরো কয়েকজন। সকলের মুঠিতে পেন্যু কাঠের জ্বলন্ত মশাল। কেউ কেউ বর্শাও নিয়ে এসেছে। এদিক সেদিক ঘুরছে পোষা শুয়োর। গোটাকয়েক বিচিত্র রঙের শিকারী কুকুর এসেছে সেঙাইদের সঙ্গে।

শীতের আকাশে জ্বালাহীন রোদ। পাহাড়ী উপত্যকার ওপর দুপুরটা যেন রোহি মধুর নেশার মত মৃদু মৃদু ঢুলছে।

সেঙাই বললো, "জা কুলির উৎসবে এবার তেমন আনন্দ হলো না।"

সকলেই মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিলো।

কানের লতায় চাকার মত একজোড়া পিতলের এল্‌সে ভুল নেড়ে একটি মেয়ে বললো, "হু-হু, এবার রেঙকিলানটা নেই। বড় ফুর্তিবাজ ছেলে ছিলো রেঙকিলান।"

সকলেই সমস্বরে সমর্থন করলো, "হু-হু, ঠিক কথা।"

তির্যক চোখে মেয়েটির দিকে তাকিয়ে ছিলো সেঙাই, "কী লো হেজালি, রেঙকিলানের জন্যে দেখি পরান উথল-পাথল করছে। তলায় তলায় পিরীত জমিয়েছিলি না কী?"

হেজালি এবার ফোঁস করে উঠলো, "আমার আর পিরীতের মরদ নেই? একটা মাগী তো ছিলো রেঙকিলানের। ঘরে তার বউ ছিলো; আমি কেন তার সঙ্গে পিরীত করতে যাবো! ঐ সব মাগী-চাখা মরদে আমার চলবে না। আমার টাটকা জোয়ান নাগর চাই।"

"টাটকা জোয়ান নাগর তোর জন্যে একেবারে আকাশ থেকে লাফিয়ে নামবে!" গলাটা কুৎসিত হয়ে উঠলো সেঙাইর।

হেজালির ফণা এবারে নির্মম হয়ে উঠলো, "একটা মানুষ ছিল, তার কথা বলেছি। সে তোর, আমার, সকলের ছিল লগোয়া (ক্ষেতের সঙ্গী)। ফের ছুই কথা যদি বলবি, বর্শা দিয়ে তোর মুখখানা এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবো!"

"কী বললি?" গর্জন করে উঠলো সেঙাই।

এবার আর কোন উত্তর দিলো না হেজালি।

পিঙলেই বললো, "থাম তোরা। এদিকে মশাল যে নিভে গেলো। আয়, ক্ষেতে ফসলের গোড়া পুড়িয়ে সাফ করতে হবে। তারপর জোয়ারের দানা পুঁততে হবে। খামোখা ঝগড়া করছিস কেন?"

সকলে ক্ষেতের মধ্যে নেমে এলো। তারপরে চারদিকে ছড়িয়ে পড়লো। কুকুরগুলো স্বাধীন আনন্দে উপত্যকার ওপর ছুটাছুটি করে বেড়াতে লাগলো। সোনালী খড়ের কাটা গুচ্ছের মধ্যে মুখ গুঁজে গুঁজে শুয়োরগুলো দু-এক কণা শস্যের সন্ধানে হন্যে হয়ে ফিরতে শুরু করেছে।

বাঁশের টুকরো পুঁতে জমির সীমানা ঠিক করা রয়েছে। যে যার সীমানায় নেমে গিয়েছে। যাদের মশাল নিভে গিয়েছিলো, তারা আবার সঙ্গীদের মশাল থেকে নতুন করে আগুন ধরিয়ে নিয়েছে।

"হো-ও-ও-ও-ও"—

খুনোর (আবাদী জমি) দিকে দিকে আগুন জ্বলে উঠলো। ধান আর জোয়ারের শস্যহীন অংশগুলো শুকিয়ে শুকিয়ে উন্মুখ হয়ে ছিলো। মশালের সোহাগে সেগুলো দাবানল হয়ে জ্বলে উঠলো। ফসলের ক্ষেতে মধ্যশীতের এই দুপুরে চিতাশয্যা রচিত হলো।

"হো-ও-ও-ও-ও"—

আকাশের দিকে দিকে উঠে যাচ্ছে পাহাড়ী জোয়ান-জোয়ানীর আনন্দিত চিৎকার। উঠে যাচ্ছে লিকলিকে আগুনের শিখা আর রাশিরাশি ধোঁয়া।

"হো-ও-ও-ও-ও"—

একটু একটু করে কোলাহলটা তীব্র হয়ে উঠেছে।

সহসা কে যেন গেয়ে উঠলো :

আনা এচাঙচো লোচো,
সেনা হামবঙ ইসোনিল।

সঙ্গে সঙ্গে উপত্যকার দিকে দিকে তার প্রতিধ্বনি বাজলো। অজস্র কণ্ঠে সুর জেগে উঠলো। আর সেই ছন্দিত আর সুরময় সঙ্গীত বাতাসে দোল খেতে খেতে উপত্যকার ওপর দিয়ে মালভূমির দিকে চলে গেলো। তারপর সেখান থেকে লঘু আমেজের মত দক্ষিণ পাহাড়ের চূড়ায় ভেসে গেলো :

আনা এচাঙচো লোচো,
রেচিঙ হামবঙ ইসোনিল।
আনা এচাঙচো লোচো,
ইজেম হামবঙ ইসোনিল।

ফসলের জমিটা এখন কালো হয়ে গিয়েছে। ধান আর জোয়ারের শস্যহীন অংশগুলোর ভস্ম বাতাসে বাতাসে উড়ে বেড়াতে শুরু করেছে। শীতের এই দুপুর, এই রোদ, পাহাড়ী জমিতে এই আগুনের উৎসব, আর এই গান—সব মিলিয়ে এক বিচিত্র পটভূমি সৃষ্টি হয়েছে এই উপত্যকায়।

এক সময় গান থামলো। আগুন নিভলো। ঝকঝকে রোদ গেরুয়া হলো। আবাদী জমির দিকে দিকে ক্ষতের মত ফুটে বেরুলো কালো কালো চিহ্ন। আজকের মত কাজ শেষ হলো।

ক্ষেত থেকে উঠে সকলে আবার বনের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো। সকলের মুখে কণা কণা ঘাম ফুটে বেরিয়েছে। দু-একজন প্রতিবেশী একটি গ্রামের

নাগাদের দেখাদেখি সারা গায়ে উল্কি এঁকেছিলো। বুক-পেট, হাত-পিঠ, কপাল-গাল—শরীরের যে অঙ্গে এতটুকু সুযোগ পেয়েছে, সেখানেই আদিম কারুকলা ফুটিয়ে তুলতে বিন্দুমাত্র কসুর করে নি তারা। নানা ছবি। নরমুণ্ড, বুনো মোষের মাথা, হাতির দাঁত। বীভৎস আনন্দে শিল্পী তার তুলি বুলিয়ে গিয়েছে। সেই উল্কি-রেখার ওপর দরধারায় ঘাম নেমে আসছে।

কে একজন বললো, "আসছে মাসে ফসল পাহারার জন্যে মাঠে মাঠে থে (জমির ঘর) তৈরি করতে হবে। তারপর ঝুম আবাদের জন্যে জঙ্গল পোড়াতে হবে। এবার খালি কাজ আর কাজ। একেবারে সেই নগদা উৎসব পর্যন্ত আর জিরোবার ফাঁক নেই।"

ওঙলে বললো, "কাজ তো জনমভোর আছেই। যেতে দে ও-সব কথা। বস্তিতে ফিরবি তো সব? আজ নাচগানের একটা ব্যবস্থা করলে মন্দ হয় না; কী বলিস সেঙাই?"

উৎসাহিত হয়ে উঠলো সেঙাই, "খুব ভালো হবে। চল্, চল্ বস্তিতে। জোরি কেসুঙে নাচগান হবে আজ। রাজী তো? কি রে সারুয়ামারু, তোর বাড়ির উঠোনে?"

সারুয়ামারু ভারি ফুর্তিবাজ। খুশী খুশী গলায় সায় দিল সে, "নিশ্চয়ই।"

"হো-ও-ও-ও-ও"—

পুলকিত কলরব উঠলো পাহাড়ী জোয়ান-জোয়ানীদের গলায়।

ওঙলে বললো, "তোর বাড়ির উঠোনে নাচগান হবে। রোহি মধু আর শুয়োরের মাংস খাওয়াতে হবে কিন্তু।"

"নিশ্চয়ই খাওয়াব।"

"হো-ও-ও-ও-ও"—

উপত্যকার আবাদী জমি থেকে নিবিড় বনের মধ্যে ঢুকলো পাহাড়ী মানুষগুলো। নাচগান, তার সঙ্গে বাঁশের পানপাত্র ভরে রোহি মধু আর শুয়োরের মাংস। এক অপরূপ উল্লাসে সকলে হল্লা শুরু করে দিয়েছে। তাদের খুশী খুশী চিৎকারে সন্ত্রস্ত হয়ে উড়ে যাচ্ছে গুটসুঙ পাখির ঝাঁক। আখুশু ঝোপের ফাঁকে ফাঁকে হরিণের শিঙ আর ময়ালের মাথা চকিতে বেরিয়েই অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। খরিমা পতঙ্গের দল আতঙ্কে ঠকঠক শব্দ করছে।

পৃথিবীর প্রাণশক্তির আদিম স্বচ্ছাম প্রকাশ এই নিবিড় অরণ্যে। সেই প্রাণশক্তি এই নাগা পাহাড়ে দুর্দাম, দুর্বার। যেখানে এতটুকু রন্ধ্র পেয়েছে

সেখানেই এক জৈব প্রেরণায় মাথা তুলেছে শ্যামাভ অঙ্কুর। সেই অঙ্কুরই একটু একটু করে শাখা বিস্তার করেছে, পাতার জিভ দিয়ে রোদবৃষ্টির আসব শুষে শুষে একদিন বনস্পতি হয়ে উঠেছে। তারপর নাগা পাহাড়ের ধমনীর ওপর গুরুভার অস্বস্তির মত চেপে বসেছে। তার নীচে রচনা করেছে হিমছায়া। সে ছায়ায় হিংস্র শ্বাপদের সংসার বেড়ে উঠেছে। বাঘ, চিতাবাঘ, বুনো মোষ আর দাঁতাল শুয়োরের অবাধ লীলাভূমি এই ভীষণ অরণ্য। তাদের ওপর প্রভুত্বের অধিকারে এসেছে মানুষ। ভয়াল, ভয়ঙ্কর আর এক প্রাণশক্তির রূপ। অতিকায় কুড়ালের ফলায় অরণ্য সংহার করে রচনা করেছে জনপদ। বর্শার মুখে মুখে শ্বাপদের হিংসা নির্মূল করে তার অধিকারের সীমানাকে প্রসারিত করে চলেছে মানুষ। দূরে দূরে ছোট ছোট গ্রাম নজরে আসে। নীচু নীচু ঘর, খড়ের চাল, বাঁশের দেওয়াল। মোটা মোটা খাটসঙ গাছের ডালেও অনেক ঘর। এই বন থেকে যতটুকু সুবিধা পাওয়া যায় সেটুকু আদায় করতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করে নি মানুষেরা। মাঝে মাঝে বাঘনখের আঁচড়ের মত ফালি ফালি পথ। অবিরাম চলতে চলতে পথগুলো আপনা থেকেই জন্মেছে। এদের পেছনে কোন সতর্ক অধ্যবসায়ের ইতিহাস নেই।

বনবাদাড় দলিত করে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ী মানুষগুলো। চড়াই বেয়ে বেয়ে ওপরের দিকে উঠছে। হাতের মুঠিতে বর্শার ফলাগুলো দোল খেয়ে চলেছে।

"হো-ও-ও-ও-ও—"

আচমকা দাঁড়িয়ে পড়লো সেঙাই। তার দৃষ্টিটা গিয়ে পড়েছে উত্তর পাহাড়ের চড়াইয়ের দিকে। প্রথম বিকালের মোহন রোদ বন্যার মত ছড়িয়ে পড়েছে উত্তর পাহাড়ে। সহসা কয়েক দিন আগের একটা বিকাল স্মরণের মধ্যে দোল খেয়ে উঠলো সেঙাইর। সেদিন শিকারে বেরিয়েছিলো সে আর রেঙকিলান। সেদিন ঐ উত্তর পাহাড়ের এক শব্দহীন ঝরনার পাশে এক নগ্ন নারীতনুর রেখায় রেখায় এক অনাস্বাদিত পৃথিবীর আমন্ত্রণ সে পেয়েছিলো। টিজু নদী পার হয়ে পোকরি বংশের মেয়ে মেহেলী এসেছিল এ পারের ঝরনার জলে ধারাস্নানে। মেহেলী—পোকরি বংশের মেয়ে। তাদের শত্রুপক্ষ! তার ঠাকুরদা জেভেথাঙের মুণ্ডু ওরা ছিঁড়ে নিয়ে গিয়েছিলো অনেককাল আগে। বুড়ো খাপেগা মোরাঙে বসে সে গল্প তার কাছে বলেছে। কিন্তু মেহেলী! বিকালের মায়াবী আলোতে নিঃশব্দ ঝরনার পাশে এক নগ্ন নারীতনু। আদিম

নারী। সেঙাইর রক্তে রক্তে কেমন একটা বিভ্রান্তি চমক দিয়ে উঠলো। এক স্পষ্ট কামনা বর্শামুখের মত ঝিলিক দিলো।

সেঙাইর দেখাদেখি সকলে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো।

সেঙাই বললো, "তোরা সব বস্তিতে ফিরে যা। আমি একটু উত্তরের পাহাড়ে যাবো। বস্তিতে ফিরবো একটু পরেই।"

"নাচগানের কী হবে রে শয়তান?" ওঙলের গলায় রীতিমত বিক্ষোভ।

"তোরা ব্যবস্থা কর। আমি একটু পরেই তো আসছি।"

আর দাঁড়ালো না সেঙাই। পাহাড়ের দেহ বেয়ে বেয়ে সমতল মালভূমির দিকে তরতর করে নামতে লাগলো। উত্তরের পাহাড়ে যেতে অনেকটা সময় লাগবে। মনের মধ্যে তীব্র একটি প্রত্যাশা ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। হয়তো মেহেলী এসেছে সেই ঝরনার কিনারে।

"হো-ও-ও-ও-ও—"

পাহাড় আর বন কাঁপিয়ে বাকী সকলে গ্রামের দিকে চলে গেলো।

দুলতে দুলতে নীচের মালভূমিতে নেমে এলো সেঙাই। একদিকে এক নগ্ন নারীতনু। মেহেলী। আর একদিকে তার ঠাকুরদাকে হত্যা করেছে পোকরি বংশ। প্রতিহিংসা আর কামনা। মৃত্যুমুখ বর্শা আর রমণীয় নারী—আদিম প্রাণের বিজ্ঞানে দুটিই সত্য। দুটিই নির্মম সত্য। ভয়ঙ্কর সত্য। এ দুয়ের মধ্যে দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে সেঙাইর অস্ফুট, বন্য মন।

এক সময় নিঃশব্দ ঝরনাটার পাশে এসে দাঁড়ালো সেঙাই। চারদিকে একবার চনমন করে তাকালো। সে দিনের মত আজ আর কেউ নেই এখানে। সেদিন এখানে মেহেলী ছিলো। আদিম মানবীর অনাবরণ রূপ দেখতে দেখতে আবিষ্ট হয়ে গিয়েছিলো সেঙাই। বর্শা সে তুলে ধরেছিলো সত্যি, কিন্তু তার ফলায় হত্যার কোন প্রেরণা হয়তো ছিলো না। আদিম এক নারীদেহের আত্ম-সমর্পণ, এই নিয়েই সেদিন তৃপ্ত হয়েছিলো সেঙাই। কিন্তু আজ! সেদিন সে কি জানতো, বর্শার ফলায় শুধু খোন্‌কেকে শিকার করে আসে নি, সে নিজেও শিকার হয়ে গিয়েছিলো। কামনার এক বর্শা দিয়ে তাকে শিকার করে গিয়েছিল মেহেলী। লোহার বর্শা দিয়ে একবার আঘাত করা যায়, দু বার আঘাত করা যায়, কিন্তু মেহেলী তার অপরূপ নারীদেহের রূপ দিয়ে, তার নির্বাক আত্ম-সমর্পণ দিয়ে অহরহ তার দেহমনকে আঘাত দিয়ে চলেছে। আঘাতে আঘাতে মেহেলী হয়তো বিকল করে দিয়ে গিয়েছে সেঙাইর অস্ফুট পাহাড়ী চেতনা।

এখানে কয়েক দিন আগে সেই মোহন বিকেলে একটা অবাস্তব স্বপ্ন দেখেছিলো কি সেঙাই? এই পাহাড়ে, এই বনের বস্তুদেহে মেহেলী নামে কি কোন নারীর অস্তিত্বই ছিলো না?

তা হতে পারে না। মেহেলী আছে। আর সবচেয়ে যেটা নির্মম সত্য, সেটা সেঙাইর ইন্দ্রিয়ে ইন্দ্রিয়ে ঝড়ের মত তাণ্ডব শুরু করে দিয়েছে এই মুহূর্তে। মেহেলীকে তার চাই। তার প্রতিটি ইন্দ্রিয় দিয়ে, প্রতিটি উদগ্র রক্তকণা দিয়ে সে আস্বাদ নেবে মেহেলীর রমণীয় দেহের। একটা অবরুদ্ধ গোঙানি সেঙাইর গলা বেয়ে বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে, "গোঁ-ও-ও-ও-ও"—

মুখখানা ভয়ানক হয়ে উঠেছে সেঙাইর। ছোট ছোট পিঙ্গল চোখদুটো জ্বলতে শুরু করেছে।

মাঝখানে কয়েকটা দিন জা কুলি উৎসব নিয়ে মেতে ছিলো তাদের ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম। অতিরিক্ত উল্লাসে আর রোহি মধুর তীব্র মাদক নেশায় অবসন্ন হয়ে পড়েছিলো সেঙাই। উত্তর পাহাড়ের মেহেলী নামে এক পাহাড়ী যৌবনের কামনা জা কুলি উৎসবের আমোদ আর রেঙকিলানের অপমৃত্যুর নীচে হারিয়ে গিয়েছিলো। আজ ফসলকাটা আবাদী জমি পোড়াতে পোড়াতে আবার নতুন করে মেহেলীর কথা মনে পড়েছে তার।

সেই প্রথম দেখার রাত্রেই মোরাঙ থেকে মেহেলীর সন্ধানে বেরিয়ে যেতে চেয়েছিলো সেঙাই। হিমার্ত রাত্রি সেদিন তাকে শতবাহু তুলে বাধা দিয়েছিলো। কিন্তু আজ? আজ কোন বাধা মানবে না। প্রকৃতি আজ তার পক্ষে। আর মানুষের বাধা বর্শার মুখে মুখে নির্মূল করে সে মেহেলী নামে এক নারীদেহের কামনায় পৌঁছাবে। পৌঁছাতেই হবে। আদিম পৃথিবী তার রক্তে রক্তে তুফান তুলেছে।

ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে সেঙাইর। মোটা মোটা ঠোঁট দুটো ফুলে ফুলে উঠতে শুরু করেছে। প্রচণ্ড আবেগে বুকের পেশীগুলো তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে। চারদিকে আবারও চনমন চোখে তাকালো সেঙাই। যদি দেখা হয় মেহেলীর সঙ্গে! মেহেলী তো বলেছিলো, সে রোজ এই নিরালা ঝরনার জলে স্নান করে যায়। এই ঝরনা তার বড় ভালো লাগে। তবে কেন সে আজ এলো না? মনের মধ্যে আবেগটা শতমুখ দিয়ে যেন বিদীর্ণ হতে লাগলো সেঙাইর।

আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালো সেঙাই। তারপর বর্শাটাকে প্রচণ্ড থাবায় চেপে দুলতে দুলতে টিজু নদীর দিকে চলে গেলো।

নয়

সেদিন টিজু নদী ডিঙিয়ে একটা সম্বরের সন্ধানে সালুয়ালাঙ গ্রামের সীমানায় চলে এসেছিলো সেঙাই আর রেঙকিলান। আজ আর রেঙকিলান নেই সঙ্গে। একেবারে গ্রামের কাছাকাছি চলে এলো সেঙাই।

এখনও আকাশে বেলাশেষের খানিকটা পাণ্ডুর রঙ লেগে রয়েছে। বনের ঘন ছায়ায় সালুয়ালাঙ গ্রামের দু-একজন পাহাড়ী মানুষ এখনও ঘুরে বেড়াচ্ছে। একবার দেখে ফেললে আর রক্ষা থাকবে না। এখানে বন বেশী নিবিড় নয়। আশেপাশে কোন নিরাপদ ঝোপও নেই। সন্ধ্যার অন্ধকার না নামা পর্যন্ত গ্রামে ঢোকাটা বুদ্ধিমানের কাজ হবে না। পাহাড়ী জোয়ান সেঙাই অন্তত এটুকু বোঝে। আর যাই হোক শত্রুদের বর্শায় হৃৎপিণ্ডটা তার চৌফালা হয়ে যাক—এমন সদিচ্ছা সেঙাইর নেই। সালুয়ালাঙ গ্রাম তার মুণ্ডু নিয়ে নারকীয় উল্লাসে মেতে উঠবে, তার রক্ত দিয়ে মোরাঙের দেওয়ালে দেওয়ালে বীভৎস শিল্পকলা ফুটিয়ে তুলবে—ভাবতেও ইন্দ্রিয়গুলো অসাড় হয়ে এলো সেঙাইর।

চারদিকে একবার সন্ধানী দৃষ্টিতে তাকালো সেঙাই। এই জীমবো গাছের বিশাল কাণ্ডটার আড়াল থেকে সালুয়ালাঙ গ্রামখানা পরিষ্কার নজরে আসে। এ গ্রামে এর আগে কোনদিনই ঢোকে নি সেঙাই।

পোকরি বংশের গ্রাম। তাদের শত্রুপক্ষের আস্তানা। মনে মনে কথাগুলো একবার ভেবে নিলো সেঙাই। কিন্তু আজ প্রতিহিংসার প্রেরণায় এ গ্রামে আসে নি সেঙাই। আর এক আদিম প্রবৃত্তির ডাকে সে এসেছে। সে প্রবৃত্তির বাস্তব প্রকাশ একটি নারীদেহে। তার নাম মেহেলী।

চারদিক তাকিয়ে ঝাঁকড়া জীমবো গাছটার মগডালে উঠে গেলো সেঙাই। সন্ধ্যে পর্যন্ত এখানেই অপেক্ষা করতে হবে।

এক সময় পশ্চিম আকাশ থেকে বিবর্ণ বেলাশেষ মুছে গেলো। প্রথমে ছায়া ছায়া, পরে গাঢ় অন্ধকার নেমে এলো নাগা পাহাড়ে। আর অতিকায় জীমবো গাছটা থেকে নীচে নেমে এলো সেঙাই। তারপর সতর্ক পা ফেলে

ফেলে, স্নায়ুগুলিকে ধনুকের ছিলার মত প্রখর করে সালুয়ালাঙ গ্রামের প্রান্তে এসে দাঁড়ালো।

এদিকেই সালুয়ালাঙ গ্রামের বিশাল মোরাঙ। গাঢ় অন্ধকারে বিশেষ কিছুই নজরে আসছে না। শুধু অতিকায় একটা প্রেতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে মোরাঙটা।

পাহাড়ের নীচু একটা ভাঁজ থেকে ওপরে উঠে এলো সেঙাই। সঙ্গে সঙ্গে মোরাঙের বাঁ পাশে একটা মশাল নজরে পড়লো। মশালের শিখাটা এদিকেই এগিয়ে আসছে। বুকের মধ্যে এক ঝলক রক্ত যেন ছলাত করে আছড়ে পড়লো সেঙাইর। লাফিয়ে আবার পাহাড়ের ভাঁজে নেমে গেলো সে। তারপর নিশ্বাস রুদ্ধ করে অচেতনের মত পড়ে রইলো।

মশালের শিখাটা ঠিক মাথার ওপরের টিলাটা ধরে এগিয়ে যেতে লাগলো। একবার মাথা তুললো সেঙাই। মাথার ঠিক ওপরেই দড়ির লেপ জড়ানো এক নারীমূর্তি। চকিতে তার মুখখানা দেখে চমকে উঠলো সে। সালুনারু! রেঙকিলানের বউ তবে কি টিজু নদী ডিঙিয়ে এই সালুয়ালাঙ গ্রামে আশ্রয় পেয়েছে!

রেঙকিলানের মৃতদেহটা যেদিন দক্ষিণ পাহাড়ের অতল খাদে সারুয়ামারু খুঁজে পেয়েছিলো, ঠিক সেদিনই বেয়াদপির জন্য আর রেনজু আনিজার নামে অপরাধের জন্য খাপেগা তার দিকে বর্শা তুলে ধরেছিলো। ঘনবনের মধ্যে লাফিয়ে পড়ে সেদিন প্রাণটাকে বাঁচিয়েছিলো সালুনারু। তারপর থেকে কেলুরি গ্রামে আর তাকে কেউ দেখে নি।

সালুনারু আর তার হাতের মশালটা এক সময় দূরের কেসুঙগুলোর দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে হিম ঝরতে শুরু করেছে। সকালে দুপুরে বাঁশের পান-পাত্র পূর্ণ করে বার সাতেক রোহি মধু খেয়েছিলো সেঙাই। অত্যন্ত উষ্ণ পানীয়। তবু শরীরের জোড়ে-জোড়ে কাঁপুনি ধরে গিয়েছে। দাঁতে দাঁতে হি-হি বাজনা শুরু হয়েছে। এ গ্রামেরই একটা পোষা শুয়োর কখন যেন পাশে ঘেঁসে দাঁড়িয়েছে। কাঁটাভরা কর্কশ জিভ। সেই জিভ দিয়ে পিঠের ওপরটা চেটে চেটে দিচ্ছে সেঙাইর। বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা দিয়ে প্রাণীটার পাঁজরে একটা খোঁচা দিলো সেঙাই। তীব্র আর্তনাদ করে উঠলো শুয়োরটা। তারপর ঘোঁত ঘোঁত করে পাহাড়ের আর এক ভাঁজে মিলিয়ে গেলো।

আরো কিছু সময় নিঃশব্দে পড়ে রইলো সেঙাই। তারপর থাবার মধ্যে ভয়াল বর্শাটা চেপে ধরে ওপরের টিলায় উঠে এলো।

মোরাঙের ঠিক মুখোমুখি একটা অতিকায় ভেরাপাঙ গাছ। তার আড়ালে দেহটাকে যতদূর সম্ভব সংক্ষিপ্ত করে দাঁড়ালো সেঙাই। মোরাঙের মধ্য থেকে পেন্যু কাঠের মশালের আলো এসে পড়েছে বাইরে। শীতার্ত রাত্রির অন্ধকার বিদীর্ণ করে সে আলো রহস্যময় হয়ে উঠেছে। মোরাঙের দরজার ঠিক ওপরেই বিশাল এক বর্শার মাথায় একটা নরমুণ্ড। আবছা আলো-অন্ধকারে বীভৎস দেখাচ্ছে। নরমুণ্ডটার মাংস ঝরে ঝরে গিয়েছে, হনু আর কণ্ঠার হাড়ের ওপর আর গলার কাছে কিছু কিছু মাংসের অবশেষ কালো হয়ে ঝুলছে এখনও। চোখের কোটরে মণিদুটো নেই; শুধু বিরাট দুটো গর্তে হিমাক্ত রাত্রির অন্ধকার যেন শিলীভূত হয়ে রয়েছে।

এই নরমুণ্ড। সালুয়ালাঙ গ্রামের বীরত্বের স্মারক। তার পৌরুষের ঘোষণা। শত্রুর মুণ্ডু কেটে এনে সালুয়ালাঙ গ্রাম বর্শার ফলায় গেঁথে আকাশের দিকে তুলে ধরেছে; তুলে ধরেছে বিজয়গৌরবে। গর্বিত ঔদ্ধত্যে।

পেশীগুলো আচমকা ঝনঝন করে বেজে উঠলো আদিম মানুষ সেঙাইর। হাতের বর্শাটা থাবা থেকে ঝরে গেলো পাথরের টিলায়। টঙ করে একটা ধাতব শব্দ উঠলো। এই নরমুণ্ড কি তবে তার ঠাকুরদার? বহুকাল আগে টিজু নদীর খরধারায় পোকরি বংশের বর্শা যাকে নির্মম আঘাতে হত্যা করেছিলো? রক্তের কণায় কণায় বিদ্যুৎ বয়ে চললো সেঙাইর।

একটা ভয়ঙ্কর মুহূর্ত। তারপরেই বর্শাটা তুলে নিয়ে এক পা দু পা করে মোরাঙের পাশে এসে দাঁড়ালো সেঙাই। এ দিকটা অনেকটা নিরাপদ। নীচে খাড়া পাহাড়ের দেহ অতল খাদে নেমে গিয়েছে। চারদিকে নীরন্ধ্র অন্ধকার। শুধু মোরাঙ থেকে বাঁশের দেওয়াল ভেদ করে অগ্নিকুণ্ডের আভা বেরিয়ে আসছে। দেওয়ালের পাশে ওত পেতে দাঁড়ালো সেঙাই। তারপর চোখ দুটোর মধ্যে দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয় কেন্দ্রিত করে তাকালো।

মোরাঙের মধ্যটা এবার পরিষ্কার নজরে আসছে। বাঁশের মাচানের ওপর শুয়ে রয়েছে একটি শীর্ণ দেহ। তার চারপাশে অনেকগুলো মানুষ ভিড় করে রয়েছে।

একটা বুড়ো বাঁশের মাচানের মানুষটার ওপর ঝুঁকে পড়লো। অস্পষ্ট আলোয় দেখা যায়, তার কানে পিতলের অতিকায় নীয়েঙ গয়না। গলার

চারপাশে ময়াল সাপের হাড়ের মালা। কপালের ওপর তিনটি গাঢ় রক্তের রেখা। নির্লোম গালে অসংখ্য কুঞ্চন। এই গ্রামের সর্দার সে।

বুড়ো মানুষটা ফিসফিস গলায় বললো, "কি তামুন্যু (চিকিৎসক), কী মনে হচ্ছে? হু-হু, আমার কিন্তু ভালো ঠেকছে না।"

মাচানের আর এক পাশে একটি মানুষ বসে ছিলো। সারা দেহ অনাবৃত। বুকের ওপর রাশি রাশি উল্কির চিত্তির। গলার চারপাশে মানুষের করোটির মালা। হাতে একখণ্ড বাদামী রঙের হাড়। গম্ভীর গলায় সে বললো, "উহু, আমারও ভালো ঠেকছে না সর্দার। ঘায়ে পোকা হয়ে গিয়েছে। এই ছাখ্ কেগোথেনা পাতা বেটে লাগিয়ে দিয়েছিলাম। কিন্তু কিছুই হচ্ছে না।"

সহসা ছিলামুক্ত তীরের মত সাঁ করে মাচানের ওপর উঠে বসলো শোয়ানো মানুষটা। মশালের আলোতে তার পিঙ্গল চোখ দুটো আশ্চর্য বন্য দেখাচ্ছে। বুকের বাঁ দিকটা বিরাট একটা ফাঁক হয়ে ঝুলে পড়েছে। মেটে রঙের এক পিণ্ড মাংস যেন ঠেলে বেরিয়ে আসতে চাইছে। বোধ হয় এটাই মানুষটার হৃৎপিণ্ড। জান্তব গলায় প্রলাপ বকে উঠলো মানুষটা, "খুন, খুন—খুন করে ফেলবো। বর্শা দে……ওরা কে? কে?…হোঃ-হোঃ-হোঃ—ও-ও-ও—"

শেষ পর্যন্ত মাতাল গলায় অট্টহাসি হেসে উঠলো মানুষটা।

মোরাঙের বাইরে বাঁশের দেওয়ালের পাশে চমকে উঠলো সেঙাই। বাঁশের মাচানের ওপর সাঁ করে উঠে যে মানুষটা প্রলাপ বকছে, সে খোন্‌কে। মশালের আলোতে খোন্‌কের কঙ্কাল দেহটা একটা প্রেতমূর্তির মত দেখাচ্ছে।

খোন্‌কে মরে নি! সেদিন সেঙাই যে বর্শার ফলা ছুঁড়ে মেরেছিলো, সেটা তো তবে ব্যর্থ হয়েছে!

মাথাটা টলমল করে দুলে উঠলো সেঙাইর। নীচের অতল খাদে সে পড়েই যেতো। তার আগেই বাঁশের দেওয়ালটা ধরে টাল সামলে নিলো।

খোন্‌কেকে লাফিয়ে উঠতে দেখে চারপাশ থেকে জোয়ান ছেলেরা ছত্রভঙ্গ হয়ে সরে দাঁড়ালো। সকলের চোখে মুখে আতঙ্ক খেলে খেলে যাচ্ছে। সালুয়ালাঙ গ্রামের তামুন্যুও (চিকিৎসক) রীতিমত ভয় পেয়েছে। বাঁশের মাচানটা থেকে উঠে সে-ও সরে দাঁড়িয়েছে বেশ একটা নিরাপদ দূরত্বে। তার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে বুড়ো সর্দার।

কাঁপা কাঁপা গলায় বুড়ো সর্দার বললো, "কি ব্যাপার তামুন্যু?"

"আনিজা! আনিজা! খারাপ আনিজাতে পেয়েছে খোন্‌কেকে।"

"কী করতে হবে?" কাঁপা কাঁপা গলা এবার ফিসফিস শোনাচ্ছে সর্দারের।

"হু-হু, কাল রাত্তিরে আমি স্বপ্ন দেখেছিলাম ; এমনটি হবে। চটপট একটা শুয়োর বলি দিয়ে রক্ত নিয়ে আয়। টেট্‌সে আনিজার নামে বলি দিবি।"

দুটো জোয়ান ছেলে মোরাঙের দরজা দিয়ে শুয়োরের সন্ধানে ছুটে গেলো পোকরি কেসুঙে। পোকরি বংশের ছেলে খোন্‌কে। তাদের শুয়োরই উৎসর্গ করা হবে।

এখনও সমানে প্রলাপ বকে চলেছে খোন্‌কে, "খুন—খুন—খুন—কর্‌! আগুন লাগিয়ে দে চারদিকে। হো-ও-ও-ও—"

অট্টহাসির সঙ্গে মনে হলো বুকের অতিকায় ফাটলটা দিয়ে হৃৎপিণ্ডটা ছিটকে বেরিয়ে আসবে খোন্‌কের। ভয়ানক দেখাচ্ছে তার বুকের ক্ষতটা।

রাক্ষসের মত বিরাট মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আচমকা বাঁশের মাচানটার কাছে চলে এলো তামুন্যু। তারপর দুটি প্রখর থাবায় খোন্‌কের কাঁধ দুটো ধরে শুইয়ে দিলো। তারও পর একটা বাদামী রঙের চ্যাপ্টা হাড়ে তিনটে ফুঁ দিয়ে মুখের মধ্যে পুরে দিলো। চারদিকে একবার চনমন তাকিয়ে তামুন্যু তার মুখখানা খোন্‌কের বুকের ওপর রাখলো। শেষমেষ চুকচুক শব্দ করে ক্ষতমুখ থেকে লালাভ রক্তধারা শুষে নিলো। পাহাড়ী চিকিৎসার এ এক বীভৎস পদ্ধতি। এক নারকীয় প্রক্রিয়া।

বাঁশের পাত্রে কিছুটা কেগোথেনা পাতা বাটা ছিলো। খোন্‌কের ক্ষতে তার থেকে খানিকটা তুলে মেখে দিলো তামুন্যু। আর বাঁশের মাচানের ওপর নিঃসাড় হয়ে পড়ে রইলো খোন্‌কে। চোখ দুটো তার অর্ধেক বুজে এসেছে। একটা বিষণ্ণ অবসাদ দেহময় মাখামাখি হয়ে রয়েছে। শুধু ঢিমে তালে নিশ্বাসের সঙ্গে বুকের ক্ষতমুখটা চৌফালা করে মেটে রঙের হৃৎপিণ্ডটা ঠেলে বেরিয়ে পড়তে চাইছে।

শীতের রাত্রি আরো হিমার্ত হয়ে উঠেছে। সহস্র দাঁত দিয়ে সেঙাইর সারা দেহকে রক্তাক্ত করে তুলছে একটু একটু করে। অসহ্য তাড়নায় শরীরের জোড়গুলো যেন খুলে খুলে আসতে চাইছে। তবু অসাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো সেঙাই।

একটু পরেই মোরাঙের দরজার দিকে কতকগুলি পেন্যু কাঠের মশাল ফুটে বেরুলো। চেঁচামেচি উঠলো।

মোরাঙের এই দেওয়ালের দিকটা অনেকটা নিরাপদ। তবু শরীরটাকে যতটা সঙ্কুচিত করা যায়, তাই করে দেওয়ালের গায়ে লেগে রইলো সেঙাই।

একটু পরেই একটা কাঠের পাত্রে খানিকটা তাজা রক্ত নিয়ে এলো সেই জোয়ান দুটো। একটু আগেই পোকরি কেসুঙে শুয়োর বলির খবর দিতে গিয়েছিলো তারা। তাদের সঙ্গে আরো কয়েকটি পুরুষ মানুষ মোরাঙের মধ্যে চলে এসেছে।

একজন কাঠের পাত্রটা এগিয়ে দিতে দিতে বললো, "এই নে তামুন্যু, রক্ত এনেছি। আনিজার নামে খোন্‌কের বাপ শুয়োর বলি দিয়েছে।"

মোরাঙের দরজার ওপর চেঁচামেচিটা এবার উগ্র হয়ে উঠছে।

বুড়ো সর্দার বললো, "দরজার সামনে কে ওরা?"

"খোন্‌কের ছোট বোন মেহেলী আর তার মা এসেছে। বস্তি থেকে আরো কয়েকটা মেয়ে এসেছে। তারা সব জটলা করছে।" সেই জোয়ান ছেলেটা বললো, "খোন্‌কের খবর জানতে চায়।"

মোরাঙে মেয়েদের প্রবেশ নিষিদ্ধ। তাই তারা দরজা থেকে খানিকটা দূরে জটলা করছে। নাগা পাহাড়ের এই প্রথাকে অপমান করে কোন মেয়ের মোরাঙে ঢোকার উপায় নেই। কোন মতেই, কোন কারণেই এই প্রথাকে ভাঙা চলবে না। মোরাঙ হলো অবিবাহিত জোয়ান ছেলেদের নৈতিক জীবনের পীঠভূমি। নারীর রতি, নারীর কামনা আর রিপুর তাড়না থেকে অনেক, অনেক দূরে এর অকলুষ অস্তিত্ব। এর পবিত্রতা নারীদেহের আসক্তি দিয়ে কলুষিত করে তোলা রীতিমত এক অপরাধ। সে অপরাধের শাস্তি নির্মম, নিষ্ঠুর। অনিবার্য মৃত্যু দিয়ে সে অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত করতে হয়। তাই মেহেলীরা বাইরেই দাঁড়িয়ে রয়েছে।

মোরাঙের বাঁশের দেওয়ালে শরীরটা হিমে হিমে আড়ষ্ট হয়ে আসছে সেঙাইর। তবু একটি শব্দ শুনতে পেয়েছে সে। একটি নাম তার সমস্ত পাহাড়ী চৈতন্যের ওপর ছড়িয়ে পড়েছে। সে নাম, সে শব্দ মেহেলী। এই মেহেলীর কামনাই তাকে শীতের হিমে দক্ষিণ পাহাড় থেকে টিজু নদীর এপারে এই সালুয়ালাঙ গ্রামে টেনে এনেছে। ময়াল সাপ যেমন করে তার নিশ্বাসে নিশ্বাসে ছোট্ট হরিণশিশুকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যায়, ঠিক তেমনি করেই কি মেহেলী তাকে এই পাহাড়ে নিয়ে এসেছে!

পাহাড়ের হিম অসহ্য হয়ে উঠেছে। তার দাঁতে দাঁতে শরীরটা যেন ফালা

কালা হয়ে যাবে, মনে হলো সেঙাইর। এত কাছাকাছি মেহেলী, তবু কাছে যাবার উপায় নেই। ওপাশে গেলেই একটা বর্শার ফলা পাঁজরটাকে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দেবে। এ একেবারে নিশ্চিত। সেঙাইর এখন মনে হচ্ছে, মেহেলীর যে সুন্দর নগ্ন শরীরের কামনায় টিজু নদী ডিঙিয়ে এ পারে এসেছে সে, সে শরীর যেন কোন মেয়ের নয়। সেটা একটা সোনালী সাপ। যার স্পর্শে নির্ঘাত মৃত্যু।

শরীরের ডান দিকটা যেন ধরে গিয়েছে সেঙাইর। সেদিকে কোন সাড় নেই, বোধ নেই। কী করবে, ঠিক করে উঠতে পারছে না সেঙাই।

আচমকা মোরাঙের মধ্যে ঘটে গেলো ঘটনাটা। আর চমকে উঠলো সেঙাই।

. বাঁশের মাচানের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো তামুন্যু (চিকিৎসক)। তার মুঠিতে একটা কাঠের পাত্র। সেই পাত্রে টকটকে তাজা অনেকটা রক্ত। একটু আগেই শুয়োর বলি দিয়ে নিয়ে এসেছিলো জোয়ান ছেলেটা।

এতক্ষণ বাঁশের মাচানে নিশ্চুপ শুয়ে ছিলো খোন্‌কে। আর একটু একটু করে তার চারপাশে ঘন হয়ে আসছিলো বুড়ো সর্দার আর মোরাঙের জোয়ান ছেলেরা।

তামুন্যুর মুখে আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটে বেরিয়েছে। রাক্ষসের মত অট্টহাসি হেসে উঠলো সে, "হোঃ-ও-ও-ও, হোঃ-ও-ও-ও, হোঃ-ও-ও-ও, দেখলি তো সদ্দার, আনিজার—"

তার কথা মাঝপথেই থমকে গেলো। সাঁ করে মাচানের ওপর আবার উঠে বসেছে খোন্‌কে। মৃত্যুযন্ত্রণায় তার মুখখানা ভয়ানক হয়ে উঠেছে। ছোট ছোট চাপা চোখের মধ্য থেকে পিঙ্গল মণি দুটো ঠিকরে আসছে। আর বুকের সেই বিশাল ফাটলে মেটে রঙের হৃৎপিণ্ডটা নিশ্বাসের সঙ্গে বেরিয়ে আসবে, মনে হলো। অস্বাভাবিক গলায় প্রলাপ বকে উঠলো খোন্‌কে, "খুন—খুন—হোঃ—হোঃ—হোঃ—আমার বর্শা দে—"

"আনিজা! হু-হু, এমনিতে আনিজার রাগ পড়বে না। একটা শুয়োরে চলবে না তার। খোন্‌কেকে সে চাইছে। খোন্‌কে এই মোরাঙে থাকলে বস্তিতে মড়ক ধরে যাবে। শিগ্‌গির ওকে খাদে ফেলে দে সদ্দার।" বাঁশের মাচানের পাশ থেকে সরে গেলো তামুন্যু। খোন্‌কে সম্বন্ধে শেষ রায় দিয়ে বিশাল মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে আর একটা মাচানে গিয়ে বসলো।

জোয়ান ছেলেরা চারপাশে ছত্রখান হয়ে ছড়িয়ে পড়েছিলো।

বুড়ো সর্দার বললো, "এই যাসিমু, এই ফিরাঙ, তোরা খোন্‌কেকে ধরে পেছনের খাদে ফেলে দিয়ে আয়।"

মোরাঙের দেওয়ালের পাশে একটা অসাড় দেহে শিহরণ খেলে গেলো। স্নায়ুগুলো ধনুকের ছিলার মত টঙ্কার দিয়ে উঠলো। এখুনি খোন্‌কেকে নিয়ে জোয়ান ছেলেরা এদিকে আসবে। তারপর ছুঁড়ে ফেলে দেবে নিঃসীম খাদের অতলে। কঠিন পাথরের আঘাতে আঘাতে দেহটা রেণু রেণু হয়ে অদৃশ্য হয়ে যাবে খোন্‌কের। কিন্তু সে ভাবনা ভাবছে না সেঙাই। সে ভাবছে, এখানে এসে তাকে দেখলে জোয়ান ছেলেরা দাঁতাল শুয়োরের মত ছিন্ন ভিন্ন করে ফেলবে। সামনের দিকে যাওয়া অসম্ভব। মোরাঙের দরজার কাছে মশাল নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহেলীরা। শত্রুপক্ষের কুমারী যৌবনকে বিন্দুমাত্র ভরসা নেই।

ইতিমধ্যে মোরাঙের মধ্যে জোয়ান ছেলেরা খোন্‌কেকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছে। আর ভাবতে পারছে না সেঙাই। অসাড় দেহটাকে কোনক্রমে টানতে টানতে পাহাড়ের দেহ বেয়ে খাদের দিকে অনেকটা নেমে গেলো সে। চেতনাটা কেমন আড়ষ্ট হয়ে আসছে। কিছুই বুঝতে পারছে না সেঙাই। হাতের থাবাটা দিয়ে পাথরের একটা চাঁই ধরে আশ্রয় নিয়েছিলো। একটু একটু করে থাবাটা শিথিল হয়ে আসছে। পিঠের ওপর, মুখের ওপর কুচি কুচি বরফ জমছে। প্রায় অচেতন দেহটাও যেন চিনচিন করে উঠছে। ভয়ানক একটা অনুভূতি চেতনা আর নিশ্চেতনার মধ্যে দোল খেয়ে যাচ্ছে সেঙাইর। দেহমন থেকে তার চৈতন্য যেন মুছে যেতে শুরু করেছে।

আচমকা ওপর থেকে একটা বিশাল গুরুভার আছড়ে পড়লো পাশের পাথরের ওপর। ঝপাং করে শব্দ উঠলো। সেই সঙ্গে একটা তীব্র-তীক্ষ্ণ আর্তনাদ। "আ-উ-উ-উ--।" নির্ঘাত খোন্‌কে। তার পরে একেবারেই নিস্তব্ধ হয়ে গেলো অন্ধকার পাহাড়ী খাদটা। শুধু নিবিড় অরণ্যের মধ্য দিয়ে পাক খেতে খেতে একটা মানবদেহ নীচের দিকে নেমে যেতে লাগলো।

আর কিছুই শুনতে পেলো না সেঙাই। শুধু মগ্ন চেতনার মধ্যে বুঝতে পারলো, তার থাবাটা শিথিল হয়ে আসছে। আর পাথরের অবলম্বনটা একেবারেই খসে গিয়েছে। কিন্তু হাত বাড়িয়ে আর একটা আশ্রয় ধরার মত সামর্থ্য সে হারিয়ে ফেলেছে। সীমাহীন শূন্যতায় তার দেহটা ছিটকে পড়লো। কোথায়ও কোন আশ্রয় নেই। চারপাশ থেকে রাশি রাশি অন্ধকার হা-হা

গ্রাস মেলে রয়েছে। একটু আগে খোন্‌কের দেহটা অতল খাদের দিকে নেমে গিয়েছিলো। হয়তো তারই প্রেতাত্মা বিশাল একখানা হাত বাড়িয়ে সেঙাইকে নীচের দিকে টেনে নিয়ে চলেছে।

কোথায় মুছে গেলো মেহেলী, কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলো টিলায়-উপত্যকায়, মালভূমি আর চড়াই-উতরাইতে দোল-খাওয়া এই নাগা পাহাড়। জীবন থেকে, চৈতন্য থেকে যৌবনের সাধ, কামনা আর বাসনা, সব নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। কিছুই ভাবতে পারছে না সেঙাই। অস্ফুট বোধ, অপরিণত বন্য মন। সেই বোধ আর মন এখন একেবারেই ক্রিয়া করছে না। তবু সেঙাইর মনে হলো, দেহটা তার আশ্চর্য হালকা হয়ে গিয়েছে। শিরায়-স্নায়ুতে, ধমনী আর ইন্দ্রিয়ে, বোধ আর বুদ্ধিতে যে প্রাণ বহমান, সে প্রাণ একটু একটু করে স্তব্ধ হয়ে আসছে।

নিরাশ্রয় শূন্যতায় পাক খেতে খেতে নীচের দিকে নামতে লাগলো সেঙাইর নিশ্চেতন দেহটা।

দশ

প্রথম বিকেলে ক্ষেতে ক্ষেতে ফসলহীন আগাছা পুড়িয়ে উত্তর পাহাড়ে চলে গিয়েছিলো সেঙাই। আর ওঙলেরা ফিরে এসেছিলো তাদের ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামটিতে। সকলে মিলে ঠিক করেছিলো, নাচগানের মাতাল ঘূর্ণিতে আর নির্দোষ উল্লাসে আজকের বিকেলটাকে জমিয়ে তুলবে।

এক সময় সেই নাচ শুরু হলো সারুয়ামারুর ঘরের সামনে অর্থাৎ জোরি কেসুঙে। সমস্ত গ্রামখানা চারপাশ থেকে এসে জমা হয়েছে সারুয়ামারুর উঠানে। পাথুরে মাটির ওপর চক্রাকারে বসে পড়েছে সকলে। তামাটে পাহাড়ী মানুষ। কানে পিতলের নীয়েঙ গয়না। চাপা চাপা ছোট চোখে, চ্যাপ্টা নাকে, গোলাকার কামানো মাথায় আর অনাবৃত দেহে খুশির হিল্লোল বয়ে যাচ্ছে। সারা দেহ ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, প্রতিটি অঙ্গ দুলিয়ে দুলিয়ে উল্লাস কি ক্রোধের রূপ ফোটায় এই পাহাড়ী মানুষেরা।

মেয়ে আর পুরুষ—সব পাশাপাশি বসেছে। ঘনিষ্ঠ ভঙ্গিতে একজন আর একজনের কাঁধের ওপর হাত তুলে দিয়েছে। আর নাচের তালে তালে গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ছে। উলঙ্গ আকাশের নীচে এই বিচিত্র পাহাড়ী গ্রাম। এই আকাশের মত, এই পাহাড়ের মত নগ্ন তাদের হাসি কি অশ্রুর প্রকাশ।

একপাশে কয়েকটা পালিত শুয়োর আর কুকুর ঘুরঘুর করে বেড়াচ্ছে। আর মাঝে মাঝে খুশী-খুশী গলায় অস্ফুট জান্তব শব্দ করে উঠছে। তারপরেই হয়তো পাহাড়ী মানুষগুলোর গায়ে এসে গড়াগড়ি দিয়ে পড়ছে। পাহাড়ী নাচের আসরে জানোয়ার আর মানুষে কোন প্রভেদ নেই। দুজনেরই উল্লাস প্রকাশের ধারা এক। নাচের ফাঁকে ফাঁকে হল্লা করে উঠছে পাহাড়ী মানুষগুলো, "হোঃ—হোঃ—ওঃ—ওঃ—ওঃ"—

জোরি কেসুঙের সামনে অর্ধ-গোলাকার পাথরখানার ওপর এসে বসেছে বুড়ো খাপেগা। তার পরনে আরি হু কাপড়। যারা শত্রুপক্ষের দুটো মাথা ছিঁড়ে আনতে পারে বর্শার মুখে, তারাই এই কাপড় পরার গৌরব অর্জন করে। কাপড়খানা ঘোর রক্তবর্ণ; হাঁটুর ওপরে তার প্রান্তটা ঝুলছে। কাপড়ের

ওপর চামড়ার ঢাল, বাঘের চোখ, হাতির মাথা, চিতাবাঘ, মোষ, সম্বর আর বর্শা আঁকা রয়েছে।

"হো—ও—ও—ও—"

বেলাশেষের আকাশের দিকে দিকে মাতলা উল্লাস উঠে যাচ্ছে।

জোয়ান ছেলেরা চারপাশে বসে বসে খুলি (এক ধরনের বাঁশি) বাজিয়ে চলেছে। কার একদিকে অতিকায় জয়ঢাকের মত গোটা কয়েক মেথি কোকোয়েনঘ্যু খুলি বসানো হয়েছে। কয়েকজন মিলে মোটা মোটা মোষের হাড় দিয়ে সেগুলো প্রচণ্ড উৎসাহে পিটিয়ে চলেছে। দ্রাম্— দাম্—ম্—ম্—

দক্ষিণ পাহাড়ের দিকে দিকে সেই গম্ভীর মন্দ্র তরঙ্গিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। ছোট্ট কেলুরি গ্রামখানা যেন থরথর করে কাঁপছে সে শব্দে।

চারপাশে চক্রাকারে বসেছে গ্রামের মেয়ে পুরুষ। আর মাঝখানের রাঙা-ধুলো-ভরা জায়গাটায় উদ্দাম নাচ চলেছে।

একদিকে ছটি জোয়ান ছেলে ; পরস্পরের কাঁধের ওপর হাত দিয়ে দাঁড়ানো একটি পাহাড়ী ছন্দ। আর একপাশে ছটি যুবতী মেয়ে। জোয়ানদের মত তারাও কাঁধে কাঁধে হাত দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। হাঁটু পর্যন্ত তাদের বিচিত্র রঙের কাপড়ে মানুষের কঙ্কাল, মোষের মাথা আর বর্শা-ঢাল আঁকা রয়েছে। দুটি দলের সকলেরই কোমরের ওপর থেকে উর্ধ্বদেহ অনাবৃত।

যুবতীদের কানে পিতলের নীশে দুল। মণিবন্ধে হাতির দাঁতের মোটা মোটা বলয়। চুলের ভাঁজে ভাঁজে সম্বরের ছোট ছোট শিঙ গোঁজা। কানের পাতায় সাঙলিয়া লতার নীলাভ ফুল। ছেলেদের মাথায় মোষের শিঙের মুকুট। কানে আউ পাখির পালক গোঁজা। গলায় কড়ির মালা।

দু দলের মাঝখানে তিনটে বাঁশের খুঁটি পোঁতা রয়েছে। সেই খুঁটিগুলিকে চক্রাকারে বেষ্টন করে একবার দুটো দল নাচতে নাচতে মুখোমুখি হচ্ছে। পরস্পরের মাথায় মাথা ঠেকছে। তার পরই আবার পেছন দিকে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে বিচিত্র ভঙ্গিতে পিছিয়ে একটা নির্দিষ্ট বিন্দুতে এসে থামছে। মাত্র একটি মুহূর্ত। আবার সামনের দিকে ঝুঁকে ছন্দিত পা ফেলে ফেলে অন্য দলটির দিকে এগিয়ে যাওয়ার পালা।

"দ্রাম্—ম্—ম্—ম্—"

গমগম শব্দ উঠছে মেথি কেকোয়েনঘ্যু খুলি বাদ্যের। তার সঙ্গে আবিষ্ট হয়ে উঠেছে বাঁশির সুর। আর সেই আবহ বাজনার সঙ্গে তাল মিলিয়ে

মিলিয়ে ছন্দিত পায়ে নাচ চলেছে। উদ্দাম নাচ। দুর্বার নাচ। অবিরাম নাচ। পায়ের আঘাতে আঘাতে রাঙা ধুলোর মেঘ উড়ছে।

পাহাড়ীদের এই নাচকে বলে ইয়াচুমি কোঘিল নাচ।

"হো—ও—ও—ও—"

নাচের সঙ্গে সঙ্গে বাজছে আমোদিত কণ্ঠের কলরব।

বুড়ো খাপেগা ঘন ঘন পাকা মাথাখানা দোলাচ্ছে। হাত নেড়ে নেড়ে তারিফ করছে নাচ আর বাজনার।

জোরি কেসুঙে নাচ হচ্ছে। তাই সারুয়ামারু আর তার বউ জামাতসু বাঁশের পানপাত্রে সকলের সামনে রোহি মধু দিয়ে দিয়ে যাচ্ছে।

"হো—ও—ও—ও—"

আকাশে বিবর্ণ বেলাশেষ। দূরের পাহাড়চূড়া আবছা হয়ে আসছে। পশ্চিমের বনশীর্ষ থেকে রোদের রঙ মুছে গিয়েছে।

মাতাল দেহের মুদ্রাভঙ্গে নেচে চলেছে পাহাড়ী যুবতী। উদ্দাম ছন্দে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে আসছে পাহাড়ী জোয়ান। তার সঙ্গে সঙ্গে জলদ্ তালে বাজছে বাজনা।

খাপেগা প্রচুর আমোদ পেয়েছে। গোলাকার কামানো মাথা নাড়ছিলো সে। আচমকা তার পাশে এসে দাঁড়ালো সিজিটো। সিজিটো হলো সেঙাইর বাপ।

বুড়ো খাপেগা তাকালো সিজিটোর দিকে, "কী রে, কী ব্যাপার? নাচ আর বাজনা বেশ জমেছে। বোস্, বোস্।"

বিরক্ত দৃষ্টিতে নাচ-বাজনার আসরটার দিকে তাকিয়ে ছিলো সিজিটো। আর অখণ্ড মনোযোগে বুক, কপাল আর কাঁধের পাশে দুই বাহুসন্ধি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রশ আঁকছিলো। সারা মুখ দাড়ি-গোঁফের লেশহীন। সেই মুখে একটা নিরাসক্ত ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো সিজিটোর, "এ-সব আমার ভালো লাগে না সদ্দার। তোর সঙ্গে আমার কথা আছে।"

"কী কথা?" পাকা ভুরু দুটোকে কুঁচকে তাকালো বুড়ো খাপেগা।

"একটু দাঁড়া। হুই সারুয়ামারুকে ডেকে আনি আগে।"

জোরি কেসুঙের একপাশে দাঁড়িয়ে সারা দেহ বিচিত্র ভঙ্গিমায় আঁকাবাঁকা করে এই আদিম নৃত্যকলা উপভোগ করছিলো সারুয়ামারু। সিজিটো তাকে ডাকলো, "এই সারুয়ামারু, ইদিকে আয়। ওখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে টেফঙের (বাঁদর) মত খুব যে নাচছিস!"

মাতলা একটা ঝড়ের মত একে চিত করে ফেলে, ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে লাফিয়ে সোঁ সোঁ করে ছুটে এলো সারুয়ামারু, "কী রে সিজিটো, কোহিমা থেকে ফিরলি বুঝি ?"

"হু-হু। সাহেব তোকে যেতে বলেছে।"

সমানে ক্রশ এঁকে চলেছে সিজিটো। খুশি-খুশি গলায় সে বললো, "এই ভাখ্, সাহেব আমাকে কী দিয়েছে।" গায়ে একটা বড় হরিণের ছাল জড়ানো ছিলো সিজিটোর। তার তলা থেকে একটি সাদা ধবধবে জামা বের করে আনলো সে। তারপর সকলের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলো, "হু-হু, তুই গেলে তুইও পেতিস।"

ইতিমধ্যে নাচ আর বাজনা থেমে গিয়েছিলো। বিচিত্র কৌতূহলে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ, সকলে সিজিটোর চারপাশে বৃত্তাকারে জমা হয়েছে।

পাহাড়ী মানুষগুলোর গলায় এবার বিস্ময়টা সরবে ফেটে পড়লো, "এটা কী ? এটা কী ?"

এর আগে তারা কোনদিন জামা দেখে নি। সভ্যতা থেকে অনেক, অনেক দূরে এই তুচ্ছ পাহাড়ী গ্রামে এই প্রথম জামার আবির্ভাব। এবার আত্মপ্রসাদের হাসিটা সারা দেহে ছড়িয়ে পড়লো সিজিটোর। প্রচণ্ড শব্দ করে হেসে উঠলো সে, "হো—ও—ও, হো—ও—ও। এর নাম হলো জামা। ফাদার আমাকে দিয়েছে।"

"এটা দিয়ে কী হয় ?"

"কী আর হবে। গায়ে দেয়।" সাদা ধবধবে জামাটা পরে দেখিয়ে দিলো সিজিটো, "কী রে, কেমন দেখাচ্ছে ?"

"ভালো, ভালো। খুব সুন্দর।"

চারপাশ থেকে পাহাড়ী মানুষগুলো কলরব করে উঠলো।

"দেখবি, ফাদার আমাকে আরো কত জিনিস দেবে। পায়ের পাতা পর্যন্ত প্যাণ্ট দেবে, কোট দেবে, আরো জামা দেবে।" সকলের মুখের ওপর দিয়ে গর্বিত দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিয়ে গেলো সিজিটো।

প্যাণ্ট, জামা, কোট—বিচিত্র সব শব্দ, অদ্ভুত সব নাম। পাহাড়ী মনের অভিধানে এই নামগুলির, এই শব্দগুলির কোন অস্তিত্ব নেই। নির্বাক হয়ে তাকিয়ে রইলো সকলে।

কথা বলছে, আর সঙ্গে সঙ্গে ক্রশ এঁকে চলেছে সিজিটো। নির্বিকার।

নির্বিরাম। আচমকা তার দৃষ্টি এসে পড়লো সারুয়ামারুর ওপর। ভয়ঙ্কর গলায় সে বললো, "কী রে, তুই ক্রশ করছিস না যে আমার মত! ফাদার যে বলে দিয়েছিলো।"

"ও-সব আমার ভালো লাগে না। কোন কালে করি নি।" অপরাধী গলায় বললো সারুয়ামারু।

"তুই ভারি নিমকহারাম তো। ফাদার তোকে নিমক দিয়েছে, আরো কত কী দিয়েছে। আর তুই বেইমানি করলি!" কটমট চোখে তাকিয়ে রইলো সিজিটো।

"একবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো না! নিমকহারামি করে, বেইমানি করে পাহাড়ের ইজ্জত নষ্ট করবে!"

হাতের মুঠিতে একটা মৃত্যুমুখ বর্শা তুলে নিলো বুড়ো খাপেগা।

"হো—ও—ও—ও—"

চারপাশ থেকে চিৎকার করে উঠলো মানুষগুলো। সেই প্রচণ্ড চিৎকারকে ছাপিয়ে সিজিটোর গলা পর্দায় পর্দায় চড়তে লাগলো, "বুঝলি সদ্দার, আমাদের কেলুরি বস্তির কেউ কোনদিন কারো সঙ্গে নিমকহারামি করে নি। হুই শয়তান সারুয়ামারু করেছে। ফাদার ওকে নিমক দিয়েছে, কাপড় দিয়েছে। আর তার বদলা সম্বরের ছাল নেয় নি, কস্তুরী নেয় নি। শুধু সে বলেছিলো, কপালে, বুকে, কাঁধে আঙুল ঠেকাতে। ফাদার বলে, এর নাম ক্রশ আঁকা। সেই ক্রশ সারুয়ামারু শয়তানটা আঁকে না।"

বর্শার ফলাটা সারুয়ামারুর বুকের কাছে ঠেকিয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো বুড়ো খাপেগা, "সাহেব যা বলেছিলো, তাই কর। নিমক খেয়েছিস, তার কথা রাখবি না? একেবারে জানে মেরে ফেলবো না শয়তানের বাচ্চা!"

একটি কলের পুতুলের মত কপাল, বুক আর বাহুসন্ধি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রশ এঁকে চললো সারুয়ামারু। আর বীভৎস গলায় বুড়ো খাপেগা বললো, "পাহাড়ী মানুষ কখনো কারো সঙ্গে বেইমানি করে না। নিমকহারামি করে না। কেউ করলে তার জান চলে যাবে বর্শার মুখে।"

"হো—ও—ও—ও—"

আকাশের দিকে দিকে আর একবার উদ্দাম চিৎকার উঠে গেলো।

"শহরে গিয়েছিলি, সেই গল্প বল্। যে মানুষটা তোকে জামা দিয়েছে, তার গল্প বল্।" চারপাশ থেকে পাহাড়ী মানুষগুলো এবার ঘিরে ধরলো সিজিটোকে।

বিচিত্র মানুষ এই সিজিটো। মাঝে মাঝে কত পাহাড় ডিঙিয়ে, কত জলপ্রপাত উজিয়ে, কত মালভূমি আর উপত্যকা পাড়ি দিয়ে সে চলে যায় শহরে। মোককচঙে কি কোহিমায়। অবশ্য আরো অনেকে শহরে যায় এই গ্রাম থেকে। সারুয়ামারু যায়, বুড়ো নড্রিলো যায়। লবণের সন্ধানে অনেকেরই যেতে হয়। সারুয়ামারুই সিজিটোকে প্রথম নিয়ে গিয়েছিলো শহর কোহিমায়। তারপর থেকে শহর এক বিচিত্র আকর্ষণে তাকে বার বার টেনে নিয়ে গিয়েছে। পাহাড়ী এই ছোট্ট জনপদে তার তৃষিত কামনা যেন তৃপ্ত হয় না। এই নিবিড় বন, এই টিজু নদী, দক্ষিণ আর উত্তরের তরঙ্গিত উপত্যকা, ওপরে অবারণ আকাশ—এদের মধ্যেই একদিন জন্ম নিয়েছিলো সিজিটো। পাহাড়ী মানুষ সে। কিন্তু ছোটবেলা থেকেই সে তার প্রিয়জন, বন্ধু-বান্ধব থেকে বিচ্ছিন্ন। তার রক্তে রক্তে অরণ্যের আহ্বান নেই, এই ভয়াল শৈলচূড়ার কামনা নেই। কী যে সে চাইতো, তার অস্ফুট বন্য মন তার হদিশ পেতো না। তার পর একদিন কৈশোরের সীমা ডিঙিয়ে দুর্বার যৌবন এলো দেহমনে। পাহাড়ী প্রথা অনুযায়ী বিয়ে হলো সেঙাইর মায়ের সঙ্গে।

সিজিটো জানতো, তার বাপ জেভেথাঙকে হত্যা করেছিলো টিজু নদীর ওপারের সালুয়ালাঙ গ্রামের মানুষেরা। জেভেথাঙের মুণ্ডু কেটে বিজয়-গৌরবে পোকরি বংশ উৎসব করেছিলো, এ সংবাদও তার অজানা নয়। তবু তার রক্তে প্রতিহিংসার জ্বালা নেই। প্রতিশোধের আগুন নেই। কেমন যেন নিরুত্তাপ মানুষ সিজিটো। বুড়ো খাপেগা অনেক বার জেভেথাঙের কাহিনী তার কাছে বলেছে। কিন্তু এতটুকু উত্তেজনার চিহ্ন নেই তার মনের কি দেহের কোথায়ও। কেমন একটা নিস্পৃহ ভাব, একটা শীতল নিরাসক্তি। ঝালাপালা হয়ে অবশেষে গর্জন করে উঠেছে বুড়ো খাপেগা, "ইজা হাণ্টসা সালো। এত ভীরু তুই! এই বস্তির নাম তুই ডোবাবি টিজু নদীর জলে। একেবারে মাগীরও অধম। এ বস্তির মাগীরাও বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে শত্রুর মুণ্ডু আনতে পারে। তুই একটা কী?"

কোন প্রতিবাদ করতো না সিজিটো। বন-পাহাড়ের মানুষ হয়েও তার রক্তে অরণ্যের হিংসা নেই। চকিত দুটো চোখ তুলে সে উঠে যেতো মোরাঙ থেকে।

মাঝে মাঝে একা-একা দূরের পাহাড়ে চলে যেতো সিজিটো। কোন নিঃসঙ্গ জলপ্রপাতের কিনারে বসে বসে তার গর্জন শুনতে ভালো লাগতো

তার। কখনো বিশাল একটা ভেরাপাঙ গাছের মগডালে উঠে অনেক, অনেক দূরে দৃষ্টি ছড়িয়ে দিতো সিজিটো। এই পাহাড়ী দিগন্ত, তার ওপারে নীল আকাশ, তার পরের পৃথিবী আর দৃশ্যমান নয়। সেই অদৃশ্য জগৎ, সেই রহস্যের পৃথিবী প্রতিনিয়ত তাকে হাতছানি দিতো। এক দুর্বার আকর্ষণে এই পাহাড়, দূরের ঐ আকাশ ডিঙিয়ে তার বিচিত্র পাহাড়ী মন চলে যেতে চাইতো। তাদের ছোট্ট জনপদ কেলুরি, পরিচিত মানুষগুলো, আরো অন্তরঙ্গ করে জানা বন, পাহাড়, উপত্যকা, তার শ্বাপদের সংসার একেবারেই অসহ্য হয়ে উঠতো সিজিটোর কাছে।

একদিন আকাশের ওপারে সেই রহস্যের পৃথিবীটা দরজা খুলে দিলো। সারুয়ামারুই তাকে নিয়ে গিয়েছিলো কোহিমায়। পাহাড়ী শহর কোহিমা হতবাক বিস্ময়ে চারিদিক তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলো সিজিটো। তাদের পরিচিত ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রাম, ধান আর জোয়ারের খেত, রুক্ষ মালভূমির বাইরে এমন সুন্দর সাজানো একটা জনপদ থাকতে পারে, তা কি সে জানতো? এই শহরেই আর একটা জগৎ তার পাহাড়ী মনের সামনে এসে দাঁড়িয়েছিলো। সারুয়ামারুই পাদ্রীসাহেবের সঙ্গে তার পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলো। হুণ্টসিঙ পাখির পালকের মত ধবধবে গায়ের রঙ, সাহেবের চোখের মণি দুটো কী উজ্জ্বল! কী নীল!

এই কোহিমা শহর, এই পাদ্রীসাহেব বার বার বহুদূরের সভ্যতা থেকে আরো অনেক ফারাকের এক বিচিত্র পাহাড়ী মনকে আকর্ষণ করে আনলো। অনেক গল্প শুনলো সিজিটো। যীশুর কাহিনী, বাইবেলের গল্প। সে-সব গল্পের প্রায় সবগুলোই সঙ্গে সঙ্গে ভুলে গেলো সে। অনেক জামা-কাপড় উপহার পেলো। লালচে রঙের পানীয় আর খাবারের স্বাদ ইন্দ্রিয় দিয়ে ধরে এনে গ্রামের সকলকে বললো। পাদ্রীসাহেব একটু একটু করে ক্রশ আঁকতে শেখালো তাকে। সে অনেক ইতিহাস।

এই কোহিমা পেরিয়ে সে সাহেবের সঙ্গে গিয়েছিলো মোককচঙ মোককচঙ থেকে মাও, মাও উজিয়ে ইম্ফল। সাহেব তাকে আশ্বাস দিয়েছে ডিমাপুরে নিয়ে যাবে। মস্ত বড় শহর গৌহাটিও বাদ যাবে না। সেখান থেকে শিলং।

দূরতম শহর-বন্দরের গল্প বলে বলে সে গ্রামের সকলকে হকচকিয়ে দেয় এই নগণ্য পাহাড়ী গ্রাম, আর ঐ ছয় আকাশের ছয় পাহাড়ের ওপারে যে

বিচিত্র জগৎ ছড়িয়ে রয়েছে, এই দুয়ের মধ্যে সিজিটো হলো সেতুবন্ধ। সারুয়ামারুই তাকে প্রথম শহরে নিয়ে গিয়েছিলো। কিন্তু সারুয়ামারুর দৌড় কোহিমা পর্যন্ত। সারুয়ামারুকে অনেক পেছনে ফেলে সে অনেক এগিয়ে গিয়েছে।

কয়েকদিন আগে সে কোহিমা গিয়েছিলো। এই মাত্র ফিরে এসেছে। অপূর্ব এক পৃথিবীর সংবাদ সে নিশ্চয়ই বয়ে এনেছে। নিশ্চয়ই সে সংবাদ রূপকথার মত অপরূপ। গ্রামের মানুষগুলো সিজিটোর গল্প শোনার জন্য আগ্রহে, কৌতূহলে উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছে।

বুড়ো খাপেগা বললো, "এবার তো কোহিমা থেকে ফিরলি। সেখানকার গল্প বল্ সিজিটো। সকলে শুনি।"

আকাশে সন্ধ্যার ছায়া গাঢ় হয়ে আসছে। বাতাস হিমাক্ত হয়ে উঠতে শুরু করছে।

সিজিটো বললো, "এখুনি রাত্রি হবে। চল্, মোরাঙে গিয়ে বলি।"

সারুয়ামারুর বউ জামাতসু এগিয়ে এলো সামনের দিকে। সে বললো, "আমরা মাগীরা তো মোরাঙে ঢুকতে পারবো না। এখানে বসেই গল্প বল্ সেঙাইয়ের বাপ। আমি মশাল জ্বালিয়ে দিচ্ছি। আর হাত-পা সেঁকবার জন্য কাঠে আগুন ধরাচ্ছি।"

সিজিটোকে দেখে চোখদুটো বিচিত্র আনন্দে ধকধক জ্বলছিল জামাতসুর। সিজিটো এসেছে! রক্তকণাগুলো আগুনের বিন্দু হয়ে শিরায় শিরায় কিলবিল করতে শুরু করেছে জামাতসুর।

জামাতসুর দিকে একবিন্দু ভ্রূক্ষেপ নেই। সিজিটো নিজের কথাই বলে চললো, "বুঝলি সর্দার, তোর সঙ্গে একটা কথা আছে।"

বুড়ো খাপেগা এই ছায়া-ছায়া অন্ধকারে সিজিটোর মুখের দিকে তাকালো, "কী কথা রে সিজিটো?"

"ফাদার একবার আমাদের বস্তিতে আসতে চায়। তা আমি বললুম, আমাদের সর্দারের সঙ্গে কথাবার্তা বলে নি। তারপর আমি খবর দিলে যাবি। আমাদের পাহাড়ী বস্তিতে না বলে-কয়ে গেলে শেষে কে কোথা থেকে বর্শা হাঁকড়ে বসবে, তার কি কিছু ঠিক আছে। তোকে তো চেনে না আমাদের বস্তির লোকেরা। হয়তো তোকে শত্রু মনে করতে পারে।" গম্ভীর গলায় কথাগুলো উচ্চারণ করলো সিজিটো।

"কিন্তু তোর ফাদার আমাদের বস্তিতে আসবে কী করতে?" বুড়ো
খাপেগার কপালে রাশি রাশি বলিরেখার ভাঁজে শঙ্কা ফুটে বেরুলো।

"বস্তির সকলকে ক্রশ আঁকা শেখাবে।"

"আমরা তো কেউ নিমক নিই নি তোর সাহেবের কাছ থেকে। তা
আমাদের ও-সব শেখাবে কেন? তুই আর সারুয়ামারু নিমক নিয়েছিস, আরো
কত কী নিয়েছিস, তোরা তোদের ফাদার যা বলবে, তাই করবি। খবদ্দার
নিমকহারামি করবি না। আমরা নিমক নিই নি, আমরা কেন শিখতে
যাবো?" বুড়ো খাপেগার ভ্রূ দুটো কাঁকড়া বিছার মত কুঁচকে এলো সহসা।

"হো—ও—ও—ও—"

পাহাড়ী মানুষগুলো চিৎকার করে উঠলো।

"এই থাম শয়তানের বাচ্চারা।" হুঙ্কার দিয়ে উঠলো বুড়ো খাপেগা।
তারপর আবার সিজিটোর দিকে তাকালো, "না, না, এই বস্তিতে হুই সব ভিন
দেশী মানুষ ঢুকতে পারবে না। আনিজার রাগ এসে পড়বে। তোরা বস্তির
বাইরে গিয়ে যা খুশি করিস, করবি। কিন্তু বস্তিতে হুই সব চলবে না।"

আচমকা কে যেন বলে উঠলো, "রাত্তির হলো, এখনও তো সেঙাই ফিরলো
না উত্তরের পাহাড় থেকে। কী রে সদ্দার?"

নাচ আর বাজনার আনন্দিত মাতলামির মধ্যে সেঙাইর কথা খেয়াল
ছিলো না কারো। তার ওপর কোহিমা থেকে ফিরেছে সিজিটো। সঙ্গে নিয়ে
এসেছে অফুরন্ত গল্পের ভাণ্ডার। দূরের শহর-বন্দরের গল্প। বরফসাদা
সাহেবদের গল্প। কৌতূহলের অতল তলায় হারিয়ে গিয়েছিলো ছোট্ট পাহাড়ী
গ্রাম কেলুরির মানুষগুলো।

আচমকা সকলে চকিত হয়ে উঠলো। তাই তো, সেঙাই নেই এই নাচ-
বাজনার আসরে, এই বিশাল আকাশের নীচে গল্প-কথার উল্লসিত কলরবের
মধ্যে।

বুড়ো খাপেগা বললো, "উত্তর পাহাড়ে কখন গেলো সে?"

ওঙলে বললো, "আমরা সকলে খুনোতে (আবাদী জমি) গেছলাম
দুপুরে। আগাছায় আগুন দিয়ে ফিরবার পথে সেঙাই গেলো উত্তর পাহাড়ে।
সে বললো, তোরা গিয়ে নাচ-বাজনা শুরু কর। আমি এখুনি আসছি। সে
বিকেলবেলার কথা। নাচ-বাজনার হল্লায় আর খেয়াল ছিল না। তাই তো
এখন কী করবো সদ্দার?"

"কী সব্বনাশ! হুই দিকটা ভালো নয়। টিজু নদী পেরিয়ে হুই সালুয়ালাঙ বস্তির শয়তানেরা মাঝে মাঝে এ পারে আসে। ওরা হলো আমাদের শত্রু। শিগগির তোরা মশাল নিয়ে একবার যা। ছাখ্ কী হলো?"

সিজিটো বললো, "অত দেখার কী হলো, সেঙাই ঠিক এসে পড়বে।"

আকাশ থেকে শীতের রাত্রি এই নাগা পাহাড়ের ওপর গাঢ় অন্ধকার ঢালছে থরে থরে। নিশ্ছেদ অন্ধকার। কোথায়ও এতটুকু রন্ধ্র নেই।

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সিজিটোর দিকে তাকালো বুড়ো খাপেগা, "তুই চুপ কর। সায়েবদের গা চাট্ গিয়ে।"

"আচ্ছা আচ্ছা। আমি ঘরে যাই তবে।" সামনের দিকে পা বাড়িয়ে দিলো সিজিটো।

একসময় গোটাকয়েক অগ্নিমুখ মশাল জ্বলে উঠলো। তারপর সেই মশালগুলো তীরের ফলার মত সাঁ সাঁ করে নেমে গেলো উপত্যকার দিকে।

"হো—ও—ও—ও—"

একটা ভয়ঙ্কর পাহাড়ী ঝড় উত্তর পাহাড়ের দিকে ছুটে চললো।

এগারো

সালুয়ালাঙ গ্রামের ওপর জা কুলি মাসের রাত্রি এখন নিথর হয়ে গিয়েছে। কেসুঙে কেসুঙে পাহাড়ী মানুষগুলো নিঃসাড় হয়ে ঘুমুচ্ছে। অন্ধকারের সঙ্গে গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের কণা ঝরছে আকাশ থেকে। মোরাঙের মধ্যে পেন্যু কাঠের মশাল এখন নিভে গিয়েছে। অগ্নিকুণ্ড থেকে এতটুকু রক্তাভাসও বেরিয়ে আসছে না বাইরে।

হিমার্ত বাতাস মাঝে মাঝে সাঁ সাঁ করে আছড়ে পড়ছে বনশীর্ষে। এই তুষারঝরা রাত্রি, এই হিমাক্ত বাতাস, এই নিবিড় অন্ধকার। পাহাড়ী জনপদটা শীত ঋতুর ভয়াল রাত্রির থাবা থেকে পালিয়ে দড়ির লেপের নীচে ডুব দিয়েছে। একটা নিটোল আর মসৃণ ঘুমের অতলান্তে একেবারে তলিয়ে যাচ্ছে একটু একটু করে।

কোথাও এতটুকু শব্দ নেই। নিথর জনপদ। এমন কি শুয়োর আর কুকুরগুলো পর্যন্ত একটু উত্তাপের প্রার্থনায় পাহাড়ের ভাঁজে ঢুকে গিয়েছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে হিমাক্ত পাথরের উপর স্থির হয়ে পড়ে রয়েছে পালিত মোষের দল।

অনেক দূরে পোকরি কেসুঙ থেকে একটা মশালের আলো মোরাঙের দিকে এগিয়ে আসছে। আশ্চর্য ক্ষীণ আলোকবিন্দু। চারপাশের কঠিন অন্ধকারকে প্রাণান্ত সংগ্রামে সামান্য সরিয়ে একটু পথ করে নিতে পেরেছে। মশালের চারপাশে এক রহস্যময় আবছায়া। আর সেই আবছায়ায় গুঁড়ো গুঁড়ো বরফের কণা উড়ছে।

একটু একটু করে মশালের আলোটা মোরাঙের পেছনে এসে দাঁড়ালো। পাশে অতল খাদ। বনের বাঁধনে জটিল হয়ে পাহাড়ের দেহ খাড়া নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। মশালের নিস্তেজ দৃষ্টি খাদের গভীরে পৌঁছাতে পারে নি। চারপাশ থেকে গাঢ় কুয়াশা আলোকবিন্দুটির শ্বাসনলী চেপে ধরেছে। নিজেকে এতটুকু বিস্তার করতে পারছে না মশালটা।

মশালের দুপাশে দুটি নারীমূর্তি। জঙ্ঘা থেকে মাথার ওপর পর্যন্ত দড়ির

লেপ দিয়ে জড়ানো। তাদের ভৌতিক ছায়া এসে পড়েছে মোরাঙের দেওয়ালে। ছায়া দুটো কাঁপছে।

মোরাঙের দিকে দুজনে চনমন চোখে তাকালো। তারপর একজন ভীরু-ভীরু গলায় বললো, "খুব সাবধান মেহেলী, ওরা জানতে পারলে একেবারে টুকরো টুকরো করে কাটবে। আমার কিন্তু বড্ড ভয় করছে।"

"ভয় করলে কেসুঙে ঘরে ফিরে যা লিজোমু। তুই আমার দাদাকে না পিরিত করতি! তুই না দাদার পিরিতের মাগী ছিলি! তোর মত মেয়েকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে মোরাঙে ঝুলিয়ে রাখা দরকার।" মেহেলীর চোখ দুটো আগ্নেয় হয়ে উঠলো।

আশ্চর্য! লিজোমু দাউদাউ করে জ্বলে উঠলো না। শুধু ফিসফিস গলায় সে বললো, "খোন্‌কেকে খাদে ফেলে দিয়েছে সর্দার। সে কি আর বেঁচে আছে?"

"খাদে ফেলার সময় একপাশে দাঁড়িয়ে আমি দেখেছি। এই ঘন বন। এর মধ্যেই হয়তো কোথায়ও আটকে আছে দাদা। তুই একটু দাঁড়া, আমি নীচে নেমে দেখে আসি। এখানে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকবি। খবদ্দার! মোরাঙের ওরা যেন টের না পায়।" শেষের দিকে গলাটা কেঁপে কেঁপে উঠলো মেহেলীর, "তুই দেখিস, দাদা মরে নি। ও ঠিক আবার বেঁচে উঠবে। যদ্দিন সেরে না ওঠে, তদ্দিন ওকে লুকিয়ে রাখতে হবে গাছের ওপরের ঘরে।"

মোরাঙটার দিকে শঙ্কিত চোখে একবার তাকিয়ে নিলো লিজোমু, "আমার কিন্তু অন্য ভয় করছে মেহেলী। আনিজার ভয়ে সর্দার খোন্‌কেকে হুই খাদে ফেলে দিয়েছে। খোন্‌কেকে তুলে আনলে যদি আনিজার রাগ এসে পড়ে!"

আতঙ্কে মুখখানা নীরক্ত হয়ে গেলো মেহেলীর। তাই তো! এ ব্যাপারটা সে একবারও ভেবে দেখে নি। আনিজা! ঐ একটি নামে ধমনীর ওপর রক্ত উথল-পাথল হয়ে ওঠে। চেতনাটা কেমন যেন অসাড় হয়ে যায়। একবার ঢোঁক গিললো মেহেলী। পাহাড়কন্যা সে, হাতের মুঠিতে একটা বিশাল বর্শা ধরা থাকলে শত্রুর হৃৎপিণ্ড সে এফোঁড়-ওফোঁড় করে দিতে পারে। প্রয়োজন হলে অতিকায় মেরিকেৎসুর একটি আঘাতে গুঁড়ো-গুঁড়ো করে দিতে পারে বুনো বাঘের মাথা। কিন্তু এই আনিজা নামটির মুখোমুখি হয়ে মেহেলী আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই কোথা থেকে সারা ধমনীটাকে মাতিয়ে মাতিয়ে রক্তের উচ্ছ্বাস খেলে গেলো। একটা বিচিত্র

দুঃসাহস কোথা থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে সব দ্বিধাকে ভাসিয়ে নিয়ে গেলো। সব ভীরুতা মুছে গেলো পাহাড়ী মেয়ের চেতনা থেকে।

মেহেলী বললো, "দাদা নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। এই বনের মধ্যে একটু একটু করে পচে মরবে সে! তুই কি তাই চাস, লিজোমু? দেখি না, যদি বাঁচাতে পারি!"

"কিন্তু আনিজার রাগ! আর সদ্দার জানতে পারলে—" বাকীটুকু আর শেষ করতে পারলো না লিজোমু। একটা স্পষ্ট অপঘাতের আশঙ্কায় গলাটা আপনা থেকেই বুজে এলো তার।

"যা হবার হবে। আমায় অত ভয় নেই। আনিজার রাগ পড়লেও মরবো আর সদ্দার জানতে পারলেও বাঁচবো না। তুই ওপরে দাঁড়া লিজোমু। আমি একবার খাদে নামছি।"

আর দাঁড়ালো না মেহেলী। মশালটা বাঁ হাতের থাবায় চেপে ধরে খাড়াই পাহাড়ের গা বেয়ে বেয়ে নীচের খাদের দিকে নেমে গেলো সে। আর একটা প্রেতমূর্তির মত মোরাঙের পাশে, তুষারঝরা আকাশের তলায় দাঁড়িয়ে রইলো লিজোমু।

পাহাড়ী অরণ্য। গহন আর নীরন্ধ্র। মশালটা নিয়ে সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে নামছে মেহেলী। গাছের ফাঁক দিয়ে, ঝোপের পাশ দিয়ে পথ করে করে এগুতে হচ্ছে। দুটো চোখের দৃষ্টিকে মশালের আলোর চেয়েও তীক্ষ্ণতর করে একটি মানবদেহের সন্ধানে চারিদিকে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে ফেলছে সে। খোন্‌কের দেহের এতটুকু আভাস কোথায়ও পেলেই, সে ঝাঁপিয়ে পড়বে। তারপর দুটি বাহুর বেষ্টনে বনশয্যা থেকে তুলে নিয়ে আসবে। মেহেলীর স্থির বিশ্বাস, খোন্‌কের দেহটা খাদের অতলে গড়িয়ে যায় নি। এ বনের কোথায়ও, নিশ্চয়ই কোন শিকড়ে, কি গাছের ডালে, কি ঝোপের মাথায় আটকে রয়েছে।

হিমঝরা এই বনের মধ্যে শ্বাপদের চিহ্নমাত্র নেই। গুহার সঙ্কীর্ণ বিস্তারের মধ্যে বিশাল দেহ গুঁজে গুঁজে একটু উত্তাপ সৃষ্টি করছে তারা। বাঘ, চিতা কি বুনো মোষ জা কুলি মাসের এই প্রখর শীতের বিক্রমে তাদের সহজ বিচরণের রাজ্য থেকে পলাতক হয়েছে। ফেরারী হয়েছে।

জঙ্ঘার নীচ থেকে পায়ের পাতা পর্যন্ত অনাবৃত। শীতের রাত্রি শরীরের সেই অংশটুকুর ওপর কেটে কেটে বসছে। পা দুটো যেন পক্ষাঘাতের তাড়নায় অসাড় হয়ে আসতে শুরু করেছে মেহেলীর।

সামনের জীম্বো গাছের দেহে কঠিন বাঁধনে জড়িয়ে ধরেছে একটা কালো রঙের লতা। আচমকা মেহেলীর মশালটা কেমন করে যেন সেই লতায় গিয়ে লাগলো। সাঁ করে লতাটা সোজা হয়ে গেলো, তারপরেই কালো বিদ্যুতের মত পাশের একটা ঝোপের ওপর আছড়ে পড়ে অদৃশ্য হলো। লতা নয়, একটা পাহাড়ী অজগরের বাচ্চা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো মেহেলী। মাত্র একটি সন্ত্রস্ত মুহূর্ত। তারপরেই আবার নীচের দিকে পা চালিয়ে দিলো সে।

জা কুলি মাসের রাত্রি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। অসহ্য শীতে আঙ‍্লের ডগা-গুলো চিনচিন করতে শুরু করেছে। চামড়া চৌচির করে ফিনকি দিয়ে যেন এখুনি রক্ত বেরিয়ে আসবে।

অসহায় চোখে চারিদিকে একবার তাকালো মেহেলী। কোথাও খোন্‌কের চিহ্নমাত্র নেই। চারিদিকে নিবিড় বন আর ক্রুর অন্ধকার হা-হা গ্রাস মেলে রয়েছে। পাহাড়ী মেয়ে মেহেলীর বুকের মধ্যে ভয়ের শিহরণ খেলে গেলো। সমস্ত দেহটা শিরশির করে উঠলো।

পাশেই কোন একটা গুহা থেকে এই অতল খাদ কাঁপিয়ে গর্জন করে উঠলো একটা ক্ষ্যাপা বাঘ। সেই গর্জনের প্রতিধ্বনি দুপাশের পাহাড়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে অনেকক্ষণ জেগে রইলো। কোথায় কোন বনচূড়া থেকে প্রেতকণ্ঠে চেঁচিয়ে উঠলো এক ঝাঁক টানডেন্‌লা পাখি। পাখি নয়, যেন আনিজার কান্না। বাইরেই কেবল হিম ঝরছে না, অপরিসীম ভয়ে সারা দেহের রক্ত গুঁড়ো গুঁড়ো বরফ হয়ে ধমনীর ওপর আছাড় খেতে লাগলো মেহেলীর। নিষ্প্রাণ একখণ্ড শিলামূর্তির মত পাহাড়ের একটা খাঁজের মধ্যে বসে পড়লো মেহেলী। আর হাতের থাবা থেকে মশালটা ছিটকে পড়েছে পাহাড়ী ঘাসের ওপর।

শুকনো পাহাড়ী ঘাস। জা কুলি রাত্রির হিমে ভিজে গিয়েছিলো। আচমকা পেন্থ্য কাঠের মশালের শিখা লেগে দাবদাহের মত জ্বলে উঠলো। শীতে আড়ষ্ট দুটি হাত আর দুটি পা সেই আগুনের দিকে প্রসারিত করে দিলো মেহেলী।

সারা দেহের পেশীতে পেশীতে চেতনা ছিলো মেহেলীর। একটু একটু করে আগুনের উত্তাপে রক্ত সঞ্চালন শুরু হলো অনাবৃত হাত-পায়ে। জা কুলির রাত্রির এই হিমঝরা শীতে দাবাগ্নির শিখাটুকুতে মধুর আরাম রয়েছে।

সেই আগুন এক সময় নিস্তেজ হয়ে এলো। ঊর্ধ্বমুখ শিখা ক্ষীণ হলো।

বিষণ্ণ রক্তাভায় নিঃশেষ হলো দাবাগ্নি। আচমকা সেই ক্ষীণ রক্তাভায় সামনের দিকে তাকাতেই সারা দেহে কেমন একটা শিহরণ খেলে গেলো মেহেলীর। স্নায়ুগুলো ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। সামনের একটা ভেরাপাঙ গাছের ঝাঁকড়া মাথায় একটা মানুষের দেহ দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। ঘন পাতার ফাঁক দিয়ে তার একটা হাত বাইরে বেরিয়ে এসেছে। নিশ্চয়ই খোন্‌কে।

পাহাড়ী ঘাসের আগুন ক্ষীণতর হচ্ছে। বিষণ্ণ রক্তাভা মুছে আসতে শুরু করেছে। সহসা রক্তে রক্তে প্রখর উত্তেজনা ঝাঁ-ঝাঁ করতে শুরু করলো মেহেলীর। জা কুলি রাত্রির হিমে শরীরটা অসাড় হয়ে এসেছিলো। সে কথা ভুলে গেলো মেহেলী। বিদ্যুতের স্পর্শে যেন লাফিয়ে উঠলো সে। তারপর পেন্যু কাঠের মশালটা পাহাড়ী ঘাসের আগুনে গুঁজে দিলো। কিন্তু আশ্চর্য! নিভন্ত আগুনে মশাল জ্বলে উঠলো না।

একপাশে মশালটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেহেলী। তারপর নিরুপায় চোখে একবার এদিক-সেদিক তাকিয়ে নিলো। কিন্তু জা কুলি মাসের এই তুষার-ঝর-ঝর রাত্রি বড় নির্মম, ভীষণ নিষ্ঠুর। এতটুকু আগুন, এতটুকু উত্তাপের আভাসকে টুঁটি টিপে ধরার জন্য চারিদিক থেকে থাবা শানিয়ে ওত পেতে রয়েছে সে।

নাঃ, একটা শিলামূর্তির মত এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে চলবে না। যেমন করেই হোক, খোন্‌কের দেহের কাছে এখনি পৌছাতে হবে মেহেলীকে। পাহাড়ী ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে অল্প অল্প আগুনের আলো আছে। সেটুকু ভরসা করেই মেহেলীর দেহমনে প্রেরণার উচ্ছ্বাস খেলে গেলো। সন্তর্পণে পা ফেলে ফেলে সামনের ভেরাপাঙ গাছটার নীচে এসে দাঁড়ালো মেহেলী।

পাহাড়ের এই অতলদেশে কোথায়ও এক কণা উৎসাহ নেই। শুধু ঘাসবনের ফাঁকে ফাঁকে একটু একটু আগুন আনিজার রক্তচোখের মত জ্বলছে। দুটো হাত বাড়িয়ে হিমাক্ত গাছের কাণ্ডটাকে আলিঙ্গন করলো মেহেলী। তারপর তরতর করে একটা বনবিড়ালের মত একেবারে মগডালে উঠে এলো।

নিকষ অন্ধকার। পাহাড়ী ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে যে রক্তাভ আগুনের কণাগুলো জ্বলছিলো, তার রেশ এই পর্যন্ত এসে পৌছাতে পারে নি। আন্দাজে আন্দাজে হাতিয়ে শেষ পর্যন্ত সেই নরদেহটির কাছে চলে এসেছে মেহেলী। এমন কি তার হাতখানা পর্যন্ত স্পর্শ করতে পারা যাচ্ছে। বিশাল গাছ বেয়ে এই মগডালে উঠে আসতে হাঁপানি ধরে গিয়েছিলো মেহেলীর। দ্রুততালে

কয়েকটা নিশ্বাস পড়লো তার। ঘন ঘন। ফুসফুস ভরে বার কয়েক বাতাস টেনে নেবার পর নিজের শরীর থেকে দড়ির লেপখানা খুলে ফেললো মেহেলী। তারপর অসাড় আর জ্ঞানহীন নরদেহটির চারদিকে নিবিড় স্নেহে জড়িয়ে দিলো।

অনাবৃত দেহ। শীতের রাত্রি চারিদিক থেকে নির্মমভাবে ঝাঁপিয়ে পড়লো মেহেলীর ওপর। মনে হলো, দাঁতে দাঁতে, নখে নখে এই হিমঝরা রাত্রি ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ফেলবে। আর একটি মুহূর্তও অপেক্ষা করা চলবে না। প্রতিটি অনুপলে এই রাত্রি তাকে একটু একটু করে গ্রাস করছে।

গাছের মাথা থেকে সেই নিশ্চেতন নরদেহটিকে পিঠের ওপর তুলে নিলো মেহেলী। গুরুভার সবল দেহ। মেরুদণ্ডটা বেঁকে যাবার উপক্রম হলো তার। দড়ির লেপের দুটি প্রান্ত দিয়ে নিজের পেটের সঙ্গে নরদেহটিকে বেঁধে নিলো মেহেলী। পাহাড়কন্যা সে। পাথরের মত কঠিন তার দেহের পেশীভার। ধীরে ধীরে সতর্কভাবে পা ফেলে ফেলে সরু প্রশাখা থেকে মোটা শাখায়, তারপর বিশাল কাণ্ড বেয়ে বেয়ে নীচের দিকে নামতে লাগলো মেহেলী।

নীচে নেমে গুরুভার নামিয়ে বার কয়েক ঘন ঘন নিশ্বাস টানলো মেহেলী। তারপর আশ্চর্য শীতল নরদেহটিকে আবার পিঠের উপর তুলে নিলো। তারও পর পাহাড়ের খাড়া দেহ বেয়ে বেয়ে, বন্ধুর চড়াইর দিকে উঠতে লাগলো। পিঠের ওপর অচেতন মানুষটির দেহভারে ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে মেহেলী। মেরুদণ্ডটা টনটন করছে ; যেন দেহ থেকে ছিটকে বেরিয়ে যাবে সেটা। দু হাত দিয়ে সামনের লতাপাতার বাধা সরিয়ে এগুচ্ছে মেহেলী।

সহসা ডান-পাখানা পিছলে গেলো মেহেলীর। ছিটকে একটা পাহাড়ী গর্তের মধ্যে পড়ে গেলো সে। কোমরের ওপর প্রচণ্ড আঘাত লেগেছে। মনে হচ্ছে, নিম্নাঙ্গটা দেহ থেকে ছিঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছে। জা কুলি রাত্রির এই আঘাত। মজ্জায় মজ্জায় তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা চমক দিয়ে যাচ্ছে তার। তীব্র গলায় আর্তনাদ করে উঠলো মেহেলী, "আ-উ-উ-উ—"

কয়েকটি মাত্র ক্লিষ্ট মুহূর্ত। তারপরেই আবার খাড়া হয়ে উঠলো মেহেলী। ইতিমধ্যে নরদেহটিকে পিঠ থেকে কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছিলো সে।

নিস্তব্ধ আর নির্জন পাহাড়ী চড়াই। পিঠের ওপর একটি অচেতন মনুষ্য-দেহ ছাড়া আর কোথায়ও কোন প্রাণের সাড়া নেই। এই মুহূর্তে একটা হিংস্র শ্বাপদের চোখে খানিকটা নীল আগুন দেখতে পেলেও আশ্বস্ত হতে

পারতো মেহেলী। কিন্তু এই ভয়াল শীতের রাত্তিরে একটি আরণ্যক প্রাণীর সান্নিধ্য পাওয়া যাবে না কোথায়ও।

এক সময় পাহাড়ী খাদের অতল থেকে ওপরে উঠে এলো মেহেলী। একেবারে মোরাঙের পাশে দাঁড়িয়ে চারিদিকে সতর্ক দৃষ্টিটা বুলিয়ে নিল। নাঃ, ভয়ের কোন কারণ নেই। মোরাঙের জোয়ান ছেলেরা দড়ির লেপের নীচে একটি মসৃণ স্বপ্নের লূতাতন্তু দিয়ে মনোরম এক জাল বুনে চলেছে এখন। সেই জালের কেন্দ্রবিন্দুতে একটিমাত্র মুখ। সে মুখ তাদের লগোয়া লেন্যুদের (প্রেমিকাদের) মুখ।

একবার নীচের দিকে তাকালো মেহেলী। তারপর ফিসফিস গলায় ডাকলো, "লিজোমু, এই লিজোমু—"

কোন উত্তর নেই কোথায়ও।

আবারও ডাকলো মেহেলী, "এই লিজোমু—"

পাহাড়ী খাদের ওপরে এই মোরাঙের কিনারে লিজোমু নামে কোন নারীর কণ্ঠে জবাব ফুটে বেরুলো না। নিশ্চয়ই সে এই শীতের রাত্রির অবিরাম প্রহার থেকে পালিয়ে দড়ির লেপের উষ্ণ আরামে এতক্ষণে আয়েস করে কুণ্ডলী পাকিয়েছে।

সহসা মোরাঙের মধ্যে মৃদু কলরব জেগে উঠলো। জেন্যুর (মধ্যরাত্রি) আগে গ্রামে গ্রামে সমস্ত নাগারা একবার জেগে ওঠে। নাগা পাহাড়ের এ একটা প্রচলিত রীতি।

আর দাঁড়ালো না মেহেলী। মোরাঙের কিনার থেকে একটা উল্কার মত পাশের টিলার দিকে উঠে গেলো সে। এই রাত্রিবেলায় সর্দার তার পিঠের ওপর খোন্‌কের দেহটি দেখতে পেলে আর উপায় থাকবে না। নিদারুণ আতঙ্কে পায়ের পেশীতে পেশীতে দুর্বার বেগ নেমে এলো। এই জা কুলির হিমার্ত রাত্রিতে দরধারায় ঘাম ছুটতে শুরু করেছে মেহেলীর।

এক এক করে ন্‌গুরি কেসুঙ, কাতারি কেসুঙ, নিসুরি কেসুঙ পেরিয়ে গ্রামের প্রান্তে চলে এলো মেহেলী। চারপাশে ঘন কুয়াশার পর্দা নেমে এসেছে। নানা কেসুঙের ঘরগুলোতে অস্পষ্ট আলোর বিন্দু দেখা যায়। মাঝ রাত্রিতে পাহাড়ী প্রথা অনুযায়ী সমস্ত সালুয়ালাঙ গ্রামখানা ঘুমের অতলতা থেকে জেগে উঠেছে। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। মুঠি মুঠি কাঁচা তামাকপাতা চিবিয়ে কি বাঁশের পানপাত্রে কয়েক চুমুক রোহি মধুর মৌতাত দিয়ে

স্নায়ুগুলোকে প্রখর করে তুলবে পাহাড়ী মানুষগুলো। তারপরেই আবার দড়ির লেপের নীচে মসৃণ একখানা ঘুমের মধ্যে ডুবে যাবে।

কখন যে বিশাল খাসেম গাছটার তলায় এসে দাঁড়িয়েছিলো খেয়াল ছিলো না মেহেলীর। এখন আর অস্বস্তি নেই। অন্তত সূর্য ওঠার আগ পর্যন্ত সে নিশ্চিন্ত। সকালের আলোতে পাহাড়ী মানুষগুলির হিংস্র চোখ খুলবার আগেই সে খোন্‌কেকে লুকিয়ে ফেলতে পারবে।

এক সময় বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে গাঠের ওপরে উঠে এলো মেহেলী। কাঁধের ওপর সেই অচেতন নরদেহ। গাছের ডালে ছোট্ট একখানি ঘর। লতার বাঁধন আর আতামারী পাতার চাল। এই ঘরখানা মেহেলীর। রাত্রে এই ঘরেই তার নিঃসঙ্গ বিছানা পাতা হয়। কুমারী মেয়ের একক শয্যা পাহাড়ী পুরুষের কামনা থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে যেন উঠে এসেছে।

ধীরে ধীরে মাচানের ওপর নিশ্চেতন মানুষটিকে শুইয়ে দিলো মেহেলী। তারপর একটা হরিণের ছাল নিজের সারা গায়ে জড়িয়ে মানুষটির দিকে ঝুঁকে পড়লো। পাতার চাল, চারপাশে বাঁশের দেওয়াল আর সমস্ত দেহে হরিণের ছালের আরাম। সব মিলিয়ে একটা কবোষ্ণ আরামের পরিমণ্ডল।

মেহেলী ডাকলো, "দাদা, এই দাদা—"

নিরুত্তর পড়ে রইলো মানুষটি! একটু চুপ করে রইলো মেহেলী, তারপর একখানা হাত সেই হিমদেহের ওপর বিছিয়ে দিলো। শেষমেষ একটু একটু করে ঝাঁকানি দিতে লাগলো সে। নাঃ, জীবনের কোন লক্ষণ, চেতনার কোন আভাসই নেই সেই দেহে। অনেকক্ষণ আগে খোন্‌কেকে সেই খাদের মধ্যে ফেলে দিয়েছিলো মোরাঙের জোয়ানেরা। জা কুলি রাত্রির হিমে হিমে একেবারে জমাট বরফ হয়ে গিয়েছে তার দেহ। মানুষটির নাকের কাছে হাত রাখলো মেহেলী। অনেকটা বিরতির পর গরম নিশ্বাসের ক্ষীণ এক-একটা ধারা তিরতিরিয়ে পড়ছে হাতের ওপর। এই নিশ্বাসের মধ্যে প্রাণের আশ্বাস খুঁজে পেলো মেহেলী। খোন্‌কে বেঁচে আছে। নিশ্চয়ই বেঁচে আছে। সর্বাঙ্গ দিয়ে একটা অপূর্ব পুলকের শিহরণ খেলে গেলো মেহেলীর। তার এই দুঃসাহস, আনিজার বিরুদ্ধে এই সক্রিয় প্রতিবাদ তবে ব্যর্থ হয় নি।

ঘরের এক কোণে মাটির পাত্রে একরাশ নিভু-নিভু আগুন রয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে আগুনের কাছে চলে এলো মেহেলী। সেই অগ্নিপাত্রটার ঠিক পাশেই অনেকগুলো বাঁশের চোঙা; রোহি মধুতে কানায় কানায় পূর্ণ

হয়ে রয়েছে। একটা পানপাত্র তুলে ঢকঢক করে আকণ্ঠ রোহি মধু গিলে নিলো মেহেলী। শরীরটা এবার বেশ চাঙ্গা হয়ে উঠেছে। শীতার্ত ইন্দ্রিয়গুলো বেশ সক্রিয় হচ্ছে তার। এখন হিমঝরানো জা কুলি রাত্রির সঙ্গে অনেকক্ষণ লড়াই করতে পারবে মেহেলী।

বাঁশের পাটাতন থেকে আগুনের আধারটা তুলে নিলো মেহেলী। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে আবার সেই মানুষটির কাছে চলে এলো। আগুন নিভে এসেছিলো, ফুসফুস শূন্য করে জোরে জোরে কয়েকটা ফুঁ দিলো মেহেলী। ওপরের সাদা রঙের ছাই সরে গিয়ে আগুনটা রক্তমুখ হয়ে উঠলো।

পাটাতনের একপাশে একপিণ্ড কার্পাস তুলো পড়ে ছিলো। সেটা তুলে আগুনের পাত্রটার ওপরে মেলে ধরলো মেহেলী। পরম মমতায় সেই গরম তুলো দিয়ে সেঁক দিতে শুরু করলো সে। বার বার। নিশ্চেতন দেহটা একটু একটু করে প্রাণিত হলো; তারপর থরথর করে কেঁপে উঠলো।

সহসাই ঘটে গেলো ঘটনাটা। সেঁক দিতে দিতে মেহেলীর হাতখানা মানুষটার বুকের কাছে চলে এসেছিলো। কিন্তু হাতড়ে হাতড়ে একখানা বিশাল ক্ষত সেই বুকের কোথায়ও আবিষ্কার করতে পারলো না মেহেলী। তবে, তবে এ কে? এ দেহ কার? পাহাড়ী খাদের অতল অরণ্য থেকে জা কুলি মাসের এই হিমাক্ত রাত্রিতে কার দেহ বয়ে এনেছে মেহেলী? এ তো খোন্‌কে নয়!

আনিজা! আনিজা! খাসেম গাছের মগডালে কুমারী মেয়ের এই ছোট্ট শোয়ার ঘর। এই ঘরে কি খোন্‌কের বদলে কোন প্রেতাত্মার দেহ তুলে আনলো মেহেলী! আকাশ ফাটিয়ে চিৎকার করে উঠতে চাইলো মেহেলী। কিন্তু অতিকায় একটা থাবা দিয়ে কে যেন কণ্ঠনলী চেপে ধরেছে। একটা বিবর্ণ শব্দও মুক্তি পেলো না মেহেলীর গলা থেকে। অপরিসীম আতঙ্কে একেবারে শিলীভূত হয়ে গিয়েছে যেন মেহেলীর সারাটা দেহ।

গাছের ওপর এই শূন্যের আশ্রয় থেকে পালিয়ে যাবার এক দুর্বার প্রেরণা খেলে গেলো মেহেলীর দেহমনে। কিন্তু প্রাণান্ত চেষ্টাতেও একটা পা বাঁশের সিঁড়ির দিকে বাড়িয়ে দেবার সামর্থ্যটুকুও সে হারিয়ে ফেলেছে। নিষ্প্রাণের মত বসেই রইলো মেহেলী।

জমাট অন্ধকার। এক সময় সামনের নিঃসাড় দেহটা থেকে একটা অস্ফুট কাতরোক্তি শুনতে পেলো মেহেলী, "আ-উ-উ-উ—"

নাঃ, আনিজা নয়। একটি জীবন্ত মানুষের সাহচর্য রয়েছে এই ছোট্ট ঘর খানার মধ্যে। খানিকটা সাহস ফিরে এলো মেহেলীর স্নায়ুগুলোতে। সাহস নয়, দুঃসাহস। সহসা আগুনের পাত্রটা মানুষটির মুখের কাছে নিয়ে এলো মেহেলী। এক অদম্য কৌতূহলে তার নিশ্বাস দ্রুততর হয়ে উঠেছে।

অগ্নিপাত্রটার ওপর ঝুঁকে বার কয়েক জোরে জোরে ফুঁ দিলো মেহেলী। আর সেই রক্তাভ আগুনের আলোতে মানুষটির মুখখানা দেখে চমকে উঠলো সে। খোন্‌কে নয়, এ তো টিজু নদীর ওপারের কেলুরি গ্রামের ছেলে সেঙাই। তাদের শত্রুপক্ষ। আশ্চর্য হয়ে গেল মেহেলী। তবে কি পাহাড়ী খাদের গভীর পাতাল থেকে শত্রুপক্ষের ছেলেকে পিঠের ওপর তুলে নিয়ে এসেছে সে। তারপর পরম মমতায় নিজের বিছানায় শুইয়ে দিয়েছে। কিছুক্ষণ নিঝুম হয়ে বসে রইলো মেহেলী।

"আ-উ-উ-উ—" এবার দেহটা নড়তে শুরু করেছে। আর মাঝে মাঝে অস্পষ্ট গলায় আর্তনাদ করে উঠছে সেঙাই।

সেঙাই! তাদের শত্রুপক্ষের ছেলে। সহসা কয়েক দিন আগের একটা মোহন বিকেল চেতনার মধ্যে দোল খেয়ে উঠলো যেন মেহেলীর। সেদিন জোহেরি বংশের দুর্দান্ত যৌবনের মুখোমুখি হয়েছিলো সে। একটা মৃত্যুমুখ বর্শার ফলা তার দিকে তুলে ধরেছিলো সেঙাই।

আশ্চর্য! রোজ টিজু নদী ডিঙিয়ে কি এক অসহ্য আকর্ষণে ওপারের সেই নিঃশব্দ ঝরনাটার পাশে চলে যেতো মেহেলী। একটা টানডেন্‌লা পাখির মত জল ছিটিয়ে ছিটিয়ে স্নান করতে বড় ভালো লাগতো। বিচিত্র যোগাযোগ। সেই ঝরনার পাশে দেখা হয়েছিলো সেঙাইর সঙ্গে। বর্শা তুলে ধরেছিলো বটে, কিন্তু সামান্য একটু আত্মসমর্পণ করতে আর তাকে আঘাত করে নি শত্রুপক্ষের ছেলে সেঙাই। পাহাড়ী জোয়ানের পিঙ্গল দুটি চোখে বিচিত্র এক ভাষা দেখে তার যৌবন টঙ্কার দিয়ে উঠেছিলো। সমস্ত পেশীগুলো ঝন্‌ঝন্ করে বেজে উঠেছিলো। সোনালী বুক, নিটোল দেহ, মসৃণ শ্রী অঙ্গ। এক অনাস্বাদিত সঙ্কেত শিহরিত হয়ে গিয়েছিলো অস্ফুট মনে। পাহাড়ী কুমারীর যৌবন! জলপ্রপাতের মত উদ্দাম। সেদিন সেঙাইর বর্শার নীচেই নিজেকে সমর্পণ করে নি মেহেলী। সেদিন ধারালো থাবায় থাবায়, একটি নির্মম আলিঙ্গনের মধ্যে তাকে যদি জোহেরি বংশের এক ক্ষ্যাপা যৌবন উন্মত্ত হয়ে পিষে ফেলতো, তা হলে হয়তো সে চরিতার্থ হতে পারতো। তার নিজেকে সমর্পণ

সার্থক হয়ে উঠতো। কিন্তু সেদিন সেঙাই চলে গিয়েছিলো। তারপর আরো দু-একদিন সেঙাইর খোঁজে গিয়েছে মেহেলী। কিন্তু শত্রুপক্ষের যৌবন আর তার দৃষ্টিতে ধরা দেয় নি।

সেদিনের বিকেলকে নিয়ে একটি বন্য কামনার জ্বালার কথা থাক। একটা হিসাব কিছুতেই মিলছে না মেহেলীর। এই অতল খাদের মধ্যে কি করে এসে পড়লো সেঙাই? টিজু নদী ডিঙিয়ে এই সালুয়ালাঙ গ্রামের পাহাড়ী খাদে কিসের সন্ধানে এসেছিল সে?

"আ-উ-উ-উ—" আর্তনাদটা এবার বেশ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

চকিত হয়ে উঠলো মেহেলী। তারপর হামাগুড়ি দিয়ে রোহি মধু-ভরা একটা বাঁশের পানপাত্র নিয়ে এলো। তারও পর হাতিয়ে হাতিয়ে সেঙাইর মুখখানা খুঁজে বের করলো। ঠোঁট দুটো জুড়ে এসেছিলো সেঙাইর। ডান হাতের আঙুল দিয়ে মুখটা ফাঁক করে দিলো মেহেলী। তারপর বাঁশের পানপাত্র থেকে বিন্দু বিন্দু রোহি মধু ঢেলে দিতে লাগলো জিভে। প্রথমে চেটে চেটে সেই উষ্ণ পানীয়ের আস্বাদ নিতে লাগলো সেঙাই। তারপর ঢক্‌ঢক্‌ করে গিলে পানপাত্রটা শূন্য করে দিলো।

মেহেলী ডাকলো, "এই সেঙাই, এই—"

দেহটা আবার নিস্পন্দ হয়ে গিয়েছে। নিরুত্তর পড়ে রইলো সেঙাই।

এবার দু হাত দিয়ে ঝাঁকানি দিলো মেহেলী। তবু কোন জবাব নেই সেঙাইর তরফ থেকে। তেমনি নিঃশব্দ হয়ে পড়ে রয়েছে সেঙাই।

সমস্ত দেহের রক্তকণাগুলো সরীসৃপের মত কিলবিল করতে শুরু করেছে মেহেলীর। একটি কঠিনপেশী জোয়ান ছেলে, এই শীতের রাত্রি, সেই জোয়ান ছেলেটিকে আগুনের তাপে তাপে কবোষ্ণ করে তুলেছে সে, রোহি মধুর রমণীয় মৌতাত দিয়ে তার স্নায়ুগুলোকে উত্তেজিত করে তুলতে চেয়েছে মেহেলী। কিন্তু এ কী হলো? সেঙাইর হিমার্ত দেহের শুশ্রূষা করতে করতে একটা বিচিত্র সম্ভাবনা শিরায় শিরায় বিদ্যুতের মত বয়ে গিয়েছে তার। এই কুমারী গৃহ দুটি পাহাড়ী যৌবনকে নিয়ে সার্থক হয়ে উঠতে পারে। এই নিঃসঙ্গতা মনোরম হয়ে উঠতে পারে। মেহেলী ভুলে গিয়েছে খোন্‌কের কথা। তার রক্তে রক্তে আদিম অরণ্য ডাক দিয়েছে।

একটা ক্ষ্যাপা বাঘিনীর মত সেঙাইর পাশে বসে বসে ফুলছে মেহেলী। এই শীতের হিমে আচমকাই যদি শত্রুপক্ষের পুরুষ তার কাছে এসে পড়েছে,

তবে কেন সে তার কুমারী জীবনের বাসনাকে অক্ষত রেখে যাবে! বুকের ভেতর মেহেলীর ফুসফুসটা ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। প্রচণ্ড উত্তেজনায় কেঁপে কেঁপে উঠছে সারা দেহ।

সহসা সেঙাইর বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো মেহেলী। তারপর দুটি বাহুর প্রখর আলিঙ্গনে বেষ্টন করে ধরলো সেঙাইর দেহটা। তার ধারালো নখ কেটে কেটে বসে গেলো সেঙাইর বুকে-পিঠে-গলায়-ঘাড়ে।

ময়াল সাপের মত ফোঁস্-ফোঁস্ করে কয়েকটা আগ্নেয় নিশ্বাস পড়লো সেঙাইর বুকে। মেহেলী চাপা গলায় গর্জন করে উঠলো, "এই সেঙাই, এই—"

নিথর হয়ে পড়ে রইলো সেঙাই। মাঝে একবার শুধু অপরিসীম ক্লান্ত গলায় আর্তনাদ করে উঠলো সে, "আ-উ-উ-উ—"

হিস্-হিস্ করে উঠলো মেহেলী, "আমি তোকে খাদ থেকে তুলে আনলুম। আর আমার কথাটা শুনতে পাচ্ছিস না শয়তানের বাচ্চা!"

মেহেলীর আলিঙ্গন তীব্র হলো, তারপর তীব্রতর। তার শাণিত নখ আর দাঁতগুলো ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেলতে লাগলো সেঙাইর দেহ।

"আ-উ-উ-উ—"

সমস্ত শরীরটা শিথিল হয়ে গিয়েছে সেঙাইর। পাহাড়ী কুমারী মেহেলী তার দেহের সমস্ত উত্তাপ দিয়ে, তার মনের সমস্ত কামনার আগুন দিয়ে, তার বন্য উত্তেজনা দিয়ে আর ধারালো নখ-দাঁতের আঘাত দিয়েও সেঙাইকে মাতিয়ে তুলতে পারলো না।

জা কুপি মাসের একটা উত্তেজিত রাত্রি মেহেলীর কাছে ব্যর্থ হয়ে গেলো।

এক সময় পাহাড়ের ওপর আলোর অস্পষ্ট আভাস দেখা দিলো। ঘন কুয়াশার আবরণ ভেদ করে ছায়া-ছায়া আলো এসে পড়েছে খাসেম গাছের এই ছোট্ট ঘরখানায়।

সেঙাইর বুকের পাশে সারা রাত বসে ছিলো মেহেলী। এবার ধীরে ধীরে মাথা তুললো সে। প্রথম ভোরের এই ছায়া-ছায়া আলোতে সেঙাইর দিকে তাকিয়ে একটা শিহরণ খেলে গেলো তার চেতনায়। কী ভয়ানক, কী বীভৎস দেখাচ্ছে সেঙাইকে!

একটু পরে আস্তে আস্তে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে নীচে নেমে গেলো মেহেলী।

বারো

দক্ষিণ পাহাড় থেকে এখন কুয়াশা সরে গিয়েছে। উত্তর পাহাড়ের ঘন সবুজ উপত্যকা রোদের আলোতে ঝলমল করছে। কাল রাত্রিতে আকাশ থেকে যে রাশি রাশি তুষারকণা ঝরেছিলো, সূর্যের উত্তাপে টলটলে জলবিন্দুর আকারে তাদের জন্মান্তর হয়েছে।

আর পাহাড়ের চড়াইতে এই ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম সালুয়ালাঙ জেগে উঠেছে। কেসুঙে কেসুঙে নানা মানুষের কলরবে, আউ পাখির চীৎকারে, কুকুর আর মোরগগুলোর অবিশ্রান্ত চেঁচামেচিতে উদ্দাম পাহাড়ী জীবনের পরিচয়।

খাসেম গাছের মগডালে একটি নিঃসঙ্গ কুমারী মেয়ের বিছানা। তার ওপর একটু একটু করে চোখ মেললো সেঙাই। পিঙ্গল দৃষ্টি এখন রক্তলাল। বেশীক্ষণ একসঙ্গে তাকিয়ে থাকতে পারছে না সেঙাই। অপরিসীম ক্লান্তিতে চোখ দুটো আপনা থেকেই বুঁজে আসছে। প্রচণ্ড নেশার পর পেশীগুলো যেমন শ্লথ হয়ে আসে, ঠিক তেমনি এক অবসাদে দেহের গ্রন্থিগুলো যেন বিস্রস্ত হয়ে গিয়েছে।

কিছু সময় নির্জীবের মত পড়ে রইলো সেঙাই। তারপর আবার চোখ মেললো। চোখ মেললো, কিন্তু কিছুই যেন দেখতে পাচ্ছে না। তার দৃষ্টির সামনে পাহাড়ী পৃথিবী আশ্চর্য শূন্য হয়ে গিয়েছে। উপত্যকার ওপর ঐ রোদের রঙ, দক্ষিণ পাহাড়ের সানুদেশে ঐ নিবিড় বন—সব এক তরল ছায়া-লোকের আড়ালে.যেন আবছায়া হয়ে গিয়েছে। মাথার রগগুলো ঝন্‌ঝন্‌ করে ছিঁড়ে পড়ছে। মজ্জায় মজ্জায় এক তীক্ষ্ণ যন্ত্রণা চমক দিয়ে যাচ্ছে।

আরো অনেকটা সময় পার হয়ে গেলো।

এবার চারদিকে একবার চনমন চোখদুটো, ঘুরিয়ে আনলো সেঙাই। পাহাড়ী মাটি থেকে অনেক উর্ধ্বে শূন্যাশ্রয়ী এই ঘর। নীচে বাঁশের পাটাতন, একপাশে গোটাকয়েক রোহি মধু-ভরা বাঁশের পাত্র, স্তূপাকার কার্পাস তুলোর পাঁজ, হরিণ আর মোষের কাঁচা ছাল থেকে উগ্র দুর্গন্ধ—এ ছাড়া ঘরের মধ্যে আর কিছু নেই। আর কেউ নেই।

একসময় নিজের দিকে তাকালো সেঙাই। সারা দেহে রক্ত জমাট হয়ে রয়েছে। থকথকে পাহাড়ী রক্ত হিমে হিমে জমে কালো হয়ে গিয়েছে। কপাল, গলা, বুক—দেহের প্রতিটি প্রত্যঙ্গে ফালা ফালা আঘাতের চিত্র। কোথায়ও বা নখ আর দাঁতের অগভীর ক্ষতরেখা।

নিজের দেহের এই বীভৎস আঘাতগুলোর কথা ভাবছে না সেঙাই। তার চেতনার মধ্যে ধমক দিয়ে যাচ্ছে কালকের হিমাক্ত রাত্রিটা। অস্পষ্ট কতকগুলি ছবি। তাদের ধারাবাহিকতা নেই, অবিচ্ছিন্ন কোন সংহতি নেই। অসম্পূর্ণ কতকগুলো ছবির মিছিল সেঙাইর স্নায়ুর ওপর দোল খেতে খেতে এগিয়ে চলেছে।

সালুয়ালাঙ গ্রাম! তার মোরাঙ! খোন্‌কের বুকের ক্ষতমুখে মেটে রঙের হৃৎপিণ্ড! তামুন্যু! সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার! মোরাঙের দরজায় মশাল ধরে দাঁড়িয়ে ছিলো মেহেলী! এক সময় খোন্‌কেকে পাহাড়ী খাদে ফেলতে এসেছিলো এই গ্রামের কয়েকটি জোয়ান ছেলে। তার আগেই খানিকটা নীচের দিকে নেমে একটা বিশাল পাথরের চাঁই ধরে আশ্রয় নিয়েছিলো সেঙাই। তার পর হিম আর হিম। আগুমি সাপের বিষের মত জা কুলি রাত্রির হিম তার দেহটাকে জর্জরিত করে দিয়েছিলো। অবশ হয়ে গিয়েছিলো চেতনাটা। এক সময় খোন্‌কেকে খাদে ফেলে গিয়েছিলো জোয়ান ছেলে।। খাড়াই পাহাড়ের দেহ বেয়ে বেয়ে, নিবিড় বনের ফাঁক দিয়ে গুমগুম্ শব্দ করতে করতে নীচের দিকে নেমে গিয়েছিলো খোন্‌কের দেহটা। তারপরেই আশ্চর্য হিমে হাতের থাবা শিথিল হয়ে গিয়েছিলো সেঙাইর। অস্পষ্ট চেতনার মধ্যে সে বুঝতে পারছিলো, তার দেহটা শূন্যে পাক খেতে খেতে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে। তারপর আর কিছু মনে নেই সেঙাইর।

কিন্তু এই মুহূর্তে সেঙাইর দুর্বল স্নায়ুগুলো কিছুতেই ধরতে পারছে না, কেমন করে এই অচেনা ঘরের মধ্যে সে চলো এলো? কে তাকে এই নিঃসঙ্গ বিছানায় শুইয়ে দিয়ে গেলো?

সহসা বাঁ দিকে তাকালো সেঙাই। একটা কাঠের পাত্রে একপিণ্ড ভাত, খানিকটা ঝল্‌সানো মাংস আর বাঁশের পানপাত্র ভরে রোহি মধু রয়েছে। তার পিঙ্গল পাহাড়ী চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। মনে পড়লো, কাল দুপুরের পর এক কণা ভাতও তার পেটে পড়ে নি। আর কিছু ভাবনার সময় নেই। পেটের মধ্যে খিদের ময়ালটা এতক্ষণ পাক দিচ্ছিল। তারপর অপরিসীম

অবসাদের জন্য খিদের বোধটা কেমন যেন ভোঁতা হয়ে ছিলো সেঙাইর। এই মুহূর্তে ভাতের পাত্রটা দেখবার সঙ্গে সঙ্গে পেটের মধ্যে সেই ময়ালটা দাপাদাপি শুরু করে দিলো।

বুক হিঁচড়ে হিঁচড়ে পাত্রটার কাছে এলো সেঙাই। ভাতের পিণ্ডটার ওপর এক আস্তর পাহাড়ী পিঁপড়ে জমে রয়েছে। সেদিকে এতটুকু ভ্রূক্ষেপ নেই সেঙাইর। ব্যগ্র একখানা থাবা পাত্রটার দিকে প্রসারিত করে দিলো সেঙাই। তারপর অতিকায় গ্রাসে গ্রাসে ভাতের পিণ্ড, আর ঝল্সানো মাংস নিঃশেষ করে ফেললো। একপাশে বাঁশের পানপাত্রটা পড়ে ছিলো, সেটা তুলে এক ছেদহীন চুমুকে শূন্য করে দিলো সেঙাই।

এখন অবসাদ অনেকটা মুছে গিয়েছে সেঙাইর ইন্দ্রিয়গুলো থেকে। অনেক সুস্থ মনে হচ্ছে নিজেকে। ভাত, মাংস আর রোহি মধু থেকে প্রাণকণা নিয়ে নিয়ে শরীরটা রীতিমত চাঙ্গা হয়ে উঠলো সেঙাইর। এতক্ষণ শুয়ে ছিলো সেঙাই, এবার বাঁশের পাটাতনের ওপর উঠে বসলো।

কিছুটা সময় পার হলো। একসময় নীচের দরজার কাছে এসে মুখখানা বকের মত বাড়িয়ে দিলো সেঙাই। অপরিচিত গ্রাম। টিলায় টিলায়, পাহাড়ের ভাঁজে ভাঁজে অজানা মানুষের জটলা। যুবতী মেয়েরা সরু বাঁশের ফ্যাফ্যা দিয়ে তুলো পিঁজছে। কেউ কেউ ম্যু দিয়ে দড়ির লেপ বুনছে। আরো দূরে মেয়ে-পুরুষরা একসঙ্গে বেতের ত্রিকোণ আখুত্সা (চাল রাখার ঝোড়া) বানাচ্ছে। নারী-পুরুষের যৌথ পরিশ্রমে এই আদিম পাহাড়ী গ্রাম একটু একটু করে নিজের সংসার রচনা করে চলেছে। কেউ কেউ পাথরের ওপর বর্শার ফলা শানিয়ে নিচ্ছে। এই প্রতিকূল প্রকৃতি। হিংস্র চিতা কি বুনো মোষ, হিংস্রতর প্রতিবেশী গ্রাম—তাদের সঙ্গে সহবাস। অতএব, ধারালো বর্শার চেয়ে নিবিড় অন্তরঙ্গতা আর কার সঙ্গে সম্ভব! রোদের আলোতে ঝকমক করে উঠছে বর্শার ফলাগুলো।

গাছের ওপর ছোট্ট ঘরখানায় নিশ্চুপ বসে রইলো সেঙাই। একটি মানুষও তার পরিচিত নয়। এই অজানা গ্রামে এখন নামা ঠিক নিরাপদ হবে না। ঐ বর্শার ফলাগুলো তা হলে চৌফালা করে ফেলবে তাকে। আগে রাত্রি নামুক, তারপর দেখা যাবে। অন্ধকারের সাহায্য ছাড়া এই পাহাড়ী গ্রামে নেমে আসা কোনমতেই সম্ভব নয়। চারপাশে মৃত্যু ওত পেতে রয়েছে। ভাবতেও পাহাড়ী জোয়ান সেঙাইর মেরুদণ্ড বেয়ে হিমধারা নামতে শুরু করলো।

বাঁশের মাচানের ওপর শুয়ে ছিলো সেঙাই।

দূর থেকে মোষ-বলির বাজনা ভেসে আসছে। মেথিকেকোয়েনঘ্য খুলির গম্ভীর শব্দ উপত্যকার ওপর দিয়ে ছড়িয়ে ছড়িয়ে পড়ছে। দ্রাম-ম্-ম্-ম্-ম্। সেই সঙ্গে খুঙের ভয়ঙ্কর আওয়াজ। বাজনার শব্দে নেশা ধরে গেলো সেঙাইর। বন্দী শ্বাপদের মত গর্জন করে উঠতে চাইলো সেঙাই। কিন্তু না, এই অচেনা গ্রামের মানুষগুলো একবার টের পেলে আর রেহাই থাকবে না। অতএব, বুকের মধ্যে নিরুপায় গর্জনটাকে স্তব্ধ করে দিতে হলো সেঙাইর।

এখন সবে মাত্র দুপুর। সন্ধ্যা পর্যন্ত ঘরের মধ্যে আটকে থাকতে হবে তাকে। অসহায় আক্রোশে ফুলতে লাগলো সেঙাই।

অচমকা বাঁশের সিঁড়িতে শব্দ উঠলো। আর সেই শব্দটা পাহাড়ী গ্রামের মাটি থেকে ঘরের দিকে উঠে আসছে। চমকে উঠলো সেঙাই, তারপর দ্রুত নীচের ফাঁকটার কাছে চলে এলো।

বাঁশের সিঁড়িটা সরাসরি পাটাতন ভেদ করে ওপরে উঠে এসেছে। সেই সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ঘরের মধ্যে চলে এলো মেহেলী।

পদশব্দে চমকে উঠেছিলো সেঙাই। মেহেলীকে দেখে বিচিত্র বিস্ময়ে পিঙ্গল চোখ দুটো ভরে গেলো তার। নির্নিমেষ মেহেলীর দিকে তাকিয়েই রইলো সে।

মেহেলী বললো, "কী রে, উঠে পড়েছিস দেখছি—"

সেঙাইর দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতেই দপ করে চোখ দুটো জ্বলে উঠলো মেহেলীর। সহসা সাঁ করে ঘরের এক কোণ থেকে লোহার একটা মেরিকেত্সু তুলে এনে তাক করলে সে।

মাথার ওপর উদ্যত মেরিকেত্সু। আর পাহাড়ী মেয়ের দু চোখে নিশ্চিত ঘাতনের ঝিলিক। অসহায় করুণ হয়ে এলো সেঙাইর দৃষ্টি। আর্ত গলায় সে বললো, "আমাকে মারিস নি মেহেলী, কাল রাত্তিরে খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলাম। এই দেখ, মাথা-হাত-পা কেটে ফালা-ফালা হয়ে গেছে।"

উবু হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো মেহেলী। এবার লোহার মেরিকেত্সুটা বাঁশের পাটাতনের ওপর নামিয়ে সেঙাইর পাশে এসে বসলো সে।

সেঙাইর দৃষ্টি থেকে তখনো বিস্ময়ের চমকটা একেবারে মুছে যায় নি। ফিসফিস গলায় সে বললো, "তুই এখানে কী করে এলি মেহেলী!"

"বাঃ, বেশ বললি তো! আমাদের বস্তিতে আমি থাকবো না!" খিলখিল করে একটা অবাধ জলপ্রপাতের মত হেসে উঠলো মেহেলী।

"আমি এখানে এলাম কী করে ?"

"আমার পিঠে চেপে এসেছিস। খাদের বন থেকে আমি তুলে নিয়ে এসেছি তোকে।"

কৃতজ্ঞতায় পিঙ্গল চোখ দুটো কোমল হয়ে এলো সেঙাইর। গলাটা কেমন যেন মন্থর শোনাচ্ছে তার, "তুই না তুলে আনলে আমি মরেই যেতাম মেহেলী। তুই আমাকে বাঁচিয়েছিস।" সেঙাইর দৃষ্টিটা মেহেলীর মুখের ওপর এখনও নিষ্পলক হয়ে রয়েছে।

হাসির জলপ্রপাত এবার উদ্দাম হয়ে উঠলো মেহেলীর, "বাঁচাবার জন্যে তোকে তুলে আনি নি সেঙাই। ভালো করে মারার জন্যে তোকে এনেছি। তুই আমার দাদাকে মেরেছিস। তার শোধ তুলবো না? সন্ধ্যের সময় মোরাঙের সামনে তোকে বলি দেওয়া হবে। এখুনি গিয়ে জোয়ান ছেলেদের ডেকে আনবো।"

"মেহেলী!" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো সেঙাই।

"কী বলছিস ?" পাহাড়ী মেয়ের সারা মুখে তীব্র রেখায় একটা ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো।

"সেদিন আমাদের বস্তিতে তুই গিয়েছিলি। সেদিন আমিও তোকে মারতে পারতাম। কিন্তু মারি নি। আজ আমাকে বাঁচা তুই।" কেলুরি গ্রামের পাহাড়ী যৌবনকে বড় অসহায় দেখাচ্ছে এই মুহূর্তে। সেঙাইর কান্নাকে একটু একটু করে উপভোগ করলো মেহেলী।

"তুই আমার দাদাকে মেরেছিস! তার কী হবে ?"

"তোর দাদা কে ?" চমকে উঠলো সেঙাই।

"খোন্‌কে। খোন্‌কেকে ওরা কাল খাদে ফেলে দিয়েছিলো আনিজার ভয়ে। দাদাকে খুঁজতে খাদে নেমেছিলাম। অন্ধকারে ভুল হলো। দাদার বদলে আমার পিঠে চড়ে তুই এলি।" একটু থামলো মেহেলী, তারপর বললো, "সারা সকাল ধরে দাদাকে কত খুঁজে এলাম। খাদের কোথায়ও তাকে পেলাম না। হয়তো বাঘেরা তাকে খেয়ে ফেলেছে।"

পাহাড়ী মেয়ে মেহেলীর সমস্ত মুখখানা বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। দুটি কপিশ চোখের মণি চৌচির করে কয়েক বিন্দু লবণাক্ত জলের আভাসও ফুটে বেরুলো। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরেই গর্জে উঠলো মেহেলী, "তুই এই বস্তিতে এসেছিলি কী করতে? মরতে? জানিস সবাই জেনে ফেলেছে,

তুই আমার দাদাকে মেরেছিস। আমাদের বস্তির ছোকরারা তোকে পেলে একেবারে কিমা বানিয়ে ছাড়বে।"

"কে বলেছে আমি খোন্‌কেকে মেরেছি?" বিবর্ণ গলায় প্রশ্নটা চমকে উঠলো সেঙাইর।

"সালুনারু। তোদের বস্তির রেঙকিলানের বউ। সে সব বলে দিয়েছে আমাদের সর্দারের কাছে।"

দুর্বল স্মৃতির ওপর কালকের সন্ধ্যাটা ছায়াপাত করলো সেঙাইর। পাহাড়ের একটা ভাঁজ থেকে সে দেখেছিলো সালুনারুকে। অগ্নিমুখ একটা মশাল নিয়ে সালুনারু অনেক দূরের কেসুঙগুলোর আড়ালে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো কাল।

শিথিল গলায় সেঙাই বললো, "হু-হু, সালুনারু তবে তোদের বস্তিতে এসে আস্তানা গেড়েছে। আমাদের বস্তি থেকে পালিয়ে এসেছে টেফঙের বাচ্চাটা। সর্দার ওকে পেলে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবে একেবারে। জানিস, কী শয়তানী ছুই সালুনারু!"

"কী করেছিল সালুনারু?"

"যেদিন তোর দাদা খোন্‌কেকে আমি বর্শা দিয়ে ফুঁড়েছিলুম, সেদিন রাত্তিরে রেঙকিলান তো রেন্‌জু আনিজার রাগে পাহাড় থেকে পড়ে মরলো। এক তাজ্জবের ব্যাপার সেটা। আমি, রেঙকিলান, ওঙলে আর পিঙলেই তো বস্তিতে ফিরে যাচ্ছি। আচমকা সালুনারুর মত গলায় কে যেন ডাকলো। আর তাই শুনে রেঙকিলান বাইরের পাহাড়ের দিকে চলে গেলো।"

"তারপর?" মেহেলীর চোখেমুখে রুদ্ধশ্বাস কৌতূহল।

"সকালবেলা সালুনারু এলো রেঙকিলানের খোঁজে। সে নাকি আগের রাত্তিরে রেঙকিলানকে ডাকে নি বাইরের পাহাড় থেকে। বস্তির জোয়ানরা সকলে মিলে সর্দারের সঙ্গে খুঁজতে বেরুলাম, তারপর দক্ষিণ পাহাড়ের খাদের মধ্যে দেখলাম, রেঙকিলান মরে পড়ে রয়েছে।"

"শেষে কী হলো?"

"কী আবার হবে? আমাদের সর্দারের সঙ্গে বচসা করলে সালুনারু, রেনজু আনিজাকে গালাগালি দিলো। তারপর সর্দার যেই বর্শা দিয়ে ফুঁড়তে উঠলো, সে বনের মধ্যে পালিয়ে গেলো।"

"কী সর্বনাশ! রেন্‌জু আনিজাকে গালাগালি দিলো সালুনারু!" বিস্ময়ে আতঙ্কে শিউরে উঠলো পাহাড়ী মেয়ে মেহেলী।

দূরের কোন একটা কেসুঙ থেকে মোষ বলির বাজনা ভেসে আসছে। গম্ভীর আর ভয়ঙ্কর শব্দ তরঙ্গিত হয়ে যাচ্ছে এই নগণ্য পাহাড়ী জনপদটুকুর ওপর দিয়ে।

ওপরে আতামারী পাতার চাল। তার ফাঁক দিয়ে দুপুরের রোদ এসে পড়েছে ঘরখানায়। মোহন রোদ। জা কুলি মাসের সূর্য বড় সুস্বাদু, বড় মনোরম।

সহসা গাছের ওপরে আদিম এই গৃহকোণ থেকে সব কথারা হারিয়ে গেলো। সেঙাই তাকালো মেহেলীর দিকে। মেহেলী তারই দিকে অপলক তাকিয়ে রয়েছে। সেঙাই আর মেহেলী। টিজু নদীর এপার আর ওপার পোকরি আর জোহেরি বংশের দুই বন্য যৌবন মুখোমুখি হয়েছে। সালুয়ালাং আর কেলুরি গ্রামের দুই শত্রুপক্ষ দুজনের সারা দেহে সঙ্কেতময় কোন আরণ্যক ভাষা সন্ধান করে বেড়াচ্ছে।

মেহেলী এক সময় বললো, "কাল সারারাত তোর পাশে আমি বসে ছিলাম সেঙাই। আঁচড়েছি, কামড়েছি তবু তোর কোন সাড়া পাই নি।"

"কাল কি আমার জ্ঞান ছিলো? কত ওপর থেকে খাদে পড়ে গেছিলাম তুই না থাকলে কি আমি বাঁচতাম! এই ছাখ্, গায়ে চাপ চাপ রক্ত জমে রয়েছে। বস্তিতে ফিরে একেবারে তামুন্যুর (চিকিৎসক) কাছে যেতে হবে।"

"আমাদের বস্তির তামুন্যুর কাছ থেকে ওষুধ এনে দেবো তোকে। ঠিক সন্ধ্যের পর।"

একটু সময়ের বিরতি। তারপর আবার মেহেলী বললো, "তুই দাদাকে মারলি কেন বল তো?"

"আমার ঠাকুরদাকে তোদের বস্তির লোকেরা মেরেছিলো! তার শোধ নেবো না?" দুটো চোখ ধক্‌ধক্ করে জ্বলে উঠলো সেঙাইর।

"হু-হু। সেই জন্যে বুঝি খোন্‌কেকে মারলি? বেশ, শোধবোধ হয়ে গেল।"

"হু-হু, শোধবোধ হলো।"

"আচ্ছা সেঙাই, আমি শুনেছি, তোদের আর আমাদের এই দুটো বস্তি মিলিয়ে একটা বস্তি ছিলো অনেক কাল আগে। তার নাম কুরগুলাঙ। টিজু নদীর দুধারের লোকদের মধ্যে খুব খাতির ছিলো, পিরীত ছিলো।"

"আমিও তাই শুনেছি। আমাদের খাপেগা সদ্দার মোরাঙে বসে সে সব গল্প বলেছিলো।"

মেহেলী বললো। তার কণ্ঠ আশ্চর্য কোমল শোনাচ্ছে, "আচ্ছা, আমাদের বস্তির লোক তোর ঠাকুরদার মুণ্ডু কেটেছিলো। তুইও আমার দাদাকে মারলি। শোধবোধ হয়ে গেলো। এবার দু বস্তিতে আবার পিরীত হতে পারে না? বেশ হয় তা হলে। তোদের দুই ঝরনার জলে চান করতে যেতে আমার এত ভালো লাগে!"

"পিরীত হলে তো ভালোই হয়। কিন্তু ঠাকুরদার খুনের শোধ আর নিতে পারলুম কই? খোন্‌কের মুণ্ডুটা তো আর কেটে নিয়ে যেতে পারি নি। অথচ তোরা আমার ঠাকুরদার মাথাটা কেটে এনেছিলি সেদিন।" অত্যন্ত বন্য হয়ে এলো সেঙাইর চোখ দুটো। সারা মুখে চাপ-চাপ রক্ত। এই মুহূর্তে অত্যন্ত বীভৎস দেখাচ্ছে তাকে।

ধূসর অতীতের স্মৃতি নিয়ে দুটি পাহাড়ী যৌবন কখনও কোমল, কখনও ভয়াল, কখনও আবার স্বপ্নাতুর কখনও নির্মম হয়ে উঠতে লাগলো।

আবোলতাবোল কথার তুফান উঠলো এক সময়। কোন পারম্পর্য নেই, কোন সঙ্গতি নেই, সুষ্ঠু কোন ধারাবাহিকতা নেই কথাগুলোর মধ্যে। এক প্রসঙ্গ থেকে অন্য প্রসঙ্গে চকিতে সরে সরে আসতে লাগলো সেঙাই আর মেহেলী।

বাইরে মোষ বলির বাজনা উদ্দাম হয়ে উঠেছে। দ্রাম্-ম্-ম্-ম্—। দ্রাম্-ম্-ম্-ম্। চরম মুহূর্ত বোধ হয় উপস্থিত হয়েছে। অতিকায় একটা কালো জানোয়ারের দেহ থেকে এই মুহূর্তেই বিশাল মাথাটা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। টকটকে তাজা রক্তে লাল হয়ে যাবে পাহাড়ী গ্রামের মাটি।

মেহেলী বললো, "আমাদের এই সালুয়ালাঙ বস্তিতে কেন এসেছিলি, বললি না তো সেঙাই?"

"তোর খোঁজে। আমাদের ঝরনায় আজকাল আর যাস না কেন?" সরাসরি দৃষ্টিতে তাকালো সেঙাই।

"সদ্দার যেতে বারণ করে দিয়েছে।"

সহসা নীচের মাটি থেকে একটি নারীকণ্ঠ ভেসে এলো গাছের ওপরের এই ঘরখানায়, "মেহেলী, এই মেহেলী। কী করছিস ঘরে?"

নীচে বাঁশের পাটাতন-কাটা দরজা। সেখান দিয়ে মুখটা বাড়িয়ে দিলো

মেহেলী, "কী আবার করবো ? এই যাচ্ছি রে পলিঙা। দাঁড়া, দাঁড়া একটু। এখুনি যাচ্ছি।"

থাসেম গাছটার এলোমেলো শিকড়গুলির কাছে দাঁড়িয়ে আছে এক কুমারী মেয়ে। পলিঙা। সে আবারও বললো, "কাটিরি কেম্বুঙে মোষ বলি হয়েছে। দেখবি আয়। মাংস আনতে যাবি না ?"

"যাবো।" মুখখানা ঘরের মধ্যে এনে সেঙাইর দিকে তাকালো মেহেলী, "এবার যাই। সন্ধ্যের সময় আবার খাবার আর রোহি মধু নিয়ে আসবো। তামুন্যার কাছ থেকে ওষুধও নিয়ে আসবো তোর ঘায়ে লাগিয়ে দেবার জন্যে।"

সেঙাই বললো, "সন্ধ্যের সময় আমি চলে যাবো। অন্ধকার না আসা পর্যন্ত এখানেই থাকতে হবে। তোদের বস্তির লোকদের কাছে আমার কথা বলিস না মেহেলী।" কাতর আর্তি ফুটলো সেঙাইর গলায়।

"অতি সহজে যেতে হবে না এই বস্তি থেকে। দুই খাদ থেকে পিঠে করে এনেছি, সারা রাত তুলো গরম করে সেঁকে সেঁকে তোকে বাঁচিয়েছি। সে কি মাগ্‌না ? যতদিন আমার খুশি, যতদিন আমার আশা না মিটবে ততদিন এই ঘরেই আটকে থাকতে হবে তোর। দাদাকে সাবাড় করেছিস, তার বদলে একটু একটু করে তোকে খুন করবো আমি। সারা জীবন তোকে এই ঘরে আটকে রাখবো।" পাহাড়ী মেয়ে মেহেলী অপরূপ রহস্যময়ী হয়ে উঠলো। আউ পাখির মত একবার ঘাড় বাঁকিয়ে তাকালো সে। তারপর বাঁশের সিঁড়িটার দিকে পা বাড়িয়ে দিলো। নীচের মাটিতে তারই জন্য অপেক্ষা করছে পলিঙা।

কাটিরি কেম্বুঙে মোষের মাংস আনতে যাবে তারা।

তেরো

কাল রাত্তিরে টিজু নদীর কিনারায় অনেকক্ষণ পর্যন্ত বসে ছিলো ওঙলেরা। আকাশের এক কোণে আনিজা উইখু (ছায়াপথ) বিবর্ণ রেখায় ফুটে ছিলো। ছড়িয়ে ছড়িয়ে কয়েকটা তারা নিস্তেজ আলো দিচ্ছিলো। আর টিজু নদীর পারে নিবিড় বনের মধ্যে গোটাকয়েক রক্তচোখ মশাল দপদপ করে জ্বলছিলো।

এক সময় ওঙলে বলেছিলো, "কী করা যায় বল দিকি? দুই দিক থেকে তো কোন আওয়াজ পাচ্ছি না।"

'হু-হু, তাই তো।" সকলেই মাথা নাড়লো।

"সেঙাই দুই দিকেই যে গেছে, তার ঠিকই বা কী?" ওঙলে আবারও বলেছিলো।

"হু-হু, ঠিক বলেছিস।" অজস্র জোয়ান গলায় একই সমর্থন।

পিঙলেই বললো, "নির্ঘাত দুই দিকেই গেছে। সেঙাই সেই যে মেহেলীর কথা বলতো! মনে আছে তো তোদের? মেহেলী তো সালুয়ালাঙ বস্তির মেয়ে। তার তল্লাসেই দুই বস্তিতে গেছে সেঙাই। হু-হু।"

"হু-হু, খুব পিরীত করে সেঙাই, মেহেলী হলো তার পিরীতের মাগী।" এবার সরব হয়ে উঠেছিলো আর একটি জোয়ান ছেলে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। পেন্থ্য কাঠের মশাল শুধু দপদপ করে জ্বলছিলো। জা কুলি মাসের রাত্রি ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে। হিমের দাঁত কেটে কেটে বসেছে অনাবৃত দেহগুলোর ওপর। মশালের অগ্নিবিন্দুর চারপাশে সাদা সাদা ঘন কুয়াশা ঘনতর হয়েছে।

কে যেন বললো, "বড় শীত ওঙলে, কী করা যায় এবার? আর এখানে বসে থাকা যাবে না। নির্ঘাত মরে যাবো।"

ওঙলে বলেছিলো, "তাই তো! সালুয়ালাঙ বস্তিটাও তো মড়ার মত পড়ে রয়েছে। সেঙাইর মাথা বর্শা দিয়ে গেঁথে নিয়ে যেতে পারলে এতক্ষণ হল্লা করে পাহাড় ফাটিয়ে ফেলতো দুই শয়তানের বাচ্চারা।"

"হু-হু—" সকলেই গোলাকার কামানো মাথা ঝাঁকিয়েছিলো।

ওঙলে আবারও বলতে শুরু করেছিলো, "এক কাজ করি আয়, আমরা হল্লা শুরু করে দি। যদি সত্যি সত্যি সেঙাইর মাথা নিয়ে থাকে, ঠিক সাড়া দেবে সালুয়ালাঙের রামখোরা।"

"হু-হু—"

একটু পরেই টিজু নদীর নীল ধারাকে চমকে দিয়ে অনেকগুলো পাহাড়ী জোয়ানের গলায় গর্জন উঠেছিলো। সে গর্জনে শিউরে উঠেছিলো আকাশের আনিজা উইখু।

"হো—ও—ও—ও—য়া—আ—আ—"

"হো—ও—ও—ও—য়া—আ—আ—"

একসময় গর্জনের রেশ থেমে গেলো। টিজু নদীর কিনারায় অনেকগুলো পাহাড়ী জোয়ান উৎকর্ণ হয়ে রইলো। তাদের এই হুঙ্কারের প্রতিধ্বনি নদীর ওপারে অনেক গলায় বেজে ওঠে কি না? এই গর্জনের জবাব দেয় কি না ওপারের পাহাড়ী জনপদ সালুয়ালাঙ?

কিন্তু, নাঃ। তাদের এই আদিম আহ্বানের উত্তর ভেসে এলো না এপারে। সালুয়ালাঙ বস্তিটা একেবারেই নিষ্প্রাণ হয়ে রয়েছে যেন।

অনেকক্ষণ পরে ওঙলে বলেছিলো, "তাই তো! ওপারে সেঙাই যায় নি বলেই মনে হচ্ছে। তবে সে গেলো কোথায়? কী বলিস তোরা? যাবি না কি সালুয়ালাঙ বস্তিতে?"

ওঙলের প্রশ্নমালার জবাব দেবার আগেই কয়েকটা গলায় আনন্দিত শব্দ উঠেছিলো, "চিতাবাঘ, হুই যে চিতাবাঘ—"

জোয়ান মানুষগুলোর কৌতূহল চোখের পিঙ্গল মণিতে এসে ঘন হয়েছে। সামনে, ঠিক টিজু নদীর মাঝামাঝি একটা কালো পাথরের ওপর দাঁড়িয়ে রয়েছে চিতাবাঘটা। দু চোখের তরল আগুন ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দু পাশের উপত্যকার ওপর ফেলছিলো সে। নিরাপদ শান্তিতে এই জা কুলি মাসের হিমাক্ত রাত্তিরে সে বেরিয়ে এসেছিলো গুহার কবোষ্ণ আরাম ছেড়ে। মসৃণ আর উত্তপ্ত একটি ঘুমের অতল তলায় ডুবে যাবার আসক্তি তার হয়তো নেই।

পরম আরামে চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে একবার মৃদু গর্জন করে উঠেছিলো চিতাবাঘটা, "হো—উ—উ—ম্—ম্—ম্"

ওঙলে বললো। তার গলাটা জা কুলি রাত্রির ভৌতিক অন্ধকারে আশ্চর্য ফিসফিস শুনিয়েছিলো, "তোরা সব বোস্। আমি আর পিঙলেই যাচ্ছি।

বর্শা দিয়ে চিতাবাঘটাকে ফুঁড়ে আনবো। তারপর মশালের আগুনে ঝল্‌সে খাওয়া যাবে। বড় খিদে পেয়ে গেছে। খবদ্দার, হল্লা করবি না কেউ।"

ওঙলে আর পিঙলেই ধীরে ধীরে পাহাড়ের উতরাই বেয়ে টিজু নদীর দিকে নেমে গিয়েছিলো। আর খানিকটা উঁচুতে রাশি রাশি খাসেম বনের মধ্যে কয়েকটা রক্তবিন্দুর মত জ্বলছিলো পেন্যু কাঠের মশালগুলো। আর সেই রক্ত-বিন্দুগুলো ঘিরে ঘন হয়ে বসে ছিলো কেলুরি গ্রামের জোয়ান ছেলেরা। জা কুলি মাসের সেই সন্ধ্যা রাত্রি ভয়ানক হয়ে উঠতে শুরু করেছিলো।

একসময় থমকে দাঁড়ালো পিঙলেই আর ওঙলে। এখান থেকে বর্শার সীমানায় পাওয়া যাচ্ছে চিতাবাঘটাকে।

বাতাসের মত অস্পষ্ট শুনিয়েছিলো ওঙলের গলা, "এখানে দাঁড়া পিঙলেই। আমি আগে তাক করি। তারপর তুই বর্শা ছুঁড়বি।"

একটি মাত্র মুহূর্ত। সাঁ করে ওঙলের থাবা থেকে উল্কার মত ছুটে গিয়েছিলো বর্শাটা। অব্যর্থ লক্ষ্য। কোমরের ঠিক ওপরে গিয়ে এক হাত লম্বা ফলাটা গিঁথে গিয়েছিলো। টিজু নদীকে শিউরে দিয়ে হুঙ্কার ছেড়েছিলো চিতাবাঘটা, "হো—উ—উ—ম্—ম্—"

এবার পিঙলেইর থাবায় বর্শাটা আকাশের দিকে উঠে গিয়েছিলো। কিন্তু তার আগেই চিতাবাঘের গলার সঙ্গে মিলিয়ে একটি মানবিক কণ্ঠ শোনা গেলো। মৃত্যুর যন্ত্রণায় সে কণ্ঠ এই বনভূমি, জা কুলি মাসের এই রহস্যময় রাত্রিকে চৌচির করে আর্তনাদ করে উঠেছিলো, "আ—উ—উ—উ—"

"হো—উ—উ—ম্—ম্—" তারপর টিজু নদীর ওপারে নিবিড়-বন উপত্যকার মধ্যে চিতাবাঘটা অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো। তার সঙ্গে সঙ্গে একটা মানবিক গলার আর্তনাদও মিলিয়ে গিয়েছিলো।

পিঙলেইর থাবাটা স্থির হয়ে ছিলো আকাশের দিকে। আর একেবারে শিলীভূত হয়ে গিয়েছিলো ওঙলে। দুজনে এতটুকু নড়ছে না, এতটুকু কাঁপছে না। দু জোড়া চোখ শুধু নিষ্পলক হয়ে টিজু নদীর ওপারে তাকিয়ে ছিলো।

"হো—উ—উ—ম্—ম্—"

"আ—উ—উ—উ—"

একটি হিংস্র শ্বাপদের আর একটি মানুষের আর্তনাদ ওপারের উপত্যকায় এক সময় ক্ষীণ হতে হতে মিলিয়ে গিয়েছিলো।

ভয়ে আতঙ্কে এতক্ষণ শিলীভূত হয়ে ছিলো দুজনে।

এবার ওঙলে বললো, তার গলায় বিভীষিকা কেঁপে উঠলো, "টেম্নি খামকোয়াম্ন্যু (বাঘ-মানুষ)। ও নির্ঘাত বাঘ-মানুষ! শিগ্গীর চল্। চিতাবাঘ চালান করলে একেবারে সাবাড় হয়ে যাবো সব।"

"হু-হু—" শিহরিত গলায় দুটি শব্দ ফুটে বেরিয়েছিলো পেঙলেইর।

তারপর সমস্ত শরীর থেকে সব নিষ্ক্রিয়তা ঝরে গিয়েছিলো ওঙলে আর পিঙলেইর। টিজু নদীর কিনারা থেকে দুর্বার বেগে ওপরের চড়াইতে দৌড়ে চলে এসেছিলো দুজনে। পেছন দিকে আর একবারও তাকায় নি কেউ। বার বার তাদের মনে হয়েছে, ঝাঁকে ঝাঁকে চিতাবাঘ দিগ্‌দিগন্ত থেকে থাবা মেলে, জিভ মেলে সাঁ সাঁ করে ছুটে আসছে। আর উপায় নেই, আর রেহাই নেই। বাঘ-মানুষের ক্রোধে তাদের দুজনের কেউ রক্ষা পাবে না। তারা কি জানতো, ঐ চিতাবাঘের কটুস্বাদ মাংসের পেছনে একটা বাঘ-মানুষের ভয়ঙ্কর উপস্থিতি রয়েছে!

তীরের মত ছুটতে ছুটতে পেন্ম্যু কাঠের মশালগুলোর কাছে এসে পড়েছিলো দুজনে। জা কুলি মাসের এই হিম-ঝর-ঝর রাত্রিতে দুজনের দেহ বেয়ে বেয়ে দরধারায় ঘাম ঝরছিল। বড় বড় দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাঁফাতে শুরু করেছিল ওঙলে আর পিঙলেই।

পেন্ম্যু কাঠের মশালের চারপাশে জোয়ান ছেলেরা অসহ্য শীতে কুঁকড়ে গিয়েছিলো। হিমের অবিরাম আঘাত থেকে নিজেদের দেহগুলো বাঁচাবার জন্য কুণ্ডলী পাকিয়ে ছিলো। তারপর পরস্পরের গায়ে গায়ে ঘষে খানিকটা উত্তাপ সৃষ্টি করে নিচ্ছিলো।

চমকে জোয়ান ছেলেরা তাকালো ওঙলে আর পিঙলেইর দিকে, "কী রে? কী ব্যাপার? চিতাটা কই?"

গলা থেকে আতঙ্ক ঠিকরে বেরিয়ে আসছিলো ওঙলের, "শিগ্‌গির উঠে পড়। বাঘ-মানুষ! হুই চিতাটার পেছনে রয়েছে। চল্, চল্। বস্তির দিকে ভেগে পড়ি—"

"বাঘ মানুষ!" একটা ভীত আর সন্ত্রস্ত কোলাহল ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়লো জোয়ানগুলোর মধ্যে। ছিলাকাটা ধনুকের মত সাঁ করে উঠে দাঁড়ালো সকলে। পাহাড়ী মাটির গর্তে পেন্ম্যু কাঠের মশাল পুঁতে রাখা হয়েছিলো। পট্-পট্ করে সেগুলো তুলে ফেললো তারা।

ওঙলে বলেছিলো, "বস্তির দিকে পালাই চল্। হুই বাঘ-মানুষ যদি বাঘ চালান করে দেয়, তাহলে নির্ঘাত সাবাড় হয়ে যাবো। চল্ চল্—দৌড়ো, দৌড়ো—"

অসহ্য এক জীবনের তাড়নায় জোয়ান মানুষগুলো খাড়া চড়াইয়ের দিকে উঠতে লাগলো। সাঁ-সাঁ করে পেন্যু কাঠের মশালগুলো ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

কে যেন বলেছিলো, "সেঙাই যে রইলো, তাকে খুঁজে বার করতে হবে না? সেঙাইর কথা সদ্দারকে কী বলবি, কী রে ওঙলে?"

"থাম শয়তানের বাচ্চা, আগে বাঘ-মানুষের হাত থেকে জান বাঁচা। তার পর সেঙাইর কথা ভাবিস।"

আর-একটি গলা ফুটে বেরিয়েছিলো, "এ নির্ঘাত হুই নানকোয়া বস্তির মেজিচিজুঙ। এই পশ্চিম, উত্তর আর দক্ষিণ পাহাড়ের বনে ওর অনেক বাঘ পোষা রয়েছে। রাত্তিরে বাঘ নিয়ে সে বেরোয় ইদিক-সিদিক—"

পাহাড়ী বনের মধ্য দিয়ে প্রচণ্ড একটা ঝড় কেলুরি গ্রামের দিকে চলে গিয়েছিলো। জোয়ান ছেলেরা রুদ্ধশ্বাসে চড়াই-উতরাই পেরিয়ে পেরিয়ে যাচ্ছিলো।

একেবারে মোরাঙের কাছে এসে থেমেছিলো সে দৌড়। দৌড় থামিয়ে রীতিমত হাঁফাতে শুরু করেছিলো পাহাড়ী জোয়ানেরা।

মোরাঙের চারপাশে গোল করে ঘিরে রয়েছে গ্রামের মেয়ে-পুরুষ। পুরুষদের মধ্যে কেউ কেউ মোরাঙের মধ্যে চলে এসেছিলো। বিশাল পাথর-খানার ওপর দাঁড়িয়ে ক্ষ্যাপা মোষের মত ফোঁসফোঁস করছে বুড়ো খাপেগা, "সিজিটোর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে দিতে হবে। এত বড় পাপ চলবে না এই বস্তিতে। হু-হু, সিধে কথা।"

বুড়ো খাপেগার পাশে অতিকায় একটা বর্শা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারুয়ামারু। তার চোখ দুটো দপদপ জ্বলছে। এই মুহূর্তে সে হত্যা পর্যন্ত করতে পারে, সে পারে একটা বাঘের মত গর্জন করে ঝাঁপিয়ে পড়তে।

ওঙলেরা মোরাঙের মধ্যে এসে ঢুকলো; "কী ব্যাপার সদ্দার?"

"কী আবার? সিজিটো হুই সারুয়ামারুর বউ জামাতসুর ইজ্জত নিয়েছে। শয়তানটাকে জানে মেরে ফেলে দেবো একেবারে।"

"হু-হু। আমি মোরাঙে এসেছিলাম, সেই ফাঁকে হুই শয়তান সিজিটোটা আমার কেসুঙে হাজির হয়েছে। আমি ঘরে ঢুকে হাতেনাতে ধরেছি। তা আমাকে ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়ে হুই পাহাড়ের দিকে পালিয়ে গেলো সিজিটো শয়তানটা। একেবারে কলিজা ফেঁড়ে রক্ত নিয়ে আনিজাকে দেবো না! ইজাহান্টসা সালো—" হাতের থাবায় বিশাল বর্শাটায় ঝাঁকানি দিয়ে, রক্তচোখ দুটোকে আরো দপদপ করে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো সারুয়ামারু।

মোরাঙের বাইরে আকাশ-ফাটানো কোলাহল উঠছে। ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ কেলুরির সমস্ত মানুষ সমস্বরে চিৎকার করে চলেছে। সে চিৎকারের ছেদ নেই। বিরতি নেই।

ওঙলে বললো, "জামাতসু আর সিজিটো কোথায় ?"

সারুয়ামারু বন্য গলায় চেঁচিয়ে উঠেছিলো, "বললুম তো, সিজিটো হুই বাইরের পাহাড়ের দিকে পালিয়েছে। আর জামাতসুকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে রেখে দিয়েছি। আহে ভু টেলো।" কদর্য গালাগালিতে জা কুলি মাসের রাত্রিটাকে বীভৎস করে তুললো সারুয়ামারু, "সিজিটোর ঘরবাড়ি পুড়িয়ে তবে এবার ছাড়বো। রামখোটাকে পেলে বর্শা দিয়ে ফুঁড়বো।"

মোরাঙের বাইরে দাঁড়িয়ে সিজিটোর মা বুড়ী বেঙসানুও সমানে গর্জন করে চলেছে। বিধ্বস্ত দাঁতগুলোতে কড়মড় বাজনা তুলে সে বলছে, "ইজা রামখো। আমার আবার জানতে বাকী আছে। হুই সারুয়ামারুর বউ হুই জামাতসু মাগীর কথা বস্তির কে না জানতো! শয়তানীর সঙ্গে সব জোয়ানের পিরীত। যত দোষ হলো সেঙাইর বাপের! হুই সব চালাকি চলবে না। আপোটিয়া!"

সাঁ করে মোরাঙের মধ্য থেকে বেরিয়ে এলো সারুয়ামারু, "চুপ কর বুড়ী মাগী। বেশি বকরবকর করবি তো একেবারে গলা টিপে মেরে ফেলবো। বেশি সাউকিরি করতে হবে না ছেলের হয়ে।" মোরাঙের দিকে হুন্টসিঙ পাখির মত গলাটা বাড়িয়ে দিয়ে সারুয়ামারু চেঁচিয়ে উঠলো, "সদ্দার তুই ইদিকে আয়। তুই একবার খালি বল্, সিজিটোর ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে দি।"

কয়েক দিন আগে সূর্য ওঠার রূপকথা নিয়ে সারুয়ামারুর সঙ্গে বুড়ী বেঙসানুর প্রায় একটা খণ্ডযুদ্ধ বাধবার উপক্রম হয়েছিলো। সেদিন এই কেলুরি গ্রামের সমস্ত মানুষ মৃত্যুমুখ বর্শা বাগিয়ে বেঙসানুর পাশে এসে দাঁড়িয়েছিলো। তারাই আজ আবার সারুয়ামারুর পাশে অন্তরঙ্গ হয়ে

াড়িয়েছে। হাতের থাবায় তাদের জীমবো পাতার মত ভয়াল বর্শাফলক। ার গলায় উচ্ছৃঙ্খল চিৎকার।

"হো—ও—ও—আ—আ—আ—"

মশালের আলোতে তাদের ভয়ঙ্কর হিংস্র দেখাচ্ছে। কে যেন উল্লসিত লায় বললো, "কই রে সারুয়ামারু, চল্ তাড়াতাড়ি। সিজিটোর ঘরখানা ডিয়ে আসি।"

"ও সদ্দার, তুই একবার খালি বল্।" অনেকগুলো গলা আগ্রহে ঝকমক রছে, "তুই বললেই আমরা মশাল নিয়ে আসি।"

বুড়ো খাপেগা একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মানুষগুলোর ভাবগতিক লক্ষ্য রছিলো। এবার সে রায় দিলো। সব গলার কোলাহল ছাপিয়ে তার গার উঠলো আকাশের দিকে, "চুপ কর শয়তানের বাচ্চারা। একেবারে াচরম্যাচর শুরু করে দিয়েছে সবগুলো মিলে!"

বুড়ী বেঙসানুর দিকে তাকিয়ে এবার বুড়ো খাপেগা বললো, "শোন বঙসানু, সিজিটো তুই জামাতসুর ইজ্জত নিয়েছে। তার দাম দিতে হবে তাকে। সারুয়ামারু হলো জামাতসুর সোয়ামী। দুটো শুয়ার আর াতটা বর্শা দিয়ে দে সারুয়ামারুকে।"

এবার একটা বুনো বানরীর মত চেঁচিয়ে উঠলো বুড়ী বেঙসানু, "কেন? ত দেবো কেন? তুই জোরি বংশের বউর ইজ্জত এত দামী নাকি? বলিস কী র খাপেগা শয়তান!"

চারপাশে গোলাকার মানুষের ভিড়টা একটু চুপচাপ ছিলো। আচমকা কলে আবার চেঁচামেচি শুরু করে দিলো। তার মধ্য থেকে সরবে বিদীর্ণ লো সারুয়ামারু, "ইজ্জতের কথা বলছিস! বলতে লজ্জা হলো না, কী লো বুড়ী াগী? নো ইহিআঙশিঙ ইহাঙসা! বস্তির সবাই জানে, তোর সোয়ামী জেভে- াঙের মুণ্ডু না কেটে নিয়ে গিয়েছিলো সালুয়ালাঙের মানুষগুলো! তার বদলা নতে পেরেছিস? তবে কোন মুখে ইজ্জতের ফুটানি ফুটাচ্ছিস লো শয়তানী।"

সকলে মাথা ঝাঁকালো, "হু-হু—"

এবার একেবারে নিভে গিয়েছে বুড়ী বেঙসানু। নিস্তেজ গলায় সে বললো, 'আচ্ছা আচ্ছা, তুই দুটো শুয়ার আর সাতটা বর্শা দিয়ে তোর বউটার ইজ্জতের াম দেবো। আমার সোয়ামীর মুণ্ডুর কথা বললি, সেঙাই যে সেদিন খোনকেকে মরে এলো। তাতে বুঝি বদলা নেওয়া হয় না!"

"খুব বদলা নিয়েছে!" তাচ্ছিল্যে ঠোঁট দুটো বেঁকে গেলো সারুয়ামারুর, "মাথা আনতে পেরেছে সেঙাই? তোদের জোহেরি বংশের মাথা ওরা নিয়েছে। ওদের পোকরি বংশের মাথা যেদিন আনতে পারবি, সেদিন মুখ নেড়ে কথা বলবি, তার আগে নয়। হু-হু—"

"হু-হু—" সকলে চক্রাকার কামানো মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সায় দিলো।

দুটো শুয়োর আর সাতটা বর্শার বদলে সারুয়ামারুর বউ জামাতস্থর ইজ্জতের দাম ঠিক করে দিয়েছিলো খাপেগা সর্দার। এবার সকলে ছত্রখান হয়ে যার যার কেসুঙের দিকে চলে যেতে শুরু করেছে।

কে যেন বললো, "আমরা ভাবতাম, সিজিটোটা আলাদা মানুষ। আমাদের সঙ্গে তার হালচাল মেলে না। এখন দেখছি, তা নয়।"

"ঠিক বলেছিস।" জা কুলি রাত্রির অন্ধকারে আর-একটি কণ্ঠ ব্যঙ্গের রঙে রাঙিয়ে ফুটে বেরুলো, "পরের বউর কাছে পিরীত ফুটাবে না তো কেমনতরো পাহাড়ী মানুষ! জরিমানা দেবো, দুটো মাথা ফাটাবে মেয়েমানুষের জন্যে; তা নয়, শুধু বস্তি ছেড়ে কোথায়, কোন চুলোয় যে চলে যায় ছুই সিজিটো! আজ দেখলুম, নাঃ, যতই দূরদেশে যাক, যতই সাদা মানুষের গল্প বলুক, আসলে ও পাহাড়ী মানুষই। পাহাড়ী রক্ত রয়েছে ওর বুকে। সে কথা ভুললে চলবে কেন? শয়তানটা আমাদের থেকে আলাদা হয়ে থাকে, এইবার! হো—হো—হো—"

"হু-হু—" আর একজন সায় দিতে দিতে দূরের কেসুঙগুলোর দিকে ছড়িয়ে পড়লো, "আজকের রাত্তিরটা সিজিটোর গল্প করে কাটানো যাবে বউর সঙ্গে।. বড় মজার কেচ্ছা।"

সিজিটোর একটা নতুন পরিচয় আবিষ্কার করেছে কেলুরি গ্রামের মানুষগুলো। আর সেই অপূর্ব উত্তেজক পরিচয়টা নানা রঙে, নানা কথায় আর নানা রসে ফেনিয়ে ফাঁপিয়ে সারা রাত্রি তারা উপভোগ করবে। এমন এক প্রত্যাশা সকলের মনে মনে নেশা ধরিয়ে দিয়েছে।

মাঝে মাঝে সুদূর পাহাড়ের চূড়া ডিঙিয়ে, কত উপত্যকা পেরিয়ে, কত মালভূমি উজিয়ে দূরের শহর-বন্দরে চলে যায় সিজিটো। আশ্চর্য রহস্যময় মানুষ সে। কত বিচিত্র দেশের, কত বিচিত্র মানুষের, কত অস্বাদিত খাবারের গল্প বলে। একই পাহাড়ী জনপদের মানুষ হয়েও সে যেন আলাদা। অনেক স্বতন্ত্র। এই মুহূর্তে জামাতস্থর ইজ্জত নেবার মধ্যে তারা সিজিটোর

আদিম কামনায় তাদেরই প্রতিচ্ছায়া দেখতে পেয়েছে। তাদের সঙ্গে সিজিটোর বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। এটুকু আবিষ্কার করেই তারা খুব খুশী হয়েছে।

মোরাঙের চার কিনারা থেকে কেলুরি গ্রামের সব মানুষগুলো যার যার কেসুঙে চলে গিয়েছে। চারপাশে একটু আগের কোলাহল একেবারেই নিশ্চিহ্ন হয়েছে।

আচমকা বুড়ো খাপেগা তাকালো ওঙলের দিকে। তারপর বললো, "কী রে, সেঙাই কোথায়? তাকে নিয়ে এসেছিস?"

"তাকে পেলুম না।"

"তাকে না নিয়েই চলে এলি তোরা!" বুড়ো খাপেগার ঘোলাটে চোখ দুটো ধক করে জ্বলে উঠলো, "কী রে রামখোর বাচ্চারা?"

"কী করবো, তুই বল তো জেঠা। সেঙাইর খোঁজেই তো গেলুম। টিজু নদীর ওপরে চিতাবাঘ নিয়ে বেরিয়েছে টেমি খামকোয়াম্যু (বাঘ-মানুষ)। প্রাণ নিয়ে পালিয়ে যে আসতে পেরেছি, তাই যথেষ্ট।" কেঁপে কেঁপে সন্ত্রস্ত গলায় বললো ওঙলে। একটু আগের চিতাবাঘ মারতে যাবার কাহিনী, চিতাবাঘের গায়ে বর্শা লাগার পর চিতাবাঘ আর একটি মানবিক গলার আর্তনাদ—কিছুই সে বাদ দিল না।

"হু-হু, বুঝতে পেরেছি। এ হুই নানকোয়া বস্তির মেজিচিজুঙের কাজ। হুই সালুয়ালাঙ আর নানকোয়া বস্তিতে বড় পিরীত। আচ্ছা দেখা যাক, কী করা যায়!" দাঁতে দাঁত ঘষলো বুড়ো খাপেগা।

"আমার মনে হচ্ছে, বুঝলি জেঠা, সেঙাই সালুয়ালাঙের দিকে যায় নি। নদীর পারে দাঁড়িয়ে আমরা কত তড়পালুম। হো-হো করে অনেক হল্লা করলুম। তবু সালুয়ালাঙ বস্তির কোন সাড়া পেলুম না।" ওঙলে বললো।

"হু-হু—" আশ্চর্য গম্ভীর হলো বুড়ো খাপেগার নীরোম মুখখানা। কী একটা ভাবনার অতল লোকে সে যেন তলিয়ে গিয়েছে, "তাই তো, সেঙাইটা গেল কোথায়?"

এতক্ষণ মোরাঙের বাইরে কোথায় যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো সারুয়ামারু। এইমাত্র সে বাইরের ঘরে চলে এলো, "দুটো শুয়োর আর সাতটা বর্শা দিয়ে আমার বউর ইজ্জতের দাম দিলে চলবে না সদ্দার। হুই শয়তান সিজিটো একবার বস্তিতে ঢুকলে হয়, একেবারে জানে মেরে ফেলবো।"

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠলো বুড়ো খাপেগা, "চুপ কর শয়তানের বাচ্চা।"

কেলুরি বস্তিটা কাল সারা রাত্রি আর একটি মুহূর্তের জন্যও ঘুমোতে পারে নি। দুটি মানুষ ছাড়া সকলে সিজিটোর এই আদিম পরিচয় নিয়ে রাতভোর গল্প করেছে। রঙে রঙে, রসে রসে আরো অপরূপ করে তুলেছে।

শুধু বুড়ো খাপেগার অতন্দ্র চোখে সেঙাইর মুখখানা বার বার ভেসে উঠেছে। গেল কোথায় ছেলেটা? এই কেলুরি গ্রামের আর তার স্যাঙাত জেভেথাঙের বংশের সম্মান যে রাখতে পারে, সে হলো সেঙাই। তাকে ফিরে পেতেই হবে। সেঙাইর মধ্যে খাপেগা তার নিজের যৌবনকালের প্রতিচ্ছায়া দেখতে পায়। যেমন করেই হোক, সেঙাইকে ফিরে পেতেই হবে।

আর জোরি কেসুঙে বাঁশের মাচানে শুয়ে ধকধক করে চোখদুটো জ্বলেছে জামাতসুর। আশ্চর্যভাবে তারা ধরা পড়ে গেলো আজ। সিজিটো! সিজিটো! সারুয়ামারু যখন কেসুঙে থাকতো না, যখন কোহিমা কি মোককচঙে চলে যেতো, সকলের অগোচরে এমনি কতদিন রাতে সে এসেছে তার বিছানায়। দুটি বাহুর বেষ্টনে তার তামাভ অঙ্গশ্রী জড়িয়ে ধরে দূরতম শহর-বন্দরের গল্প বলেছে। তাকে নিয়ে পালিয়ে যাবার ফন্দি এঁটেছে। একটি মনোরম স্বপ্নের কথা বলে জামাতসুর দু চোখে কোহিমা কি মোককচঙের নেশা এঁকেছে। এ দৃশ্য কেলুরি বস্তির কেউ কোনদিন দেখে নি। সিজিটো-জামাতসুর নিভৃত জীবনের ইতিহাস সকলের দৃষ্টি থেকে অনেক দূরে অদৃশ্য ছিলো। গ্রামের কেউ তাদের গোপন প্রণয়ের কথা জানতো না।

সেই সিজিটোই আজ এসেছিলো কোহিমা থেকে। সারুয়ামারু ঘরে ছিলো না। ভরসা পেয়ে সন্ধ্যার পর জোরি কেসুঙে ঢুকেছিলো সিজিটো।

"কই লো জামাতসু?"

"এই তো। আয়, আয়। শয়তানটা ঘরে নেই। মোরাঙের দিকে গেছে।"

একটু আগে জোরি কেসুঙে নাচ-বাজনা হয়েছিলো। তারপরেই তল্লাস পড়েছিলো সেঙাইর। বুড়ো খাপেগা আর জোয়ান ছেলেদের সঙ্গে মোরাঙের দিকে চলে গিয়েছিলো সারুয়ামারু। সেই মানুষই আচমকা ঘরে ফিরেছিলো যেন কিসের খোঁজে। আর এসেই পরস্পরের বাহুবন্দী দুটি পাহাড়ী নরনারীকে দেখেছিলো। সিজিটো আর জামাতসু। বন্য মানুষ! সাঁ করে বাঁশের

দেওয়াল থেকে বর্শা নিয়ে ছুঁড়ে মেরেছিলো সারুয়ামারু। অব্যর্থ লক্ষ্য। ফলাটা জামাতসুর কব্জিতে গেঁথে গিয়েছিলো। আর মাচান থেকে লাফিয়ে একটা উল্কার মত বাইরের পাহাড়ে পলাতক হয়েছিলো সিজিটো। সিজিটোর সঙ্গে সঙ্গে এই পাহাড় থেকে পালিয়ে কোহিমায় ঘর বাঁধার রমণীয় স্বপ্নটাও ফেরারী হয়েছিলো জামাতসুর।

খানিকটা আগে তামুন্যুর কাছ থেকে খানিকটা আরেলা পাতা নিয়ে এসে জামাতসুর কব্জির ক্ষতে লাগিয়ে দিয়েছে সারুয়ামারু। তারপর বুড়ী রেঙসান্নুর কাছ থেকে দুটো শুয়োর আর সাতটা বর্শা এনেছে। জামাতসুর ইজ্জতের দাম। ঘরে এসে হুঙ্কার দিয়েছিলো সারুয়ামারু, "ছাখ মাগী, তোর ইজ্জতের দাম আদায় করলুম।"

এখন তারই পাশে একটা অতিকায় মোষের মত ভোঁসভোঁস করে ঘুমাচ্ছে সারুয়ামারু।

ঘুমেরা আজ কোন সুদূরে, আকাশের আনিজা উইখুর পরপারে নির্বাসিত হয়েছে। ঘুম আসছে না জামাতসুর। শুধু দু চোখের মণিতে একটি মুখের প্রতিচ্ছায়া ফুটে উঠছে। একটি ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে। সে ছবির বাস্তব নাম সিজিটো। সিজিটো এখন কত দূরে? দূর পাহাড়ের বনে বনে সিজিটো কি তার কথাই ভাবছে? তার স্বপ্নই দেখছে?

চৌদ্দ

কাটিরি কেস্থঙে আজ বিরাট ভোজ। আওশে ভোজ। এই ভোজের স্বাদকে রসনায় স্থায়ী করে রাখার জন্য মোষ বলি দেওয়া হয়েছে। কেস্থঙের সামনে অমসৃণ পাথরের চত্বরটা রক্তে লাল হয়ে গিয়েছে। মহাকায় প্রাণীটা দু টুকরো হয়ে দুদিকে ছিটকে পড়ে রয়েছে।

পলিঙা আর মেহেলী চলে এলো কাটিরি কেস্থঙে। কেস্থঙের চারপাশে গ্রামের সব মানুষ পাহাড়ী মৌমাছির মত ভনভন করছে। এমন একটা ভোজের আনন্দে সকলে রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠেছে। কাটিরি কেস্থঙে আজ সমস্ত গ্রামখানার নিমন্ত্রণ। এই বংশের ছেলে বিয়ে করে সমস্ত সালুয়ালাঙ গ্রামটাকে আজ প্রথম ভোজ দিচ্ছে। প্রথামত ভোজ দিয়ে দাম্পত্য জীবনের জন্য স্বীকৃতি আর শুভেচ্ছা আদায় করছে সমাজের কাছ থেকে।

বাঁ দিকে সব রান্নার আয়োজন। বড় বড় মাটির পাত্র। পুরুষানুক্রমে পুড়তে পুড়তে পাত্রগুলো কালো হয়ে গিয়েছে। অতিকায় কাঠের হাতা। অজস্র মানুষের জটলা। উল্লসিত কোলাহলে সমস্ত কাটিরি কেস্থঙটা মুখর হয়ে উঠেছে। উত্তাল হয়ে উঠেছে।

এদিকে আসতে আসতে পলিঙা বললো, "কী লো মেহেলী, তোর লাগোয়া পন্যুকে (প্রেমিক) তো দেখালি না। শুধু গল্পই বললি তার। কেমন দেখতে লো সেঙাইকে ? খুব মজাদার চেহারা বুঝি !"

চমকে একবার মেহেলী তাকালো পলিঙার দিকে। হ্যাঁ, পলিঙা তার সই। তার ঘনিষ্ঠ বান্ধবী। তার কাছে সেই মোহন বিকেলে প্রথম দেখার পর সেঙাইর একটি মনোরম ছবি এঁকেছে মেহেলী। পাহাড়ী কুমারী তার যৌবনের সমস্ত মাধুর্য দিয়ে সে ছবিতে রঙ চড়িয়েছে। তার নায়কের রূপ দিয়ে একটি চকিত বিভ্রমের সৃষ্টি করেছে পলিঙার চেতনায়।

পলিঙা আবারও বললো, "এত ভালো তোর পিরীতের মানুষটা ! এত সুন্দর ! এত কথা বলেছিস তার সম্বন্ধে। একদিনও তো দেখালি না। দেখালে আমি ভাঙিয়ে নেবো না কি ? কী লো শয়তানী ?"

চারদিকে একবার চনমন চোখে তাকিয়ে মেহেলী বললো, "আজ দেখাবো। কাটিরিদের মাংস নিয়ে বাড়ি ফিরবো ; তারপর যাবো ডাইনী নাকপোলিবার কাছে। সেখান থেকে ফিরে তোকে দেখাবো সেঙাইকে। খবদ্দার, সেঙাইর কথা কাউকে বলবি না।"

পাহাড়ী মেয়ে পলিঙার সারা মুখে চোখে বিস্ময়ের লেখা ফুটে বেরিয়েছে। বিচিত্র আগ্রহে যেন তার পিঙ্গল চোখ দুটো ধকধক জ্বলছে। অনেকগুলো কৌতূহল তার প্রশ্নের রূপ নিলো, "কোথায় সেঙাই ? নাকপোলিবা ডাইনীর কাছে যাবি কেন ?" ফিসফিস শোনালো পলিঙার কণ্ঠ। দুর্বার বিস্ময়ে তার সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো ধনুকের ছিলার মত প্রখর হয়ে উঠলো। পলিঙা বললো, "সেঙাইকে আটক করে রেখেছিস ?"

"হু-হু।"

"কারুকে বলিস না। তা হলে খোঁজ পড়ে যাবে সেঙাইর। সদ্দার জানতে পারলে আমার পিরীতের মরদটাকে একেবারে সাবাড় করে ফেলবে।"

এবার অত্যন্ত বিশ্বস্ত শোনালো পলিঙার কথাগুলো, "না, না, তুই আমার সই। তোর ভালবাসার লোককে আমি ধরিয়ে দেবো না। সেঙাই তো এই বস্তির শত্তুর। ওকে পেলে সদ্দার নির্ঘাত বর্শা দিয়ে ফুঁড়বে। ওকে আমি ধরিয়ে দেবো না।"

কৃতজ্ঞ দৃষ্টিতে পলিঙার দিকে তাকালো মেহেলী। তাকিয়েই রইলো। তার পিঙ্গল চোখের মণি দুটো আশ্চর্য কোমল হয়ে উঠছে।

এক সময় কাটিরি কেসুঙ থেকে আওশে ভোজের মাংস নিয়ে নিলো মেহেলী আর পলিঙা। এটি এই পাহাড়ী জনপদগুলির রীতি। আওশে ভোজের দিনে প্রতিবেশীদের মোষের মাংস বিতরণ করলে গৃহী জীবন, বিবাহিত যুগলের নীড় রচনা সার্থক হয়ে ওঠে। নতুন দম্পতি সুখী হয়।

মাংস নিয়ে ফিরতে ফিরতে মেহেলী বললো, "তুই তোদের কেসুঙে মাংস রেখে আয় আগে। তারপর আমাদের কেসুঙের পেছনে এসে দাঁড়াবি পলিঙা।"

"কেন ?"

"কেন আবার ? নাকপোলিবা ডাইনীকে দাম দিতে হবে না ? তার ওষুধের দাম ? সেই যে সেঙাইকে আটক করে চারটে বর্শা আর দু খুদি (আড়াই সের পরিমাণ) ধান নিয়ে যেতে বলেছিলো ? মনে নেই তোর ?"

বাতাসের মত অস্ফুট শোনাচ্ছে মেহেলীর কণ্ঠ, "আচ্ছা পলিঙা, নাকপোলিবা ডাইনীর ওষুধে কাজ হবে তো!"

"নিশ্চয়ই হবে।"

"আমার বড় ভয় করে বুড়ীটাকে।" একটু থামলো মেহেলী। তারপর বললো, "সেঙাইকে আমার চাই। যেমন করে হোক, ওকে আমার পেতেই হবে। হু-হু। সেঙাইকে যখন আটক করেছি, সারা জনমের মত ঠিক ধরে রাখবো।"

চোখ দুটো মাছের আঁশের মত চকচক করছে মেহেলীর।

কাটিরি কেসুঙে আওশে ভোজের মোষ বলি দেখতে সবাই চলে গিয়েছে। বাইরের ঘরে কেউ নেই। ভীরু ভীরু চোখে ভেতরের দিকে একবার তাকালো মেহেলী। নাঃ, তাদের পোকরি কেসুঙ একেবারে শূন্য। তার বাবা, মা, এমন কি ছোট ছোট ভাইবোনেরা পর্যন্ত বুনো মোষ বলির মজা দেখতে চলে গিয়েছে। নির্মানব এই পোকরি কেসুঙ।

এমন একটা অপূর্ব সুযোগ তার বরাতে লেখা ছিলো, তা কি জানতো মেহেলী! সন্তর্পণে বাঁশের মাচানের তলা থেকে চারটে বর্শা, ঝুড়ি থেকে ধান নিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো সে। বুকের ভেতর হৃৎপিণ্ডটা উথল-পাথল হচ্ছে। তীব্র আতঙ্কে নিঃশ্বাস দ্রুত তালে উঠছে, নামছে। বাপের মুখোমুখি হলে আর রেহাই থাকবে না। এই বর্শাগুলো নিয়ে তার চামড়া উপড়ে রোদে শুকাতে দেবে, যেমন করে একটা হরিণ কি চিতাবাঘের ছাল শুকাতে দেয়।

শত্রুপক্ষের ছেলে সেঙাই। তার কামনার পুরুষ। তার প্রতিটি রক্তকণা দিয়ে, প্রতিটি স্নায়ুর জ্বালা দিয়ে সে পেতে চায় সেঙাইকে। তার আদিম আলিঙ্গনের মধ্যে ধরতে চায় সেঙাইকে। এ কথা পলিঙা আর লিজোমু ছাড়া আর কাউকে বলে নি মেহেলী। এ সংবাদ তার বাপ জানে না, তার মা জানে না, কেউ জানে না। একে শত্রুপক্ষের যৌবন, তার ওপর সেঙাইয়ের জন্য চারটে বর্শা আর দু খুদি ধানের মূল্য দিয়ে মেহেলীর মনোবিলাসকে কিছুতেই বরদাস্ত করবে না তার বাপ। তাই সকলের অগোচরে নাকপোলিবার ওষুধের মূল্য হাতিয়ে আনতে হলো মেহেলীকে।

কেসুঙের পেছন দিকে কথামত দাঁড়িয়ে আছে পলিঙা। তার সঙ্গে লিজোমুও এসেছে।

চারিদিকে দুটো পিঙ্গল চোখের দৃষ্টি দোলাতে দোলাতে পলিঙাদের কাছাকাছি চলে এলো মেহেলী। তারপর ভীরু-ভীরু গলায় বললো, "নাকপোলিবা ডাইনীর কাছে চল।"

তিন জনে উত্তর পাহাড়ের দিকে দ্রুত পা চালিয়ে দিলো।

বাদামী পাথরের মধ্যে দিয়ে সুড়ঙ্গটা অন্ধকার গুহায় অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। সুড়ঙ্গের চারপাশে উদ্দাম বন। গুহার মধ্যে পাথরের ভাঁজে ভাঁজে আগুন জলছে! আর সেই ভয়াল অন্ধকারে পাথরের আগুনের পাশে দুটি আগ্নেয় গোলক নির্নিমেষ ঘূর্ণিত হচ্ছে। এই ধকধক অগ্নিপিণ্ড দুটি ডাইনী নাকপোলিবার চোখ।

পাহাড়ী জনপদ থেকে অনেক, অনেক দূরে এই ভয়ঙ্কর গুহার অন্ধকারে অতন্দ্র বসে থাকে ডাইনী নাকপোলিবা। পল-প্রহরের হিসাব নেই, মাস-বছরের, তারিখ-সালের ইতিহাস নেই, এই নির্জন গুহাগৃহের দুটি আগ্নেয় গোলক দিনরাত্রি দূর পাহাড়ের দিকে, উপত্যকার দিকে, অনেক দূরের টিজু নদীর দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। এই অগ্নিপিণ্ড দুটির নির্বাণ নেই, অবিরাম জলে জলে নিভে যাবার প্রহর কোন কালে আসবে কি না, আশেপাশের পাহাড়ী মানুষেরা তা জানে না।

এদিকে পাহাড়ী মানুষেরা বড় কেউ আসে না। এদিকে নাকপোলিবার ডাইনী নামটা একটা বিভীষিকার মত রাজত্ব করে। ঐ দুটি আগ্নেয় গোলকের ওপর কোন মানুষের ছায়া পড়লে না কি আর উপায় থাকে না। সে মানুষের রক্ত একটু একটু করে বাষ্প হয়ে উড়ে যায়। তারপর একদিন একটি কঙ্কালের আকার নিয়ে কোন পাহাড়চূড়া থেকে অতল খাদে আছড়ে পড়ে মরে যায় তাজা পাহাড়ী মানুষটা। তাই ডাইনী নাকপোলিবার দৃষ্টির সীমানা ছাড়িয়ে বহু দূরের পাহাড়ে পাহাড়ে জনপদ রচনা করেছে এই পাহাড়ী মানুষগুলো।

মানুষ আসে না। কিন্তু মাঝে মাঝে আসে পাহাড়ী যৌবন। যুবক-যুবতী। বুকে বুকে তাদের বন্য বাসনার জ্বালা। কামনার একটি পুরুষ কি একটি নারীর অভাবে পৃথিবী যখন শূন্য হয়ে যায়, যখন প্রেমিক কি প্রেমিকা দুটি বাহুর মধ্যে ধরা দেয় না, তখন ডাইনী নাকপোলিবার কাছে আসে তারা।

ডাইনী নাকপোলিবা! তার তূণে কত ছলাকলার তীর। তার হিসাবহীন বয়সের এই জীর্ণ দেহের হাড়ে হাড়ে, চামড়ার কুঞ্চনে কুঞ্চনে কত মন্ত্র-তন্ত্র।

এই গুহাগৃহে নির্বাসিত থেকে কত আনিজার সঙ্গে সে সই পাতিয়েছে, কত প্রেতাত্মার সঙ্গে তার অন্তরঙ্গতা!

পাহাড়ী প্রেম! বন্য মানুষের কামনা! যেমন ভীষণ, তেমন দুর্বার। তখন বিভীষিকা ফেরারী হয়, পলাতক হয়। সাত পাহাড়ের অরণ্যের মধ্য দিয়ে দুলতে দুলতে পাহাড়ী যৌবন আসে নাকপোলিবার গুহায়। রাশি রাশি বর্শা আর ধানের বিনিময়ে একটি মন্ত্রপড়া গাছের শিকড় নিয়ে যায়। নাকপোলিবার মন্ত্রপড়া শিকড়ের মহিমায় নাকি কামনার মানুষটি একটি পোষা বানরের মত ধরা দেয়।

ঙ্গা কুলি মাসের বিকেল। বাইরের উপত্যকায় ঘন রোদ ছড়িয়ে রয়েছে। সোনালী আমেজে মাখামাখি হয়ে রয়েছে বন, পাহাড়, মালভূমি।

আচমকা সুড়ঙ্গের ওপর একটি ছায়া পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে গুহাগর্ভের অগ্নিপিণ্ড দুটি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো। কর্কশ গলা ভেসে এলো নাকপোলিবার, "কে রে শয়তানের বাচ্চা? কে ওখানে?"

"আমি সালুনারু।"

"ভেতরে আয়।"

হামাগুড়ি দিয়ে গুহার মধ্যে চলে এলো সালুনারু। চারপাশে ভয়াল অন্ধকার। যেন আদিম কোন দুর্নিরীক্ষ্য কাল থেকে রাশি রাশি প্রেত ওত পেতে রয়েছে নাকপোলিবার গুহায়। এই প্রেতগুলির সঙ্গে নাকপোলিবার দিনরাত্রি সহবাস। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ছমছম করে উঠলো পাহাড়ী মেয়ে সালুনারুর।

চারপাশে পাথরের ভাঁজে ভাঁজে পেন্ম্যু কাঠের রক্তাভ আগুন জ্বলছে। আগুন নয়, যেন সেই প্রেতাত্মাদের দৃষ্টি নিষ্পলক হয়ে রয়েছে।

নাকপোলিবা বললো, "কী চাই তোর? ভালোবাসার লোককে বশ করার কায়দা শিখতে এসেছিস? তার দাম এনেছিস? চারটে বর্শা, দু খুদি ধান? কী লো পাহাড়ী জোয়ানী?"

আতঙ্কে হৃৎপিণ্ডের ওপর রক্ত চলকে চলকে পড়ছিলো সালুনারুর। এবার অনেকটা ধাতস্থ হলো সে, "ভালোবাসার নাগরকে বশ করতে আসি নি তোর কাছে। ডাইনী হতে এসেছি। আমাকে মন্ত্র-তন্ত্র শিখিয়ে দে। আমি ডাইনী হবো।"

বলে কী মেয়েটা! বয়সের হিসাব নেই নাকপোলিবার, লেখাজোখা নেই

অভিজ্ঞতার। এই অসংখ্য বছরের জীবনে পাহাড়ী উপত্যকায় অজস্র জীবন দেখেছে ডাইনী নাকপোলিবা। কুরগুলাঙ গ্রাম দেখেছে। তারপর সেই কুরগুলাঙ গ্রামের প্রেতাত্মার ওপর কেমন করে গড়ে উঠল এই কেলুরি আর সালুয়ালাঙ জনপদ, তাও দেখেছে। কত ঝড়-তুফান দেখেছে নাকপোলিবা! পাহাড়ী পৃথিবীর কত জন্ম-মৃত্যু দেখেছে! তার সীমা নেই। তার সংখ্যা নেই। কত যৌবন এসেছে তাদের ভালোবাসার মানুষটিকে বশ করার মন্ত্র নিতে, সুলুক-সন্ধান জানতে। কিন্তু এমন কথা কেউ কোনদিন বলে নি। এমন কথা তার হিসাবহীন বয়সের জীবনে আর কোনদিন শোনে নি ডাইনী নাকপোলিবা।

অগ্নিপিণ্ড দুটো আশ্চর্য বিস্ময়ে সালুনারুর মুখের ওপর স্থির হয়ে রয়েছে। সারা বুকে উল্কি। পৃথিবীর আদিম শিল্প নাকপোলিবার অনাবৃত দেহে যথেষ্ট রেখায় আঁকা রয়েছে। শীর্ণ দুটি স্তনের নীচে বুকটা ধুকপুক করে নড়ছে নাকপোলিবার। সে বলল, "কী বললি, ডাইনী হবি?"

"হু-হু"—

"কেন? তুই কোন বস্তির মেয়ে?"

"আমি হুই কেলুরি বস্তির মেয়ে। আমাকে হুই বস্তির সদ্দার ভাগিয়ে দিয়েছে। ডাইনী হয়ে ওদের সব মারবো। যাকে পাবো, তাকে শেষ করবো।" কুপিত একটা অজগরের মত ফণা তুললো সালুনারু। "তুই আমাকে ডাইনী করে দে।"

"তুই বিয়ে করেছিস? সোয়ামী আছে?"

"বিয়ে করেছিলাম। সোয়ামীকে রেন্‌জু আনিজা মেরে ফেলেছে।"

চকিত হয়ে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা, "রেন্‌জু আনিজাতে মেরেছে? নাম কী তোর সোয়ামীর?"

"রেঙকিলান।"

"রেঙকিলান! রেন্‌জু আনিজা!" নিদাঁত মাড়ি বের করে হিঃ হিঃ অট্টহাসি হেসে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা। তার বীভৎস হাসিটা গুহার দেওয়ালে দেওয়ালে আহত হতে হতে মাথা চৌচির করে মরতে লাগলো। হাসির দমকে আগুনের গোলক দুটো একবার নিভতে লাগলো, আবার জ্বলতে লাগলো, "রেঙকিলান! রেন্‌জু আনিজা। আমিই তো রেন্‌জু আনিজা। তোর সোয়ামীকে মেরেছি। কী মজার খেলা বল তো! রেঙকিলানের

নাম ধরে সেদিন দক্ষিণ পাহাড় থেকে ডাক দিলাম। ব্যস্, তারপরেই বাইরের পাহাড় থেকে খাদে পড়ে শয়তানটা একেবারে খতম। আমি এতদিন খালি ভেবেছি, ছোঁড়াটা আবার মরলো কি না? তুই আমাকে বাঁচালি সালুনারু। খেলাটা নতুন ধরেছি কি না? বেশ ভালোই জমবে মনে হচ্ছে! হিঃ-হিঃ-হিঃ—”

আবারও হেসে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা। তার হাসিটা গুহার কঠিন শিলায় শিলায় আছাড়ি-আছাড়ি খেতে লাগলো।

“তুই মেরেছিস আমার সোয়ামীকে? বাতাসের মত ফিসফিস গলায় বললো সালুনারু। কেউ শুনলো না সে কথা। নাকপোলিবা নয়, হয়তো সালুনারু নিজেও নয়। প্রেতাত্মা! বুড়ী নাকপোলিবা শুধু ডাইনীই নয়, একটা ভয়ানক আনিজা! সে-ই তবে রেঙকিলানকে ডেকে ডেকে বিভ্রান্ত করে খাদের অতল তলে ফেলে মেরেছে! সালুনারুর মনে হলো, একটা প্রচণ্ড উৎক্ষেপে ক্ষ্যাপা একটা বাঘিনীর মত তার দেহটা ঝাঁপিয়ে পড়বে ডাইনী নাকপোলিবার ঘাড়ের ওপর। তারপর ধারালো নখে নখে, দাঁতে দাঁতে টুকরো টুকরো করে ফেলবে তাকে। কিন্তু কিছুই হলো না। চারপাশের পাথরের ভাঁজে ভাঁজে প্রেতদৃষ্টির মত আগুন, নাকপোলিবার হাসি আর কপিশ অন্ধকার। চারপাশে বসে বসে কারা যেন হিম নিঃশ্বাস ফেলছে। চেতনাটা কেমন যেন অবশ হয়ে আসছে সালুনারুর। একেবারে শিলীভূত হয়ে গেলো সে।

নাকপোলিবা বললো, “ডাইনী হবি, তা দাম এনেছিস ছলাকলা শেখার?”

আড়ষ্ট গলায় সালুনারু বললো, “আমার সোয়ামীর জান নিয়েছিস। তুই জানের দামে আমাকে ডাইনী করে দে। কেলুরি বস্তিকে আমি সাবাড় করে ছাড়বো।”

“আচ্ছা, তাই দেবো। ডাইনীই বানিয়ে দেবো তোকে। কিন্তু এখানে থাকতে হবে তোর। পারবি তো?”

বুকটা ছমছম করে উঠলো সালুনারুর। কাঁপা-কাঁপা গলায় সে বললো, “পারবো।”

আচমকা সুড়ঙ্গের ওপর আবার তিনটি ছায়া পড়লো।

অন্ধকার গুহার মধ্য থেকে তীব্র তীক্ষ্ণ গলায় চিৎকার করে উঠলো নাকপোলিবা, “কে? কে ওখানে? ভেতরে আয় শয়তানের বাচ্চারা।”

"আমরা পিসী।" মেহেলী, লিজোমু আর পলিঙা হামাগুড়ি দিয়ে গুহার মধ্যে ঢুকলো।

নাকপোলিবা বললো, "কী চাই তোদের?"

মেহেলী বললো, "তোর ওষুধের দাম নিয়ে এসেছি পিসী। ওষুধ দে।"

"কই দেখি, দেখি—"

মেহেলীর হাতের মুঠি থেকে চারটি বর্শা আর দু খুদি ধান ছিনিয়ে নিলো ডাইনী নাকপোলিবা। সেগুলো পাথরের খাঁজে লুকিয়ে রাখতে রাখতে বললো, "কিসের ওষুধ?"

"সেদিন আমি আর পলিঙা এসেছিলুম। তোকে বলে গেলুম, সেঙাইকে আমার মনে ধরেছে। ওকে আমার চাই। আমাদের শত্রু ওরা, তাই বশ করতে হবে।"

"হু-হু, মনে ধরেছে!"

এক কিনার থেকে সালুনারু তীক্ষ্ণ গলায় বলে উঠলো, "সেঙাই? কোন সেঙাই? কেলুরি বস্তির সেঙাই না কি?

"হু-হু।" শান্ত গলায় বললো মেহেলী।

"সেঙাই না তোর দাদাকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়েছে?" বিস্ময়ে কেঁপে উঠলো সালুনারুর গলা।

"বর্শা দিয়ে ফুঁড়েছে দাদাকে, তাতে আমার কী? সে আমার পিরীতের মানুষ। তাকে আমার চাই।" কণ্ঠটা কেমন আবিষ্ট হয়ে এলো মেহেলীর।

'চুপ মার সব। কত দেখলাম এই বয়সে! পিরীত হয়েছে, তা সে যত শত্রুই হোক, বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে যাক নিজেকে, তবু বিছানায় গেলে তার কথা মনে পড়ে। তাকে না হলে ঘুম আসে না। মন সোয়াস্তি মানে না। কী বলিস লো মেহেলী? মনের মধ্যে যেন বর্শার ঘা মেরে যায় জোয়ানেরা।" হিঃ-হিঃ করে গা-ছমছম হাসি হেসে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা।

কিছু সময়ের বিরতি। সুড়ঙ্গের ওধারে বনময় উপত্যকায় বিকেলের রোদ নিভে আসতে শুরু করেছে। ছায়া-ছায়া হয়ে আসছে পাহাড়ী পৃথিবী। আর গুহার অন্ধকার আরো ঘন হচ্ছে, আরো নিকষ হচ্ছে।

এক সময় মেহেলী বললো, "আমার ওষুধ দে পিসী।"

"সেঙাইকে আটক করেছিস তো! তার গায়ে না ছোঁয়ালে সে বশ হবে না কিন্তু। আর একবার ছোঁয়াতে পারলে একেবারে পোষা বাঁদর বনে যাবে।"

"হু-হু। সেঙাই শয়তানটাকে আটক করেছি আমার শোয়ার ঘরে।"

আর একটি মুহূর্তও দাঁড়ালো না লিজোমু। সুড়ঙ্গপথের মধ্য দিয়ে একটা ছিলামুক্ত তীরের মত তার নগ্ন দেহটা সাঁ করে বাইরের উপত্যকায় ছিটকে পড়লো।

সেঙাই! ক্ষ্যাপা একটা বাঘিনীর মতো লাফিয়ে উঠলো সালুনারু। কেলুরি গ্রামের একজনকে অন্তত সে তার থাবার সীমানায় পেয়েছে। কেলুরি গ্রাম! বুড়ো খাপেগা তাকে বর্শা দিয়ে শাসিয়ে দিয়েছে, ও গ্রামে ঢুকলে আর প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয় প্রখর হয়ে উঠলো সালুনারুর। সে বললো, "আমিও যাবো একটু সালুয়ালাঙ বস্তিতে।"

সে-ও আর দাঁড়ালো না। সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে তার অনাবৃত দেহটা একটা তীব্রগামী বল্লমের মত বাইরের অরণ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

একপাশে নিথর হয়ে বসে বসে সব কিছু দেখলো আর শুনলো পলিঙা আর মেহেলী।

ইতিমধ্যে রাশি রাশি বাঁশের চোঙা বের করছে বুড়ী নাকপোলিবা। পোড়া চুল, পিঁপড়ের মাটি, গুন্মু পাতা আর আতামারী লতার শিকড় মুঠির মধ্যে নিয়ে বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়তে লাগলো সে। মাঝে মাঝে একটানা ফুঁ দিয়ে চললো। তারপর মরা মানুষের করোটি আর মোষের হাড় সেগুলোতে ঠেকিয়ে মেহেলীর দিকে জীর্ণ হাতখানা বাড়িয়ে দিলো নাকপোলিবা, "এগুলো সেঙাইয়ের গায়ে ঠেকাবি। খবদ্দার, ও যেন দেখতে না পায়। দেখবি একটা পোষা বাঁদর হয়ে দিনরাত তোর গায়ের গন্ধ শুঁকবে সেঙাই।"

আবারও অট্টহাসি বেজে উঠলো নাকপোলিবার নিদাঁত মুখে। সে হাসি গুহার অন্ধকারে ভয়ানক হয়ে বাজতে লাগলো।

পনেরো

ছিলামুক্ত তীরের মত ছুটে চলেছে লিজোমু। পায়ের নীচ দিয়ে সরে সরে যাচ্ছে চড়াই-উতরাই। সরে যাচ্ছে উপত্যকা আর মালভূমি। এক টিলা থেকে আর-এক টিলার ওপর দিয়ে দুলতে দুলতে এগিয়ে চলেছে পাহাড়ী মেয়ে লিজোমু। পায়ের নীচে ছিটকে যাচ্ছে পাথর, এবড়োখেবড়ো রুক্ষ মাটি, আর অস্ফুট চেতনার ওপর সাঁ সাঁ করে ছুটে ছুটে যাচ্ছে কতকগুলো মুখ, কতকগুলো ভাবনার রেখা। সেঙাই! খোন্কে! মেহেলী!

খোন্কেকে সর্দার ফেলে দিয়েছে গভীর খাদের অতল তলায়। খোন্কের সঙ্গে সঙ্গে লিজোমুর জীবন থেকে পাহাড়ী পুরুষের প্রেম কি একেবারেই মুছে গিয়েছে? না, না। টিজু নদীর এপার থেকে সে অনেকবার দেখেছে সালুয়ালাঙ গ্রামের যৌবনকে। সেঙাইকে। এক বিচিত্র নেশায় তার অস্ফুট মনটা সেঙাইর রূপে আবিষ্ট হয়ে ছিলো। তা ছাড়া, মেহেলীর কাছে সেঙাইর কথা অনেক বার শুনেছে। তার পাহাড়ী মন বার বার দোল খেয়েছে। কিন্তু সেদিন তার জীবনে ছিলো খোন্কে। লিজোমুর সেঙাইমুখী দেহমন খোন্কের পিরীতে সোহাগে একটু একটু করে নিভে গিয়েছে। অস্ফুট বন্য মনটা আর দুটি পিঙ্গল চোখ ভরে খোন্কে কাল পর্যন্ত বেঁচে ছিলো। কিন্তু এখন আর নেই, আজ আর নেই খোন্কে। খোন্কে যদি নাই রইলো পৃথিবীতে, তবে কি তার উদ্দাম যৌবন ব্যর্থ হয়ে যাবে? পাহাড়ী কুমারীরা পিরীত করবে, মনের মানুষের সঙ্গে ঘর বাঁধবে, সমাজকে ভোজ খাওয়াবে। আর সে-ই শুধু পুরুষহীন জীবন নিয়ে জ্বলেপুড়ে খাক হবে? না, না। খোন্কের দাম সে আদায় করবে সেঙাইর কাছ থেকে।

সেও পাহাড়ী মেয়ে। প্রয়োজন হলে পুরুষের যৌবনকে অন্যের কামনা থেকে ছিনিয়ে আনতে পারে। তা ছাড়া সে পুরুষ যদি সেঙাই হয়। মেহেলী তার চোখের সামনে কেলুরি গ্রামের যৌবনকে ভোগ করবে। তা হয় না। তা হতে পারে না। অন্তত খোন্কে-হীন এই জীবনে লিজোমু তা সহ্য করবে না। খোন্কে যদি নাই রইলো, পাহাড়ী যৌবনের দাবি কি তবে

চরিতার্থ হবে না? খোন্‌কে নেই, কিন্তু তার কামনার আগুন অন্য পুরুষের দেহেও রয়েছে। খোন্‌কে নেই, কিন্তু তার ব্যগ্র আলিঙ্গন অন্য কারো দুটি বাহুর মধ্যে থাকতে পারে। আর সে দেহ, সে বাহু যদি সেঙাইর হয়। সালুয়ালাঙ গ্রামের শত্রুপক্ষ সে পুরুষকে তার চাই।

কখন যে বিশাল খাসেম গাছটার নীচে এসে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো লিজোমু, খেয়াল ছিলো না। চারদিক একবার চনমন চোখে তাকালো। পাহাড়ের অনেক চড়াই-উতরাই, অনেক টিলা উপত্যকা ডিঙিয়ে এসেছে। ঘন ঘন নিঃশ্বাসে বুকখানা উঠছে, নামছে।

চারপাশে বেলাশেষের রঙ নিবে আসতে শুরু করেছে। রোদ সরে গিয়েছে দূরের পাহাড়-চূড়ায়।

আর এক মুহূর্তও দাঁড়ালো না লিজোমু। তরতর করে বাঁশের সিঁড়ি বেয়ে ওপরের ঘরে চলে এলো।

পাটাতনের ওপর উবু হয়ে বসে ছিলো সেঙাই। চমকে উঠলো, "কে? কে রে, মেহেলী এসেছিস না কি?"

ময়াল সাপিনীর মত লিজোমু হিস্‌হিস করে উঠলো "কেন? মেহেলী ছাড়া আর কোন জোয়ান মাগী নেই সালুয়ালাঙ বস্তিতে?"

"কে তুই?"

"আমি লিজোমু। কেন তুই আমার পিরীতের মরদটাকে মেরেছিস সেঙাই?"

ঘরের মধ্যে ছায়া ছায়া অন্ধকার। আতামারী পাতার চালের ফাঁক দিয়ে বেলাশেষের খানিকটা আবছা রঙ এসে পড়েছে। কেমন যেন রহস্যময় হয়ে উঠেছে পরিবেশটা।

গলাটা এবার কেঁপে উঠলো সেঙাইর, "কে তোর পিরীতের মরদ?"

"খোন্‌কে।"

"খোন্‌কে!" সেঙাই চেঁচিয়ে উঠলো।

"হু-হু, খোন্‌কে। তুই খোন্‌কেকে মেরেছিস। আমার জোয়ান নাগরটা মরেছে, তার দাম দিতে হবে।" এই ছায়া-ছায়া অন্ধকারেও লিজোমুর চোখদুটো যেন জ্বলছে।

"কী দাম দেবো!" শিউরে উঠলো সেঙাই, "আমাকে মারিস না। কাল রাত্তিরে আমি খাদে পড়ে গেছলাম। খুব লেগেছে। সারা গা কেটেকুটে ফালা-ফালা হয়ে গেছে।"

"না, তোকে মারতে আসি নি সেঙাই। খোন্‌কের জানের দাম তুই নিজে। তুই আমার লগোয়া পন্যু (প্রেমিক) হ। তোকে আমি চাই।" সেঙাইর পাশে অন্তরঙ্গ হয়ে বসলো লিজোমু।

"তোকে আমি চাই না। মেহেলী কোথায়? তামুন্যুর (চিকিৎসক) কাছ থেকে আমাকে ওষুধ এনে দেবে বলেছিলো, এখনো এলো না তো!" ছিটকে পাটাতনের আর এক পাশে সরে গেলো সেঙাই। তারপর ক্রুদ্ধ গলায় বললো, "তোকে আমি চাই না। তুই ভাগ।"

"আমাকে তুই চাস না! বেশ, তা হলে খোন্‌কেকে ফেরত দে। আমার তো আর পিরীত করার মরদ নেই।" সাপের মাথার মণির মত লিজোমুর চোখের মণি দুটো দপদপ জ্বলছে, "তুই আমার হ। আমাকে তোর সঙ্গে নিয়ে যা তোদের বস্তিতে।"

"আমি পারবো না।"

"পারবি না! মেহেলীর সঙ্গে পিরীত করতে পারবি, আর আমার সঙ্গে পারবি না! তোকে পারতেই হবে।" বলতে বলতে সেঙাইর কাছে সরে এলো লিজোমু। গাঢ় গলায় বললো, "তুই আমাকে পিরীত করবি কি না বল?"

"না।"

"তবে খোন্‌কেকে মারলি কেন?"

"আমার ঠাকুরদাকে তোরা অনেক কাল আগে মেরেছিস। তার শোধ তুললাম। তবু আপসোস রইলো। খোন্‌কের মাথাটা আমাদের মোরাঙে নিয়ে যেতে পারলাম না।" শেষ দিকে কেমন যেন বিমর্ষ শোনালো সেঙাইর গলাটা।

"বেশ, শোধবোধ হলো। এবার আমাকে তোর লগোয়া লেন্যু (প্রেমিকা) করে নে।"

"না।"

"না! আমার সঙ্গে পিরীত করবি না! তা হলে মনে রাখিস সেঙাই শয়তান, আমার চোখের সামনে মেহেলীর সঙ্গে তোর পিরীত জমতে দেবো না। তোকে আর তোদের বস্তিতেও ফিরতে হবে না। আমি এখুনি সদ্দারকে ডেকে আনছি।" পাটাতনের ফোকর দিয়ে বাঁশের সিঁড়ির দিকে পা বাড়িয়ে দিলো লিজোমু।

এক মুহূর্ত:স্তব্ধ হয়ে রইলো সেঙাই। আচমকা তার শিরায় শিরায় চমক খেলে গেলো যেন। সব নিষ্ক্রিয়তা দেহমন থেকে ঝরে গেলো। সে জানে, লিজোমু যেই মাত্র তাদের সর্দারকে খবর দেবে, সঙ্গে সঙ্গে এই গাছের চার পাশে তীরধনুক আর বর্শার ফলায় মৃত্যু ছুটে আসবে। নাঃ, কোনমতেই লিজোমুকে নামতে দেওয়া হবে না খাসেম গাছের মগডালের এই ছোট্ট ঘরখানা থেকে। সাঁ করে পাটাতন থেকে মেহেলীর একখানা মেরিকেতস্থ তুলে নিলো সেঙাই। তারপর তাক করে ছুঁড়ে মারলো।

অব্যর্থ লক্ষ্য। ধারালো অস্ত্রটা লিজোমুর কোমল বুকের ওপর গেঁথে গেলো। ফিনকি দিয়ে টকটকে তাজা রক্ত বাঁশের পাটাতনকে ভিজিয়ে দিতে লাগলো। আর আর্তনাদ করে ঘরের মধ্যেই লুটিয়ে পড়লো পাহাড়ী যুবতী লিজোমু, "আ-উ-উ-উ—"

ইতিমধ্যে একটা বাঁশের পানপাত্র তুলে নিয়েছে সেঙাই। সেটা দিয়ে লিজোমুর দেহের ওপর একটার পর একটা আঘাত দিয়ে চললো। অবিরাম। বার বার।

খানিকটা পর লিজোমুর দেহটা একেবারেই নিস্পন্দ হয়ে গেলো। এবার থামলো সেঙাই। লিজোমুকে এই ঘর থেকে ছেড়ে দিলে অনিবার্য মৃত্যু ধেয়ে আসতো, অপঘাত ছুটে আসতো।

পাটাতনের ফোকর দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সেঙাই। পাহাড়ী উপত্যকা থেকে দিন মুছে গিয়েছে। অন্ধকার নেমে আসছে উত্তর পাহাড়ের চূড়ায়। আসন্ন রাত্রির দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে একটা বিচিত্র সম্ভাবনা খেলে গেলো সেঙাইর ভাবনায়।

ষোলো

জা কুলি মাসের রাত্রি গহন হয়েছে, অনেক গভীর হয়েছে। প্রথম প্রহর পার হয়ে গিয়েছে খানিকটা আগে।

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

আচমকা সালুয়ালাঙ গ্রামটা কেঁপে কেঁপে উঠলো। অজস্র জোয়ানের গর্জনে শিউরে উঠলো জা কুলি মাসের হিমাক্ত অন্ধকার।

পেন্য্য কাঠের অনেকগুলো মশাল অন্ধকারকে ফালা-ফালা করে ছুটে আসছে খাসেম গাছটার দিকে। মশালের আলোতে বর্শার ফলাগুলো ঝকমক করে উঠছে। সাঁ-সাঁ করে ছুটে আসছে একটা পাহাড়ী ঝড়। জোয়ান মানুষের ঝড়। মাথায় তাদের মোষের শিঙের মুকুট। পরনে মানুষের মুণ্ডু-আঁকা আরি পী কাপড়। দু চোখে হত্যার প্রতিজ্ঞা।

একেবারে সামনে রয়েছে সালুনারু আর বুড়ো সর্দার।

সর্দার গর্জে উঠলো, "কোথায় সেঙাই? কেলুরি বস্তির শয়তান আমাদের খোন্‌কেকে মেরেছে। মুণ্ডু ছিঁড়ে মোরাঙে ঝুলিয়ে রাখবো না আজ! ইজা হাণ্টসা সালো।"

সালুনারু বললো, "তবে বুঝবো সদ্দার তোর মুরোদ। শুধু কি খোন্‌কেকে ফুঁড়েছে হুই সেঙাই, আবার মেহেলীর সঙ্গে পিরীত জমিয়েছে। তার ঘরে রাত কাটাতে এসেছে এ বস্তিতে। গাছের ওপরে মেহেলীর ঘরে আছে টেফঙের বাচ্চাটা।"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

শোরগোল উদ্দাম হয়ে উঠছে। রীতিমত ধন্ধুমার। সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ানেরা কি জানতো, জা কুলি মাসের এই রাত্রিটা তাদের জন্য এমন একটা হত্যার সুযোগ নিয়ে আসবে?

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

খাসেম গাছটার চারপাশ ঘিরে ধরলো জোয়ান ছেলেরা। পাহাড়ী মাটির

ভাঁজে মশালগুলো পুঁতে দিলো। অন্ধকার যেন চারপাশে জমাট বেঁধে গিয়েছে। আর সেই কঠিন অন্ধকার চিরে চিরে মশালের শিখা জ্বলছে। মশালের আলোগুলির চারদিক ঘিরে গুঁড়ো গুঁড়ো সাদা বরফ ঝরছে। জা কুলি মাসের অসহ্য হিমাক্ত রাত্রি। কিন্তু আদিম এক হত্যার নেশায় সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ানেরা বেপরোয়া হয়ে উঠেছে। এই হিম-ঝর-ঝর রাত্রি তাদের বিন্দুমাত্র বিচলিত করতে পারছে না।

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

উত্তেজিত গলায় কে যেন বললো, "কী রে সদ্দার, কী করবো এবার?"

আরো একটি গলা শোনা গেলো, "আমি কিন্তু সেঙাইর মুণ্ডুটা কাটবো।"

"না, আমি, আমি।" সর্দারের কাছে সকলেই এক দাবি জানালো; তারস্বরে চিৎকার করতে লাগলো।

"চুপ কর টেফঙের বাচ্চারা। আহে ভু টেলো।" বুড়ো সর্দার ধমকে উঠলো। বুকের ওপর সাপের হাড়ের মালাটা ঝনঝন করে বেজে উঠলো। মাথায় মোষের শিঙের মুকুট কাঁপলো। রক্তচোখে জোয়ানগুলোর মুখের দিকে তাকিয়ে বুড়ো সর্দার বললো, "কেউ উঠে হুই ঘর থেকে শয়তানের বাচ্চাটাকে ফুঁড়ে নিয়ে আয়।"

উত্তেজনায় একজন সিঁড়ির দিকে ছুটে গেলো। তার ডান হাতের থাবায় একটা অতিকায় খারে বর্শা। বাঁ হাত দিয়ে সিঁড়ির বাঁশ চেপে ধরলো জোয়ানটা। আচমকা পেছন থেকে আর একজন দু হাতে কোমর জড়িয়ে ধরে টেনে নামিয়ে দিলো তাকে, "কী রে টেফঙ, মরতে যাচ্ছিস না কি? ওপর থেকে সেঙাই যদি বর্শা হাঁকড়ায়, তখন?"

তাই তো! এ কথাটা আগে ভেবে দেখে নি কেউ। ওপর থেকে সেঙাই যদি বর্শা চালায়, তবে টুপ করে একটা পাকা খাসেম ফলের মত নীচে পড়ে যাবে। তাই তো!

বুড়ো সর্দার আগ্নেয় চোখে খাসেম গাছের মগডালে আতামারী পাতায়-ছাওয়া ছোট্ট ঘরখানার দিকে তাকিয়ে রইলো। তাই তো!

আচমকা সালুনারু বললো, "উঠলে নির্ঘাত বর্শা দিয়ে ফুঁড়বে সেঙাই। বর্শা চালাতে ও ভারি ওস্তাদ। তার চেয়ে পুড়িয়ে মার।"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

ছোট্ট সালুয়ালাঙ গ্রামটা পাহাড়ী মানুষগুলোর অনবরত চিৎকারে শিউরে উঠতে লাগলো। ঠিক! খাসা বুদ্ধি জুগিয়েছে সালুনারু। সকলে মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সায় দিলো, "হু-হু, সেই ভালো।"

বুড়ো সর্দার বললো, "কিন্তু আগুন ধরাবো কেমন করে?"

টেনে টেনে ব্যঙ্গভরা গলায় সালুনারু বললো, "এই বুদ্ধিতে সর্দার হয়েছিস! বাঁশের ডগায় মশাল বেঁধে আগুন লাগিয়ে দে।"

"চুপ কর শয়তানের বাচ্চা। আমার বুদ্ধি নেই?" খেঁকিয়ে উঠলো বুড়ো সর্দার, কিন্তু খেঁকানিটা ভয়ানক শোনালো না। মনে মনে সে সালুনারুর খাসা মগজের তারিফ করলো। তারপর জোয়ানদের দিকে তাকিয়ে বললো, "যা, বাঁশ নিয়ে আয় খানকয়েক।"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

খাসেম গাছের চারপাশে যে পাহাড়ী ঝড়টা এতক্ষণ স্তব্ধ হয়ে ছিলো, এবার সেটা উপত্যকার দিকে সাঁ-সাঁ করে নেমে গেলো।

একটু পরেই খানকয়েক বাঁশ কেটে নিয়ে এলো জোয়ানেরা। তারপর সেই বাঁশের ডগায় মশাল বেঁধে বুড়ো সর্দারের দিকে তাকালো।

বুড়ো সর্দার বললো, "এবার হুই ঘরে আগুন লাগিয়ে দে।"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

আকাশের দিকে দিকে পাহাড়ী জোয়ানদের গলা থেকে ভয়ানক চিৎকার উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে মশালগুলো মেহেলীর ঘরখানার দিকে উঠে গেলো।

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

আতামারী পাতার চালে আগুন লেগেছে। চারপাশ থেকে লিকলিকে জিভ মেলে ঘরখানাকে ঘিরে ধরেছে দাবাগ্নি। ফটফট শব্দে বাঁশ ফাটছে। লতার বাঁধন ছিঁড়ছে। খড়ের দেওয়াল পুড়ে যাচ্ছে। খাসেম গাছের মগডালে নিষ্ঠুর দাবদাহ, আর সেই সঙ্গে এই আদিম হত্যার উল্লাসে সালুয়ালাঙ গ্রামের অজস্র জোয়ান একটানা চিৎকার করে চলেছে, হো-ও-ও-ও-আ-আ-, হো-ও-ও-ও-আ-আ-"

আচমকা এই দাবাগ্নি আর নীচের এই চিৎকারকে চমকে দিয়ে একটা তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শোনা গেলো। খাসেম গাছের ডালে জ্বলন্ত ঘরখানা থেকে সেই আর্তনাদ জা কুলি মাসের এই হিমাক্ত রাত্রিটাকে যেন দুমড়ে মুচড়ে একাকার করে ফেলতে লাগলো, "আ-উ-উ-উ-আ—"

হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

নীচের পাথুরে মাটিতে জোয়ানেরা চেঁচাতে লাগলো। খাসেম গাছের মগডালে এই মৃত্যুকে তারা উপভোগ করছে। লাফাচ্ছে। পরস্পরকে জড়িয়ে ধরে নাচছে। নাচতে নাচতে সকলে দলা পাকিয়ে যাচ্ছে।

বীভৎস গলায় বুড়ো সর্দার বললো, "শয়তানের বাচ্চাটা মরছে। আমাদের বস্তির জিতই রয়ে গেলো। সেঙাইর ঠাকুরদাকে অনেক কাল আগে আমরা মেরেছি। এবার সেঙাইকে মারলাম। হোঃ—হোঃ—হোঃ—"

"শত্তুর মরলো। আজ রাত্তিরে কিন্তু ভোজ দিতে হবে সদ্দার।" জোয়ান ছেলেরা নতুন করে হল্লা শুরু করে দিলো।

"দেবো। নিশ্চয়ই দেবো রে শয়তানের বাচ্চারা। আজ আমাদের কী আনন্দের দিন। সকলের কাছ থেকে একটা করে শুয়োর নিয়ে মোরাঙে খাওয়া হবে।"

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

খাসেম গাছের মগডালে আগুন এখন নিবে আসছে। আতামারী পাতার ছোট্ট ঘরখানা পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে।

এক সময় সকলে খাড়া উপত্যকা বেয়ে বেয়ে গ্রামের দিকে যেতে শুরু করলো। এই খাসেম গাছের তলা থেকে অনেক, অনেকদূরে মিলিয়ে যাচ্ছে মশালের শিখাগুলো। শুধু ভয়াল শোরগোলের রেশটা এখনও ভেসে আসছে, "হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

একটা বড় সাপেথ ঝোপের কিনার থেকে এই আগুন, এই হত্যা আর জোয়ানদের ভয়ঙ্কর উল্লাস দেখছিলো পলিঙা আর মেহেলী। খাসেম গাছের মগডালে ঐ আগুনের মতই চোখ দুটো জ্বলছিলো মেহেলীর। কিন্তু কোন উপায় ছিলো না। সামনে এগিয়ে এলে সেঙাইর সঙ্গে তাকেও পুড়ে ছাই হয়ে যেতে হতো। সর্দারের ক্রোধ তাকে ক্ষমা করতো না।

শুধু মেহেলীর দুটি নিরুপায় চোখের দৃষ্টি দেখছিলো, কেমন করে সেঙাই নামে এক রমণীয় পুরুষ-স্বপ্ন আতামারী পাতার ঘরে পুড়ে পুড়ে ছারখার হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে এক সময় তার হাতের মুঠি থেকে নাকপোলিবা মন্ত্রপড়া ওষুধ ঝুরঝুর করে ঝরে পড়েছিলো।

মেহেলী তাকালো পলিঙার দিকে। জ্বালাভরা গলায় বললো, "দেখলি পলিঙা, কেমন করে সদ্দার পুড়িয়ে মারলো সেঙাইকে!"

সাপেথ ঝোপটার পাশে পাথরের মত জমাট হয়ে গিয়েছিলো পলিঙা। মেহেলীর কথাগুলো তার অবশ দেহটাকে ঝাঁকানি দিয়ে গেলো, "হু-হু, এ হুই সালুনারু শয়তানীর কাজ!"

চোখদুটো সাপের মণির মত দপদপ করে জ্বলছে। এদিক-সেদিক তাকিয়ে ভয়ানক গলায় গর্জে উঠলো মেহেলী, "হু-হু। দেখিস, হুই সালুনারুর কলিজা ফেড়ে আমি রক্ত খাবো। কেলুরি বস্তি থেকে এখানে এসে শয়তানি শুরু করেছে!"

"একটা আস্ত ডাইনী হুই মাগী। দেখছিস না, কেমন করে এ বস্তির সদ্দারকে হাত করে নিয়েছে।"

"আমার কেমন যেন লাগছে পলিঙা। হুই সেঙাইটা মরে গেলো, ওরা পুড়িয়ে মারলো। হুই সদ্দার, হুই সালুনারু, হুই জোয়ান ছোকরারা, কাউকে আমি রেহাই দেবো না। আমার পিরীতের মরদকে ওরা পুড়িয়ে মারলো পলিঙা; এর বদলা আমি নেবো।" প্রতিহিংসায় পাহাড়ী যুবতী মেহেলীর মনটা উদগ্র হয়ে উঠলো। প্রতিটি রক্তকণা যেন তার দাউদাউ করে জ্বলছে। দুটি পিঙ্গল চোখের মণি চৌচির করে, তামাভ দেহের প্রতিটি ইন্দ্রিয়কে ফালা-ফালা করে সেই রক্তের কণিকাগুলো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসতে চাইছে।

অনাবৃত দেহ। দুজনের সারা শরীরে সামান্য আচ্ছাদনও নেই। জা কুলি মাসের হিম নির্মম হয়ে উঠেছে। তবু, মেহেলী কি পলিঙার এতটুকু সাড় নেই। সেঙাইর বীভৎস মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে দুটি পাহাড়ী যুবতী দৈহিক যন্ত্রণার সব রকম বোধের বাইরে চলে গিয়েছে।

মেহেলী ভাবলো, এর বদলা তার নিতেই হবে। প্রতিহিংসা ছাড়া তার মনে আর কোন কামনা নেই এই মুহূর্তে।

মেহেলী চিৎকার করে উঠলো, "এখন কী করি বল্ তো পলিঙা? সেঙাইকে না পেলে শরীরে জ্বলুনি কমবে না আজ। কত আশা করেছিলুম। যাতে সেঙাই না ভাগতে পারে, তার জন্য ডাইনী নাকপোলিবার কাছ থেকে চারটে বর্শা আর দু খুদি ধান দিয়ে ওষুধ নিয়ে এলুম। সব হুই সালুনারু মাগী নষ্ট করে দিলো।"

মেহেলীর আরো কাছাকাছি ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো পলিঙা। তারপর প্রথামত তার বুকের ওপর হাতখানা রেখে বললো. "কী আর করবি! মোরাঙের একজন জোয়ানকে ধরে লগোয়া পম্ম্য (প্রেমিক) বানিয়ে নে। সেঙাই যখন নেই, তখন আর কী করবি মেহেলী ?"

"না. না। সেঙাইর মত একটা জোয়ানও কি আছে আমাদের বস্তিতে? সব এক-একটা পাহাড়ী বাঁদর। টেমে নুটুঙ।" দপদপ করে জ্বলে উঠলো মেহেলীর চোখ ছুটো।

কিছু সময় দুজনেই চুপ। জা কুলি মাসের কৃষ্ণপক্ষ সমস্ত আকাশের দিকে দিকে নিবিড় অন্ধকার ছড়িয়ে দিয়েছে। এদিক সেদিক দু-চারটে তারা মিটমিট করছে।

এক সময় মেহেলী বললো, "একবার আমার ঘরে গিয়ে দেখবো পলিঙা? কাল অত উঁচু থেকে খাদের মধ্যে পড়ে গিয়েছিলো সেঙাই, কিন্তু মরে নি। আজও তো না মরতে পারে!"

"চল, চল—"

দ্রুত পা চালিয়ে খাসেম গাছটার নীচে চলে এলো মেহেলী আর পলিঙা।

মেহেলী বললো, "তুই নীচে দাঁড়া। আমি দেখে আসি।"

বাঁশের সিঁড়িটা খুবই মজবুত। কাঁচা আতামারী লতার কঠিন বাঁধন আগুনে একটুও পোড়ে নি। তরতর করে একটা বনবিড়ালের মত ওপরে উঠে এলো মেহেলী।

আতামারী পাতার চাল পুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছে। বাঁশের পাটাতনের ওপর স্তূপাকার হয়ে রয়েছে ঘরপোড়া ছাই। আর সেই ছাইগুলির নীচে রক্তাভ আগুন এখনও একেবারে নিবে যায় নি। দু হাত দিয়ে রাশি রাশি ছাই আর অঙ্গার সরিয়ে দেহটা খুঁজে বার করলো মেহেলী। জ্বলন্ত অঙ্গারের আলোতে বীভৎস দেখাচ্ছে। চামড়া আর মাংস পুড়ে সমস্ত শরীরটা ঘেয়ো ঘেয়ো হয়ে গিয়েছে।

দু হাত দিয়ে হাতিয়ে হাতিয়ে পোড়া দেহটির বুকে আচমকা ঝলসানো স্তনের আভাস পেলো মেহেলী। সঙ্গে সঙ্গে একটা চমক খেলে গেলো মেরুদাঁড়ার মধ্যে দিয়ে। সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো সমস্বরে যেন ঝঙ্কার দিয়ে উঠলো। এ তো সেঙাই নয়!

খাসেম গাছের মগডালে পাটাতনের ওপর থেকে চিৎকার করে

উঠলো মেহেলী, "এই পলিঙা, উপরে উঠে আয়। সেঙাই তো এখানে নেই, একটা মাগী পুড়ে রয়েছে ; অন্ধকারে ঠিক বুঝতে পারছি না।"

সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে ওপরে উঠে এলো পলিঙা। মেহেলীর পাশে নিবিড় হয়ে বসলো। চোখমুখ থেকে তার বিস্ময় ঠিকরে বেরুচ্ছে, "কী ব্যাপার মেহেলী ? সেঙাই মরে নি ! বলিস কী ?"

"বলছি ঠিকই। হু-হু, এই ছাখ।

অঙ্গারের রক্তাভ আলোতে মেহেলী আর পলিঙা অনেকক্ষণ ঝলসানো নারীদেহটির দিকে তাকিয়ে রইলো। একসময় পলিঙা বললো, "এ নির্ঘাত লিজোমু। এই ছাখ মেহেলী, বাঁ হাতের দুটো আঙুল নেই। আমাদের বস্তিতে লিজোমুরই তো বাঁ হাতের আঙুল দুটো কাটা। তাই না ?

"হু-হু। ঠিক, ঠিক।"

"কিন্তু লিজোমু এখানে এসেছিলো কেন ?"

"কী জানি ?"

জা কুলি মাসের রাত্রিতে দুটি পাহাড়ী যুবতী মুখোমুখি বসে রইলো। একটি কথা বলছে না কেউ। একেবারেই চুপচাপ।

চার পাশে পোড়া ঘরের রাশি রাশি ছাই। মেহেলী কি পলিঙার অস্ফুট পাহাড়ী মন সমস্ত বিচার দিয়ে, সমস্ত বুদ্ধি দিয়ে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারছে না। কেন, কেন খাসেম গাছের মগডালে এসে একটু একটু করে ঝলসে ঝলসে মরলো লিজোমু। মেহেলী কি পলিঙা জানে না, কেমন করে সেঙাই নামে একটা নিষিদ্ধ কামনার দিকে খারিমা পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছিলো লিজোমু। কিন্তু সে কামনা ধরাছোঁয়ার বাইরেই থেকে গেলো। সে কামনা একটু একটু করে পুড়িয়ে মারলো লিজোমুকে।

পলিঙা বললো, "সেঙাই নেই তো এখানে ?"

"না, আমি সব উলট-পালট করে দেখেছি।"

"সে তবে গেলো কোথায় ?" এক মুহূর্ত চুপচাপ থেকে কী যেন ভেবে নিলো পলিঙা, তারপর বললো, "সেঙাই নিশ্চয় ভেগেছে। এক কাজ করি আয়, লিজোমুকে আমরা খাদে ফেলে দি। নইলে সদ্দার কাল সকালে খোঁজ নিলে লিজোমুকে পেয়ে যাবে। তারপর সেঙাই আর তোর ওপর ক্ষেপে উঠবে। সদ্দারকে তো জানিস।"

"ঠিক বলেছিস।"

একটু পরেই লিজোমুর পোড়া দেহটা কাঁধের ওপর তুলে নিয়ে নীচে নেমে এলো মেহেলী আর পলিঙা। তারপর কয়েকটা টিলা ডিঙিয়ে খাড়াই খাদটার পাশে এসে দাঁড়ালো।

মেহেলী বললো, "সেদিন সদ্দার দাদাকে খাদে ফেলে মারলো। আজ লিজোমুটা পুড়ে মরলো। বেঁচে থাকলে ওদের বিয়ে হতো।"

কথা বললো না পলিঙা। মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সায় দিলো।

একটুক্ষণ দুজনেই চুপ।

পলিঙা বললো, "এবার লিজোমুকে ফেলে দি।"

একটি মাত্র মুহূর্ত। লিজোমোর ঝলসানো দেহটা শূন্যে পাক খেতে খেতে অতল খাদে মিলিয়ে গেলো। একটি দুর্দান্ত পাহাড়ী কামনা জা কুলি রাত্রির অন্ধকারে চিরকালের জন্য মুছে গেলো।

সতেরো

পোকরি কেস্থঙের কাছে চলে এসেছে পলিঙা আর মেহেলী।

মেহেলী বললো, "লিজোমুর কথা কারো কাছে বলিস না পলিঙা।"

"না, তেমন সই আমি না। যা, এবার ঘরে যা। আমি যাই। বড্ড খিদে পেয়েছে।" সামনে একটা বড় টিলার দিকে উঠে গেলো পলিঙা।

আর ভীরু ভীরু পা ফেলে পোকরি কেস্থঙের সীমানার মধ্যে এসে পড়লো মেহেলী। এখান থেকে পরিষ্কার নজরে অসাছে। বাইরের ঘরে পেন্যু কাঠের মশাল জ্বালিয়ে মুখোমুখি বসেছে তার বাপ আর তাদের গ্রামের সর্দার। সামনে রোহি মধুর পূর্ণ পানপাত্র। কাঠের বাসনে খানিকটা ঝলসানো মাংস। সর্দার আর তার বাপের বসবার ভঙ্গিটি বড় ঘনিষ্ঠ, বড় অন্তরঙ্গ।

মোষ বলির যূপকাষ্ঠটা পেছনে রেখে সাঁ করে বাঁশের দেওয়ালের পাশে এসে দাঁড়ালো মেহেলী। দেহের সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলোকে কান আর দুটি চোখের মণিতে এনে নিথর হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো।

সর্দার বললো, "তোকে একটা শুয়োর দিতে হবে সাঞ্চামখাবা।"

মেহেলীর বাপের নাম সাঞ্চামখাবা। তারিয়ে তারিয়ে সে রোহি মধুর পাত্রটাকে শেষ করে আনছিলো। এবার মুখ তুললো, "কেন? শুয়োর দিতে হবে কেন?"

"আজ শত্তুর পুড়িয়ে মেরেছি। হুই কেলুরি বস্তির সেঙাইকে আজ শেষ করেছি। মোরাঙে একটা ভোজ হবে না!" বুড়ো সর্দার আরো নিবিড় হয়ে বসলো। তারপর খাসেম গাছের মগডালে সেঙাইকে পুড়িয়ে মারার আদ্যোপান্ত কাহিনীটা বেশ রসিয়ে রসিয়ে বললো।

"হু-হু, নিশ্চয়ই হবে। কিন্তু সেঙাইটা কে?"

"হুই কেলুরি বস্তির ছেলে। তোর পিসী নিতিৎসুকে ছিনিয়ে নিতে এসে যে মরেছিলো, সেই জেভেথাঙের নাতি।" কানের নীয়েঙ গয়না দুলিয়ে দুলিয়ে বললো বুড়ো সর্দার।

লাফিয়ে উঠলো সাঞ্চামখাবা, "বেশ করেছিস সদ্দার। পুড়িয়ে পুড়িয়ে মেরে ঠিক করেছিস। একটা কেন? দুটো শুয়োর দেবো আমি।"

"হু-হু। জানিস, হুই সেঙাই ছোকরা তোর মেয়ের পিরীতের জোয়ান ছিলো। ফুর্তি করার জন্যে খাসেম গাছের ঘরে তাকে পুষে রেখেছিলো তোর মেয়ে। খবর পেয়ে একেবারে জ্যান্ত পুড়িয়ে এলুম। হোঃ-হোঃ-হোঃ—" পোকরি কেসুঙটাকে কাঁপিয়ে বুড়ো সদ্দারের অট্টহাসি উঠলো।

"আমার মেয়ে? কে? মেহেলী হুই শত্তুরপক্ষের ছোকরার সঙ্গে পিরীত জমায়? তার সঙ্গে ফুর্তি করে? একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়বো না?" রোহি মধুর মৌতাতে সাঞ্চামখাবার দু চোখ জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগলো। বললো, "মেহেলীকে দেখেছিস সদ্দার?"

সাঞ্চামখাবার কথায় বেড়ার ওপাশের দুটি কান চমকে উঠলো। বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা ধকধক করে লাফাতে লাগলো মেহেলীর।

বাঁশের পানপাত্রটা একপাশে ছুঁড়ে হুঙ্কার দিল সাঞ্চামখাবা, "মেজাজটা ভালো নেই, চারটে বর্শা আর দু খুদি ধান খোয়া গেছে। ভেবেছিলাম ওগুলো দিয়ে অঙ্গামীদের কাছ থেকে আয়োঙ্গে (হার), খারোন্‌জে (এক ধরনের দা) আর অ্যাকেয়া (তলোয়ার জাতীয় অস্ত্র) বদল করে আনবো। আর ইদিকে শয়তানী শত্তুরদের সঙ্গে মজেছে!"

বুড়ো সর্দার লাল লাল দাঁতগুলো মেলে হাসলো। বললো, "ধান আর বর্শা মেহেলীই চুরি করে নিয়েছে। সেঙাইকে বশ করবার জন্যে হুই বর্শা আর ধান বদল করে ডাইনী নাকপোলিবার কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে এসেছে।"

"ডাইনী নাকপোলিবা! কে বললো তোকে?" চড়া গলার আওয়াজ এবার ফিসফিস শোনালো সাঞ্চামখাবার।

"সালুনারু বলেছে। সে সব দেখেছে, সে-ই তো সেঙাইকে ধরিয়ে দিয়েছে।"

"সালুনারু! ও, কেলুরি বস্তি থেকে যে মাগীটাকে খেদিয়ে দিয়েছে?"

"হু-হু।"

বাঁশের দেওয়ালের ওপাশে একটি নারীদেহে এই জা কুলি মাসের হিমাক্ত রাত্রিতে ঘাম ঝরতে শুরু করেছে। হৃৎপিণ্ডটা থেমে থেমে আসছে মেহেলীর। বাপ আর সর্দারের কথাগুলো শুনতে শুনতে চেতনাটা কেমন যেন অথর্ব হয়ে যাচ্ছে।

বুড়ো সর্দার বললো, "এবার মেহেলীকে বিয়ে দিয়ে দে।"

"হু-হু, তাই করতে হবে। নানকোয়া বস্তির মেজিচিজুঙের বাপ বউপণ পাঠাবে বলেছে।"

"মেজিচিজুঙ! সে তো বাঘ-মানুষ। তার সঙ্গে বিয়ে দিবি?"

"হু-হু। মেহেলীর জন্যে অনেক পণ দেবে। শত্তুরদের একটা জোয়ানকে তো মেরেছিস। আরো কত জোয়ান আছে কেলুরি বস্তিতে। যুবতী বয়েস, তাগড়া ছোকরা দেখলে কি আর শত্তুর বলে বাগ মানবে! ঠিক পিরীত জমিয়ে বসবে।" খেঁকিয়ে হাসতে হাসতে বলে উঠলো সাঞ্চামখাবা "যে বয়সের যে ধরম। অন্য কারুর সঙ্গে মজবার আগেই মেহেলীর বিয়ে দেবে। তুই নানকোয়া বস্তির বাঘ-মানুষই সই।"

মেজিচিজুঙ! একটা বাঘ-মানুষের সঙ্গে তার বিয়ে দেবে সাঞ্চামখাবা! বুকের মধ্যটা ভয়ে আতঙ্কে ধড়াস করে উঠলো মেহেলীর।

"হু-হু, ঠিক বলেছিস। আমার মেয়ে তুই লিজোমুটাকেও বিয়ে দিতে হবে এবার। খোন্‌কে বেঁচে থাকলে তার সঙ্গেই দিতুম। কী আর করা! আনিজাতে টানলে ওটাকে।" বলতে বলতে উঠে দাঁড়ালো বুড়ো সর্দার, "যাক, অনেকক্ষণ এসেছি। এবার একটা শুয়োর দিয়ে দে। মোরাঙের ছোকরারা গিলবার জন্যে বসে রয়েছে।"

"হু-হু, দিচ্ছি। বাইরে চল।" একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললো সাঞ্চামখাবা, "হুই কেলুরি বস্তির সেঙাই শয়তান খোন্‌কেকে মারলো। তাকে পুড়িয়ে মেরেছিস। দুটো শুয়োর দেবো আমি। ছেলেটা বেঁচে থাকলে তোর মেয়েটার সঙ্গেই জুড়ে দিতাম।"

দেহটাকে যতখানি সম্ভব ছোট করে দেওয়ালের সঙ্গে মিশে রইলো মেহেলী।

দুজনে বাইরে বেরিয়ে এলো।

বুড়ো সর্দার বললো, "তুই মোরাঙে যাবি না?"

"হু-হু, যাবো। দুটো শুয়োর দেবো আর মাংস খেতে যাবো না! তোর মতলবটা কি বল দিকি সদ্দার? মোষ বলির যূপকাষ্ঠের পাশে এসে একবার দাঁড়ালো সাঞ্চামখাবা। তারপর বললো, "পথে মেহেলীকে পেলে একবার পাঠিয়ে দিস তো সদ্দার। শয়তানীটার চামড়া তুলে নেবো আজ। আমার চারটে বর্শা, দু খুদি ধান দিয়ে শত্তুরদের জোয়ানকে বশ করার ওষুধ কিনেছে! আহে ভু টেলো!"

"হু-হু। দেখা হলেই পাঠিয়ে দেবো।"

সাঙ্কামখাবা ফুঁসতে লাগলো, "আমাকে না বলেই মেহেলীটা শত্তুরদের ছোঁড়ার সঙ্গে পিরীত জমালো!"

"হু-হু।"

"শুনে মেজাজটা বেয়াড়া হয়ে গিয়েছে সর্দার। হুই জোহেরি বংশের শয়তানগুলোর সাহস দেখে তাজ্জব লাগে। জেভেথাঙটাকে একবার সাবাড় করলুম। তবু আক্কেল নেই। আবার সেঙাই এসেছে আমাদের পোকরি বংশের মাগীর সঙ্গে পিরীত ফুটোতে!" একটু দম নিয়ে সাঙ্কামখাবা বললো, "তা শয়তানটাকে পুড়িয়ে বেশ করেছিস।"

"হু-হু।"

একটু সময় চুপচাপ কাটলো।

"চল, হুই দিকে শুয়োরগুলো রয়েছে।" পোকরি কেসুঙের পেছন দিকে সাঙ্কামখাবা আর বুড়ো সর্দার অদৃশ্য হয়ে গেলো।

আর বাঁশের দেওয়ালটার পাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কর্তব্য স্থির করে ফেললো মেহেলী। আজ রাত্রে বাপের সামনে গিয়ে ঐ বাইরের ঘরে কিছুতেই দাঁড়াতে পারবে না সে। তা হলে নির্ঘাত বর্শা দিয়ে তাকে ফুঁড়ে ফেলবে সাঙ্কামখাবা। জা কুলি মাসের এই রাত্রিটুকুর জন্য সে পলিঙার বিছানায় আশ্রয় নেবে। সে বিছানা নিরাপদ। নির্বিঘ্ন।

আঠারো

টলতে টলতে চড়াইটার দিকে উঠতে উঠতে একবার পিছন ফিরলো সেঙাই। অনেক, অনেক দূরে টিজু নদীর ওপারে সালুয়ালাঙ গ্রামখানা এখন জা কুলি রাত্রির অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

কপালের দুপাশে রগ দুটো দপদপ করে লাফিয়ে চলেছে। খাদের মধ্যে আছড়ে পড়ে সমস্ত শরীরটা ফালা-ফালা হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিলো। সারা দেহে চাপ-চাপ রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে রয়েছে। অনেক রক্ত দেহ থেকে বেরিয়ে গিয়েছে। অবসাদে আর অপরিসীম শ্রান্তিতে পেশীগুলো কুঁকড়ে কুঁকড়ে আসছে সেঙাইর। বুকের মধ্যটা খালি করে বড় বড় নিশ্বাস পড়তে লাগলো। ঘন ঘন। বার বার।

চেতনাটা কেমন আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। একবার হিমাক্ত পাথরের ওপর বসে পড়লো সেঙাই। তার অস্পষ্ট ভাবনার ওপর কতকগুলো ঘটনার জটলা হলো। এই দুটো দিন কেমন যেন অসত্য মনে হয়, কেমন যেন অবাস্তব। খোন্‌কে, খাদের মধ্যে অচৈতন্য হয়ে পড়ে যাওয়া, মেহেলী, খাসেম গাছের মগডালে আতামারী পাতার ঘর, লিজোমু! এদের মধ্যে যেন কোন যোগ নেই, মিল নেই। সব যেন বিচ্ছিন্ন, গ্রন্থিহীন, শিথিলবন্ধ। আবার সব মিলিয়ে এক, অখণ্ড। পাহাড়ী মানুষ সেঙাই তার ঘোলাটে চেতনার মধ্যে এখন তাদের কোন ধারাবাহিক ছবি ধরতে পারছে না।

শুধু মনে পড়ছে লিজোমুকে। উঃ, আতঙ্কে সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো যেন শিউরে ওঠে এখনও। শরীরের সমস্ত শক্তি দুটি কব্জির মধ্যে এনে সে মেরিকেতস্থটা ছুঁড়ে মেরেছিলো লিজোমুর বুকে। বাঁশের পাটাতনের ওপর আর্তনাদ করে আছড়ে পড়েছিলো লিজোমু। তারপর বাঁশের পানপাত্র দিয়ে তার অচেতন দেহটাকে আঘাতের পর আঘাতে অসাড় করে দিয়েছিলো সেঙাই। সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দারকে খবর দেবার সব আশঙ্কাই নির্মূল করে দিয়েছিলো। ভাবতে ভাবতে চমকে উঠলো সেঙাই।

তারপর আর কিছু সময় অপেক্ষা করেছিলো। যেই মাত্র উত্তর পাহাড়ের

চূড়ায় সন্ধ্যার ধূসর ছায়া পড়তে শুরু হলো, ঠিক তখনই বাঁশের সিঁড়িটা বেয়ে তরতর করে নীচে নেমে এসেছিলো সেঙাই। তারও পর ঘন বনের আড়ালে আড়ালে, চড়াই-উতরাই উজিয়ে, উপত্যকা ডিঙিয়ে, টিজু নদীর নীল ধারা পেরিয়ে এইমাত্র এপারে চলে এসেছে। আসতে আসতে একবারও সালুয়ালাঙ গ্রামখানার দিকে তাকায় নি।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত আগের ঘটনা। তবু যেন মনে হয়, একটা জন্মান্তর ঘটে গিয়েছে। পাথরের টিলায় বসে ফুসফুস ভরে বার কয়েক বাতাস টেনে নিলো সেঙাই। তারপর পাশের একটা মেশিহেঙ ঝোপ ধরে উঠে দাঁড়ালো।

আচমকা সেঙাইর নজরে পড়লো, অনেক, অনেক দূরে সালুয়ালাং গ্রামের আকাশ চিরে চিরে আগুন উঠছে। সে আগুন জাকুলি মাসের হিমময় অন্ধকারে রক্তলেখার মত ফুটে বেরিয়েছে। সেঙাই জানতেও পারলো না, ঐ আগুন খাসেম গাছের মগডালে সেই আতামারী পাতার ঘরখানাকে পুড়িয়ে দিচ্ছে। সেই ঘর, যে ঘরে একটু আগেও সে আটক হয়ে ছিলো। সে জানতেও পারলো না, সেঙাই নামে এক বন্য পুরুষ-কামনায় খারিমা পতঙ্গের মত যে নারীদেহটি ঝাঁপিয়ে এসে পড়েছিলো, সে এখন ঐ আকাশ-ছোঁয়া আগুনে ঝলসে ঝলসে মরছে।

টিলাটার ওপর থেকে উঠে পড়েছিলো সেঙাই। এবার টলতে টলতে উপত্যকার দিকে নামতে লাগলো। এখনও অনেকটা পথ পেরিয়ে যেতে হবে। তারপরে পাওয়া যাবে তাদের ছোট্ট গ্রাম কেলুরির সীমানা।

"হো—ও—ও—ও—আ—আ—"

"হো—ও—ও—ও—আ—আ—"

জাকুলি মাসের রাত্রিটাকে চকিত করে উল্লসিত শোরগোল উঠছে কেলুরি গ্রামের মোরাঙের সামনে অনেকগুলো মশাল জ্বলছে। পেন্থু কাঠের মশাল। আর সেই মশালগুলোর চারপাশে গোল হয়ে বসেছে জোয়ান ছেলেরা। ঠিক মাঝখানে একটা অগ্নিকুণ্ড জ্বালানো হয়েছে। মোটা মোটা খাসেম কাঠে আগুনের গনগনে রক্তাভা।

একপাশে পড়ে রয়েছে গোটা দুই বুনো মোষ। প্রাণী দুটির সারা গায়ে তীর আর বর্শার ফলা ফুটে রয়েছে। লাল হেপোন্নে ফুলের মত থোকা থোকা তাজা রক্ত ঘন হয়ে রয়েছে। পাহাড়ী মানুষগুলো তীর আর বর্শা দিয়ে বুনো

মোষের কুচকুচে কালো দেহে নিষ্ঠুর ছবি এঁকেছে যেন। আজ দুপুরে শিকারে গিয়েছিলো জোয়ান ছেলেরা। বর্শা আর তীরের ফলায় বুনো মোষ গেঁথে ফিরেছে একটু আগে।

রাত্রি ঘন হচ্ছে। আগুনের কুণ্ডটার চারপাশে নিবিড় হয়ে বসেছে উলঙ্গ জোয়ানগুলো।

একজন বললো, "হু-হু, বুনো মোষ দুটো বড় ভুগিয়েছে। তা হোক, আজ ফলার বেশ জমবে, কী বলিস তোরা?"

উত্তরে সকলে উল্লসিত গলায় চিৎকার করে উঠলো, "হো—ও—ও—ও—আ—আ—হু-হু, কী মজা!"

কে যেন বললো, "এবার বর্শা আর তীরগুলো খুলে ফেল বুনো মোষ দুটোর গা থেকে। হাত লাগা সকলে।"

"হু-হু—" পলকের মধ্যে কয়েকজন জোয়ান ছেলে বুনো মোষ দুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো।

ইতিমধ্যে মোরাঙের বাইরের ঘর থেকে বুড়ো খাপেগা বেরিয়ে এসেছে। মোষ দুটোর দিকে তাকিয়ে তার লোলুপ চোখ দুটো ঝলসে উঠলো, "বেশ তাগড়া জানোয়ার রে! মাংসটা খেয়ে জুত হবে মনে হচ্ছে। এই ওঙলে, এই পিঙলেই, এই পিরনাঙ, যা নিমক নিয়ে আয়। হু-হু, মাংসটা তরিবত করে খাওয়া যাবে।"

সকলের মাঝখানে তুলোর দড়ির লেপ জড়িয়ে জাঁকিয়ে বসলো বুড়ো খাপেগা। আর ওঙলেরা ছুটলো লবণের সন্ধানে।

কে যেন বললো, "সেঙাইটা নেই। সে থাকলে মজা হতো।"

"হু-হু, তা হতো।" বুড়ো খাপেগা কানের লতায় পিতলের নীয়েঙ দুল দোলালো। বললো, "সে নির্ঘাত মরেছে। দুদিন ধরে এত খুঁজলাম। তা ছোঁড়াটার পাত্তাই নেই। এ নিশ্চয়ই দুই রেন্‌জু আনিজার কাজ। কোথায় কোন খাদে পড়ে মরে রয়েছে যে শয়তানের বাচ্চাটা!"

"রেন্‌জু আনিজা! রেন্‌জু আনিজা!" জোয়ান ছেলেদের গলা এবার ফিস ফিস শোনাতে লাগলো।

"হু-হু, রেঙকিলানকে যে মেরেছে, এ নির্ঘাত তারই কাজ। ও নাম আর করিস না। রাত্তিরবেলা বড় ভয় করে।" চুপ করে গেলো বুড়ো খাপেগা। একটু পরেই আবার বলতে লাগলো, "সেঙাই মরেছে। নিশ্চয়ই

মরেছে। নইলে এ দুদিনে ঠিক খুঁজে পেতুম। সালুয়ালাঙ বস্তির শত্তুররা ওকে মারলে চেঁচিয়ে পাহাড়ে ভূমিকম্প বাধিয়ে দিতো না!"

"একটু আগে সালুয়ালাঙ বস্তির লোকেরা খুব চেঁচাচ্ছিলো কিন্তু!" একটি জোয়ান ছেলে বললো।

"যেতে দে, যেতে দে এখন ওসব কথা। আগে তরিবত করে মাংস খাই। তাগড়া মোষের মাংস। হু-হু।" রসনায় রসের ফোয়ারা ছুটলো বুড়ো খাপেগার, "কাল দেখা যাবে। দরকার হলে সালুয়ালাঙের সবগুলো শয়তানের মাথা ছিঁড়ে আনবো না! বড় শীত আজ।" অগ্নিকুণ্ডটার দিকে দুখানা জীর্ণ হাত বাড়িয়ে দিলো বুড়ো খাপেগা। এখন তার উত্তাপ চাই। জা কুলি রাত্রির হিম থেকে বাঁচবার জন্য প্রচুর উত্তাপ।

খানিকটা পরে ওঙলেরা ফিরে এলো। কিন্তু কেউ লবণ আনে নি।

বুড়ো খাপেগা বললো, "কী রে, নিমক এনেছিস?"

"না জেঠা, নিমক নেই।"

"নিমক নেই তো কী দিয়ে মাংস গিলবি?" গর্জে উঠলো বুড়ো খাপেগা।

"সেঙাইর বাপ তো বস্তি ছেড়ে ভেগেছে। তোরা ভাগিয়ে দিয়েছিস। মোককচঙ কি কোহিমা থেকে সে-ই তো নিমক এনে বস্তির সবাইকে দিতো।" ওঙলে বললো।

"হু-হু। সিজিটোটাকে আবার ফিরিয়ে আনতে হবে দেখছি।" বুড়ো খাপেগা রক্তচোখে এবার সামনের দিকে তাকালো। তারপর হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "এই সারুয়ামারু—"

বুনো মোষের দেহ থেকে বর্শা আর তীরের ফলাগুলো তুলে ফেলছিলো সারুয়ামারু। অন্য কোন দিকে নজর কি কান ছিল না। খাপেগার কথা শুনে ফিরে তাকালো, "কী বলছিস রে সদ্দার?"

"কী আবার বলবো! খুব তো শাসিয়েছিলি সিজিটোকে; তোর বউর ইজ্জতের দাম বাগিয়েছিস সিজিটোর মায়ের কাছ থেকে। এবার নিমক দেবে কে? সারা বস্তি নিমক না খেয়ে কি মরবে?"

লাল লাল দাঁতের সারি বের করে খিঁচিয়ে উঠলো বুড়ো খাপেগা।

"তা আমি কী করবো?" সারুয়ামারুর চোখ দুটো যেন ঝিলিক দিয়ে উঠলো, "আমার বউর ইজ্জত নেবে সিজিটো, তার দাম বাগাবো না!"

"হু-হু। তা তো বাগাবিই। কিন্তু নিমক দিতে হবে তোর। মোককচঙ

কি কোহিমা শহর থেকে সারা বস্তির জন্যে নিমক নিয়ে আসবি কাল। নইলে সিজিটোকে ফিরিয়ে আনবি। এখন আমরা মাংস খাবো। তার জন্যে নিমক দিবি। যা নিমক নিয়ে আয়।" পাহাড়ী দলপতি বুড়ো খাপেগা হুকুম দিলো।

চকিতে উঠে দাঁড়ালো সারুয়ামারু, "আমার নিমক নেই।"

"নিমক নেই তো মাংস খাবো কী দিয়ে?"

"কেন? আপুফু ফল দিয়ে খাবি। নিমক না থাকলে টক আপুফু ফলই তো আমরা খাই। তাই নিয়ে আসবো?"

"বড় কষা লাগে ফলগুলো। আজুখে (লবণ জলের প্রস্রবণ) থেকে নিমক-জল নিয়ে আয়। সেই জল দিয়ে মাংস খাবো। তবে কাল শহর থেকে নিমক নিয়ে আসতে হবে তোর। মনে থাকে যেন।" পাথরের ওপর আরও জাঁকিয়ে বসলো বুড়ো খাপেগা।

সারুয়ামারু একটি জোয়ান ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে নীচের বনের দিকে ছুটলো।

ইতিমধ্যে বুনো মোষ দুটোর গা থেকে বর্শা আর তীরের ফলাগুলো উপড়ে নেওয়া হয়েছিলো। সকলে মিলে এবার দেহ দুটোকে অগ্নিকুণ্ডটার মধ্যে ফেলে দিলো। বিশাল কুণ্ড। গনগনে আগুন। চারপাশ থেকে মোটা মোটা জলন্ত কাঠগুলোকে তুলে মোষ দুটোর ওপর চাপানো হলো।

"হো—ও—ও—ও—আ—আ—"

জোয়ানদের গলা থেকে উল্লসিত হল্লা উঠছে আকাশের দিকে। বিশৃঙ্খল আর হিংস্র শোরগোল। "হো—ও—ও—ও—আ—আ—"

কে যেন বললো, "শুধু শুধু ঝলসাচ্ছিস সর্দার, কাঁচাই মেরে দিলে হতো। তর আর সইছে না।"

বুড়ো খাপেগা তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। তারপর খেঁকিয়ে উঠলো, "কে, কে? শয়তানের বাচ্চা হুই কুকী আর সাঙটামদের মত অসভ্য হয়ে রয়েছে এখনও! কাঁচাই সব গিলতে চায়! একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো না। একটু আগুনে ঝলসে না নিলে স্বোয়াদ আসে মাংসে!"

"হো—ও—ও—ও—আ—আ—"

খাসেম কাঠের আগুনে ঝলসে যাচ্ছে মহাকায় প্রাণী দুটো। চর্বি জ্বলে, চামড়া পুড়ে দপদপ ঝলক উঠছে।

"হো—ও—ও—ও—আ—আ—"

লোহা আর বাঁশের বড় বড় ছুরি নিয়ে এসেছে সকলে। সামনে বুনো মোষের দেহ ঝলসে উগ্র লোভনীয় গন্ধ ছড়াচ্ছে। জা কুলি মাসের রাত্রি আমোদিত হয়ে উঠেছে। যাদের রসনা বেসামাল হয়ে উঠেছে, যারা অতিমাত্রায় লোলুপ হয়েছে, তারা এর মধ্যেই অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিচ্ছে। তারপর চকিতে একখণ্ড মাংস ছিঁড়ে নিয়ে আসছে ছুরি দিয়ে। লবণের বদলে ঝরনার লবণ-জল নিয়ে এখনও ফিরে আসে নি সারুয়ামারু আর জোয়ান ছেলেটা। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই তাদের। পরম তৃপ্তিতে সেই আধপোড়া মাংস লাল লাল দাঁতের ফাঁকে ফেলে চিবাতে শুরু করেছে জোয়ান ছেলেগুলো। আর তারই ফাঁকে ফাঁকে হল্লা করে উঠছে, "হো—ও—ও—ও—আ—আ—"

আচমকা পাহাড়ের ভাঁজ থেকে গোঙানি ভেসে এলো, "ও সদ্দার, সদ্দার—আমি এসেছি।"

যাদের ধ্যান-জ্ঞান দুটি পিঙ্গল চোখের মণি হয়ে ঝলসানো বুনো মোষ দুটোর দিকে আটকে ছিলো, তারা এবার চমকে উঠলো।

পাহাড়ের ভাঁজ থেকে আবারও গোঙানিটা শোনা যেতে লাগলো। "সদ্দার, ও সদ্দার। আমি সেঙাই। আমাকে একটু ধরে নিয়ে যা ; উঠতে পারছি না। শিগগির আয়।"

"আনিজা! আনিজা! সেঙাই তো মরেছে। পালা, পালা সব।" একটা সন্ত্রস্ত কোলাহল উঠলো আগুনের কুণ্ডটার চারপাশে। জনকয়েক দৌড়ে মোরাঙের মধ্যে গিয়ে ঢুকলো।

"চুপ কর শয়তানের বাচ্চারা।" কালো পাথরখানা থেকে লাফিয়ে উঠলো বুড়ো খাপেগা, "এত মানুষের সামনে আনিজারা আসে না। মশাল নিয়ে আমার সঙ্গে আয়।"

একটু পরেই পাহাড়ের ভাঁজ থেকে সেঙাইর প্রায় অচেতন দেহটা তুলে মোরাঙে নিয়ে এলো জোয়ান ছেলেরা। এতটা চড়াই-উতরাই পার হয়ে আসতে আসতে হিমে সমস্ত শরীরটা অবশ হয়ে গিয়েছিলো সেঙাইর। সামনের পাথরের ভাঁজে এসে লুটিয়ে পড়েছিলো সে।

কিছু সময়ের জন্য বুনো মোষের লোভনীয় মাংসের কথা ভুলে থাকতে হলো। সেঙাইর চারপাশে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সকলে। তার সঙ্গে উত্তেজক খবর নিশ্চয়ই কিছু আছে। সে লোভও কম নয়।

বুড়ো খাপেগা বললো, "কী রে, কী ব্যাপার? সারা গায়ে রক্তারক্তি কেন? কী হয়েছে?"

থেমে থেমে দুটি দিনের সব কাহিনী বলে গেলো সেঙাই। কথার ফাঁকে ফাঁকে বার বার থামতে হলো। কখনও তার গলা ফিসফিস শোনালো, কখনও অত্যন্ত উত্তেজিত। খোন্‌কে, মেহেলী, লিজোমু, গভীর খাদ—কিছুই বাদ দিলো না সেঙাই। শেষে হাঁফাতে হাঁফাতে বললো, "এই মাত্তর সেই খাসেম গাছের ঘরখানা থেকে তাল বুঝে নেমে এসেছি। বড় খিদে পেয়েছে সদ্দার।"

বুড়ো খাপেগা বললো, "এই ওঙলে, বুনো মোষের মাংস নিয়ে আয়। এই পিঙলেই, তুই তামুন্যুকে (চিকিৎসক) ডেকে আন। এই পিঙকুটাঙ, তুই রোহি মধু নিয়ে আয়।"

মোরাঙের বাইরে ঘন অন্ধকার। ওঙলে, পিঙলেই আর পিঙকুটাঙ তিনদিকে ছুটে গেলো!

সেঙাই আবারও বললো, "হুই মেহেলী আমাকে বাঁচিয়েছে সদ্দার, ওকে আমি বিয়ে করবোই। তুই দেখিস। ওর বাপ আমার সঙ্গে বিয়ে না দিলে লড়াই বাধিয়ে দেবো।"

"হু-হু, বিয়ে করবি। সালুয়ালাঙ বস্তি মেহেলীকে না দিলে ছিনিয়ে নিয়ে আসবো। এই তো চাই সেঙাই। তোর ঠাকুরদাকে হুই বস্তি থেকে নিতিৎসুকে এনে দিতে পারি নি। সেদিন আমরা হেরে গিয়েছিলুম, সেদিন জেভেথাঙ মরেছিলো। তোর জন্যে হুই মেহেলীকে ছিনিয়ে এনে আমাদের জিততে হবে। যেমন করেই হোক, সালুয়ালাঙ বস্তিকে হারিয়ে দিতেই হবে।" কেলুরি গ্রামের অতীতকাল এই বুড়ো খাপেগা। তার দুচোখে এক ভয়ানক প্রতিজ্ঞা জলতে লাগলো।

অনেকদিন পর এই সেঙাইর মধ্যে তার যৌবনকালকে দেখতে পেয়েছে বুড়ো খাপেগা। সেই রক্তাক্ত অতীতের দিনগুলো, নিতিৎসু-জেভেথাঙকে নিয়ে দুই গ্রামের লড়াই চেতনার মধ্যে দোল খেয়ে উঠেছে। সেঙাই-মেহেলীকে নিয়ে একালে আর একটা সংঘাতের আভাস পাওয়া যাচ্ছে। পাহাড়ী সর্দার খাপেগার উল্লাসের দিন বৈ কি আজ! একালের ছোকরাদের কাছে সে অতীত কালের ভেলকি দেখিয়ে ছাড়বে।

হঠাৎ কী ভেবে বুড়ো খাপেগা বললো, "বুঝলি সেঙাই, তোর বাপ সিজিটো হুই সারুয়ামারুর বউর ইজ্জত নিয়েছে।"

ছিলাকাটা ধনুকের মত সাঁ করে মাচানের ওপর উঠে বসলো সেঙাই, "বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলেছিস বাপটাকে ?"

"না।"

"তবে কী সদ্দার হয়েছিস ?" ঘন ঘন নিশ্বাস পড়লো সেঙাইর। বুকে বিশাল একখানা থাবা চেপে দম নিলো সে, "পরের বিয়ে-করা মাগীর দিকে নজর, আমি হলে সাবাড় করে ফেলতুম। তা সে যেই হোক না। হু-হু।"

"ইজ্জতের দাম আদায় করেছি তোর ঠাকুমার কাছ থেকে। আর সিজিটো শয়তানটা ভেগেছে।"

"বাপটা ভেগেছে ? বেশ হয়েছে। আর ইজ্জতের দাম আদায় করেছিস, তা হলে তো সব কিছু চুকেই গেছে।" উত্তেজনায় উঠে বসেছিলো সেঙাই। এবার পরম ক্লান্তিতে মাচানের ওপর এলিয়ে পড়লো।

এক সময় সারুয়ামারু আর জোয়ান ছেলেটি লবণ-জল নিয়ে মোরাঙে ফিরলো। ওঙলে এলো বুনো মোষের মাংস নিয়ে, পিঙলেই এলো তামুন্যুকে নিয়ে আর রোহি মধু-ভরা বাঁশের পানপাত্র নিয়ে ফিরলো পিঙকুটাঙ।

উনিশ

দুপুরের দিকে বুড়ো সর্দার লিজোমুকে খুঁজতে বেরুল। সালুয়ালাঙ গ্রামের টিলাগুলো ডিঙিয়ে কেম্বুঙে কেম্বুঙে থামতে লাগলো।

"তোরা কেউ লিজোমুকে দেখেছিস ?"

"কই না তো।" যে মেয়েটি উত্তর দিলো, সে আবার অখণ্ড মনোযোগে কাফ্যা দিয়ে দড়ির লেপ বুনতে শুরু করলো।

একটা বাঁক ঘুরলো বুড়ো সর্দার। একপাশে কপিশ রঙের পাথরের ওপর কতকগুলো জোয়ান ছেলের জটলা বসেছে। পিতলের এলস্ (ক্ষুর-জাতীয় অস্ত্র) দিয়ে গোল করে তাদের মাথা কামিয়ে দিচ্ছে জন-দুই ছোকরা। আর একদিকে বড় ভেড়াপাঙ গাছের ছায়াতলে নিবিড় হয়ে বসেছে কয়েকটি যুবতী মেয়ে। তাদের সুঠাম অঙ্গশ্রীর ওপর দুপুরের রোদ নেশার মত জড়িয়ে রয়েছে। টুগু পাতার আঠা আঙুলে মাখিয়ে বাহুসন্ধির কেশ একটি একটি করে নির্মূল করছে তারা। ঠিক তেমনি প্রক্রিয়ায় একটু দূরের কয়েকজন জোয়ান ছেলে তাদের চিকন দাড়ি-গোঁফ উপড়ে নিচ্ছে। এইগুলি এই পাহাড়ী নারীপুরুষের অবশ্য করণীয় প্রথা।

বুড়ো সর্দার বিশাল ভেরাপাঙ গাছটার নীচে এসে দাঁড়ালো, "কী রে, তোরা লিজোমুকে দেখেছিস ?"

"না সদ্দার। কাল দুপুরের পর থেকে তাকে আর দেখি নি।"

"তাই তো, গেলো কোথায় শয়তানের বাচ্চাটা! এই দ্যাখ না, আজ সন্ধ্যের সময় জুকুসিমা বস্তি থেকে জানথাঙ আসবে। কী করি বল তো ?" হতাশ দৃষ্টিতে চারিদিকে তাকালো বুড়ো সর্দার।

এবার সকলে রীতিমত উৎকর্ণ হয়ে বসলো, "জানথাঙ কে রে সদ্দার ?"

"পিমঙের পিসী।"

"পিমঙ! সেই যে ছোঁড়ার সঙ্গে কাল সেঙাইকে পোড়াবার আগে লিজোমুর বিয়ে ঠিক করলি ?"

"হু-হু, পিমঙের পিসী বউপণ নিয়ে আসবে। বিয়ের বায়না দিয়ে যাবে

আজ। কিন্তু কোথায় গেলো যে টেফঙের বাচ্চাটা!" এতক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর দস্তুরমত ক্লান্ত হয়ে পড়েছে বুড়ো সর্দার। এবার সে যতটা বিরক্ত হলো, তার চেয়ে শঙ্কিত হলো অনেক বেশি।

"লিজোমুর বিয়ে। ভোজ হবে, ভোজ হবে।"

"সাদা শুয়োর খাওয়াতে হবে কিন্তু সদ্দার। কোন কথা শুনছি না।"

জোয়ান-জোয়ানীরা সকলে মিলে শোরগোল করতে লাগলো। সে শোরগোল সমস্ত সালুয়ালাঙ গ্রামটাকে যেন মাতিয়ে তুললো।

"চুপ কর শয়তানের বাচ্চারা। লিজোমুকে খুঁজে বার কর আগে, তবে তো বিয়ে!" গর্জে উঠলো বুড়ো সর্দার।

কে যেন বললো, "লিজোমু তো মেহেলীর সই। তার কাছে খোঁজ নিলে নিশ্চয়ই তাকে পাওয়া যাবে।"

"ঠিক বলেছিস।" বুড়ো সর্দার পোকরি কেসুঙের দিকে পা বাড়িয়ে দিলো।

আচমকা একটি যুবতী মেয়ে বললো, "খোন্কের সঙ্গে না লিজোমুর বিয়ে হবার কথা ছিলো, কী রে সদ্দার?"

"ছিলো তো। খোন্ককে আনিজাতে মারলো। কাল আবার পিমঙের বাপ এসেছিলো, সে তার ছেলের সঙ্গে লিজোমুর বিয়ের কথাটা পাড়লো। খোন্কে মরেছে, তাই আমিও রাজী হলুম। পিমঙের বাপ আমার সেঙাত। আমরা একসঙ্গে কেলুরি বস্তির সঙ্গে লড়াই করেছি। যাক সে কথা। জুকুসিমা বস্তির সঙ্গে আমাদের কতদিনের কুটুম্বিতে। ওরা কত খাতির করে।" বলতে বলতে সামনের টিলার দিকে উঠে গেলো বুড়ো সর্দার।

বুড়ো সর্দার টিলাটার ওপাশে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিলো।

একটি যুবতী মেয়ে ঘাড়খানা অপরূপ ভঙ্গিতে বাঁকিয়ে বললো, "খোন্কেটা এই সবে মরলো। সদ্দারের আর তর সয় না। এর মধ্যেই লিজোমুর বিয়ে ঠিক করে ফেলেছে!"

"মেয়ে বেচে কত পণ পাবে বল দিকি! সে খেয়ালটা আছে তোর?" খাসেম গাছের ছায়াতলে আর-একটি গলা শোনা গেলো।

"সাম্মেচু! আমাদের সদ্দার একটা আস্ত সাম্মেচু (ভয়ানক লোভী মানুষ)।"

পাহাড়ী জোয়ান আর জোয়ানীদের মধ্যে মৃদু একটা গুঞ্জন উঠলো।

"সবাই চুপ, একেবারে চুপ। সর্দার শুনতে পেলে সক্কলকে সাবাড় করবে।" যুবতী মেয়েটি সতর্ক করে দিলো। সকলে চুপ করে গেলো।

খোখিকেসারি কেসুঙ থেকে পোকরি কেসুঙের দিকে আসছিলো পলিঙা আর মেহেলী। একখণ্ড বিশাল পাথরের পাশে সর্দারের সঙ্গে দেখা হয়ে গেলো তাদের।

বুড়ো সর্দার বললো, "লিজোমুকে দেখেছিস মেহেলী? কী রে পলিঙা, তুই দেখেছিস?"

বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন ধক করে উঠলো মেহেলী আর পলিঙার। চট করে একবার পলিঙা তাকালো মেহেলীর দিকে। মেহেলীও তার দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছ। চোখের পলক পড়ছে না। তুজনে অনেকটা সময় তাকিয়েই রইলো।

বুড়ো সর্দার আবারও বললো, "কী রে, দেখেছিস তোরা? লিজোমু তো তোদের সই। কাল তুপুরের পর থেকে তাকে পাচ্ছি না।"

কাঁপা গলায় মেহেলী বললো, "কই, আমরা দেখি নি তো।"

বড় অসহায় দেখালো বুড়ো সর্দারকে। ঘোলাটে চোখের ঠিক নীচেই বর্শার ফলার মত ফুঁড়ে বেরিয়েছে হনুতুটো। সারা মুখের রাশি রাশি কুঞ্চনে জরা স্থায়ী ছাপ ফেলেছে। ভাঙা গলায় বুড়ো সর্দার বললো, "কী করি বল তো মেহেলী? আজ বউপণ আসবে লিজোমুর। কিন্তু কোথায় যে গেলো মেয়েটা! খুঁজেই পাচ্ছি না।"

"বউপণ!" প্রায় চেঁচিয়ে উঠলো মেহেলী।

"হু-হু, কাল সন্ধ্যের সময় এসেছিলো পিমঙের বাপ, ওই জুকুসিমা বস্তি থেকে। আমাদের সঙ্গে ওদের খুব খাতির। তোর দাদা খোন্‌কেটা তো মরলো। তাই ওদের ছেলে পিমঙের সঙ্গে লিজোমুর বিয়ের ঠিক করলাম। বংশটাও ভালো। লোখেরি বংশ।" ফিসফিস শব্দে বলতে বলতে এক সময় একেবারে থেমে গেলো বুড়ো সর্দার।

মেহেলী ভাবছে অন্য কথা। লিজোমুর ঝলসানো বীভৎস দেহটা এখনও যেন পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছে সে। না, না, সর্দারকে সে কিছুতেই বলতে পারবে না, কেমন করে খাসেম গাছের মগডালে লিজোমু একটু একটু করে পুড়ে মরেছে। বুকের মধ্যে ধমনীটা ছিঁড়ে রক্ত উছলে উছলে পড়ছে,

তারপর ফেনিয়ে ফেনিয়ে শিরা-উপশিরার ধারাপথে ছড়িয়ে যাচ্ছে। অসহ্য এক যন্ত্রণায় শরীরের সমস্ত পেশীগুলো যেন অসাড় হয়ে আসতে শুরু করেছে মেহেলীর। টেনেন্যু মিঙ্গেলু! বউপণ! না হোক তার দাদা খোন্‌কের সঙ্গে লিজোমুর বিয়ে, তবু তার বিয়ে হতো সুদূর পাহাড়ী গ্রাম জুকুসিমায়। সোয়ামীর সোহাগে সোহাগে, পাহাড়ী গ্রামের কোন বনস্পতির ছায়াতলে একটি সুন্দর গৃহস্থালিতে সার্থক হতো লিজোমু। চরিতার্থ হতো তার যৌবনের কামনা। কিন্তু সে আজ নেই, ধরা-ছোঁয়ার বাইরে সে চলে গিয়েছে। লিজোমু পুড়ে পুড়ে মরেছে। নিজের কামনা আর বন্য বাসনার মধ্যে মেহেলী লিজোমুর মনের ছায়াই তো দেখতে পায়। পাহাড়ী গ্রামে এক সুন্দর গৃহকোণ, এক আদিম আর বলিষ্ঠ পুরুষ। কিছুই পেলো না সে। শত্রু হলেও লিজোমু তার সই। তার জন্য প্রাণটা পোড়ে বৈকি মেহেলীর!

বুড়ো সর্দার বললো, "কাল সেঙাইকে পোড়ালুম, তারপর সারারাত মোরাঙে হল্লা হলো, মাংস খাওয়া হলো। কেসুঙে আজ ফিরে দেখি, লিজোমু নেই। তোরা তবে তাকে দেখিস নি!"

"না।" অস্ফুট গলায় শব্দ করলো মেহেলী। তারপর সাঁ করে ছুটে গেলো পোকরি কেসুঙের দিকে। সর্দারের মুখোমুখি আর দাঁড়াতে পারছে না সে।

মেহেলীর পিছন পিছন পলিঙাও ছুটে চললো।

বিশ

নাগা পাহাড় থেকে জা কুলি মাস চলে গেলো। পেঁজা তুলোর মত গুঁড়ো গুঁড়ো যে তুষার ঝরতো আকাশ থেকে, তা একদিন থেমে গেলো। শীত ঋতুর আয়ু প্রায় ফুরিয়ে এসেছে। এবার কমলা-রঙ রোদের সওয়ার হয়ে আসবে গরমের সকাল, ঝকঝকে রোদের পাখনা মেলে উড়ে যাবে দুপুর, তারপর অপরূপ সোনালী বিকেল পশ্চিমের পাহাড়-চূড়া রাঙিয়ে দেবে।

জা কুলি মাসের পর এখন নম্থু কেহেঙ মাসের শুরু। দিগন্তে কুয়াশার রেখা ঘন হয়ে জমে না আজকাল। সূক্ষ্ম নীলাভ একটি কুয়াশার স্তর সুখ-সুখ শিহরণের মত পাহাড়ের চক্ররেখাটিকে জড়িয়ে থাকে। কপিশ রঙের পাহাড়ী ঘাসের ফলক থেকে শিশিরের নিটোল কণাগুলি যখন বাষ্প হয়ে উড়ে যায়, ঠিক তখনই আকাশ থেকে কুয়াশার স্তরটা একেবারেই অদৃশ্য হয়ে যায়। ঘন সবুজ বন এই নম্থু কেহেঙ মাসে ঝলমল করতে থাকে।

জা কুলি মাসের শেষ দিকে সিঁড়িখেতে জোয়ার বোনা হয়েছিলো। টিজু নদীর বরফগলা জল এনে ছিটিয়ে ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছিলো বীজ-ফসলের শিকড়ে শিকড়ে। এখন, এই নম্থু কেহেঙ মাসের কমলা-রঙ সকালে সারা মাঠ ভরে শ্যামল অঙ্কুর মাথা তুলেছে। আগামী ফসলের মাসগুলিতে পাহাড়ী খেতের ঝাঁপি সোনালী লাবণ্যে ভরে যাবে। শ্যামাভ শস্যের অঙ্কুরে অঙ্কুরে তার গর্ভধারণের ইঙ্গিত।

পুরোপুরি জা কুলি মাসটা, তারপর নম্থু কেহেঙ মাসের এতগুলি দিন মোরাঙের মাচানে শুয়ে শুয়ে কাটিয়ে দিতে হয়েছে সেঙাইর। সালুয়ালাঙ গ্রামের অতল খাদে সেদিন অচেতন হয়ে পড়ে যাওয়ার পর সারা দেহ ফালা-ফালা হয়ে ছিঁড়ে গিয়েছিলো। সেই ফালা-ফালা রক্তাক্ত ক্ষতগুলি টুগু আর আরেলা পাতার প্রলেপে শুকিয়ে গিয়েছে এতদিন পর।

আজ প্রথম মোরাঙ ছেড়ে বাইরে এলো সেঙাই। সারা দেহ এতদিনের বিশ্রামে সতেজ হয়েছে, সবল হয়েছে। চামড়া টান-টান হয়ে নিভাঁজ হয়েছে। আর সেই নিভাঁজ চামড়ার ওপর একটি চিকন চেকনাই ফুটে বেরিয়েছে।

মোরাঙের সামনে এই উঁচুপাথরের টিলা থেকে ফসলের সিঁড়িখেত নজরে আসে। ফসল পাহারা দেবার জন্যে জমির চারদিকে অজস্র ঘর তোলা হয়েছে। অনেক উঁচু থেকে সেগুলিকে ছোট ছোট বিন্দুর মত মনে হয়।

অনেকটা আগেই সকলে পার হয়ে গিয়েছে। দিকে দিকে তুপুরের আভাস ফুটে বেরিয়েছে। শক্ত করে কোমরের কাপড়ে একটা গিঁট দিয়ে নিলো সেঙাই।

একপাশে বসে বসে বর্শায় শান দিচ্ছে জোয়ান ছেলেরা। তাদের মধ্য থেকে ওঙলে বললো, "কী রে সেঙাই, বেরিয়েছিস মোরাঙ থেকে?"

"হু-হু, ভালো হয়ে গেছি তো বেরুবো না? কদ্দিন আর মোরাঙে শুয়ে থাকবো?"

"আজ সিঁড়িখেতে যাবি না কি?"

"যাবো।" বিষণ্ণ গলায় সেঙাই বললো, "এবার বীজ বুনতে পারলাম না। জোয়ার না হলে গরমের দিনগুলো খাবো কী, ভাবতে পারছি না।"

"হু-হু।' সকলে মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সায় দিলো।

"কী যে করি!" সেঙাইকে বড় অসহায় দেখালো।

"কী রে, তুই পাহাড়ী মরদের নাম ডুবিয়ে দিবি না কি?" প্রখর গলায় দক্ষিণ পাহাড়কে কাঁপিয়ে এবার হেসে উঠলো ওঙলে, "বনে মোষ নেই? হরিণ নেই? শুয়োর নেই? সম্বর নেই? বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে এনে পুড়িয়ে খাবি।"

"তা ঠিক বলেছিস।" আরো খানিকটা এগিয়ে ওঙলের পাশে এসে দাঁড়ালো সেঙাই, "তবে ফসল না বুনলে কি চলে? ফসলের আনিজা যে তাতে গোঁসা হয়।"

"হু-হু।"

"তোরা কখন সিঁড়িখেতে যাবি?"

"তুপুর পেরিয়ে গেলে।" ওঙলে বললো।

"আমাকে ডেকে নিস। আমি এখন একবার কেসুঙে যাবো। ঠাকুমার সঙ্গে দেখা করে আসি।" হনহন করে পা চালিয়ে জোহেরি কেসুঙের দিকে চলে গেলো সেঙাই।

জোহেরি কেসুঙের পিছন দিকে অর্ধগোলাকার পাথরখানার ওপর বসে ছিলো বুড়ী বেঙসানু। তার চোখ তুটি আকাশের দিকে স্থির হয়ে রয়েছে।

গরম কালের আকাশ। আশ্চর্য নীল, আশ্চর্য নির্মল। সেই আকাশে গুটসুঙ পাখির ঝাঁক সাঁতার কেটে চলেছে।

এমন সময় সেঙাই এলো।

"ঠাকুমা, এই ঠাকুমা—"

"কে? সেঙাই এসেছিস, আয়। মোরাঙে মেয়েদের ঢুকতে দেয় না, তাই তোকে দেখতে যাই না। কেমন আছিস? ভালো তো।" ঘুরে বসলো বুড়ী বেঙসান্থ।

সেঙাইর সাড়া পেয়ে ফাসাও আর নজলি বাইরের ঘর থেকে ছুটে এসেছে। এসে একেবারে ঝাঁপিয়ে পড়েছে সেঙাইর ঘাড়ে।

সেঙাই বললো, "মা কোথায়?"

"সে মাগী কি আর এখানে আছে? সে গেছে কোহিমা। তোর বাপের কাছে।"

"বাপ বস্তিতে আসে নি আর?"

"আর এলো কোথায় শয়তানের বাচ্চাটা! ওই সারুয়ামারুর বউ জামাতসুর ইজ্জত নিলে। তারপর সেই রাতেই তো কোহিমা পালালো। আমি বুড়ী শেষকালে জামাতসুর ইজ্জতের দাম দিলাম শুয়োর আর বর্শা দিয়ে।" দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে বলে উঠলো বুড়ী বেঙসান্থ, "সেই সায়েব না কী, তাদের সঙ্গেই রয়েছে টেফঙের বাচ্চাটা। টেমে ন্টুঙ!"

"মা কার সঙ্গে কোহিমা গেলো?"

"সারুয়ামারু কোহিমা গেলো দিন সাতেক আগে, তার সঙ্গে রাতের অন্ধকারে ভেগে গিয়েছে শয়তানী। মাগীর তো আবার পুরুষের গায়ের গন্ধ না পেলে মেজাজ বিগড়ে যায়।" বুড়ী বেঙসান্থ নির্বিকার ভঙ্গিতে খেউড় গাইতে শুরু করলো, "আহে ভু টেলো!"

সেঙাইর সতেজ দেহটা অদ্ভুত উত্তেজনায় ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো। থরে থরে সাজানো পেশীগুলিতে দোলানি শুরু হলো, "সারুয়ামারু কই? কোহিমা থেকে ফিরেছে?"

"হু-হু, কাল সন্ধ্যের সময় ফিরেছে বস্তিতে।" এবার বিস্বাদ গলায় বুড়ী বেঙসান্থ বললো, "কী খাবি সেঙাই? এবার তো সিঁড়িখেতে জোয়ারের বীজ বোনা হলো না। তুইও মোরাঙের মাচানে শুয়ে শুয়ে ভুগলি, আর ওই টেফঙের বাচ্চা সিজিটোটা তো কোহিমায় পালিয়ে রইলো।

সায়েবদের গায়ে যে কী স্বোয়াদ মাখা আছে, সেই জানে।" চিন্তিত মুখে বুড়ী বেঙসাম্নু আবার বললো, "ফসল হলো না, এবার খাবি কী সেঙাই ?"

"কী আবার খাবো ? লোটেস্যু পাখি মারবো, হুন্টসিঙ পাখি মারবো, মোষ আর হরিণ শিকার করবো। শুয়োর গেঁথে আনবো। শুধু মাংস খেয়ে কটা মাস কাটিয়ে দেবো। যদ্দিন এই বন আর পাহাড় রয়েছে, জানোয়ার আর পাখি রয়েছে, এই দুখানা হাত রয়েছে, বর্শা আর সুচেন্যু রয়েছে, তদ্দিন না খেয়ে মরবো না কি ? কী রে ঠাকুমা ?" সরাসরি দৃষ্টিতে বুড়ী বেঙসাম্নুর দিকে তাকালো সেঙাই।

"সে কথা ঠিক সেঙাই। আমরা পাহাড়ী মানুষ, জন্তু-জানোয়ার পেলেই আমাদের পেট চলে যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি অন্য কথা।"

"কী কথা আবার ভাবছিস ?" সেঙাইর কপালের টান-টান চামড়ায় কয়েকটা রেখা ফুটে বেরুলো। আড়াআড়ি রেখা। রেখার আঁকিবুকি।

"বলছিলাম, এক বছর সিঁড়িখেতে বীজফসল পড়লো না। যদি ফসলের আনিজার রাগ না পড়ে, তবে তো আমাদের সিঁড়িখেতে আর ফসলই হবে না কোনদিন ! কতকাল আর মাংস খেয়ে কাটাবি ?"

"আরে হবে, হবে। ফসলের আনিজার নামে একটা সম্বর বলি দিলেই হবে। তুই বোস ঠাকুমা, আমি একটু সারুয়ামারুকে ডাকি।" অর্ধগোলাকার পাথরখানার ওপর উঠে দাঁড়ালো সেঙাই।

ফাসাও আর নজলিও লাফিয়ে উঠে পড়েছে, "তুই কোথায় যাচ্ছিস দাদা ? আমরা যাবো, আমরা যাবো। আমাদের মার কাছে দিয়ে আয়।"

"মার কাছে যাবে ! দেখলি না তোদের ফেলে কোহিমা ভাগলো মা আর বাপ। থাম সব।" রক্তচোখে তাকালো সেঙাই। তারপর পাথরখানার ওপর থেকে নীচে নেমে চিৎকার করে উঠলো, "এই সারুয়ামারু, এই সারুয়ামারু—"

মাথার ঠিক ওপরেই অতিকায় এক খণ্ড পাথর। তার পাশেই জোরি কেসুঙ। সেখান থেকে একটা বিরক্ত গলার স্বর তাড়া করে এলো, "কে ? কে ডাকে ? কে রে শয়তানের বাচ্চা ?"

"আমি সেঙাই, নীচে আয় সারুয়ামারু।"

"যাই।"

একটু পরেই জোহেরি কেসুঙে এসে দাঁড়ালো সারুয়ামারু। তারপর অর্ধ

গোলাকার পাথরখানার ওপর জাঁকিয়ে বসলো, "কী রে সেঙাই, ভালো হয়ে গেছিস দেখছি।"

"হু-হু।"

"এই যে তোর বাপ টাকা পাঠিয়ে দিয়েছে। দক্ষিণের পনেরোটা পাহাড় ডিঙিয়ে মাওএর রাস্তা পাবি। সেখানে পঁক-পঁক গাড়ি পাবি। তাই চড়ে কোহিমা যাবি। তোর বাবা যেতে বলেছে তোকে।" বলতে বলতে হাতের মুঠি থেকে একটি রুপার মুদ্রা বের করে সেঙাইর দিকে বাড়িয়ে দিলো সারুয়ামারু, "এই নে।"

ঝকঝকে রুপালী মুদ্রা। রোদ লেগে শুভ্র দ্যুতি ঠিকরে ঠিকরে বেরুচ্ছে। অদ্ভুত বিস্ময়ে ধাতব বস্তুটির দিকে তাকিয়ে রইলো সেঙাই। এ তার অচেনা। এর আগে কোনদিনই এই গোলাকার মুদ্রাটির সঙ্গে তার পরিচয় হয় নি। বুড়ী বেঙসানুও মুদ্রাটির দিকে তাকিয়ে রয়েছে অবাক হয়ে। তার হিসাবহীন বয়সের অভিজ্ঞতায় এমন একটি পদার্থ অজানাই রয়েছে।

সেঙাই তাকালো বুড়ী বেঙসানুর দিকে। এখনও সে নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌছাতে পারে নি, বস্তুটিকে স্পর্শ করবে, কি করবে না।

বুড়ী বেঙসানু ভীরু-ভীরু গলায় বললো, "এই সারুয়ামারু, এটা ধরলে আনিজার রাগ এসে পড়বে না তো! এর নাম কী?"

এই ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ। চারপাশে গহন বন। সেই বনে হিংস্র শ্বাপদের অবাধ সংসার। সেই অরণ্যে নিয়তবাহী প্রস্রবণ, কল্লোলিত জলপ্রপাত—তাদের অভিজ্ঞতার সীমানায় এগুলিই সত্য, এগুলিই গ্রাহ্য। এই পাহাড়ী পৃথিবীর বাইরে তাদের কাছে সমস্ত কিছুই সংশয়ের সীমা দিয়ে ঘেরা; অবিশ্বাস আর সন্দেহে আকীর্ণ। অস্ফুট চেতনার বিচার দিয়ে এই পাহাড়ী মানুষগুলি সবকিছু যাচাই করে তবে গ্রহণ করে। নইলে অপরিচিত কিছুর মুখোমুখি হতে তারা কুণ্ঠিত হয়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে।

সমস্ত কেলুরি গ্রামখানাকে চমকে দিয়ে হেসে উঠলো সারুয়ামারু, "কী বোকা তোরা! এর নাম হলো টাকা। এটা ধরলে কিছুতেই আনিজার রাগ হবে না।"

আশ্চর্য আকর্ষণ! হাতখানা বাড়িয়ে টাকাটা নিয়ে নিলো সেঙাই। ফিসফিস গলায় বলে উঠলো, "এটা দিয়ে কী হয়?"

"কী না হয় বল? এটা দিলে সব কিছু পাওয়া যায়।" অত্যন্ত বিজ্ঞ-বিজ্ঞ

দেখাচ্ছে এবার সারুয়ামারুকে, "কোহিমা শহরে যাবি যখন, তখন দেখবি কী হয় এটা দিয়ে। এ দিয়ে সব হয়, সব হয়। কালই তুই চলে যা কোহিমা। তোর বাপ তোর জন্যে কাজ ঠিক করে রেখেছে।"

"কাজ! কিসের কাজ?"

"বেত কাটার কাজ। নাগিনীমারা যেতে হবে। এবার তো আর সিঁড়িখেতে জোয়ারের বীজ বুনিস নি। ডিমাপুর হয়ে নাগিনীমারা চলে যাবি। আমিও যাবো। দোইয়াঙ আর রেঙমাপানির ওধারের বস্তিগুলো থেকে অনেক পাহাড়ী যাবে।"

নাগিনীমারা! ডিমাপুর! বিচিত্র সব নাম, বিচিত্র সব দেশ। এই রুপালী মুদ্রার মতই ঐ নামগুলি সেঙাই কি বুড়ী বেঙসানু জানে না। ছয় আকাশ, ছয় পাহাড় ডিঙিয়ে কোথায় কোন চক্ররেখায় ঐ নামের দেশগুলো পড়ে রয়েছে সে খবরও তাদের জানা নেই। শুধু এক দুর্নিবার কৌতূহল, এক দুর্বোধ্য আকর্ষণ সমস্ত চেতনাটাকে আচ্ছন্ন করে তুললো সেঙাইর। ডিমাপুর! নাগিনীমারা! কতদূর? কোন সুদূরে সেই সব দেশ?

হতবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলো সেঙাই। শুধু হাতের পাতায় রুপালী মুদ্রাটা ঝকঝকে রোদে ঝিকমিক করছে।

সেঙাই আবিষ্ট গলায় বললো, "কাজ করে এই টাকা পাওয়া যাবে?"

"হু-হু, অনেক পাওয়া যাবে। তোর বাপ ফাদারের কাজ করে অনেক টাকা পায়। তুইও পাবি।" সারুয়ামারু আলোক দান করে চললো।

ইতিমধ্যে সমস্ত কেলুরি গ্রামখানা জমায়ত হয়েছে জোহেরি কেসুঙে। সারুয়ামারু, বুড়ী বেঙসানু আর সেঙাইর চারপাশে নিবিড় হয়ে দাঁড়িয়েছে সকলে।

ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ কেলুরিতে এই প্রথম রুপালী মুদ্রার আবির্ভাব। বিস্ময়ে আতঙ্কে সব মেয়েপুরুষ সেঙাইর মুঠির দিকে তাকিয়ে রয়েছে। একসময় সেঙাইর থাবা থেকে ছোঁ মেরে টাকাটা তুলে নিলো একজন। ঘুরিয়ে ফিরিয়ে সন্ধানী দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো। তার মুঠি থেকে আর-একজন ছিনিয়ে নিলো। এই প্রক্রিয়ায় টাকাটা মেয়েপুরুষের জটলায় ঘুরপাক খেয়ে ফিরতে লাগলো। রুপালী মুদ্রার এই প্রথম আগমনকে বিস্ময় আর কৌতূহল দিয়ে অভ্যর্থনা জানালো কেলুরি গ্রামের মানুষেরা।

একসঙ্গে সকলে বলে উঠলো, "আমরা টাকা পাবো?"

"হু-হু, পাবি। ফাদারকে নিয়ে আসবো বস্তিতে। ফাদার আসতে চেয়েছে, তখন তোরা তাকে টাকার কথা বলবি।" সকলের মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে পাক খাইয়ে নিয়ে গেলো সারুয়ামারু। ফিসফিস গলায় বললো, "ফাদার এলে তোরা খুশী হবি তো? কেউ বর্শা দিয়ে ফুঁড়বি না?"

সকলে মুখ চাওয়াচাওয়ি শুরু করলো। শেষমেষ দ্বিধাভরা গলায় বললো, "আমরা কী জানি? সদ্দারকে জিজ্ঞেস কর তুই।"

"সদ্দার আর সদ্দার!" সারুয়ামারুর লাল-লাল দাঁতগুলো কড়মড় করে উঠলো, "সদ্দার তোদের টাকা দেবে! জানিস, টাকা দিলে সব মেলে। দুনিয়ার সব কিছু পাওয়া যায়। নিমক পাওয়া যায়, ধান পাওয়া যায়। গাড়ি চড়া যায়।"

"সব পাওয়া যায়!" কে যেন বলে উঠলো।

মানুষগুলো হতবাক হয়ে গিয়েছে। বলে কী সারুয়ামারু! ঐ সাদা-সাদা গোলাকার বস্তুগুলির এত যে মহিমা, তা কি তারা জানতো!

আচমকা মানুষগুলো হল্লা শুরু করে দিলো, "ঐই তো সদ্দার, ঐই তো সদ্দার এসেছে।"

জোরি কেসুঙের সামনে কালো একখানা পাথর খাড়া হয়ে উঠে গিয়েছে। সেটা ডিঙিয়ে জোহেরি কেসুঙে চলে এলো বুড়ো খাপেগা।

"কী রে, কী ব্যাপার? হল্লা করছিস যে! আরে সারুয়ামারু যে! এসেছিস কখন? কোহিমার গল্প বল শুনি।" এদিক-সেদিক তাকাতে লাগলো বুড়ো খাপেগা।

পাহাড়ী মানুষগুলো সমানে চিৎকার করতে লাগলো, "সদ্দার টাকা, টাকা।"

"টাকা এনেছে সারুয়ামারু। টাকা এনেছে।"

"কই দেখি!" সেঙাইর হাত থেকে টাকাটা তুলে বিস্মিত দৃষ্টিতে দেখতে লাগলো বুড়ো খাপেগা। বললো, "এ দিয়ে কী হয়!"

টাকার মহিমা সম্বন্ধে সারুয়ামারু আর একবার আলোক দান করলো। বললো, "জানিস সদ্দার, ফাদার আমাদের বস্তিতে আসবে বলেছে। অনেক টাকা দেবে। তুই বললে তাকে নিয়ে আসবো।"

সন্দিগ্ধ চোখে তাকালো বুড়ো খাপেগা, "টাকার বদলা কী দিতে হবে?"

"কিছুই না। খালি যীশু যীশু বলতে হবে। দু কাঁধে, কপালে আর বুকে আঙুল ঠেকাতে হবে। আনিজার নামে শুয়োর বলি দিতে পারবি না—"

সারুয়ামারুর গলা মাঝপথে থেমে গেলো। এর মধ্যে কেলুরি গ্রামের খাপেগা সর্দার গর্জন করে উঠেছে। ঘোলাটে চোখদুটো আগ্নেয় হয়ে উঠেছে, "কী বললি শয়তানের বাচ্চা? শুয়োর বলি বন্ধ করতে হবে! একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো না! তোর ফাদার বস্তিতে এলে আর জান নিয়ে ফিরতে হবে না। হুই সব বুকে-কপালে-কাঁধে আমরা হাত ঠেকাতে পারবো না।"

সারুয়ামারু চমকে উঠেছে। অপরিসীম আতঙ্কে ভয়ে মনটা কুঁকড়ে গিয়েছে, "আচ্ছা, ফাদারকে আসতে বলবো না। তুই যখন চাস না।"

"খবদ্দার, তোর ফাদার যেন এ বস্তিতে না আসে! আমাদের টাকা চাই না।"

"আচ্ছা।" কাঁপা গলায় বললো সারুয়ামারু। কিন্তু তার চোখদুটো ভয়ানক ক্রূর হয়ে উঠেছে।

"টাকা চাই না। চাই না।" পাহাড়ী মানুষগুলো একটানা শোরগোল করতে লাগলো, "হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

একসময় বুড়ো খাপেগা বললো, "নিমক এনেছিস কোহিমা থেকে?"

সারুয়ামারু গোলাকার কামানো মাথা ঝাঁকালো, "হু-হু, আমার ঘরে আছে। সকলে নিয়ে যাস। এইবার নিমকের দর খুব চড়া। মাধোলাল এক খুদি নিমকের বদলা এক খুদি কস্তুরী নিয়েছে কিন্তু।"

"আচ্ছা, আচ্ছা। এবার কোহিমার গল্প বল সারুয়ামারু।" একখানা বাদামী রঙের পাথরের ওপর বসলো বুড়ো খাপেগা। আর জোহেরি কেসুঙের চত্বরে হুটোপাটি করতে করতে বসে পড়লো কেলুরি গ্রামের মানুষগুলো।

সারুয়ামারু বললো, "জানিস সদ্দার, একটা ভারি ভালো মেয়ে বেরিয়েছে কোহিমাতে। আমি তাকে দেখেছি। সে আমাদের পাহাড়েরই মেয়ে।"

"কী নাম তার?"

"গাইডিলিও। মস্ত বড় মাথা, বড় বড় চোখ।" রূপময়ী এক পাহাড়ী নারীর বর্ণনা দিলো সারুয়ামারু।

"ভালো যে, বুঝলি কী করে?"

"তার চারপাশে সারা নাগা পাহাড়টা ভিড় জমিয়েছে। সে যাবে

ছোঁয়, তার রোগ ভালো হয়ে যায়। লোটা নাগারা, সাঙটামরা, সেমারা, কোনিয়াকরা—সব পাহাড়ী মানুষই তার ভক্ত হয়েছে।"

"বলিস কী?" বিস্মিত গলায় শব্দ করলো বুড়ো খাপেগা।

"সত্যি কথা। একটুও মিথ্যে নয়। সেঙাইর বাবা সিজিটোও গাইডিলিওকে দেখেছে। তাকে জিগ্যেস করে দেখিস।"

"সে ছুঁয়ে দিলে রোগ সেরে যায়! বলিস কী!"

"হু-হু। সবাই তাকে রানী বলে। জোয়ান মেয়ে, ষোলো বছর বয়েস হবে।"

আচমকা সেঙাই উঠে দাঁড়ালো। বললো, "আমি কোহিমা যাবো সারুয়ামারু। তুই আমাকে নিয়ে যাবি? রানী গাইডিলিওকে দেখবো।"

"হু-হু যাবি। তোর বাসভাড়ার টাকা দিয়ে দিয়েছে সিজোটো।" সারুয়ামারু বলে চললো, "কোহিমা কী সুন্দর শহর। এই বস্তি থেকে তোরা তো কোথাও যাবি না! গাড়ি দেখবি—"

"গাড়ি! সে আবার কী!"

রহস্যময় গলায় সারুয়ামারু বললো, "আমার সঙ্গে কোহিমা চল আগে। তোকে সব দেখাবো। গাড়ি দেখবি, পাকা বাড়ি দেখবি। আরো কত কী দেখবি!"

দুপুরের রোদ তীব্র হচ্ছে, তীক্ষ্ণ হচ্ছে। নসু কেহেঙ মাসের এই দুপুরে সিঁড়িখেতে ছোট ছোট বাঁশের ঘর থেকে ফসলের তামাটে অঙ্কুর পাহারা দেয় পাহাড়ী মানুষগুলো। দুষ্ট আনিজার দৃষ্টি থেকে, বুনো মোষের দাপাদাপি থেকে সিঁড়িক্ষেত রক্ষা করতে হয়। সকলে এক এক করে উঠে পড়লো। যাবার আগে সারুয়ামারুর কাছে তারা রানী গাইডিলিওর গল্প শুনলো। শুনতে শুনতে বিস্মিত হলো। কখনও বা মুগ্ধ। অপরূপ রূপকথার মত এক কাহিনী। যার নায়িকা গাইডিলিও স্বয়ং। তাঁর ছোঁয়ায় পুনর্জন্ম হয়। তাঁর নির্দেশে জরামৃত্যু কোথায় পালিয়ে যায়। ফেরারী হয়। গাইডিলিওর কাহিনী বাদ দিয়েও আর-একটা অপূর্ব বস্তু তাদের চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। সেটা একটা রুপার মুদ্রা। বুড়ো খাপেগার সঙ্গে সায় দিয়ে তারা যতই সারুয়ামারুর বিপক্ষে চেঁচাক, যতই হল্লা করুক, তবু টাকার কথা ভুলতে পারছে না। রানী গাইডিলিও আর টাকাটা অনেকদিন তাদের বিস্ময় আর আলোচনার প্রসঙ্গ হয়ে থাকবে।

খানিকটা পর সকলে জোহেরি কেসুঙ থেকে চলে গেলো।

সামনের কালো পাথরখানায় উঠে এলো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

সেঙাই বললো, "কোহিমা গেলে টাকা পাবো তো?"

"হু-হু, নিশ্চয়ই পাবি।" ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগলো সারুয়ামারু ফিসফিস করে বললো, "দেখলি, সদ্দারটা কী শয়তান! ফাদারকে কিছুতেই আসতে দেবে না। আচ্ছা, আমিও দেখে নেবো! যখন বন্দুক নিয়ে ফাদাররা আসবে, তখন কী করে সদ্দার শয়তানটা ঠেকায়, আমিও দেখবো।" শেষ পর্যন্ত এত আস্তে বললো, সেঙাই শুনতে পেলো না। "ভালোয় ভালোয় বলছি কি না?"

সারুয়ামারুর কথাগুলোর দিকে বিন্দুমাত্র খেয়াল নেই সেঙাইর। তার সমস্ত ভাবনাকে ভরে রেখেছে দুটো অভিনব বস্তু। একটি রুপার মুদ্রা, অপরটি রানী গাইডিলিওর গল্প। অন্যমনস্কের মত সেঙাই বললো, "রানী গাইডিলিওকে দেখাবি তো?"

"দেখাবো।" এতক্ষণ বিড়বিড় করছিলো সারুয়ামারু, এবার সোজাসুজি চোখে তাকালো, "তুই কোথায় যাবি সেঙাই? আমি এবার আমাদের কেসুঙে ফিরবো। শরীরটা বড় খারাপ লাগছে।"

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলো সেঙাই, "যা, যা। আমি সব বুঝি। বউয়ের কাছে না গেলে আরাম হচ্ছে না। শরীর খারাপ, অথচ বউয়ের সঙ্গে ফুর্তি তো থামাচ্ছিস না। কোহিমা থেকে ফিরেই তো ঘরে ঢুকেছিস! তুই একটা আস্ত শয়তান। ভাবলাম, গাইডিলিওর কথা ভালো করে শুনবো একটু—"

"রাত্তিরে মোরাঙে বসে গল্প বলবো।" আর দাঁড়ালো না সারুয়ামারু হনহন করে জোরি কেসুঙের দিকে পা বাড়িয়ে দিলো।

আর কালো পাথরখানার ওপর দাঁড়িয়ে এক নজরে সারুয়ামারুর গমনপথের দিকে তাকিয়ে রইলো সেঙাই। এখনকার মত গাইডিলিও সম্বন্ধে তার কৌতূহল মিটলো না। অপরিসীম আগ্রহটা উদগ্র হয়ে রইলো।

একুশ

টেনেন্যু মিঙ্গেলু। বউপণ। সেই বউপণ এসেছে নানকোয়া গ্রাম থেকে। পাঠিয়েছে মেজিচিজুঙের বাপ রাঙসুঙ। দুটো জোয়ান ছেলে এসেছিল বেঙমাপানি নদীর ওপারে মাঝারি আকারের গ্রাম নানকোয়া থেকে। সঙ্গে চারখানা খারে বর্শা। অতিকায়। সেগুলোর গড়নের মধ্যে অতীতের ছাপ রয়েছে, প্রাচীনত্বের সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটে আছে। আর যৌতুক হিসেবে এসেছে কড়ির গয়না, কানের নীয়েঙ দুল, হাতির দাঁতের হার। মোষের শিঙের মুকুট। তার দুপাশে হরিণের শিঙের বাহার। পিতলের গলাবন্ধ। আটর্ ফুলের সাজসজ্জা। আর সাধারণ গড়নের পঞ্চাশখানা বর্শা।

সকালবেলায় জোয়ান ছেলে দুটো এসে পৌঁছেছিলো। মেহেলীর বাপ সাঞ্চামখাবা আদর করে তোয়াজ করে তাদের নিয়ে বসিয়েছে বাইরের ঘরে। টাটকা চোলাই পীতা মধু দিয়েছে বাঁশের পানপাত্র ভরে, চাকভাঙা সোনালী মধু দিয়েছে। হুণ্টসিঙ পাখির মাংস দিয়ে কাবাব বানিয়ে সাজিয়ে দিয়েছে কাঠের বাসনে। জোয়ান ছেলে দুটো বেশ তরিবত করে কাবাব চিবুচ্ছে। তারিয়ে তারিয়ে পীতা মধুর পাত্রে চুমুক দিচ্ছে একজন। আর একজন সোনালী মধু চুকচুক করে জিভ দিয়ে টেনে নিচ্ছে।

সমস্ত সালুয়ালাঙ গ্রামখানা পোকরি কেসুঙটার চারপাশে ভেঙে পড়েছে। সাঞ্চামখাবার বাইরের ঘরে একখানা তিনকোণা পাথরে জাঁকিয়ে বসেছে গ্রামের বুড়ো সর্দার। সালুয়ালাঙ গ্রামের সমস্ত বংশের প্রাচীন মানুষগুলো পাশাপাশি ঘন হয়ে বসেছে। তাদের সামনেও পীতা মধুর ভরাপাত্র। পাখির মাংসের কাবাব।

এখন নুসু কেহেঙ মাসের দুপুর। নিঃসীম আকাশটা পুড়ে পুড়ে যাচ্ছে যেন। দুপুর জ্বলছে, কিন্তু এই পাহাড়ী পৃথিবীর রোদে জ্বালা নেই। স্নিগ্ধ মমতায় এই রোদ মনোরম, বড় আমেজী।

বুড়ো সর্দার বললো, "তোরা তো সব নানকোয়া বস্তি থেকে এলি। তাই না?"

জোয়ান ছেলে দুটো মাথা নাড়লো, "হু-হু।"

"তা টেনেম্যু মিঙ্গেলু (বউপণ) সব এনেছিস ?"

"না, সব আনি নি। আজ মেয়ের জন্য খানিকটা বায়না দিয়ে যাবো। কাল সন্ধ্যের সময় মেজিচিজুঙের পিসি আসবে। সে-ই টেকোয়েঙ কেজিঙ্গু (ঘটকী)। সে এসে বিয়ের ব্যবস্থা পাকাপাকি করে গেলে বাকি পণ দিয়ে যাবো।" পাখির মাংসের কাবাবে লুব্ধ কামড় দিয়ে একটা জোয়ান ছেলে বললো।

সহসা বিমর্ষ গলায় বুড়ো সর্দার বললো, "আমার মেয়ে লিজোমুটার বিয়ে হয়ে যেত অ্যাদ্দিনে। জুকুসিমা বস্তি থেকে তার জন্যেও তো বউপণ এসেছিলো।"

"হু-হু—" কাবাবের উপর লাল-লাল দাঁতের কামড় বসাতে বসাতে কি রোহি মধু গিলতে গিলতে প্রাচীন মানুষগুলো মাথা দোলাতে লাগলো, "হু-হু, তা হতো।"

বুড়ো সর্দারের বিষাদ তাদেরও যেন এই মুহূর্তে স্পর্শ করেছে।

নানকোয়া গ্রামের একটা জোয়ান বললো, "কী হলো তোর মেয়ের ? কী রে সদ্দার ?" ছেলেটার চোখমুখ আগ্রহে ঝকমক করছে।

"কী যে হলো, তা কি জানি ? কেলুরি বস্তির সেঙাইকে যেদিন পোড়াই, সেদিন থেকেই মেয়েটা নিখোঁজ। বাঘের পেটে গেলো, না রেন্‌জু আনিজা খাদে ফেলে মারলো, না কি বুনো মোষ শিঙ দিয়ে ফুঁড়ে সাবাড় করলো, জানতেই পারলাম না। হুই কেলুরি বস্তির শত্তুররাই বর্শা দিয়ে ফুঁড়লো কিনা তাই বা কে জানে !" একটা অসহায় দীর্ঘশ্বাস পড়লো বুড়ো সর্দারের।

কিছু সময় চুপচাপ। সাঞ্চামখাবার এই ছোট বাইরের ঘরটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইলো।

একটু পরে আবার বুড়ো সর্দারই বললো, "যেতে দে, যেতে দে ও-সব। পাহাড়ী মানুষ আমরা। এমনি করেই আমাদের জান সাবাড় হয়।"

"হু-হু।" নানকোয়া গ্রামের জোয়ান দুটো চেঁচামেচি করে সায় দিলো।

বুড়ো সর্দার তাকালো সাঞ্চামখাবার দিকে, "কী রে, মেহেলীর মামা কই ? তাকে খারে বর্শা দেবে ওরা। নইলে যে ছেলেপিলে হবে না মেহেলীর।"

"সে তো নিমক আনতে মোককচঙ গিয়েছে।" নিরুপায় গলায় বললো সাঞ্চামখাবা, "তা হলে কী হবে সদ্দার ?"

"কী আবার হবে ? সে আসবে কবে ?"

"তার কিছু ঠিক নেই।"

"তবে তোর নিজের খারে বর্শা দুটো নিয়ে নে।"

পাহাড়ী মানুষগুলোর মধ্যে বিয়ের প্রথমে একটি প্রথা আছে। সে প্রথাটি হলো, পাত্রপক্ষ থেকে বউপণ হিসেবে দুটি খারে বর্শা মেয়ের বাপ আর বড় মামাকে দিতে হয়। বড় মামা এই খারে বর্শা না পেলে, এদের বিশ্বাস, বিবাহিতা মেয়ে ঋতুমতী হয় না। সন্তানের সম্ভাবনা থাকে না। অবশেষে অ-বৎসা নারী ডাইনী হয়।

হাত বাড়িয়ে দুটো খারে বর্শা নিয়ে নিলো সাঞ্চামখাবা। অনেক দিনের পুরনো বর্শা। বউপণের জন্যই এই বর্শাগুলোর প্রচলন। এগুলোকে শান দেওয়া হয় না, অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা হয় না। পরম আদরে বাঁশের খাপের মধ্যে এগুলোকে ভরে রাখা হয়। বিয়ে ছাড়া অন্য সময় এগুলো ছোঁয়া পর্যন্ত হয় না। তাই বর্শার ফলায় লালাভ কলঙ্ক জমে রয়েছে।

খারে বর্শার ফলা দুটো নিয়ে সাঞ্চামখাবা বললো, "তা হলে সদ্দার, মেহেলীর মামার কী হবে ?"

"মোককচঙে কাউকে দিয়ে খবর পাঠা। আর শোন, তোদের একটা কথা বলতে ভুলে গেছিলাম। শোন তোরা।" বুড়ো সর্দার বাইরের দিকে তাকালো।

কেসুঙের সামনে সমস্ত সালুয়ালাঙ গ্রামখানা জটলা পাকাচ্ছে। সর্দারের ডাকে একটা ঠাসবুনন ভিড় দরজার কাছে ঘন হয়ে এলো, "কী সদ্দার ? কী বলছিস ?"

"সেদিন সায়েবরা এসেছিলো, মনে আছে ?"

"হু-হু। সায়েবরা কী ভালো ? টাকা দিয়েছে। কাপড় দিয়েছে। মজার মজার খাবার দিয়েছে।" সালুয়ালাঙ গ্রামের মেয়েপুরুষ একসঙ্গে শোরগোল করে উঠলো।

"যীশু, যীশু। মেরী, মেরী—" পাহাড়ী গ্রামটা মেতে উঠতে লাগলো।

দিন কয়েক আগে সালুয়ালাঙ গ্রামে দুজন পাত্রী এসেছিলো। তারা পাহাড়ী মানুষগুলোর মধ্যে অনেক টাকা, নানা রঙের, নানা আকারের বাহারী কাপড়-জামা ছড়িয়ে গিয়েছে। আর সেই সঙ্গে দিয়ে গিয়েছে এক অপূর্ব আলোক। বেথেলহেমের এক অনির্বাণ নক্ষত্রকে এই ছোট্ট পাহাড়ী

জনপদ সালুয়ালাঙের আকাশে চিরস্থায়ী করে রাখার সব রকম বন্দোবস্ত করে গিয়েছে। কোন দিকে বিন্দুমাত্র ত্রুটি হয় নি। যীশু! এই নামটিকে আদিম পাহাড়ী মানুষগুলির হাড়ে হাড়ে উৎকীর্ণ করতে চেয়েছে পাদ্রী সাহেবরা। সকলের কানে কানে একটি অমোঘ মন্ত্র দিয়ে গিয়েছে। সে মন্ত্রের নাম যীশু। সকলের আঙুলের ডগায় একটি মাত্র ক্রশ আঁকার কায়দা শিখিয়ে দিয়ে গিয়েছে।

পাহাড়ী মানুষগুলোর কেউ কেউ দুই বাহুসন্ধি বুক আর কপাল আঙুল দিয়ে ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রশ আঁকতে লাগলো!

বুড়ো সর্দার বললো, "কাল সায়েবের লোক এসেছিলো আমাদের বস্তিতে।"

"কই, আমরা তো জানি না।" সকলে তারস্বরে চেঁচামেচি শুরু করে দিলো।

"তোরা তখন সিঁড়িখেতে গিয়েছিলি।"

"সায়েবরা আবার টাকা দিয়েছে? মজার মজার কাপড় দিয়ে গেছে আমাদের জন্যে? কী রে সর্দার?" বলতে বলতে জনকয়েক ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

প্রশ্নগুলো শুনে বুড়ো সর্দারের ঘন ভুরুজোড়া কয়েক মুহূর্ত কাঁকড়াবিছার মত কুঁকড়ে রইলো। আচমকা কালকের কথা মনে পড়লো। সকলের অগোচরে পাদ্রীসাহেবের লোকটা তার থাবায় অনেকগুলো রুপার মুদ্রা গুঁজে দিয়ে গিয়েছিলো আর লাল রঙের একটা কাপড় দিয়েছিলো। টাকার মহিমা জানে বৈ কি বুড়ো সর্দার। এর আগেও অনেকবার কোহিমা-মাও-এর শহরে-বাজারে গিয়েছে সে।

পাদ্রীসাহেবের লোক! নামটা ভুলে গিয়েছে বুড়ো সর্দার! তবে মানুষটা তাদেরই মত পাহাড়ী। তাদেরই মত তার চোখের মণি পিঙ্গল। কিন্তু পরনে সাহেবদের মত সাদা কাপড়। হুন্টসিঙ পাখির পালকের মত ধবধবে। কাপড়টার নামও কী যেন বলছিলো লোকটা। সারপ্লিস শব্দটি বেমালুম ভুলে গিয়েছে বুড়ো সর্দার।

সাহেব পাদ্রীর লোক। তাদের দেশের পাহাড়ী পাদ্রী। বুনো সাহেব। সেই মানুষটাই ফিসফিস করে বলেছিলো, "তোকে একবার কোহিমা যেতে হবে, ফাদার যেতে বলেছে। আরো টাকা পাবি, কাপড় পাবি। নিমক

পাবি। লবণ-জলের ঝরনার জল আর টক আপুক্ফু ফল গিলে মরতে হবে না। আরো কত কী পাবি!"

টাকা! কাপড়! নিমক! শুনতে শুনতে বুড়ো সর্দার বিচলিত হয়ে গিয়েছিলো। বলা যায় একেবারেই বিভ্রান্ত হয়েছিলো। শব্দ তিনটে বার বার উল্টেপাল্টে অস্ফুট গলায় উচ্চারণ করেছিলো। লুব্ধ চোখজোড়া তাজা মাছের আঁশের মত চকচক করছিলো। জড়ানো গলায় সে শুধু বলতে পেরেছিলো, "যাবো, নিশ্চয়ই যাবো।"

ইতিমধ্যে মানুষগুলো আবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে. "কী রে সর্দার, বলছিস না কেন? দিয়ে গেছে টাকা? কাপড় দিয়েছে?"

একটু চমকে উঠলো বুড়ো সর্দার। পাহাড়ী মানুষ। মিথ্যাচার করতে বিবেক ঠিক সায় দিয়েও দিচ্ছে না। তবু কয়েক মুহূর্তের মধ্যে কর্তব্য স্থির করে ফেললো। সহসা দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে চিৎকার করে উঠলো সে, "না রে শয়তানের বাচ্চারা। টাকা দিয়ে কী করবি? টাকা দিয়ে কী হয়, জানিস? কোহিমা-মোককচঙে কোনদিন গেছিস টেফঙের ছায়েরা!"

বুড়ো সর্দার আর মেহেলীর মামা ছাড়া সালুয়ালাঙ গ্রামের অন্য কেউ শহরে-বাজারে যায় নি। টাকা দিয়ে কী নিদারুণ ভোজবাজি, কী অসম্ভব ভেলকি দেখানো যায়, তা তারা কেউ জানে না। শুধু কোলাহল করে উঠলো পাহাড়ী মানুষগুলো, "হু-হু, টাকা দিয়ে আবার কী হবে? দেওয়ালের খুঁটি ফুটো করে রাখবো। সিঁড়িখেতে পুঁতে দেবো। সায়েব বলেছিলো, টাকা হলো আউই ভু (জমির উর্বরতার জন্য ভাগ্য-পাথর)। জমিতে পুঁতে দিলে সার ভালো হবে। জোয়ার ফলবে অনেক। ভালো ধান ফলবে।"

"হু-হু।" শুকনো তামাকপাতার মত হেজে-যাওয়া মাথাখানা দোলালো বুড়ো সর্দার, "সায়েবের লোক এসেছিলো। সায়েব আমাকে কোহিমা যেতে বলেছে। টাকাকড়ি কিছু দেয় নি।"

আচমকা বাইরের ঘরের সামনে আলোড়ন দেখা দিলো। বুনো মোষের মত জমায়েত মানুষগুলোকে ছত্রখান করে, ধাক্কা মেরে, গুঁতো দিয়ে, উল্টে-পাল্টে সাঁ-সাঁ করে একটা জোয়ান ছেলে এলো। রীতিমত হাঁফাচ্ছে সে, সারা দেহটা উত্তেজনায় কাঁপছে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে।

বাইরের চত্বরে চিৎকার শুরু করে দিয়েছে মানুষগুলো। ঠাসবুনন

ভিড়ের মধ্যে পথ করে নিতে গিয়ে জোয়ান ছেলেটার ধাক্কায় কেউ পাথরে ছিটকে পড়ে মাথা ফাটিয়ে ফেলেছে। কেউ কেউ আছড়ে পড়েছে মাটির ওপর।

উত্তেজিত গলায় জোয়ানটা বললো, "সব্বনাশ হয়ে গেছে সদ্দার—"

"কী ব্যাপার? কী হয়েছে রে ইমটিটামজাক?" বুড়ো সর্দার ভুরু কুঁচকে তাকালো।

"টিজু নদীর ওই দিকে সেঙাইকে দেখে এলুম। শিকারে বেরিয়েছে। কেলুরি বস্তির আরো অনেক লোক রয়েছে তার সঙ্গে।" সমানে হাঁপিয়ে চলেছে ইমটিটামজাক।

"বলিস কী?" সকলে চমকে উঠলো।

বিস্মিত গলায় বুড়ো সর্দার বললো, "সে কী! সেদিন তো সেঙাইকে পুড়িয়ে মারলুম!"

"সেঙাইকে পুড়িয়েছিস! ওই সালুনারু শয়তানী ভুল খবর দিয়েছিলো। আহে ভু টেলো।" কুৎসিত মুখভঙ্গি করে বললো ইমটিটামজাক।

"সালুনারুকে আমি বর্শা দিয়ে ফুঁড়বো। ওর মুণ্ডু মোরাঙে ঝুলিয়ে রাখবো।" বর্শা বাগিয়ে লাফিয়ে উঠলো বুড়ো সর্দার।

আর ঠিক সেই সময় বাইরের ভিড় থেকে একটা নগ্ন নারীমূর্তি সামনের ঘন জঙ্গলে দৌড়ে পালালো।

সঙ্গে সঙ্গে শোরগোল উঠলো, "সালুনারু পালালো, পালালো।"

"টেমে নটুঙ।" একটা কদর্য গালাগালি আউড়ে আবার পাথরখানার ওপর বসে পড়লো বুড়ো সর্দার, "কেলুরি বস্তির ওই সালুনারু মাগীকে আমাদের বস্তিতে দেখলে টুকরো টুকরো করে কাটবো।"

সহসা সাঙ্কামখাবা বললো, "সে-সব পরে হবে। এখন পণ নিয়ে নি সদ্দার; কী বলিস তুই?"

"হু-হু।" সায় দিলো বুড়ো সর্দার। তারপর তাকালো নানকোয়া গ্রামের জোয়ান ছেলেদুটোর দিকে। বললো, "তোদের সঙ্গে তো কটুম্বিতে হচ্ছে। মেহেলীকে বিয়ে করবে তোদের মেজিচিজুঙ।"

"হু-হু।" একসঙ্গে মাথা দোলালো জোয়ান দুটো।

"তোরা আমাদের বন্ধু হবি। কুটুম হবি।"

"হু-হু—"

"বুঝলি, হুই কেলুরি বস্তিকে শায়েস্তা করতে হবে। ওরা আমাদের শত্তুর।" বুড়ো সর্দার বাইরের ঘর থেকে তর্জনী বাড়িয়ে দিলো টিজু নদীর ওপারে কেলুরি গ্রামের দিকে।

"হু-হু!"

সর্দার গর্জে উঠলো, "হুই বস্তি থেকে চর রেখেছে সালুনারুকে। মাগীর মুণ্ডু ছিঁড়ে মোরাঙের সামনে গেঁথে রাখবো।" একটু দম নিয়ে আবার বললো, "তোরা যখন আমাদের বন্ধু, আমাদের সঙ্গে একজোট হবি।"

"কেন?"

"কেন আবার। ওদের সঙ্গে যদি লড়াই বাধে, তখন লোকের দরকার হবে। সেই জন্যে আমাদের একজোট হতে হবে।"

"হু-হু।" মাথা ঝাঁকালো জোয়ান দুটো। বললো, "আমাদের সর্দারকে সে কথা বলতে হবে। সে বললে, আমরা জান দিতে পারি। না বললে কিন্তু কিছুই করবো না।"

বুড়ো সর্দার রক্তচোখে তাকালো। "আমাদের সঙ্গে মিলে হুই কেলুরি বস্তির সঙ্গে লড়াই না করলে কিন্তু মেহেলীর বিয়ে দেবো না তোদের বস্তিতে। সিধে কথা।"

সাঁ করে উঠে দাঁড়ালো বুড়ো সর্দার। তার থাবায় খরধার বর্শার ফলায় দুপুরের রোদ ঝকমক করছে। তাকে ভয়ানক দেখাচ্ছে।

বাইশ

বিকেলের দিকে নানকোয়া গ্রামের ছেলে দুটো চলে গিয়েছে। বুড়ো সর্দার আর সালুয়ালাঙ গ্রামের প্রাচীন মানুষগুলো পোকরি কেসুঙ থেকে বিদায় নিয়েছে। বাইরের ঘরের সামনে পাহাড়ী মানুষগুলোর যে জটলা ছিলো, তাও এখন আর নেই।

সন্ধ্যা হতে দেরি নেই। পশ্চিম পাহাড়ের চূড়ায় ধূসর ছায়া নেমে আসছে।

বাইরের ঘরে এসে ঢুকলো মেহেলী আর পলিঙা। সারাদিন তারা উপত্যকায় ঘুরে ঘুরে শুকনো পাতা আর কাঠ কুড়িয়েছে। খবরটা আগেই পেয়েছিলো। গ্রামের একটি মেয়ে এমন সরস খবরটা বেশ রসিয়ে রসিয়েই দিয়ে এসেছিলো।

"বুঝলি মেহেলী, নানকোয়া বস্তি থেকে তোর বিয়ের পণ এসেছে।"

"বিয়ের পণ কেন?" চমকে উঠেছিলো মেহেলী।

"কেন আবার? তোর যে বিয়ে। ভোজ হবে বেশ। তোর আর কী? এবার ঘরে মরদমানুষ পাবি, আমাদের মতো পাহাড়ে পাহাড়ে ছোঁক-ছোঁক করতে হবে না।" দীর্ঘশ্বাস পড়লো যুবতী মেয়েটির। তারপরেই উৎসাহিত গলায় বললো, "ভ্যাখ গিয়ে তোদের কেসুঙে বস্তির সব লোক জড়ো হয়েছে।"

কথাগুলো যেন কানের ওপর গরম চর্বি ঢেলে দিয়েছিলো। আর এক মুহূর্তও দাঁড়ায় নি মেহেলী। সমস্ত শরীরটা, এই পাহাড়ী বন, অস্ফুট ভাবনা— সব যেন অসহ্য হয়ে উঠেছিলো। সহসাই সামনের টিলায় উঠে সাঁ-সাঁ করে গ্রামের দিকে দৌড়াতে শুরু করেছিলো মেহেলী; তার পেছন পেছন ছায়ার মত ছুটেছিলো পলিঙা। আর সেই দৌড় পোকরি কেসুঙের বাইরের ঘরে এসে থেমেছিলো।

মাচানের ওপর বসে বেশ তারিয়ে তারিয়ে রোহি মধু খাচ্ছিলো সাঞ্চামখাবা। মেহেলীকে দেখে শান্ত গলায় বললো, "এই মেহেলী, তোর বিয়ের পণ এসেছে। ওই নানকোয়া বস্তির মেজিচিজুঙের সঙ্গে তোর বিয়ে।"

"মেজিচিজুঙ তো বাঘ-মানুষ! আমি হুই শয়তানকে বিয়ে করবো না।"

"কী বললি?" হুমকে উঠলো সাঞ্চামখাবা। উত্তেজনায় হাতের পিঠে পুরু ঠোঁটদুটো ঘন ঘন মুছতে লাগলো।

"কী আবার বলবো! আমি হুই মেজিচিজুঙকে বিয়ে করবো না।" জেদী গলায় মেহেলী বললো।

"ওরে ধাড়ী টেফঙ; ইজা হুবুতা!" মুখখানা কদাকার করে বিশ্রী গালাগালটা উচ্চারণ করলো সাঞ্চামখাবা। নির্বিবাদে, নির্দ্বিধায়। "আমি বিয়ের পণ নিয়েছি, আর শয়তানী বিয়ে করবে না? তোর বাপ করবে। আর তুই তো সেদিনকার ছানারে রামখোর বাচ্চা।"

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে মেহেলী বললো, "আমি হুই কেলুরি বস্তির সেঙাইকে বিয়ে করবো। ও আমার পিরীতের জোয়ান।"

কান দুটো বিশ্বাসঘাতকতা করছে না তো! বলে কী মেহেলী! বর্শা দিয়ে জিভখানা উপড়ে আনবে নাকি মেহেলীর! সাঞ্চামখাবার চোখ দুটো ভয়ঙ্কর হয়ে উঠলো। মুখ ভেঙচে সে বললো, "পিরীতের জোয়ান! সেঙাইকে বিয়ে করবি! ইজা রামখো। আজ হরিণের মত ছাল ছাড়িয়ে ফেলবো তোর—"

মাচানের ওপাশ থেকে একটা বর্শা টেনে নিলো সাঞ্চামখাবা। খরধার ফলা। সেই ফলায় মৃত্যু ঝিলিক দিয়ে উঠলো। কিন্তু বর্শা দিয়ে তাক করার আগেই ঘর থেকে লাফিয়ে বাইরে পড়লো মেহেলী, তার পিছনে পলিঙা।

সোনালী বিকেল। সামনের জঙ্গলে অদৃশ্য হলো দুটি পাহাড়ী যুবতী!

টিজু নদীর কিনারায় এসে পলিঙা বললো, "এবার কী করবি মেহেলী?"

"কী আর করবো? সেঙাইকে খুঁজে বার করবো। অনেকদিন ওর দেখা পাই নি। কী যে হয়েছে, বুঝতেই পারছি না।"

"অনেকদিন সেঙাই এদিকে আসে না। বস্তিতে ফিরে আর কোন জোয়ানীর সঙ্গে পিরীত জমিয়ে বসলো না তো! পাহাড়ী জোয়ানের মন বোঝা দায় মেহেলী। যখন যে মাগীর গন্ধ পায়, তখন তার কথাই বলে। তোকে ভুলে গেলো না তো সেঙাই?" পলিঙার দু চোখে কৌতুক ঝিকমিক করছে।

বুকটা ছাঁত করে উঠলো মেহেলীর। তাই তো, পাহাড়ী পুরুষের মন। তার স্থায়িত্ব কতখানি? সে তো ঘাসের ফলায় শিশিরের আয়ু। কেলুরি

গ্রামেও তো অনেক কুমারী কন্যা সুঠাম দেহের রূপ খুলে পুরুষের চোখের সামনে ঘুরে বেড়ায়। বিভ্রম ছড়ায়। সেই পার্বতী যুবতীদের কেউ কি ডাইনী নাকপোলিবার মন্ত্রপড়া শিকড় দিয়ে বশ করলো সেঙাইকে !

কাঁপা গলায় মেহেলী বললো, "একবার দেখে আসি। সেঙাইর কাছে না পালালে বাপ আমাকে ঠিক খুন করে ফেলবে। একেবারে খতম। সদ্দারও বস্তিতে টিকতে দেবে না। তুই একটু দাঁড়া এপারে, আমি ওপারে গিয়ে সেঙাইকে খুঁজি। আমি কিছুতেই মেজিচিজুঙকে বিয়ে করবো না।"

পলিঙা বললো, "সাবধানে যাবি। ওরা কিন্তু আমাদের বস্তির শত্তুর!"

টিজু নদী পেরিয়ে সেই নিঃশব্দ ঝরনাটার পাশে এসে দাঁড়ালো মেহেলী। কেউ কোথায়ও নেই। মনে পড়লো, এখানেই তার সঙ্গে প্রথম দেখা হয়েছিলো সেঙাইর। অনেকটা সময় অপেক্ষা করলো মেহেলী। ঘনবনের ফাঁক দিয়ে যখন জাফরি-কাটা রোদ মিলিয়ে গেলো, ঠিক তখনই কেলুরি বস্তির দিকে সে পা চালিয়ে দিলো।

কর্তব্য স্থির হয়ে গিয়েছে। যেমন করে হোক, সেঙাইর সঙ্গে আজ দেখা করতেই হবে। সাঞ্চামখাবার বর্শার খরধার ফলা থেকে, মেজিচিজুঙের বিয়ের বাঁধন থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে সে পালিয়ে এসেছে সেঙাইর আশ্রয়ের আশায়। সেঙাইকে নিয়ে দূর পাহাড়ের উপত্যকায় ঘর বাঁধবে। সেঙাইর দুটি বাহুর বেষ্টনে পাহাড়ী মেয়ে মেহেলী এই মুহূর্তে নিরাপদ শান্তি আর স্বস্তি কল্পনা করলো। তার জীবনে সেঙাইকে বড় প্রয়োজন, একান্তভাবে প্রয়োজন।

খাড়া চড়াই থেকে নীচের দিকে নামতে নামতে একটা কলরব শুনতে পেলো মেহেলী। মানুষের গলা। চট করে সামনের বড় পাথরখানার আড়ালে সে সরে দাঁড়ালো।

বাঘনখের আঁচড়ের মত ফালি ফালি পথের রেখা। সেই পথ ধরে দুলতে দুলতে আসছে একদল পাহাড়ী মানুষ। তাদের শোরগোলে স্তব্ধ বনভূমি চকিত হয়ে উঠেছে। নিশ্চয়ই এরা কেলুরি গ্রামের মানুষ। বুকের মধ্যে নিশ্বাসটা আটকে গেল। নিথর হয়ে রইলো মেহেলী।

একটা গলা শুনতে পাওয়া গেলো, "সেঙাইটাকে কোহিমার পথে দিয়ে এলুম তো সদ্দার। সারুয়ামারুটাও সঙ্গে গেলো। কোহিমা থেকে ও ফিরবে তো!"

একটা বুড়ো পাহাড়ী, নিশ্চয়ই সে দলপতি, মাথা ঝাঁকালো, "হু-হু, ফিরবে। নির্ঘাত ফিরবে। তুই যে গাইডিলিওর কথা বলেছিলো সারুয়ামারু,

কেমনতরো মেয়ে সে, তাই দেখতেই পাঠালাম। নইলে টাকা দিয়েছে বলে কি সিজিটোর কাছে পাঠাতুম নাকি? শয়তানের বাচ্চা হুই সায়েবরা সারুয়ামারুকে বলে দিয়েছে আনিজার নামে শুয়োর বলি দিতে দেবে না। আচ্ছা, একবার আমাদের বস্তির দিকে আসে যেন সায়েবরা!"

কে একজন বললো, "সায়েবরা বড় বশ করতে পারে। হুই ডাইনী নাকপোলিবার মত। সায়েবদের কাছে সিজিটো গেলো, সারুয়ামারু গেলো—আর বস্তিতে ফিরে খালি তাদের কথাই বলে ওরা। কী মন্তর যে জানে সায়েবরা! সেঙাইটা কোহিমা থেকে আবার সে রকম না হয়ে ফেরে।"

সর্দার মাথা নাড়লো, "না, না, সেঙাই তেমন ছেলে না।"

সেঙাই তবে কোহিমা চলে গিয়েছে! বুকখানা ধক্ করে উঠলো মেহেলীর। তবে, তবে সে এখন কী করবে? কী সে করতে পারে? কোনক্রমেই নিজেদের বস্তিতে সে আর ফিরতে পারবে না। সাঞ্চামখাবা তার চামড়া উপড়ে নেবার জন্য বর্শাটাকে নিশ্চয়ই শান দিচ্ছে এতক্ষণ ধরে। আচমকা তার মুখ থেকে ছিটকে বেরিয়ে এলো কথাগুলো, "সেঙাই, সেঙাই কবে আসবে?"

পাহাড়ীগুলো পাথরখানার সামনাসামনি এসে পড়েছিলো। মানুষের গলা শুনে থমকে দাঁড়ালো, "কে? কে?"

তাদের থাবায় বর্শার ফলাগুলো ঝকমক করে উঠলো।

একজন বললো, "হুই, হুই যে। হুই পাথরের আড়ালে—"

পাথরের আড়াল থেকে ভীরু গলায় গুঙিয়ে উঠলো মেহেলী, "আমাকে মারিস না, আমাকে মারিস না। আমি মেহেলী, তোদের বস্তির সেঙাইর লাগোয়া লেন্যু (প্রেমিকা)।"

নিমেষে মেহেলীকে চার কিনার থেকে ঘিরে ধরলো কেলুরি গ্রামের জোয়ান ছেলেরা। ওঙলে, পিঙলেই, পিঙকুটাঙ, এমনি অনেকে। বুড়ো সর্দার খাপেগাও রয়েছে তাদের মধ্যে।

সেঙাই আজ চলে গেলো কোহিমায়। সঙ্গে গেলো সারুয়ামারু। ওঙলেরা মাও-এর পথে এইমাত্র তাদের তুলে দিয়ে ফিরছে।

বুড়ো খাপেগা বিস্মিত গলায় বললো, "তুইই তবে মেহেলী।"

"হু-হু, সেঙাইর লাগোয়া লেন্যু। আমাকে মারিস না তোরা।" করুণ চোখে তাকিয়ে রইলো মেহেলী।

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—" তুমুল হুলস্থুল বাধিয়ে দিলো মানুষগুলো।

বুড়ো খাপেগা হুমকে উঠলো, "থাম শয়তানের বাচ্চারা।" তারপরেই মেহেলীর দিকে কোমল চোখে তাকালো, "না, তোকে মারবো না।"

ওঙলে বললো, "জেঠা, ওকে নিয়ে চল আমাদের বস্তিতে। সেঙাই কোহিমা থেকে ফিরলে বিয়ে দিয়ে দেবো।"

কে যেন বললো, "বেশ বাগে পেয়ে গেছি।"

খোঁচা-খাওয়া বাঘের মত গর্জে উঠলো বুড়ো খাপেগা, "কী, বাগে পেয়ে ওকে ধরে নিয়ে বিয়ে দিতে চাস? কেলুরি বস্তির ইজ্জত ডুবোতে দেবো না। হু-হু, তেমনি পাহাড়ী সদ্দার আমি না। লড়াই করে হুই সালুয়ালাঙ বস্তি থেকে ওকে ছিনিয়ে আনবো। তারপর বিয়ে হবে। আমাদের কলিজায় রক্ত নেই! লড়াই করতে আমরা ডরাই নাকি?"

ঘোলাটে চোখ দুটো রক্তাভ হয়ে উঠেছে বুড়ো খাপেগার। বুড়ো খাপেগা, কেলুরি গ্রামের অতীতকাল সে। আদিম বীরত্বের প্রতীক। বন্য আর পাহাড়ী মানুষদের দলনেতা। বুড়ো খাপেগা তাকালো মেহেলীর দিকে। বললো, "তুই তোদের বস্তিতে ফিরে যা। তোদের সদ্দারকে বলিস, তোকে আমরা ছিনিয়ে এনে সেঙাইর সঙ্গে বিয়ে দেবো। সে যেন ঠেকায়। সেঙাইর ঠাকুরদাকে তোরা মেরেছিস। তোদের পোকরি বংশের নিতিৎসুকে আনতে গিয়ে সেদিন আমরা হেরে গিয়েছিলাম। এবার তোকে আনতে যাবো। যা মেহেলী, চলে যা। লড়াই করে না আনলে আমাদের পাহাড়ে মেয়েমানুষের দাম থাকে না। বাগে পেয়ে বিয়ে করলে, সে আবার কী পুরুষ!"

"ঠিক ঠিক। হু-হু—" জোয়ান ছেলেরা চেঁচাতে লাগলো, "মেহেলীকে আমরা ছিনিয়ে আনবো সদ্দার। তুই চলে যা মেহেলী।"

মেহেলী আকুল হয়ে উঠলো। করুণ হলো চোখ-মুখ। বললো, "আমি আমাদের বস্তিতে আর ফিরবো না সদ্দার। তুই আমার ধরমবাপ, আমাকে সালুয়ালাঙে যেতে বলিস না।"

"কেন? কী হয়েছে তোদের সালুয়ালাঙ বস্তিতে?" বিস্মিত গলায় জিজ্ঞেস করলো বুড়ো খাপেগা।

"আমি বস্তিতে ফিরলে আমার বাপ ছাল উপড়ে নেবে।"

"কেন?"

"আমার সঙ্গে হুই নানকোয়া বস্তির মেজিচিজুঙের বিয়ে ঠিক করেছে

আমার বাপ। আমি সেঙাইকে ছাড়া কারুকে বিয়ে করবো না। তাই পালিয়ে এসেছি।" কাতর গলায় বললো মেহেলী।

"মেজিচিজুঙ! সে তো বাঘ-মানুষ! কী সব্বনাশ!" আতঙ্কে ফিসফিস শোনালো বুড়ো খাপেগার গলা, "তার সঙ্গে তোকে জুড়ে দিতে চায়।"

"হু-হু—অনেক বউ পণ পাবে কি না?"

"একটা আস্ত সাসুমেচু (ভয়ঙ্কর লোভী মানুষ) তো তোর বাপ।"

"হু-হু, সেই ভয়েই তো পালিয়ে এসেছি। তোদের বস্তিতে থাকতে দে সদ্দার। নইলে বাপ আমাকে সাবাড় করে ফেলবে। আমি বাপকে বলে এসেছি, সেঙাইকে ছাড়া আর কারুকে বিয়ে করবো না।"

"তাই হবে। তুই চল আমাদের বস্তিতে। তোকে ছিনিয়ে নিতে নিশ্চয়ই তোদের বস্তির সদ্দার আসবে। তখন লড়াই হবে।"

"হু-হু।" জোয়ান ছেলেরা চারপাশ থেকে সায় দিলো। তাদের হাতের থাবায় বর্শার ফলাগুলো ঝকমক করে উঠলো। আসন্ন লড়াইএর উত্তেজনায় তাদের মন, অস্ফুট চেতনা আর ভাবনা ভরে গিয়েছে।

"চল এবার। রাত্তির হয়ে আসছে।" ঢালু উপত্যকার দিকে নামতে নামতে বুড়ো খাপেগা বললো, "যাক, বিনা লড়াইতে তো তোকে নিচ্ছি না। দস্তুরমতো লড়াই হবে তোর জন্যে, কী বলিস মেহেলী?"

সকলের সঙ্গে চলতে চলতে মেহেলী বললো, "হু-হু—"

তেইশ

পাহাড়ী অজগরের মত আঁকাবাঁকা পথের রেখা। পাথর-কাটা মসৃণ পথ। পাহাড়ের চড়াই-উতরাই বেয়ে, বনময় উপত্যকার মধ্য দিয়ে, অতিকায় শিলাস্তূপের বাঁকে বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। পথের বিস্তার দুদিকেই। মাও থেকে একদিকে কত শৈলচূড়া পাড়ি দিয়ে সে পথ ছড়িয়ে রয়েছে মণিপুরের দিকে। উত্তর-পশ্চিম কোণে সেই পথই আবার কোহিমা শহরকে ছুঁয়ে ডিমাপুরের দিকে নেমে গিয়েছে, গিয়ে থেমেছে মণিপুর রোড রেল স্টেশনে।

মাওএর পথে এসে দাঁড়ালো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

ডান পাশে পাহাড়ের অতল খাদে দোইয়াঙ নদী গর্জে গর্জে ছুটছে। পাথরে পাথরে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে ফুলকি ছড়াচ্ছে নীল জলের ধারা। খাদের ওপর উঁচু পাথরের টিলায় দোকানপসার। টিনের চাল, পাথরের মেঝে, বাঁশের মাচানে নানা সম্ভার, কমলালেবু, লবণ, স্যাঁকা বিড়ি, কাঁচি সিগারেট। আর বিরাট বিরাট সব গুদাম—হরিণের ছাল, সম্বরের শিঙ, কস্তুরী, বাঘের ছাল, চিতার দাঁত, হাতির দাঁত দিয়ে ভরাট। বাঁ দিকে ধাপে ধাপে পাথর কেটে অনেকটা উঁচুতে গোটা তিনেক মণিপুরী হোটেল। টিনের ঘর। সামনে টিনের পাতে মণিপুরী, ইংরেজি, আসামী আর বাঙলা হরফে হোটেলগুলোর নাম লেখা রয়েছে।

বাঁ দিকের লবণ-কমলার দোকানগুলোতে অদ্ভুত ধরনের কতকগুলি মানুষ বসে রয়েছে। অবাক বিস্ময়ে এই দোকানপসার, এই অপরিচিত মানুষ, ইম্ফলের দিকে অদৃশ্য-হয়ে-যাওয়া রহস্যময় পথটার দিকে অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো সেঙাই। অদ্ভুত সব মানুষ। (এর আগে সেঙাই কোনদিনই পাথর-কাটা পথ দেখে নি। পাহাড়ী মানুষ ছাড়া এই সব সমতলের মানুষ, যেমন বাঙালী, আসামী, হিন্দুস্থানীদের দেখে নি। দেখে নি মণিপুরীদের, কাছাড়ীদের।) তাদের ভাষা দুর্বোধ্য। কোনদিন এসব ভাষা শোনে নি সেঙাই।

ফিসফিস গলায় সেঙাই বললো, "এই সব কোন দেশের মানুষ রে সারুয়ামারু? এরা আমাদের পাহাড়ী লোকদের মত তো নয়।"

প্রজ্ঞাবানের মত গম্ভীর শব্দ করে হাসলো সারুয়ামারু, "হু-হু, এরা হলো আসান্যু (সমতলের বাসিন্দা)। খবদ্দার, এদের সঙ্গে কোনদিন মিশবি না সেঙাই।"

"কেন?"

"কেন আবার। ফাদার বারণ করে দিয়েছে। এরা খুব খারাপ লোক।"

"তাই নাকি?"

"হু-হু।" গূঢ় কোন খবর দিচ্ছে, মুখখানা এমন ভয়ানক দেখালো সারুয়ামারুর, "চল না একবার কোহিমাতে, দেখবি, ফাদার সব শিখিয়ে-পড়িয়ে দেবে। এই আসান্যুদের মধ্যে বাঙালী আছে, অছমিয়া আছে, হিন্দোস্থানী আছে। ফাদার বলে দিয়েছে, ওরা সব শয়তান। খুব সাবধান সেঙাই। কোহিমাতে গিয়ে ওদের পাল্লায় পড়বি না।"

"হু-হু," মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো সেঙাই। তারপর ইম্ফলগামী পথটার দিকে তাকালো, "ওটা কী রে। সাপের মত এঁকে-বেঁকে পাহাড়ে গিয়ে উঠেছে। কী ওটা?"

"ওটা পথ। ইম্ফলের দিকে চলে গেছে।"

"ইম্ফল! সে কোন দেশ? কতদূর?" দুচোখে বিস্ময় নিয়ে তাকিয়ে রইলো সেঙাই।

"অনেকদূর। অনেক, অনেকদূর। কিন্তু পঁকপঁক গাড়িতে সকালবেলা চড়লে ঠিক সন্ধ্যের সময় পৌঁছে দেবে।"

"আমি যাবো ইম্ফলে।"

"যাবি, যাবি। ইম্ফলে যাবি, শিলঙে যাবি, কত জায়গায় যাবি। আগে তো কোহিমা চল।" সমানে বকরবকর করে চললো সারুয়ামারু। একটু পরে শুধলো, "খিদে পেয়েছে সেঙাই?"

"হু-হু—"

"চল, দুই মণিপুরীদের হোটেলে খেয়ে নি। ইম্ফল থেকে পঁকপঁক গাড়ি আসতে এখনও দেরি আছে। এমন জিনিস খাওয়াবো, জন্মে কোনদিন খাস নি।" সেঙাইর হাত ধরে টানতে টানতে ডান দিকের পাথর-কাটা সিঁড়ির দিকে টেনে নিয়ে গেলো সারুয়ামারু।

তখনও ইম্ফলের পথটার দিকে, সামনের দোকানপসারগুলোর দিকে, সমতলের মানুষগুলোর দিকে তন্ময় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রয়েছে সেঙাই। অপরূপ, অদ্ভুত, অচেনা এক পৃথিবীর মুখোমুখি এসে দাঁড়িয়েছে সে। টিজু নদীর কিনারে বনময় উপত্যকায় উপত্যকায় কেলুরি, সালুয়ালাঙ, নানকোয়া, জুকুমিচা—এই সব ছোট ছোট পাহাড়ী গ্রামের বাইরে ইম্ফলে যাবার এমন একটা মসৃণ পথ ছিলো, এমন সব দুর্বোধ্য ভাষার কলতান ছিলো, তা কি জানতো সেঙাই? সমতলের মানুষগুলোর দিকে একবার তাকালো। কেমন একটা আকর্ষণ বোধ হচ্ছে ওদের সঙ্গে মিলবার, ওদের কথা শুনবার। কিন্তু না; একটু আগেই তাদের সম্বন্ধে মোহভঙ্গ করে দিয়েছে সারুয়ামারু। কেমন এক ধরনের দুর্বোধ্য উত্তেজনায় শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগলো।

পাথরকাটা সিঁড়ি বেয়ে ওপরে উঠে এলো সেঙাই আর সারুয়ামারু। পাশের একটা ঝরনা থেকে রবারের নল দিয়ে জল আনা হয়েছে। ছড়িয়ে ছড়িয়ে, ছিটিয়ে ছিটিয়ে কালো পাথরের এবড়োখেবড়ো চত্বরটাকে ভিজিয়ে দিচ্ছে বরফ-শীতল জল। সারুয়ামারু সেই জলে হাত ধুয়ে নিলো। সেঙাইকে বললো, "হাত ধুয়ে নে সেঙাই। এটা শহর, একটু সভ্য হয়ে চলবি। এ তো আর তুই সদ্দারের কেলুরি বস্তি নয়! হু-হু।" আত্মপ্রসাদের হাসি হাসলো সারুয়ামারু।

অতিকায় বর্শাটা একপাশে রেখে হাত-পা ধুয়ে নিলো সেঙাই। ঊর্ধ্বাঙ্গ অনাবৃত। নীচে জানু পর্যন্ত একটি নীল রঙের পী মুঙ কাপড় ঝুলছে।

ঘরের ভেতরে এসে টিনের চেয়ার দেখলো সেঙাই, দেখলো কাঠের টেবিল। যত দেখছে ততই দুটি চোখ আর মন বিস্ময়ে ভরে উঠছে তার। নানা কৌতূহলে ইন্দ্রিয়গুলো আন্দোলিত হয়ে উঠছে। পেতলের থালা আর গ্লাস এলো। তার ওপর মণিপুরী বামুন ভাত, এরম্বু (শুটকী মাছের তরকারি) আর শর্মে পাতার ঝোল জাতীয় খানিকটা দিয়ে গেলো। তার পর এলো মাগুর মাছ ভাজা।

পরম তৃপ্তিতে সারুয়ামারু সপাসপ ভাতের গ্রাস তুলছে মুখে। আর চুপচাপ বসে বসে ঝকঝকে পেতলের থালা আর গ্লাসের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেঙাই।

বিশাল একটা গ্রাস ঠোঁটের কাছে এনে সারুয়ামারু তাকালো সেঙাইর দিকে, "কী রে, ভাত খাচ্ছিস না কেন? তুই এরম্বু খেয়ে ছাখ,

বুনো মোষের আধপোড়া মাংসের চেয়ে অনেক ভালো, অনেক সোয়াদ পাবি।"

"কিন্তু পেতলের এইগুলো—" বাসনগুলোর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলো সেঙাই। বললো, "এই পেতল দিয়ে তো আমরা নীশে আর নীয়েঙ তুল বানাই। হার বানাই। এতে খেলে আনিজা গোঁসা হবে না তো!"

"আরে না, না। একটা ছাগী তুই। সব তাতেই খালি আনিজা। পেতল! থু থু! তোদের হুই কেলুরি বস্তিতেই পেতলের দাম রয়েছে; শহরে গিয়ে দেখবি, ওর কোন দাম নেই। নে, নে খেয়ে নে। এখুনি আবার পঁকপঁক গাড়ি এসে পড়বে।"

সারারাত্রি উপত্যকা আর মালভূমি, টিলা আর বন আর অসংখ্য পাহাড়-চূড়া উজিয়ে এসেছে দুজনে। দেহের জোড়ে জোড়ে গাঁটে গাঁটে ক্লান্তি যেন আঠার মত জড়িয়ে রয়েছে। পেটের মধ্যে ক্ষুধার ময়াল পাক দিয়ে উঠেছে। আচমকা সেঙাই পিতলের থালাখানায় ঝুঁকে পড়লো। নিমেষে শূন্য হয়ে গেলো সাদা কয়েকটি ভাতের বিন্দু। মণিপুরী বামুন আরো ভাত ঢাললো সেঙাইর পাতে। তাও নিঃশেষ হলো।

এক সময় খাওয়ার পালা চুকে গেলো। তৃপ্তির একটা বিশাল উদ্গার তুললো সেঙাই, "ভাল ভাত বানায় তো এরা। আমাদের ভাত একেবারে গলে গলে একশা হয়ে যায়। বস্তিতে ফিরে এমনি করে ভাত পাকাবো এবার। মাংস নেই, মাংস না হলে কি ভাত খাওয়া যায়!"

সারুয়ামারু জঙগুপি কাপড়ের ভাঁজ থেকে একটি টাকা বের করতে করতে বললো, "মণিপুরীদের হোটেলে মাংস পাওয়া যায় না।"

একটু পরে টাকাটা মণিপুরী মালিকের হাতে দিয়ে বাইরে বেরিয়ে এলো দুজনে।

সেঙাই বললো, "টাকা দিলি যে!"

"বাঃ রে, টাকা দেবো না! দাম দিতে হবে না! খেলি যে, তার দাম! এবার বুঝলি তো টাকা দিলে সব মেলে শহরে।" টাকার মহিমা সম্বন্ধে এক প্রস্থ বকরবকর শুরু করলো সারুয়ামারু।

"হু-হু—" মাথা ঝাঁকিয়ে সায় দিলো সেঙাই। সে বুঝেছে। অর্থের পরমার্থ জলের মত তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। তার জ্ঞানচক্ষু খুলে দিয়েছে সারুয়ামারু।

কিছু সময় চুপচাপ।

সেঙাই আবার বলতে শুরু করলো, "কোথায় তোর পঁকপঁক গাড়ি? কোথায় রে সারুয়ামারু? কাল সারারাত হেঁটেছি, বড় ঘুম পাচ্ছে।"

"হুই—হুই—" সহসা সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলো সারুয়ামারু।

অনেকদূরে পাহাড়-কাটা পীচের পথ। আঁকাবাঁকা। চড়াই-উতরাই। সেই পথের ওপর একটা কালো বিন্দুর মত দেখাচ্ছে বাসটাকে। বলা যায়, একটা খারিমা পতঙ্গের মত সাঁ-সাঁ করে ছুটে আসছে।

সারুয়ামারু বললো, "হুই—হুই হলো পঁকপঁক গাড়ি—"

অবাক বিস্ময়ে চলমান বিন্দুটির দিকে তাকিয়ে রইলো সেঙাই। এক সময় পাহাড়ী পথের বাঁকে বাসটা অদৃশ্য হলো। তারপর আবার পাহাড়-বনের ফাঁকে ফুটে উঠলো। অনেকক্ষণ ধরে একবার দেখা দিতে আবার মিলিয়ে যেতে লাগলো বাসটা। তারপর একটু-একটু করে স্পষ্ট হতে হতে মাও-এ এসে থামলো।

সারুয়ামারু বললো, "আয় গাড়িতে উঠি—"

"উঠবো? আনিজার গোঁসা লাগবে না তো!" ভীরু-ভীরু চোখে সারুয়ামারুর দিকে তাকালো সেঙাই।

"আরে দূর! তুই একেবারে বুনো। হুই বুড়ো সদ্দারের কাছে থেকে থেকে একেবারে অসভ্য হয়ে রয়েছিস।" একটা বিরক্ত ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো সারুয়ামারুর মুখে, "হুই শয়তান সদ্দারটা—ওর জন্যে বস্তির সব মানুষগুলো বুনো হয়ে রইলো।"

"আহে ভু টেলো!" বাসে উঠতে উঠতে খিঁচিয়ে উঠলো সেঙাই, "খবদ্দার, সদ্দারকে কিছু বলবি না সারুয়ামারু। একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো তা হলে।"

একটু দমে গেলো সারুয়ামারু। চকিত দৃষ্টিতে একবার সেঙাইর দিকে তাকালো! আনকোরা পাহাড়ী মানুষ। শহরের রঙ দিয়ে, চেকনাই দিয়ে, লোভ আর লালসার রস দিয়ে সেঙাইকে মেজেঘষে নতুন রূপ দিতে, নতুন ছাঁচে ঢালাই করে নিতে সময় লাগবে। মনে মনে সারুয়ামারু পাদ্রী সাহেবদের কথা ভাবলো। এরা ভোজবাজী জানে। ওদের কথায়বার্তায় ব্যবহারে যেন জাদু আছে। সে জানে কেমন করে তার মত ভয়াল পাহাড়ী মানুষেরও পাদ্রীসাহেবদের সম্বন্ধে অনুরাগ জন্মেছে একটু-একটু করে। এই

সেঙাইর মত একদিন সেও এই শহরের শড়কে ছিলো একেবারেই বন্য। একেবারেই নতুন।

একটু হাসলো সারুয়ামারু, "আচ্ছা, আচ্ছা—একবার ফাদারের পাল্লায় নিয়ে ফেলি তোকে। তখন তোর এত ফোঁসফোঁসানি কোথায় থাকে দেখবো।"

নসু কেহেঙ মাসের দুপুর। ঝকঝকে রোদে আরাম লাগে।

এক সময় বাস চলতে শুরু করলো। চাপা-চাপা ছোট চোখ, বুকের ওপর থেকে হাঁটুর নীচু পর্যন্ত কাপড় বাঁধা কয়েকটা মেয়ে চারপাশে বসে রয়েছে। পাশে বসেছে একদল পুরুষ। তাদের চোখও তেমনি চাপা-চাপা আর ছোট ছোট।

সারুয়ামারু বললো, "এরা সব মণিপুরী। হুই ইম্ফল থেকে আসছে।"

"হু-হু—" মাথা নাড়লো সেঙাই। একটু আগেই সারুয়ামারু তাদের চিনিয়ে দিয়েছিলো।

তাদের মত জনকয়েক নাগাও এদিক-সেদিক ছড়িয়ে বসে রয়েছে।

ক্রমাগত বাঁক ঘুরছে বাস। বাঁ দিকে পাথর-কাটা পাহাড় উঠে গিয়েছে অনেক উঁচুতে। সেই পাহাড়ের গায়ে নিবিড় অরণ্য। ডানদিকে দশ কি পনেরো হাত চওড়া পথের পর থেকে নীচের অতল খাদে নেমে গিয়েছে জটিল বন।

সেঙাই বললো, "খাদে পড়ে যাবো—"

"আরে না, না—"

অসহিষ্ণু গলায় চিৎকার করে উঠলো সেঙাই, "আমি নামবো, আমি নামবো।" বাসের পাটাতনের ওপর নাচানাচি শুরু করে দিলো সে।

বাসের মধ্যে শোরগোল তুমুল হয়ে উঠলো। সারুয়ামারু দু হাত দিয়ে সেঙাইকে নীচে বসিয়ে দিলো। হয়তো আরো কিছু ঘটতে পারতো। কিন্তু তার আগেই বমি করে ফেললো সেঙাই। বমির দমকে চোখমুখ রক্তাভ হয়ে উঠলো তার। সারা দেহে আলোড়ন তুলে গোঙানি বেরুচ্ছে, "ওয়াক্-ওয়াক্-ওয়াক্—"

বাসের দোলানিতে মাথাটা বনবন করে ঘুরছে। পাশ থেকে একটা মণিপুরী মেয়ে মাথার ওপর ফুঁ দিতে লাগলো। সারুয়ামারু জড়িয়ে ধরেছে সেঙাইকে।

বাসটা পাক খেতে খেতে কোহিমার দিকে এগিয়ে চলেছে। সেঙাই সমানে চেঁচাতে লাগলো, "আনিজা, আনিজা! বস্তিতে ফিরে একটা মুর্গী বলি দিতে হবে।"

চব্বিশ

দুপুর পেরিয়ে গেছে অনেক আগেই। এখন রোদে কমলা রঙের আমেজ লেগেছে।

বাস থেকে কোহিমার পথে নামলো সেঙাই আর সারুয়ামারু। বাসের দোলানিতে আর বমি করে করে কাহিল হয়ে পড়েছে সেঙাই। উজ্জ্বল তামাটে মুখখানা শুকিয়ে গিয়েছে। বাসে তোলার জন্য সারুয়ামারুর ওপর ভীষণ রেগে গিয়েছিলো সেঙাই। কিন্তু সমতল থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে এই আকাশ-ছোঁয়া শৈল-নগর দেখতে দেখতে দুটি পিঙ্গল চোখের মণি আবিষ্ট হয়ে গেলো। পাহাড়ী মানুষ সেঙাই। বিস্ময়ে আর আগ্রহে সে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছে।

বাঁ দিকের পথ ধরে বাসটা ছেড়ে দিয়েছে।

সারুয়ামারু বললো, "হুই পঁকপঁক গাড়ি ছেড়ে দিলো। ডিমাপুরে যাবে। সেখানে আর একরকম গাড়ি আছে। বড় বড় ঘর, অনেক লম্বা। তার নাম রেলগাড়ি।"

আঁকাবাঁকা পথ। উঁচু-নীচু। চড়াই আর উতরাইএর ধারে ধারে পাইনের সারি। পথের দুপাশে সুদর্শন বাড়ি। ওপরে ঢেউটিন কি টালির চাল। প্ল্যাস্টারের দেওয়াল। বাড়ির সীমানা ছোট ছোট পাহাড়ী গাছ আর লতাকুঞ্জ দিয়ে ঘেরা।

সেঙাই বললো, "কেসুঙগুলো কী সুন্দর!"

"হু-হু। এ কি আর তোর কেলুরি বস্তির কেসুঙ। এ হলো শহর কোহিমা।" সারুয়ামারু হাসলো। এই শহরের যত মহিমা, যত গৌরব, যত মাধুর্য—সব যেন সারুয়ামারুর সেই হাসিতে ফুটে বেরুলো। এই শহরের মহিমায় যেন তারও একটা গৌরবময় ভূমিকা রয়েছে।

অনেক পথ, অনেক বাঁক, অনেক বিচিত্র মানুষের জটলা, অনেক দুর্বোধ্য কোলাহল ডিঙিয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়িটার সামনে এসে দাঁড়ালো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

সেঙাই বললো, "তোর ছুই গাড়ি আনিজার নামে বস্তিতে ফিরে একটা মুর্গী বলি দেবো।"

"চুপ চুপ।"

"চুপ কেন? কী রে শয়তানের বাচ্চা?" সেঙাইর ছুটো ছোট ছোট চোখ জলতে লাগলো।

"এটা তোর কেলুরি বস্তি নয়। এটা হলো কোহিমার শহর। তোর ছুই মুর্গী বলি দেবার কথা শুনতে পাবে ফাদার!" ফিসফিস গলায় বললো সারুয়ামারু, "ছুই ছাখ, ছুই যে পুলিস। ওদের হাতে বন্দুক রয়েছে। এক গুলিতে একেবারে সাবাড় করে দেবে। অমন কথা আর বলিস না।"

সামনের দিকে তাকালো সেঙাই। পরিষ্কার সুদৃশ্য একটি বাড়ি। ওপরে ঢেউটিনের চাল। চারপাশে অজানা অচেনা নানা রঙের বাহারী ফুল ফুটে রয়েছে। সামনে নিরপেক্ষভাবে ছাঁটা ঘাসের জমি। সবুজ কোমল আর সতেজ।

দরজার সামনে অনেক মানুষের জটলা। পায়ের পাতা পর্যন্ত ঢোলা সাদা কাপড় পরেছে কেউ কেউ। (এর আগে সারপ্লিস দেখে নি সেঙাই)। আচমকা সেঙাইর চোখ ছুটো কতকগুলো মানুষের মুখের দিকে আটকে গেলো। গায়ের রঙ হুন্টসিঙ পাখির পালকের মত সাদা। নীল চোখ। তাদের ঘিরে ধরেছে অনেক পাহাড়ী মানুষ। আর একপাশে দাঁড়িয়ে রয়েছে আরো কয়েকটা লোক। তাদের সকলের একই রকম পোশাক, হাতে একই রকমের বন্দুক (একটু আগেই বন্দুকের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়েছে সারুয়ামারু)।

সারুয়ামারু বললো, "ওরা হলো আসাম্যু (সমতলের লোক)। দেখছিস না বন্দুক হাতে রয়েছে। ফাদার বলে, ওরা ভারি শয়তান। আমাদের পাহাড়ী মানুষদের ওরা বড় মারে।"

"হু-হু—মারলেই হলো। বর্শা দিয়ে ফুঁড়বো না একেবারে!"

"চুপ, চুপ—"

সহসা ঘাসের জমির ওপাশ থেকে একটা খুশী-খুশী গলা ভেসে এলো, "আরে সারুয়ামারু যে। এসো, এসো—"

মানুষটা একেবারে সামনে এসে দাঁড়ালো। হুন্টসিঙ পাখির পালকের মত ধবধবে রঙ। তাজ্জব বনে গেলো সেঙাই। তাদের ভাষা কী চমৎকার রপ্ত করেছে বিস্ময়কর লোকটা।

সারুয়ামারু বললো, "গুড নাইট ফাদার—"

হা-হা করে হেসে উঠলো পাদ্রীসাহেব, "এখন নাইট কোথায়? এখনও তো বিকেল হতে অনেক দেরি।"

থতমত খেয়ে চুপ করে রইলো সারুয়ামারু। যে ইংরাজী শব্দ দুটি সগৌরবে সে সঞ্চয় করে রেখেছিলো এবং যার জন্য তার রীতিমত গর্ব ছিলো, তা যে এমন করে তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবে, এ কি জানতো সে?

"হু-হু," মাথা নাড়লো সারুয়ামারু।

পাদ্রীসাহেব বললো, "এ কে সারুয়ামারু?"

"এ হলো সেঙাই। তোর কাছে যে সিজিটো কাজ করে, তার ছেলে। সেঙাইকে এখানে নিয়ে এলাম ফাদার।" এবার সরাসরি দৃষ্টিতে পাদ্রী সাহেবের দিকে তাকালো সারুয়ামারু।

"বাঃ, ভালো ভালো। এসো সেঙাই, এসো।"

তিনজনে ঘাসের সবুজ জমিটায় চলে এলো। একপাশে কাঠের ক্রস খাড়া হয়ে রয়েছে। ঝকঝকে সাদা রঙ। মানবপুত্র একদিন ক্রুশবিদ্ধ হয়ে পুণ্য-রক্তে এই পাপময় পৃথিবীকে স্নান করিয়েছিলেন। এই ক্রসে তারই পবিত্র স্মরণচিহ্ন।

বিকেলের রঙ আরো ঘন হয়েছে। পশ্চিমের পাহাড়চূড়ায় স্থির হয়ে রয়েছে সূর্যটা। বিকেলের সূর্য। রক্তলাল।

কাঠের একটা বেঞ্চের ওপর জাঁকিয়ে বসেছে সারুয়ামারু। সেঙাইর দিকে তাকিয়ে সে বললো, "বোস সেঙাই।"

এক পাশে বর্শাটা রাখতে রাখতে সেঙাই বললো, "বসবো?"

"হু-হু। এটা তো বসবার জন্যেই। তুই কিছুই জানিস না। এটা কেলুরি বস্তি নয়। হু-হু—এটা কোহিমা শহর।" শহরের আদবকায়দা সম্বন্ধে আর একবার জ্ঞান দিলো সারুয়ামারু।

ইতিমধ্যে একখানা চেয়ার এনে ঘনিষ্ঠ হয়ে বসেছে পাদ্রীসাহেব। তার সঙ্গে এসেছে একটা পাহাড়ী চাকর। চাকরটার হাতে নানা ধরনের কাপড়, আর নানা রকমের খাবার। পাদ্রীসাহেব চাকরটার হাত থেকে খাবার আর কাপড়গুলো তুলে নিয়ে সেঙাইর দিকে বাড়িয়ে দিলো, "এই নাও সেঙাই। এগুলো তোমাকে দিলাম। কাপড় পরবে আর খাবারগুলো খাবে। কেমন?"

বেঞ্চের ওপর বসে পড়েছিলো সেঙাই। তার একেবারে স্পর্শের সীমানায় অদ্ভুত এক মানুষ। ধবধবে গায়ের রঙ। চোখের মণি নীল। পাহাড়ী

মানুষ সেঙাইর কাছে এই মুহূর্তে এই পাদ্রীসাহেবটি বড় অবিশ্বাস্য মনে হলো। মনে হলো, বেলাশেষের এই কমলারঙ রোদে কোহিমা শহরের এই সবুজ ঘাস জমি থেকে পাদ্রীসাহেব এক ভোজবাজীতে যে-কোন সময় মিলিয়ে যেতে পারে। স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে তাকে।

পাদ্রীসাহেব সস্নেহ গলায় বললো, "নাও, ধরো সেঙাই। লজ্জা কী?"

এবার টালুমালু চোখে সারুয়ামারুর দিকে তাকালো সেঙাই। সারুয়ামারু প্রেরণা দিতে শুরু করলো। তার গলায় রীতিমত উৎসাহ, "নে, নে সেঙাই। ফাদার ভালবেসে দিচ্ছে। এমন কাপড় জন্মেও দেখিস নি। এমন খাবার কোনদিন খাস নি।"

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে একটা হাত বাড়িয়ে কাপড় আর খাবার নিয়ে দিলো সেঙাই। তারপর ফিসফিস করে বললো, "সম্বরের ছাল আনি নি, বাঘের দাঁত আনি নি, বর্শা আনি নি—কিছুই তো আনতে দিলো না সারুয়ামারু। কী দিয়ে বদল করবো?"

"কিছু দিতে হবে না আমাকে।" সাদা মুখখানার ওপর অপরূপ হাসি ছড়িয়ে পড়লো পাদ্রীসাহেবের। পরম বাৎসল্যে চোখ দুটো তার ভরে গিয়েছে, "আমি এগুলো তোমাকে আদর করে দিলাম। আমাকে ফাদার বলে ডাকবে, বুঝলে।"

"হু-হু। ডাকবে বৈ কী?" সেঙাইর হয়ে সায় দিলো সারুয়ামারু। দস্তুরমত তৎপর হয়ে উঠেছে। বেঞ্চ থেকে উঠে একেবারে পাদ্রীসাহেবের অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়ালো সারুয়ামারু, "একশোবার ডাকবে ফাদার বলে।"

সহসা সেঙাই বললো, "আমার বাপ আর মা কই?"

"সিজিটো আর তার বউ তো?"

"হু-হু।"

"তারা গ্রীফিথ সাহেবের সঙ্গে গুয়াহাটী গিয়েছে। দু-চার দিন বাদে ফিরবে। তুমি এই চার্চে থাকো কয়েকদিন। ওরা ফিরলে দেখা কোরো।" এবার পাদ্রীসাহেব তাকালো সারুয়ামারুর দিকে, "তারপর তোমাদের বস্তির খবর কী সারুয়ামারু? আমরা যে একবার যাবো তোমাদের গ্রামে। সর্দারকে বলেছো?"

সারুয়ামারুর মুখেচোখে বিষাদ ঘনিয়ে এলো। "বলেছিলাম। কিন্তু সর্দার রাজী হচ্ছে না একেবারেই।"

"টাকা দেবো অনেক।"

"তাতেও রাজী নয়। এই সেঙাইকে জিগ্যেস করে ত্থাখ না তুই।"

পাদ্রীসাহেবের সমস্ত মুখে এতক্ষণ হাসির আলো ছড়িয়ে ছিলো। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মত হাসিটিও যেন তার সঙ্গে জন্ম নিয়েছে। সারুয়ামারুর কথাগুলো শুনতে শুনতে হাসি মুছে গেলো। এতক্ষণ বোঝা যায় নি। এবার মনে হলো, পাদ্রীসাহেবের সাদা মুখখানা ঘিরে মাকড়সার জালের মত অজস্র কালো কালো রেখার আঁকিবুকি। যেন, কতকগুলো সরীসৃপ কিলবিল করে বেড়াচ্ছে। শান্ত, সুন্দর, পবিত্র মুখখানার কোন আড়াল থেকে একটা ভয়ঙ্কর মুখ কালো কালো রেখার টানে টানে ফুটে বেরুচ্ছে। একটু আগের স্নিগ্ধ মুখখানার সঙ্গে এ মুখের কোন মিল নেই, বিন্দুমাত্র সঙ্গতি নেই।

গম্ভীর মুখে পাদ্রীসাহেব বললো, "হুঁ।" তারপর মনে মনে একটা অ-মিশনারীসুলভ গালাগালি আউড়ে সঙ্গে সঙ্গে কপাল-বুক-বাহুসন্ধি ছুঁয়ে ক্রস করলো। আশ্চর্য সংযম, সে খিস্তিটা জিভ থেকে পিছলে সেঙাইদের কান পর্যন্ত পৌছালো না। অবশ্য পৌছালেও বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ থাকতো না। কারণ শব্দগুলো বিশুদ্ধ ইংরাজী। সেঙাইদের কাছে নিতান্তই দুর্বোধ্য।

পাদ্রীসাহেব এবার কটমট করে তাকালো সারুয়ামারুর দিকে, "কেন, কী জন্যে তোমাদের বস্তিতে যেতে দেবে না সর্দার?"

"আমি বললাম, ফাদার মুর্গী-শুয়োর বলি দিতে দেবে না। ক্রস আঁকতে হবে। যীশু-মেরী বলতে হবে। তাতে সদ্দার রাজী নয়। আমাকে তো বর্শা নিয়ে তেড়ে উঠেছিলো। আর শাসিয়ে দিয়েছিলো, তোর ফাদার বস্তিতে এলে জান নিয়ে ফিরতে হবে না।" অপরাধী গলায় কথাগুলি বলে চুপ করে গেলো সারুয়ামারু।

"হু-হু—" ঘন ঘন মাথা দুলিয়ে সেঙাই বললো। ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠেছে সে, "হু-হু। আমাদের বস্তিতে হুই সব চলবে না। সদ্দার বলে দিয়েছে, সিধে কথা।"

তির্যক চোখে একবার সেঙাইকে দেখলো পাদ্রীসাহেব। তারপর সারা মুখ থেকে মাকড়সার জালটাকে মুছে দিলো। কী এক মহিমায় হাসির চেকনাই ফুটিয়ে সে বললো, "আচ্ছা। এখন খাবার খাও, এতটা পথ এসেছো। অনেক কষ্ট হয়েছে। পরে সব বোঝা যাবে। এই সারুয়ামারু, তুমি সেঙাইকে সিজিটোর ঘরে রেখে এসো। তাড়াতাড়ি আসবে।"

সেঙাইকে নিয়ে সারুয়ামারু ডান দিকের পাথুরে পথটা ধরলো।

বেতের চেয়ারখানায় বসে পাদ্রীসাহেব ভাবতে লাগলো। এই পাহাড়ী পৃথিবী। ইনফিডেল আর আইডোলেট্রির দেশ। ঘন অন্ধকারের মধ্য দিয়ে পথ কেটে কেটে ক্রিশ্চ্যানিটির আলোকিত রাজপথে এদের তুলে নিয়ে যেতে হবে। সে মিশনারী। সামান্যতে বিচলিত হলে চলবে না। এই পাদ্রী-জীবনের নেপথ্যে যে তার একটি ভয়াল জীবন ছিলো, সেই জীবনের ধূসর বাঁকে বাঁকে সব অসংযম, সব বিভ্রান্তি, সব উত্তেজনাকে নির্বাসন দিয়ে আসতে হয়েছে। সন্স অব সিনার্সদের এই পঙ্কিল পৃথিবীতে একটি শ্বেতপদ্ম ফুটিয়ে তুলবে সে, ফুটিয়ে তুলবে একটি ধ্রুবলোক। সেই শ্বেতপদ্মের নাম, সেই ধ্রুব-লোকের নাম হলো যীশু। নিজের রক্তে পৃথিবীর সব গ্লানি, সব অপরাধ তিনি শোধন করে দিয়ে গিয়েছিলেন।

পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী ভাবলো, এত বড় দীক্ষা নিয়ে সে এখানে এসেছে, তার অন্তত উত্তেজিত হওয়া চলে না।

একটু আগে বিড়বিড় করে একটা কদর্য গালাগালি উচ্চারণ করেছিলো। তার জন্য এখন অনুতাপ হচ্ছে কি? স্নায়ুগুলো রীতিমত পীড়িত হচ্ছে! একটিমাত্র কর্তব্যের প্রেরণায় সাত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে ইণ্ডিয়ার এই পাহাড়ে এসে উঠেছে। এক গোলার্ধ থেকে একেবারে আর এক গোলার্ধে। বেথেলহেমের এক উজ্জ্বল নক্ষত্রকে এই দেশের আকাশে স্থির করে রেখে যেতেই এই পাহাড়ে-কন্দরে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে। মানবপুত্রের কল্যাণময় নামকে এদেশের মানুষগুলির শিরায় শিরায় রক্তকণার মত ছড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তার রেহাই নেই।

ভাবনাটা সহসা এলোমেলো হয়ে গেল পাদ্রীসাহেবের। সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সারুয়ামারু।

পাদ্রীসাহেব বললো, "সিজিটোর ঘরে রেখে এসেছ সেঙাইকে?"

"হু-হু।"

"বোসো, তারপর তোমাদের বস্তির খবর কী? অনেকদিন তোমাকে বলেছি। এবার যাওয়ার একটা ব্যবস্থা করো। শুধুশুধু রক্তারক্তি হবে, এ আমি চাই না। আমি মিশনারী। অনেক টাকা দেবো তোমাদের। যা চাও, সব মিলবে। খালি তোমাদের খ্রীষ্টান হতে হবে।" একটু থামলো পাদ্রীসাহেব। আবার বলতে শুরু করলো, "যাক, এর মধ্যে শুয়োর বলি দাও নি তো! ক্রস এঁকেছো? যীশু-মেরীর নাম জপেছো?"

সারুয়ামারু বললো, "হু-হু, সব করেছি। তবে সে কেহ্ণু মাসে সূর্যের নামে একটা মুর্গী বলি দিয়েছিলাম।"

নাঃ! সংযমকে আর বাঁধ দিয়ে রাখা সম্ভব নয়। ধৈর্য, তিতিক্ষা, সহিষ্ণুতা, এগুলোর একটা সীমা আছে। এই ছিদেন পাহাড়ীগুলোর বিবেক বলে কি আউন্সখানেক কোন পদার্থই নেই! তোতাপাখির মত সে এই সারুয়ামারুকে পড়িয়েছে। ঐ সব আনিজার নামে কোন প্রাণীহত্যা করা চলবে না। দুটি বছর ধরে এই বুনো শয়তানের মনটাকে কত কসরতে, কত যত্নে এই প্যাগান পৃথিবী থেকে বেথেলহেমের দিকে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছে পাদ্রীসাহেব। কিন্তু পাদ্রী হলেও সে মানুষ! ছটা বেলাগাম রিপুর স্লেভ। চাপা গলায় তর্জন করে উঠলো সে, "ডেভিল, সন্স অব বিচ—"

পাদ্রীসাহেবের গালাগালির মহিমা আছে। এত আস্তে, মুখের রেখাগুলিকে এতটুকু বিকৃত না করে গালাগালিটা সে উচ্চারণ করে, যাতে মনে হয় বুঝি-বা পবিত্র প্যারাব্‌ল আওড়াচ্ছে।

ঠিক এমন সময় এলো আর একজন মিশনারী। তার দিকে তাকিয়ে পাদ্রীসাহেব উত্তেজিত হয়ে উঠলো, "এই যে পিয়ার্সন, দেখো—জাস্ট সী—এত করে বুঝিয়েছি, তবু ঠিক আনিজার নামে একটা মোরগ বলি দিয়ে বসে আছে। এত টাকা খরচ, এত পরিশ্রম জলে যাচ্ছে। এই বুনো পাহাড়ে এক্সাইলড হয়ে থাকার তবে অর্থ কী? একটা লোক যদি ঠিকমত ব্যাপটাইজড্ না হলো!"

মেজাজটা একেবারে খিঁচড়ে গিয়েছে পাদ্রীসাহেবের। বার বার তার সোনা-বাঁধানো গজদাঁতটা আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো। পাদ্রীসাহেব দুজন কী এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। অবাক হয়ে তাকিয়ে রয়েছে সারুয়ামারু। পাদ্রীসাহেবদের ভাবগতিক বিশেষ সুবিধের মনে হচ্ছে না। পাহাড়ী মানুষ সারুয়ামারু কেমন যেন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলো।

পিয়ার্সন মিটিমিটি হাসছিলো। মাত্র কিছুদিন আগে কোহিমা শহরে এসেছে। বছর পঁচিশ বয়স। সোনালী চুল বাতাসে উড়ছে। চোখের ঘন নীল মণিতে মহাসাগরের আভাস। থরে থরে পেশীভার বুক তার বাহু-সন্ধির দিকে উঠে গিয়েছে। সারা দেহের ওপর সাদা সারপ্লিসটা যেন বড় বেমানান, বড় বেখাপ্পা দেখায়। সাত ফুট লম্বা একটা ঋজু দেহ। মেরুদণ্ডটা সরলরেখায় মাথার দিকে উঠে গিয়েছে। কোহিমার পাহাড়ে-কন্দরে মিশনারীর

নিরুত্তেজ জীবনের ভূমিকা যেন কৌতুকের অভিনয় মাত্র। মনে হয়, ঐ সাদা দারপ্লিসটার মতই এই জীবনটাকে ঝেড়ে ফেলে আকাশ ফাটিয়ে হো-হো করে হেসে উঠতে পারে পিয়ার্সন। ইংলণ্ডের কোন-এক ডিউক পরিবারের ছেলে সে। কী এক দুর্বোধ্য খেয়ালে, কী এক দুর্নিবার কৌতুকে মশগুল হয়ে চার্চের চ্যাপেলে চলে গিয়েছিলো। কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটি থেকে সরাসরি চার্চের অল্টার। সেখান থেকে মহাসমুদ্রের একটা উদ্দাম ঢেউয়ের মত আছড়ে এসে পড়েছে কোহিমার পাহাড়ে।

এখনও সমানে মিটিমিটি হেসে চলেছে পিয়ার্সন।

এবার বিরক্ত গলায় পাদ্রীসাহেব বললো, "হোয়াট ডু য়ু মীন্—হাসছো কেন? সিরিয়াস ব্যাপারে হাসি ভালো নয় পিয়ার্সন।"

"আই অ্যাডমিট মিস্টার ম্যাকেঞ্জী।" হাসিটা আঠার মত এখনও আটকে রয়েছে পিয়ার্সনের পুরু রক্তাভ ঠোঁটে।

ভ্রূ দুটো কাঁকড়াবিছার মত কুঁকড়ে গেলো পাদ্রীসাহেব ম্যাকেঞ্জীর। বললো, "তোমাকে অনেকবার বলেছি, আমাকে ফাদার বলে অ্যাড্রেস করবে। এটা চার্চের নিয়ম। বাট সরি টু ওয়ার্ন—তুমি সে নিয়ম মানছো না।"

"পারডন্। আর এমনটি হবে না।" হাসিটা এখনও স্থির হয়ে রয়েছে পিয়ার্সনের ঠোঁটে।

ম্যাকেঞ্জী একবার পিয়ার্সনের দিকে তাকালো। ভাবখানা, ভবিষ্যতে দেখা যাবে। বলে উঠলো, "তুমি বিশেষ কাজকর্ম করছো না। প্রীচিংএর জন্য এত টাকা খরচ হচ্ছে এই পাহাড়ে। তোমার সেদিকে খেয়াল নেই। তুমি খালি পাহাড়-পর্বত আর ফল্‌স্ দেখে বেড়াচ্ছো।"

মুগ্ধ গলায় পিয়ার্সন বললো, "বাট ইউ মাস্ট অ্যাডমিট, ভারি সুন্দর এই নাগা পাহাড়।"

একটা ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো ম্যাকেঞ্জীর মুখে, "ভুলে যেয়ো না পিয়ার্সন, ইউ আর নট পোয়েট বাট মিশনারী। কাব্য করার জন্যে এখানে তুমি নিশ্চয়ই আসো নি। এই তো এতদিন এসেছি আমরা, একটা খাঁটি ক্রিশ্চান করতে পেরেছি! ভিশান থাকা উচিত আমাদের।"

খেদ করে একটু থামলো ম্যাকেঞ্জী। এই খেদ আর থামার মধ্যে যেন আত্মদর্শন হলো তার। তারপরেই বলতে শুরু করলো, "তোমার আর কী! ডিউক ফ্যামিলির ছেলে। একটা হুইমের ঝোঁকে এ লাইনে এসে পড়েছো।

দরকার পড়লে ছেড়ে পালাবে। কিন্তু আমরা এসেছি একটা ইন্স্‌পিরেশনের তাড়নায়, একটা ভিশানের প্রেরণায়। ক্রিশ্চানিটির আলো দিয়ে পৃথিবী থেকে প্যাগানদের আর আইডোলেট্রিকে ভাগাতে হবে। আর একটা ডেলুজ আসার আগেই আমাদের কর্তব্য হলো পৃথিবীকে শুদ্ধ করে নেওয়া। ইট ইজ নিদার হুইম নর গেম অব একসেন্‌ট্রিসিটি। এর নাম সাধনা। মানুষকে কুসংস্কার থেকে মুক্তি দিতে হবে। টু রিডিম—"

সহসা গম্ভীর হলো পিয়ার্সন। থমথমে গলায় বললো, "কিন্তু আমার মনে হয়, এ প্রীচিঙের কোন দাম নেই। কোন প্রয়োজন নেই। নিজেদের ধর্মের মধ্যেই এদের বাড়তে দেওয়া উচিত। তা হলেই যথেষ্ট উপকার করা হবে। আমার তো এই ক-দিন পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে আর এই পাহাড়ীদের দেখে দেখে তাই মনে হলো।"

কানের ওপর যেন খানিকটা তরল সীসা ঢেলে দিয়েছে কেউ। প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো ম্যাকেঞ্জী, "বলছো কী পিয়ার্সন! আমরা লোকের উপকারই করি। এতটা ফিলান্‌থ্রপি কিন্তু বরদাস্ত করা যায় না। তা ছাড়া এই মানুষগুলো শয়তানের শিকার হয়ে থাকবে! জানো তো, ব্রিটিশ রাইফেল যেখানে গেছে, সেখানেই বাইবেল গিয়ে হাজির হয়েছে। রাইফেলে-বাইবেলে মিলন না হলে পৃথিবীজোড়া রাজ্য করা সম্ভব হতো আমাদের?"

"আপনি কী বলছেন ফাদার! আমরা মিশনারী, আমাদের সঙ্গে রাজ্য-জয়ের সম্পর্কটা কী!" বিস্ময়ে গলাটা যেন চৌচির হয়ে ফেটে পড়লো পিয়ার্সনের।

"ঠিক যে দৃষ্টি দিয়ে দেখছো, তার উলটো কোণ থেকে ভাবতে হবে। আমরা আগে ব্রিটিশার, তারপরে মিশনারী। এটা ভুলো না।"

থতমত খেলো পিয়ার্সন। বলে কী ম্যাকেঞ্জী! সে সব এখন স্বপ্নের মত মনে হয়। কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটির কলোনেড্ কাঁপিয়ে যখন তার সাত ফুট দীর্ঘ ঋজু দেহটা হাঁটতো, তখন মিশনারী জীবন সম্বন্ধে ধারণা অন্য রকম ছিলো পিয়ার্সনের। শুদ্ধাচারে মানবপ্রেমে সে জীবন অপরূপ। ক্ষমাসুন্দর। মিশনারীর মন, ভাবনা, ধারণা হবে ব্যাপক, উদার এবং পক্ষপাতহীন। মিশনারীর কোন জাতি নেই, কুল নেই, গোত্র নেই। যদি কিছুই থেকে থাকে, তাতে মিশনারীর পরিচয় হয় মিশনারী। আর কিছু নয়। কিন্তু কোহিমার পাহাড়ে এসে মোহভঙ্গ হচ্ছে পিয়ার্সনের। কাচের বাসনের মত

ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যাচ্ছে তার এতদিনের লালিত মিশনারীর সংজ্ঞাটা।

কঠিন গলায় পিয়ার্সন বললো, "কিন্তু অপরের ধর্মে হাত দেওয়াটা কি ঠিক? সে আর এক ধরনের ইম্পিরিয়ালিজম্।"

নাঃ! কতক্ষণ সংযত হয়ে থাকা সম্ভব! হোক সে মিশনারী। ছয় রিপুর একটি, মনের মধ্যে তুমুল হয়ে উঠলো। ম্যাকেঞ্জীর ভুরু দুটো কুঁচকে গেলো। এই মুহূর্তে তার দুচোখে ভয়ানক এক ছায়া দেখলো পিয়ার্সন।

মিশনারী! তাদের বাকবিতণ্ডা কিছুই বুঝতে পারছে না সারুয়ামারু। তবু তার মনে হলো, বুনো বাঘকে নিরীহ হরিণের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার সময় যেমন দেখায় ঠিক তেমনি দেখাচ্ছে ম্যাকেঞ্জীকে। দেখতে দেখতে ভয়ে সে আড়ষ্ট হয়ে গেলো।

একটু পরে ম্যাকেঞ্জী আর পিয়ার্সনের অজান্তে এক-পা দু-পা করে সিজিটোর ঘরের দিকে চলে গেলো সারুয়ামারু।

তীক্ষ্ণ শাসানির গলায় ম্যাকেঞ্জী বললো, "সেটা তোমার দেখবার কথা নয় পিয়ার্সন। না পোষালে তোমাকে হোমে পাঠিয়ে দিতে হবে। ইউ আর, নো ডাউট্, এ ভেরী ডেঞ্জারাস্ এলিমেণ্ট। তোমাকে সাবধান করতে বাধ্য হচ্ছি। এ সব ব্যাপার নিয়ে, এ জাতীয় কথা বলে পাহাড়ী মানুষগুলোকে বিষাক্ত কোরো না। এর রিঅ্যাকশান্ খুব খারাপ। ব্রিটিশ গভর্নমেণ্টের পক্ষেও এ ক্ষতিকর। তুমি ছেলেমানুষ। এখনও সমঝে চলো। আগুন নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি কোরো না।"

"থ্যাঙ্কস্! চেষ্টা করবো আপনার কথামত চলতে।"

ম্যাকেঞ্জীর মনে হলো, বিদ্রূপভরে চিবিয়ে চিবিয়ে কথাগুলো উচ্চারণ করলো পিয়ার্সন। মনে হলো, একরাশ তাচ্ছিল্য বুলেটের মত এসে বিঁধলো চোখেমুখে।

সামনের গেটে ক্যাঁচ করে শব্দ হলো। সেই সঙ্গে একজোড়া ভারী বুটের সদর্প আওয়াজ। এতক্ষণ মুখখানা একটা প্যাঁচার মত কুটিল, ভয়ানক আর গম্ভীর হয়ে ছিলো। দম-দেওয়া পুতুলের মত লাফিয়ে উঠলো ম্যাকেঞ্জী। হাসলো। বললো, "গুড ডে মিস্টার বসওয়েল। আসুন, আসুন।"

সাদর অভ্যর্থনায় গদগদ হয়ে উঠলো ম্যাকেঞ্জী।

"গুড ডে ফাদার।" উদ্ধত বুট-জোড়া পাথরের উপর মসমস শব্দ করতে করতে সামনে এসে পড়লো।

মিস্টার বসওয়েলের মুখখানা বিরাট আর ভয়ঙ্কর। উদ্ধত চোয়ালটা সামনের দিকে ঝুলে পড়েছে। দুটি কপিশ চোখ। ভুরুর রোমশ মাংস চোখ ঢেকে ফেলেছে। কপালের অজস্র ক্ষতচিহ্ন মুখটাকে ভীষণ করে তুলেছে। সামনের বেঞ্চখানায় বসতে বসতে বসওয়েল বললো, "সাঙ্ঘাতিক খবর ফাদার! সারা ভারতবর্ষে আন্দোলন শুরু হয়েছে। দ্যাট্ গ্যাণ্ডী—হাফ্-নেকেড ম্যান। লোকটা জাদু জানে। একেবারে ভেলকি লাগিয়ে দিয়েছে। ইণ্ডিয়ার মাটি থেকে ব্রিটিশ রুল ওভারথ্রো করে ছাড়বে, এমন মতলব। নেটিভগুলো ক্ষেপে উঠেছে।"

"কী সর্বনাশ!" চমকে সটান খাড়া হলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী, "এখানকার খবর কী? আপনি তো পুলিস সুপার। কোন গণ্ডগোল হবে না কি?"

একটু হাসলো মিস্টার বসওয়েল। সেই হাসি তার বিশাল মুখখানায় ভয়াল ক্রুরতা ফুটিয়ে তুললো, "সেই জন্যেই তো আসা। আমি জানি কেমন করে এই আন্দোলনকে মেশিনগানের মুখে উড়িয়ে দিতে হয়। সারা ইণ্ডিয়ার এজিটেশন ঠাণ্ডা করতে চারটে ঘণ্টাও পুরো লাগে না। ওন্‌লি ইণ্ডিস্‌ক্রিমিনেট্ মেশিনগানিং। যাক, যে-কথা বলতে এসেছি ফাদার, আপনার খানিকটা হেল্প চাই—"

"সার্টন্‌লি—বলুন—"

"দেখুন, প্রথম প্রথম রক্তারক্তি করতে আমি চাই না। তবে প্রয়োজন হলে—আমিও ফার্স্ট গ্রেট-ওয়ার-ফেরত লোক; ইফ নেসেসিটি কমপেল্‌স্—তা হলে এই পাহাড়ীদের দাঁড় করিয়ে আমি বেয়োনেট প্র্যাক্‌টিস করাবো।" পুলিস সুপার মিস্টার বসওয়েল প্রথম মহাযুদ্ধ-ফেরত ক্যাপ্টেন। মেসোপটেমিয়া আর পানামা ক্যানেলের ওপর অজস্র রক্ত ক্ষরিত হতে দেখেছে সে। অন্তত মানুষের প্রাণের জন্য তার মনের কোথায়ও একবিন্দু করুণা কি স্নেহ আছে, এমন একটা অপবাদ তাকে কেউ দিতে পারবে না। মানুষের রক্তে রক্তে মেসিনগান আর অ্যাণ্টি এয়ারক্র্যাফ্‌টের মুখে মুখে প্রথম মহাযুদ্ধ তার মন থেকে স্নেহ, মমতা, ভালবাসা, দয়া, প্রীতি নামে ললিত বৃত্তিগুলিকে বাষ্পের মত উড়িয়ে দিয়েছে। এই মুহূর্তে একটা রাক্ষসের মত দেখাচ্ছে পুলিস সুপার বসওয়েলকে। তার মুখখানা ঝুঁকে পড়লো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর কানে, "আই অ্যাডমিট্ ফাদার! ঐ হাফ্-নেকেড গ্যাণ্ডীর ক্ষমতা আছে। পাহাড়-বন ডিঙিয়ে নন-কো-অপারেশনের ঢেউ এসে পড়েছে এই কোহিমার

শহরে। বাট, আই অ্যাম্ বসওয়েল। ফাস্ট´গ্রেট ওয়ার আমি দেখেছি। ম্যাসাকার, ব্লাড, আউটরেজ এগুলোর মধ্যে আমি আনন্দ পাই, আমার স্পোর্টিং স্পিরিটকে খুঁজে পাই। অন্তত আমার কোন সফ্টনেস নেই। থাকতে পারে না। দরকার হলে—"

কথা শেষ না করেই গর্জে উঠলো বসওয়েল।

একপাশে একটা শিলীভূত মূর্তির মত দাঁড়িয়ে রয়েছে পিয়ার্সন। সেদিকে এতটুকু নজর নেই। আশঙ্কায় থরথর কাঁপছে ম্যাকেঞ্জীর গলা, "ইয়েস, গান্ধীর নাম আমি শুনেছি। লোকটা সত্যি জাদু জানে। কিন্তু এই কোহিমা শহরে কী হলো মিস্টার বসওয়েল?"

"যা হবার হয়েছে। এই আনসিভিলাইজড্ ওয়াইল্ড পাহাড়ীগুলো পর্যন্ত কনশাস হয়ে উঠেছে। ঐ যে ছুকরি গাইডিলিও, হ্যাট মিন্ক্স, গান্ধীর কথা বলে, স্বাধীনতার কথা বলে পাহাড়ীগুলোকে ক্ষেপিয়ে তুলছে। আর একটু ল্যাটিচ্যুড আমি দেবো। আর একটু দৌড় আমি দেখবো।" হাতের মোটা মোটা রোমশ আঙুলগুলো শূন্যে কী যেন আঁকড়ে ধরার চেষ্টা করছে। বার বার বিরাট, কঠিন মুঠিটা পাকিয়ে পাকিয়ে আসছে তার। হয়তো গাইডিলিওর কল্পিত মুণ্ডুটা গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে তার মুঠির মধ্যে, "আমি অবশ্য কড়া নজর রেখেছি, যাতে প্লেনসম্যানরা এখানে এসে এই পাহাড়ীদের তাতিয়ে তুলতে না পারে। কোহিমার ওপাশে ডিমাপুরের দিকের রাস্তায় চেক্পোস্ট বসিয়ে দিয়েছি।" একটু থেমে বসওয়েল বললো, "আপনাকে একটা কাজ করতে হবে ফাদার—"

উৎসুক চোখে তাকালো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী, "কী করতে হবে?"

"ঐ গাইডিলিওর অনেক ফলোয়ার, অনেক ভক্ত। উইচ্ক্র্যাফ্ট্ দেখিয়ে অনেক লোক দলে জুটিয়ে নিয়েছে শয়তানীটা।" যেমন করে গোপন মন্ত্রদান করা হয়, ঠিক তেমন ভঙ্গিতেই ফিসফিস গলায় কথাগুলো বললো মিস্টার বসওয়েল। পাদ্রীর কানে নতুন ধরনের প্যারাবল্ আওড়ালো, "আপনারও তো অনেক ব্যাপ্টাইজড নাগা আছে।"

"আছে।"

"আপনি তাদের মধ্যে রটিয়ে দিন, গাইডিলিও একটা ডাইনী। গ্রামে গ্রামে হেডম্যানদের হাত করে নিতে হবে। যত টাকা দিতে হয়, গভর্নমেন্ট কসুর করবে না। এই এজিটেশন ভেঙে তছনছ করে দিতে হবে। সমতলের বাসিন্দারা এই হিলি বীস্টগুলোর সঙ্গে মিললে আমাদের খুবই

ক্ষতি হবে ফাদার। বাট্ ডোণ্ট ফরগেট্, আজ থেকেই গাইডিলিও সম্বন্ধে প্রচার করে দিন—ও একটা ডাইনী।" একটু একটু করে মুখখানা ভয়ানক হয়ে উঠলো পুলিস সুপার বসওয়েলের।

এতক্ষণ একটা শিলামূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিলো পিয়ার্সন। একেবারেই নির্বাক, নিথর। অস্বাভাবিক তীক্ষ্ণ গলায় সে বললো, "সে কী কথা! শী ইজ্ এ গুড স্যাঙ্কটিমনিয়াস গার্ল, আই নো। এ ভারি অন্যায়। ভারি অন্যায়!"

"কী অন্যায়?" বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মত সাঁ করে ঘুরে বসলো বসওয়েল।

"হোয়াট্ ডু ইউ মীন?" চোখের মণিদুটো নীল আগুনের বিন্দু হলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর।

"আমি বলছি, মিছিমিছি একজনের নামে অ্যাসপার্স করা কি ঠিক?" অত্যন্ত শান্ত গলায় পিয়ার্সন বললো।

বসওয়েল হাসলো। দু-পাটি কদাকার দাঁত অদ্ভুতভাবে আত্মপ্রকাশ করলো। পিয়ার্সনের পিঠে মৃদু একটা চাপড় দিয়ে বললো, "ইউ আর টু ইয়ং। আমাদের ধর্মের সঙ্গে রাজ্য বিস্তারের সম্পর্ক আছে ফাদার। সেটা এখন আপনি বুঝতে পারবেন না। ইয়ং ম্যান, রক্ত এখন গরম। পুঁথিপড়া বিশ্বপ্রেম মনের মধ্যে টগবগ করছে! আই ক্যান অ্যাস্যুর, ওসব ফিলান্থ্রপি বেশি দিন থাকবে না। আচ্ছা, গুড ডে। আমাকে আবার গাইডিলিওর ওখানে লোক মোতায়েন করতে হবে।"

সতেজ সবুজ ঘাসের জমিটা পেরিয়ে গেটটার কাছে চলে এসেছে পুলিস সুপার বসওয়েল। তার পিছু পিছু বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। বসওয়েল চওড়া কাঁধখানা ঘুরিয়ে বললো, "এই ইয়ং মিশনারীকে এখান থেকে সরাতে হবে ফাদার। নইলে আমাদের পক্ষে বড় ক্ষতি হবে।"

"ইয়েস, একটা শয়তান। এর ওষুধ আমি জানি।" নীচের দাঁতগুলোর ওপর ওপরের পাটিটা নির্মমভাবে চেপে বসলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর। আশ্চর্য সংযম। এতটুকু শব্দ হলো না। শুধু চাপা বীভৎস গলায় সে বললো. "আপনি কিচ্ছু ভাববেন না। সব ব্যবস্থা আমি করবো। আমার দেশের, আমার গভর্নমেণ্টের ইণ্টারেস্ট আগে দেখতে হবে।"

ক্যাঁচ করে শব্দ হলো লোহার গেটটায়। বাইরে বেরিয়ে গেলে বসওয়েল। সবুজ ঘাসের জমিটা থেকে তীক্ষ্ণ ধারালো দৃষ্টিতে ম্যাকেঞ্জীদের দিকে তাকিয়ে রয়েছে পিয়ার্সন। পলক পড়ছে না। চোখ জোড়া যেন জলছে।

পঁচিশ

পশ্চিমের পাহাড়চূড়ায় বেলাশেষের বিষণ্ণ রোদ আটকে রয়েছে।

সিজিটোর ঘরে এলো সারুয়ামারু। একপাশে বাঁশের একটা মাচান। তার ওপরে সেঙাই বসে রয়েছে। এর মধ্যে খাবারগুলো খেয়ে শেষ করে ফেলেছে সে।

ঘরের মধ্যে আবছা অন্ধকার।

সারুয়ামারু বললো, "কী রে সেঙাই, সব খাবার গিলেছিস? আমার জন্যে রাখিস নি?"

"না, সব খেয়ে ফেলেছি। বড় খিদে পেয়েছিল।"

"হু-হু, আচ্ছা যাক ওসব। ফাদারের কাছ থেকে আবার চেয়ে নেবো'খন।" সারুয়ামারু বললো, "চল, কোহিমা শহর তোকে ঘুরিয়ে আনি। মাধোলাল মারোয়াড়ীর দোকান, ভূষণ স্বকনের দোকান—যেখান থেকে আমরা নিমক নি, সব দেখিয়ে আনবো তোকে। সব কিছু চিনিয়ে দেবো।"

এবার উৎসাহিত হয়ে উঠলো সেঙাই। মাচান থেকে লাফিয়ে নীচে নামলো। "সেই যে বলেছিলি, এক রানী গাইডিলিও না কে আছে, তাকে দেখাবি না? তুই বলেছিলি, তার ছোঁয়ায় নাকি সব রোগ সেরে যায়! তামুন্যুর (চিকিৎসক) চেয়েও সে বড়। সদ্দার তাকে দেখে যেতে বলেছে।"

"হু-হু। নিশ্চয়ই দেখাবো। চল, বেরুই।"

চার্চের সামনে সবুজ ঘাসজমিটার কাছাকাছি আসতেই পেছন থেকে একটা ডাক ভেসে এলো। নির্ঘাত পাদ্রীসাহেব। ফিরে তাকালো দুজনে।

"এই সারুয়ামারু, এই সেঙাই—কোথায় যাচ্ছো তোমরা?"

ঘাসজমির ওধারে বেতের চেয়ারে বসে হোলি বাইবেলের বিশেষ একটা অধ্যায়ে মনটাকে ডুবুরির মত নামিয়ে দিয়েছিলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী।

গুটিগুটি পায়ে সামনে এসে দাঁড়ালো সারুয়ামারু। ফিসফিস গলায়

বললো, "সেঙাইকে একটু শহর দেখাবো। হুই মাধোলালের দোকান—যেখান থেকে আমরা নিমক কিনি, সেই আস্তানাটাও দেখিয়ে দেবো। দরকার হলে বস্তি থেকে ও এসে নিমক নিয়ে যাবে।"

"আর কোথায় যাবে?" শান্ত চোখে তাকালো ম্যাকেঞ্জী।

"আর হুই যে রানী গাইডিলিও আছে, তাকে একবার দেখবো।"

রানী গাইডিলিও! সাপের ছোবল পড়লো যেন ম্যাকেঞ্জীর কানে। হাতের বাইবেলখানা সশব্দে বন্ধ করে তীব্রবেগে উঠে দাঁড়ালো, "খবরদার, ঐদিকে কেউ যাবে না। গাইডিলিও একটা ডাইনী। সর্বনাশ করে ছাড়বে।"

"ডাইনী!" চমকে উঠলো সারুয়ামারু। তার মুখেচোখে একটা সন্ত্রস্ত ছায়া পড়লো।

ইতিমধ্যে পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেঙাই। সে বললো, "ডাইনী!"

"হাঁ—হাঁ—" লালচে চুল ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে, কটা চোখের মণি ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দুটি পাহাড়ী মানুষকে যাচাই করতে লাগলো ম্যাকেঞ্জী। ডাইনী! দেখতে লাগলো, ঐ একটি শব্দ কেমন করে তাদের মুখেচোখে কী প্রতিক্রিয়া ফুটিয়ে তুলছে? নিপুণ শিল্পীর মত কথার তুলিতে উচ্চারণের ঢঙে ঢঙে একটা ভয়ের ছবি আঁকতে লাগলো ম্যাকেঞ্জী। বার বার সেঙাই আর সারুয়ামারুর কানের কাছে মুখখানা ঘনিষ্ঠ করে পরম শুভার্থীর মত বলতে লাগলো, "খবরদার, জানের মায়া থাকলে গাইডিলিওর কাছে যেয়ো না তোমরা। গাইডিলিও একটা খারাপ আনিজা। বুকের রক্ত শুষে শুষে সাবাড় করে ফেলবে তোমাদের।"

কাঁপা গলায় সেঙাই বললো, "ডাইনী যখন, তখন বশীকরণ ওষুধ জানে গাইডিলিও?"

"হাঁ-হাঁ জানে। খুব সাবধান!" দুটি পাহাড়ী মানুষের মনে একটা ভয়াবহ অনুভূতি ঘন করে তুলতে লাগলো ম্যাকেঞ্জী, "এমন বশ করবে, একেবারে পোষা বাঁদর বানিয়ে ছাড়বে।"

"তবে ভালোই হলো। আমাদের পাশের বস্তি সালুয়ালাঙে আমার লগোয়া লেন্যু (প্রেমিকা) আছে। তাকে আমার চাই। তার জন্যে গাইডিলিও ডাইনীর কাছ থেকে ওষুধ নিয়ে যাবো। আমাদের উদিকে ডাইনী নাকপোলিবা রয়েছে। কিন্তু তার কাছে ঘেঁষতে বড় ভয় করে।"

একটু থতমত খেলো ম্যাকেঞ্জী। নিমেষে বিক্ষিপ্ত মনটাকে ঠিকঠাক

করে নিলো, "এ ডাইনী তোমাদের ঐ নাকপোলিবার চেয়েও সাঙ্ঘাতিক। এর কাছে যেয়ো না। আমি তোমাকে সেই সালুয়ালাঙ বস্তির লগোয়া লেন্থ্যকে (প্রেমিকা) এনে দেবো। তা হলে খুশী তো!"

"দিবি তো! দিবি তো! ও সায়েব—" আগ্রহে উৎসাহে ম্যাকঞ্জীর পাশে এসে নিবিড় হয়ে দাঁড়ালো সেঙাই, "তুই যদি এনে দিস, তবে আর গাইডিলিওর কাছে যাবো না।"

বলতে বলতে কয়েক মুহূর্তের জন্য ভাবনার মধ্যে তলিয়ে গেলো সেঙাই। তারপর কাঁপা ভীরু গলায় বললো, "কিন্তু আমাদের সদ্দার যে গাইডিলিওকে দেখে যেতে বলেছে।"

"তোমাদের সর্দার জানে না, ও কী শয়তানী! ঐ ডাইনী গাইডিলিওর কাছে গেলে একেবারে খতম করে দেবে।"

আচমকা বাঁশের গেটে ক্যাঁচ করে শব্দ হলো। চোখ তুলে তাকালো ম্যাকেঞ্জী। তারপর খুশী-খুশী গলায় অভ্যর্থনা জানালো, "আরে এসো, এসো তোমরা।"

গেটের ওপাশে অনেক মানুষের জটলা। পাহাড়ী মানুষ। তুমুল হুলস্থুল বাধিয়ে দিয়েছে। মাথায় মোষের শিঙের মুকুট, আউ পাখির পালক গোঁজা। তামারঙ দেহে অজস্র উল্কি। মানুষের কঙ্কাল, বাঘের চোখ, হাতির দাঁত আঁকা রয়েছে। হাতের থাবায় লম্বা লম্বা বর্শা। সেই বর্শার ফলায় বেলাশেষের রোদ ঝিলিক দিচ্ছে।

দলা পাকিয়ে জটলা করতে করতে মানুষগুলো সামনের ঘাসের জমিটায় এসে বসেছে। সেঙাই একবার তাদের দিকে তাকালো। তার দৃষ্টিটা সকলের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরে যেতে শুরু করলো। নানা জাতের পাহাড়ী নাগা। লোটা, আও, সাঙটাম, কোনিয়াক, সেমা, রেঙমা। বিচিত্রতম ভাষায় তারা একসঙ্গে চেঁচামেচি শুরু করে দিয়েছে। বিচিত্র ভাষা, বিচিত্রতর উচ্চারণ, আর বিচিত্র মুখভঙ্গি। সহসা একটি মুখের ওপর এসে দৃষ্টিটা শিউরে উঠলো সেঙাইর। হৃৎপিণ্ডের ধকধকানি থেমে আসতে লাগলো। ঐ মানুষটা, নির্ঘাত সালুয়ালাঙ বস্তির সর্দার।

সাঁ করে সারুয়ামারুর পেছনে এসে দাঁড়ালো সেঙাই।

সারুয়ামারু বললো, "কী রে সেঙাই? কী হলো?"

"হুই ভাখ, সালুয়ালাঙ বস্তির সদ্দার এসেছে। তুই দাঁড়া, আমি বাপের ঘর থেকে বর্শাটা নিয়ে আসি।"

"কেন ?" ঘুরে তাকালো সারুয়ামারু।

"কেন আবার ? যদি একটা লড়াই বেধে যায় !"

"আরে না, না ! ফাদার রয়েছে না ! এখানে ওসব লড়াই চলবে না। তা হলে ঐ আসান্যুরা (সমতলের মানুষ) বন্দুক হাঁকড়ে মেরে ফেলবে।"

ঘাসের জমির পাহাড়ী মানুষগুলোর কাছে এসে দাঁড়িয়েছে ম্যাকেঞ্জী। মধুর হাসিতে মুখখানা ভরে গিয়েছে তার। ম্যাকেঞ্জীর হাসির পেছনে অনেক সাধনা আছে। যে-কোন সময় যে-কোন ভঙ্গির হাসি সে অবলীলাক্রমে ফোটাতে পারে। সারপ্লিসটা গোছগাছ করতে করতে ম্যাকেঞ্জী বললো, "এই যে সর্দারেরা, তোমরা সব এসেছো। ভালোই হলো, নইলে খবর পাঠাতে হতো। তোমাদের সঙ্গে আমার কথা আছে।"

"হু-হু।" মাথা ঝাঁকিয়ে মোষের শিঙের মুকুট দুলিয়ে সায় দিলো পাহাড়ী সর্দারেরা, "কী কথা বলবি ফাদার ? বল, আমরা শুনি।"

ওপাশে এখনও দাঁড়িয়ে রয়েছে সেঙাই আর সারুয়ামারু। সারুয়ামারু বললো, "পাহাড়ী বস্তি থেকে সর্দারেরা এসেছে। ফাদার ওদের সঙ্গে এখন কথা বলবে। চল, আমরা ভাগি। শহর দেখে, ভূষণ ফুকন আর মাধোলাল মারোয়াড়ীর দোকান দেখে, রাস্তাঘাট বাজার দেখে ফিরবো।"

"হু-হু, তাই চল—"

সকলের অগোচরে লোহার গেটটা পেরিয়ে কোহিমার পথে এসে নামলো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

আর পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী পাহাড়ী মানুষগুলোর জটলায় বসে পড়লো। একান্ত অন্তরঙ্গ হয়ে।

সর্দারেরা তারস্বরে হল্লা করছে, "ফাদার, আমার বস্তিতে সকলে যীশু-যীশু করে আর করুশ (ক্রশ) আঁকে।"

"আমার বস্তিতেও।"

"আমার বস্তিতেও।"

হল্লাটা একটু একটু করে তুমুল হয়ে উঠতে লাগলো।

"গুড, ভেরী গুড—" প্রসন্নতার একটি চিকন আভা ঝলমল করছে ম্যাকেঞ্জীর মুখেচোখে, "খুব খুশী হলাম।"

একটু আগে সারুয়ামারুর মুর্গী বলির কথা শুনে মেজাজটা যে পরিমাণ খিঁচড়ে গিয়েছিলো, এই মুহূর্তে এতগুলি গ্রামের এতগুলি পাহাড়ী সর্দারের

গলায় যীশু-মেরীর নাম শুনতে শুনতে তার একশো গুণ বেশি আত্মপ্রসাদ অনুভব করলো ম্যাকেঞ্জী। তবে তার প্রীচিঙ একেবারেই অসফল নয়, ব্যর্থ হয়ে যায় নি তার মিশনারী জীবনের উজ্জ্বল শপথ। পাহাড়ী প্রাণের শিলাফলকে যীশু-মেরীর যে নাম বার বার অবিরাম প্রেরণায় লিখতে চেয়েছে ম্যাকেঞ্জী, আজ যেন তার প্রথম সুস্পষ্ট হরফ দেখতে পেলো সে। দেখে মুগ্ধ হলো। মন, চৈতন্য আর ইন্দ্রিয়গুলির ওপর একটা সুখের শিহরণ খেলে গেলো প্রৌঢ় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর।

এবার আশ্চর্য শান্ত এবং সস্নেহ গলায় ম্যাকেঞ্জী বললো, "তোমাদের নিমকের দরকার তো?"

"হু-হু, সেই জন্যেই তো এলুম ফাদার।"

"আচ্ছা, আচ্ছা—এবার অনেক নিমক দেবো। টাকাও দেবো। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে তোমাদের।"

"হো-ও-ও-ও-য়া-আ-আ—ফাদার নিমক দেবে, টাকা দেবে।"

সমতল থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে কোহিমার এই পাহাড়-চূড়ায় একটা আনন্দিত শোরগোল ঝড়ের মত ভেঙে পড়লো। সে চিৎকারে আকাশের কোন নিঃসীম শূন্যে বেথেলহেমের একটি উজ্জ্বল ধ্রুবতারা হয়তো বা চমকে উঠলো। ঘাসের জমিটার এক কিনারে কাঠের শুভ্র ক্রুশে সে কোলাহল থেকে খানিকটা কালিমা ছিটকে গিয়ে লাগলো যেন।

ম্যাকেঞ্জী সতর্কভাবে পাহাড়ী মানুষগুলোর মুখের ওপর দিয়ে দৃষ্টিটাকে পাক খাওয়াতে খাওয়াতে চার্চের একটি জানালায় এনে স্থির করলো। দেখলো, দুটি শাণিত নীল চোখ মেলে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পিয়ার্সন। পলক পড়ছে না। একটা শিলামূর্তি যেন। বাঘের ঘরে ঘোগের আস্তানা! আচ্ছা, তার নামও ম্যাকেঞ্জী। পাদ্রী-জীবনের নেপথ্যে ব্রেটনক্রুকশায়ারের রাঙা মাটিতে মাটিতে তার অতীতকে রেখে এসেছে সে। সে অতীতের খবর জানা নেই পিয়ার্সনের। সে অতীত মানুষের তাজা রক্তে রক্তে ভয়ঙ্কর। আশেপাশের পঁচিশটা শায়ার তার নামের দাপটে সেদিন তটস্থ থাকতো। একটা ভিলেজ রোগ! একটা ব্যাণ্ডিট! সেদিন তার নাম করে দুরন্ত ছেলেদের ঘুম পাড়াতো মায়েরা। তার নামে ভয়ানক ছড়া বেঁধেছিলো অশিক্ষিত গ্রামীণ কবিরা।

ব্যাণ্ডিট থেকে ধর্মযাজক। আশ্চর্য জন্মান্তর বটে! সেই ব্রেটনক্রুক-

শায়ারের রাঙা মাটি ঘোড়ার খুরে খুরে ক্ষতবিক্ষত করে, শিকারী নেকড়ের মত একদল অনুচর নিয়ে ঘুরে বেড়াতো একটা ঘৃণিত আউট ল। তার ঘোড়ার খুরের শব্দে একটা আসন্ন অপঘাতের আশঙ্কায় শিউরে উঠতো পঁচিশটা শায়ারের ধুকপুক হৃৎপিণ্ড।

ব্যাণ্ডিট থেকে মিশনারী।

কী কুৎসিত সে জীবন। মানুষের নিরীহ রক্তে রক্তে, নারীর ইজ্জতের শিকারে সে জীবন কী কদাকার। সেদিন কী অব্যর্থ ছিলো তার রাইফেলের লক্ষ্য। রিভলভারের ট্রিগারের ওপর তর্জনীটা এতটুকু কাঁপতো না সেদিন।

আউট-ল থেকে ধর্মযাজক! কত ফারাক, কত পথ পাড়ি দিয়ে আসতে হয়েছে ম্যাকেঞ্জীকে! সে কাহিনী অন্য সময় বলা যাবে। কিন্তু ব্রেটনব্রুকশায়ারের সেই ভয়ঙ্কর জীবন এখনও তার শিরায় শিরায় বিষাক্ত একটা রক্ত কণিকার মত মিশে রয়েছে। সেই কলুষিত জীবনে ফিরে যেতে চায় না পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। অজস্র মানুষের ধর্মবোধের ওপর প্রভুত্ব করায় এক ধরনের স্বাদ আছে। এমন এক বিচিত্র রকমের নেশা আছে, যার আকর্ষণ অতীত জীবনটা সম্বন্ধে অরুচি ধরিয়ে দেয়। কিন্তু পিয়ার্সনটা বড় একগুঁয়ে। বড় জেদী। যদি প্রয়োজন হয়? চার্চের জানালায় একটা বিরক্ত ভ্রূকুটি হেনে বিড়বিড় করে কী যেন বললো ম্যাকেঞ্জী। নিশ্চয়ই হোলি বাইবেলের কোন মহাজন-বাণী আবৃত্তি করলো না।

এবার সরাসরি চোখে পাহাড়ী মানুষগুলোর দিকে তাকালো ম্যাকেঞ্জী, "একটা কাজ করতে হবে তোমাদের, বুঝলে সর্দারেরা। যত টাকা চাও, যত নিমক চাও, দেবো। গাইডিলিওর নাম শুনেছো তো?"

"হু-হু।" পাহাড়ী মানুষগুলো মাথা নাড়িয়ে নাড়িয়ে সায় দিলো।

"ঐ গাইডিলিও একটা ডাইনী। তোমাদের বস্তিতে বস্তিতে এই কথাটা রটিয়ে দিতে হবে। যত টাকা চাও, দেবো।" আরো নিবিড় হয়ে বসলো ম্যাকেঞ্জী।

"কে ডাইনী? হুই গাইডিলিও?" চোঙলি সর্দার সিনামঙ্কো হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "একথা বললে একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো। আমার ছেলেটাকে অঙ্গামীরা তো সুচেন্যু দিয়ে কুপিয়ে গেলো। তামুন্যু (চিকিৎসক) বললো, ও আর বাঁচবে না। হুই গাইডিলিওর ছোঁয়ায় সে বেঁচে উঠলো। তাকে ডাইনী বলছিস!"

"হু-হু—" আও আর সাঙটাম সর্দারেরা উঠে দাঁড়ালো, "আমাদের বস্তির অনেক লোক ভালো হয়ে গেছে রানীর ছোঁয়ায়। তাকে ডাইনী বলতে বলছিস? সাবাড় করে ফেলবো।"

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

চিৎকার করে উঠে দাঁড়ালো লোটা, কোনিয়াক আর রেঙমা সর্দারেরা, "চাই না, চাই না তোর টাকা, তোর নিমক। যে আমাদের বাঁচালো, তাকে ডাইনী বলবো না।"

"যীশুর নাম বলবো না। মেরীর নাম বলবো না।"

"আর ক্রশ আঁকবো না।"

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

শোরগোল উদ্দাম হয়ে উঠলো, "রানী গাইডিলিওর সঙ্গে বেইমানি করতে বলছিস! তুই তো শয়তান আছিস।"

"তোর কাছে আর আসবো না।"

নিরুপায় আক্রোশে কটা চোখদুটো ধকধক জ্বলছে ম্যাকেঞ্জীর। সে কি জানতো, এই দুদিন পাহাড়ীগুলোর মনে যীশু-মেরীর নামে যা গড়ে তুলেছিলো, তার নীচে কঠিন ভিত্তি নেই! সহসা তার দৃষ্টিটা চার্চের জানালায় একটা মুখের ওপর এসে পড়লো। পিয়ার্সন। সূক্ষ্ম পর্দার মত সে মুখে একটি বিদ্রূপের হাসিই কি আটকে রয়েছে! সারা দেহের শিরায় শিরায় ব্রেটনব্রুকশায়ারের অতীত জীবন যেন চমক দিয়ে উঠলো ম্যাকেঞ্জীর। ক্ষ্যাপা একটা নেকড়ের মত গর্জন করে উঠতে যাচ্ছিলো ম্যাকেঞ্জী, তার আগেই ঘটে গেলো ঘটনাটা। লোহার গেটে ক্যাঁচ করে শব্দ হলো।

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

চিৎকার করতে করতে কোহিমার পথে নেমে গেলো পাহাড়ী সর্দারেরা।

সমস্ত মনটা যেন ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে ম্যাকেঞ্জীর। আগ্নেয় চোখের মণিদুটো যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না। কিছুই শুনছে না ম্যাকেঞ্জী। সব ঝাপসা, আবছা হয়ে গিয়েছে। একটা নিরাকার অন্ধকারে তালগোল পাকিয়ে গেছে তার চেতনাটা। জীবনে কোনদিন এমন অসহায় মনে হয় নি নিজেকে।

সহসা পায়ের কাছ থেকে কয়েকটি গলা বুদ্বুদের মত ফুটে বেরুলো। তাদের মধ্যে কুকী সর্দার আছে, কাছাড়ী দলপতি আছে। আর রয়েছে

সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দার। তিনটে পাহাড়ী মানুষ সাপের মত ক্রূর চোখ মেলে অনুগত কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে আছে যেন। "ফাদার, আমরা তোর নিমক খেয়েছি। ওদের মত আমরা নিমকহারামি করবো না। গাইডিলিওকে ডাইনী বলে আমাদের বস্তিতে, আমাদের চেনাশোনা বস্তিতে রটিয়ে দেবো। তবে আমাদের অনেক টাকা আর নিমক দিতে হবে।"

"দেবো, দেবো—" একটা অবলম্বন পেয়েছে ম্যাকেঞ্জী। একটা আশ্রয়। এই আশ্রয়ের ওপর দাঁড়িয়ে সে ভেলকি দেখিয়ে ছাড়বে। "তোমরা যা চাও, তাই দেবো। সব দেবো।"

আচমকা সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার বলল, "ফাদার, আমাদের বস্তির মেহেলীকে কেলুরি বস্তির লোকেরা আটক করে রেখেছে। তাকে ফিরে পেতে হবে। দুই বস্তির সেঙাই ওকে বিয়ে করতে চায়। ইদিকে নানকোয়া বস্তি থেকে মেহেলীর জন্য টেনেন্যু মিঙ্গেলু (বউপণ) দিয়ে গিয়েছে। কেলুরি বস্তির লোকেরা আমাদের শত্তুর।"

"ঠিক আছে।" চারদিকে একবার চনমন চোখে তাকালো ম্যাকেঞ্জী। গেলো কোথায় সেঙাই আর সারুয়ামারু? এই তো এখানেই ছিলো একটু আগে। তবে কি ঐ পাহাড়ী সর্দারদের সঙ্গে তারাও চার্চের সীমানা থেকে চলে গিয়েছে? কুটিল একটা সন্দেহে মনটা কালো হয়ে গেলো ম্যাকেঞ্জীর। দাঁতের ওপর দাঁত চাপিয়ে হুমকে উঠলো সে, "ঠিক আছে। মেহেলীকে তোমাদের বস্তিতে ফিরিয়ে আনবো। দরকার হলে কোহিমা শহরের সব বন্দুক নিয়ে কেলুরি বস্তিকে লোপাট করে আসবো।"

সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দারের চোখদুটো খুশিতে উল্লাসে হিংস্রভাবে জ্বলতে লাগলো।

ছাব্বিশ

কোহিমা। সমতল থেকে অনেক, অনেক উঁচুতে পাহাড়ী শহর। পাথরের ভাঁজে ভাঁজে, চড়াই-উতরাইএর ফাঁকে ফাঁকে টালি আর ঢেউটিনের বাড়ি। ময়াল সাপের মত এঁকেবেঁকে পথের রেখা উঠে গিয়েছে, তার পরেই নিশ্চল ঢেউএর মত নীচের দিকে দোল খেয়ে নেমে গিয়েছে।

পাথর-কাটা আঁকাবাঁকা পথ, পাইন আর ওক বনের আড়ালে আড়ালে কালো পাথরের টিলায় ছোট ছোট বাড়ি দেখতে দেখতে এগিয়ে চলেছে সেঙাই আর সারুয়ামারু। সেঙাইর দু চোখে মুগ্ধ বিস্ময়। তার অস্ফুট পাহাড়ী মন এই কোহিমা শহরটাকে গোগ্রাসে গিলছে যেন।

একসময় ডিমাপুর যাওয়ার পথটার পাশে এসে দাঁড়ালো দুজনে। জায়গাটা অনেকটা সমতল। সামনের দিকে বনময় পাহাড় চূড়ার দিকে উঠে গিয়েছে।

এপাশে ঠাসবুনন দোকানপসার। ঢেউটিনের চাল, খাটসঙ কাঠের দেওয়াল, নীচে ওক কাঠের পাটাতন।

সারুয়ামারু বললো, "ইস, অনেক দোকান বেড়ে গেছে। আগে তো এতো ছিলো না। আসাহ্যুরা (সমতলের লোকেরা) সব ঝাঁক বেঁধে আসছে রে সেঙাই। কোহিমা শহর একেবারে ছেয়ে ফেলেছে, দেখেছিস ?"

"হু-হু—"

"আরে সারুয়ামারু, ইদিকে এসো। এসে আসাহোয়া (বন্ধু)।" সামনের একটা দোকান থেকে সাদর ডাক ভেসে এলো।

"কে ? ও মাধোলাল মারোয়াড়ী। চল চল সেঙাই—" সারুয়ামারু সেঙাইর একটা হাত চেপে ধরলো। পাথর-কাটা পথ থেকে নীচে নেমে দুজনে মাধোলালের দোকানের দিকে এগুতে শুরু করলো।

ছোট্ট পাহাড়ী শহর এই কোহিমা। নাগা পাহাড়ের কেন্দ্রবিন্দু। সমতল থেকে বাণিজ্যের পসরা সাজিয়ে এসে বসেছে বাঙালী, আসামী, মারোয়াড়ী। এসেছে গুজরাটি আর ভুটিয়া। রকমারি সম্ভার, মনোহর সামগ্রীতে নানা রঙের বাহার। আশেপাশের পাহাড় থেকে শুকনো মরিচ, আনারস আর

পাহাড়ী আপেল নিয়ে খোলা আকাশের নীচে অস্থায়ী বাজার বসিয়েছে কুকীরা। এসেছে মিকিরেরা। মণিপুরীরাও এই বাণিজ্যমেলা থেকে নিজেদের সরিয়ে রাখে নি।

কাচের কঙ্কণ, লবণ, পাটনাই চালের ভরা নিয়ে রেল স্টেশন মণিপুর রোড থেকে এই কোহিমার বাজারে আসছে একটার পর একটা লরি। বাঘের ছাল, হরিণের শিঙ, কস্তুরী, ওক আর পাইনের কাঠ, কমলা আর রাশি রাশি বনজ ফল—নানা পণ্যভারে বোঝাই হয়ে রেলের স্টেশনে ফিরে যাচ্ছে লরির ঝাঁক।

দোকানপসারের জটলা পেছনে রেখে মাধোলালের দোকানে এসে বসলো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

মাধোলাল বললো, "কী হে সারুয়ামারু, তুমি তো আর আজকাল আসো না নিমক নিতে। কী হলো ? তোমার বাবা, তোমার ঠাকুরদা সব আমার খদ্দের ছিলো। আজকাল এত দোকান হয়েছে। আসান্যুরা (সমতলের লোকেরা) এসে কোহিমার বাজার ছেঁকে ধরেছে। কিন্তু আমি যখন এখানে আসি তখন আসান্যুদের একটা দোকানও ছিলো না। তোমার গোঁসা হয়েছে না কি আমার ওপর ?"

"না, না—" সারুয়ামারু মাথা ঝাঁকালো।

"তবে আসো না কেন ?" অন্তরঙ্গ ভঙ্গিতে সামনে এসে দাঁড়ালো মাধোলাল।

"আজকাল হুই ফাদার নিমক দেয়, তাই আর আসি না।"

"আরে রাম রাম। তাই নাকি ? তা নিমকের বদলা কী দাও ?" আগ্রহে বুড়ো মাধোলাল সামনের দিকে আরও এগিয়ে এলো।

"কিছু না, খালি ক্রুশ আঁকি আর যীশু-মেরীর নাম করি।" নির্বিকারভাবে বলে গেলো সারুয়ামারু, "হুই ফাদার বলেছে, ক্রুশ আঁকলে আর যীশু-মেরীর নাম করলে কিছুই দিতে হবে না।"

"হায়, রাম রাম—"প্রায় আর্তনাদ করে উঠলো মাধোলাল, "ঐ কাম করলে তোমার আনিজা গোঁসা হবে। পাদ্রীসাহেবরা ভারি শয়তান আছে। তোমার ধরম নষ্ট করে দিচ্ছে। খাসিয়া পাহাড়ে যখন ছিলাম তখন দেখেছি। খাসিয়াদের সব খেস্টান করে দিলো। এবার তোমাদের ধরেছে। হায়, রাম রাম।"

আজমীড় কি মারোয়াড়ের কোন-এক দেহাতী গ্রামে মাধোলালের দেশ,

তা আজ আর বিশেষ মনে পড়ে না। সূর্য ওঠার আগে আকাশের চক্ররেখায় যেমন এক আস্তর ছায়া-ছায়া রঙ লেগে থাকে, ঠিক তেমনি একটা অস্পষ্ট আবছা স্মৃতি মনের মধ্যে বিবর্ণ হয়ে রয়েছে মাধোলালের। জনারের ক্ষেত, কপিশরঙ রুক্ষ মাটি, মহিষ চারণের জমি। আর কিছু নয়। দশ বছর বয়সে বাপ ক্ষেত্রীলালের সঙ্গে এই পূর্ব ভারতে এসেছে সে। রেলের চাকার নীচে অদৃশ্য হয়েছে বিহার, তারপর সুশ্যাম বাঙলা মুল্লুক, তারও পর আসামের নিঃসীম সমতল পেরিয়ে খাসিয়া পাহাড়। নঙ পো, শিলং, চেরাপুঞ্জি। তারও পর হাফলঙে কিছুদিন থেকে এই নাগা পাহাড়। তাও আজ চল্লিশ বছর পার হতে চললো।

অনেক কিছু দেখেছে মাধোলাল। এই চল্লিশ বছরের স্মৃতিতে জমা হয়ে রয়েছে অনেক কথা, অনেক ঘটনা, অজস্র অভিজ্ঞতা। জীবনের এই চল্লিশটা বছরের প্রতিটি প্রহরের পাতায় পাতায় কত ইতিহাস লেখা রয়েছে মাধোলালের, তার শুকনো হাড়ে হাড়ে কত পাষাণলিপি আঁকা হয়েছে, তার হিসেব নেই, তার সীমা-পরিসীমা নেই।

বাপ ক্ষেত্রীলাল কোহিমার পাহাড়ে এই তেল-লবণ-আলুর দোকান দিয়েছিলো। বুড্ঢা বাঁশের মাচানের ওপর বসে দুলে দুলে সন্ত তুলসীদাসের রামায়ণ পড়তো। সেও আজ কতদিন পার হয়ে গেলো। বাপ মরলো একদিন। বছর দুয়েক পর কলকাতা শহর থেকে তাদের মুল্লুকের দেহাতী কিশোরী ফুলপিয়ারিকে শাদী করে আনলো মাধোলাল। সেবার কী হুজুগ আজীব শহর কলকাত্তায়। মিছিল, সভা, বক্তৃতা। কে এক সুরেন বানারজী না কী যেন? নামটা ঠিক মনে পড়ছে না। কাঁচ-পাকা দাড়ির জঙ্গল। বাঙালীবাবুর কলিজার জোর আছে। তাগদ আছে রক্তের। তাকে নিয়ে কী মাতামাতি! একটু-একটু শুনেছিলো মাধোলাল, তার চেয়েও কম বুঝেছিলো। বাঙালীবাবুরা নাকি সাহেবদের সঙ্গে লড়াই শুরু করেছে। পঁচিশ-তিরিশ বছর আগের সে সব ঘটনা মাধোলালের স্মৃতিতে ইতিহাস হয়ে রয়েছে।

শাদী করার পরের বছর পাণ্ডুতে বাড়ি তুললো মাধোলাল। সরমের কথা, তবু সত্যি বৈ কী! শাদীর প্রথম বছরেই ছানা-পোনা হলো। সেই ছেলে বুধোলাল এখন পঁচিশ বছরের তাজা জোয়ান। বুনো ঘোড়ার মত উদ্দাম। তার একটা শাদী দিতে হবে। অবশ্য শাদী একরকম ঠিকই হয়ে

রয়েছে। রঙ্গিয়ার মেয়ে। নাম বিরজা। আসামী মেয়ে পুত্রবধূ হবে। তাতে আপত্তি নেই মাধোলালের। এত বছর এই পূর্ব ভারতে রয়েছে, মাধোলাল। নানা দিক থেকে আত্মীয়তার শিকড়ে-বাকড়ে তাকে জড়িয়ে ধরেছে এই আসাম, এই খাসিয়া পাহাড়, এই নাগা মুল্লুক।

আজ দশ বছর ধরে কোহিমা পাহাড়ে স্থির হয়ে বসেছে মাধোলাল। মাঝে মাঝে মণিপুর রোড স্টেশন থেকে রেলে চড়ে পাণ্ডুর বাড়িতে যায়। দু-চার দিন কাটিয়ে আবার ফিরে আসে এই কোহিমার-দোকানে। সমতল থেকে অনেক উঁচুতে এই পাহাড়ী শহর তাকে শত বাহু দিয়ে যেন বন্দী করে রেখেছে। বুধোলাল অনুযোগ দেয়। এই বুড়ো বয়সে এবার পাণ্ডুর বাড়িতে গিয়ে থাকলেই হয়। যে বয়সের যে ধরম। সামনেই কামাখ্যা মন্দির। সেখানে গিয়ে পরকালের খানিকটা সুরাহা করলেও তো পারে বুড়ো মাধোলাল। আর ক-টা দিনই বা বাকী আছে পরমায়ুর? পরপারে যাবার সময় হলো বলে। ডাক আসতে কতক্ষণ? সব বোঝে মাধোলাল। কিন্তু কোহিমা যেন পাহাড়ী ডাইনীর মত তাকে কুহকিত করেছে। বিচিত্র তার ইন্দ্রজাল, তার বাহুর বেষ্টন থেকে মুক্তির বিন্দুমাত্র যেন সম্ভাবনা নেই।

বুধোলালই আজকাল পণ্যভার আমদানি করে। আমিনগাঁ থেকে, করিমগঞ্জ থেকে, তিনসুকিয়া কি হাফলঙ থেকে রেলের ওয়াগন ভরাট করে। তারপর ডিমাপুর থেকে লরিতে চাপিয়ে এই শহর কোহিমা। আর বুড়ো ক্ষেত্রীলাল যেখানে বসে সন্ত তুলসীদাসের রামায়ণ পাঠ করতো, যেখান থেকে একটি ভক্তিনম্র সুরের আবেগে এই পাহাড়ী পৃথিবীকে অমৃতময় করে তুলতো, ঠিক সেই মাচানটির ওপর বসে বুড়ো মাধোলাল পাহাড়ী মানুষগুলোর সঙ্গে গল্প করে। আজমীড় কি মারোয়াড়ের সেই দেহাতী গ্রামটির আবছায়া স্মৃতি, রেলের গল্প, পাণ্ডু-আমিনগাঁ-কাটিহারের গল্প, খাসিয়া আর গারো পাহাড়ের গল্প। কলকাতার গল্প, সাহেবদের সঙ্গে সেই বাঙালীবাবু সুরেন বানারজী না কার যেন সেই লড়াইএর ইতিহাস। শিলং-চেরায় পাদ্রী সাহেবদের কীর্তিকথা। আরো যে কত কাহিনী, তার লেখাজোখা নেই। তার ষাট বছরের প্রতিটি পলে পলে, ষাট বছরের বিরাট অতীতে আর দেহের প্রতিটি কুঞ্চনে কুঞ্চনে যে রাশি রাশি গল্প, রাশি রাশি কাহিনী পুঞ্জীভূত হয়ে রয়েছে, সেই সব গল্প বলে মাধোলাল।

সামনে চুপচাপ বসে রয়েছে সাক্ষয়ামাঙ্ক। তার পাশে সেঙাই।

মাধোলাল বলতে লাগলো, "হায়, রাম রাম। এই পাদ্রীগুলো সব বেমনাশা। নিমকের বদলা ধরম নিয়ে নেয়—"

"বলিস কী মাধোলাল! আমাদের ধরম নিচ্ছে দুই ফাদার?"

"হাঁ-হাঁ! এ কথা আবার কাউকে বোলো না। তোমার ঠাকুরদা ছিলো আমার আসাহোয়া (বন্ধু)। সে আমার দোকান থেকে নিমক নিতো। তারপর আসতো তোমার বাবা। তারও পর আসতে তুমি। তুমি তো এখন দুই পাদ্রীদের পাল্লায় গিয়ে পড়েছো। তোমাদের তিন পুরুষের সঙ্গে আমাদের কারবার। তাই সত্যি কথা বললুম। সাহেবদের কাছে আবার এসব কথা বোলো না। তা হলে আমার দোকান তুলে দেবে।"

পাহাড়ী ভাষা কী চমৎকার আয়ত্ত করেছে মাধোলাল। বিস্মিত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেঙাই।

"না, না, বলবো না। আগে তো ঠিক বুঝি নি। আনিজার নামে শুয়োর বলি দিতে ফাদার বারণ করে। একেবারে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো না!" সহজ পাহাড়ী মানুষ সারুয়ামারু ফুঁসে উঠলো।

সহসা ফিসফিস গলায় মাধোলাল বললো, "তোমাদের ঐ যে রানী গাইডিলিও আছে, তার কাছে জিগ্যেস করো। হক কথা বলবে।"

"না, না উর কাছে যাবো না। ও তো ডাইনী!" একটা সন্ত্রস্ত ছায়া এসে পড়লো সেঙাইর মুখেচোখে। সারুয়ামারুও চকিত হয়ে উঠেছে।

"ডাইনী! কে? রানী গাইডিলিও!" বিস্ময়ে গলাটা চৌচির হয়ে গেলো মাধোলালের, "কে বললে এ কথা?"

"ফাদার বলেছে।"

"মিছে কথা, একেবারে মিছে কথা।" এক আজব কাহিনীর ওপর থেকে যবনিকা তুলে দিলো বুড়ো মাধোলাল, "জানো সারুয়ামারু, আমাদের দেশে এক মহারাজা আছে। তার নাম হলো গান্ধীজী। এই সায়েবদের সঙ্গে তার লড়াই বেধেছে। আমার ছেলে বুধোলাল দুদিন আগে কলকাতা থেকে ফিরেছে। সে সেই লড়াই দেখেছে।"

সেঙাই বললো, "এই সাহেবরা কোথা থেকে এলো?"

"সে ভিনদেশ থেকে। সাত সমুদ্দুর তেরো নদী ডিঙিয়ে। অনেক, অনেক দূরে সে দেশ।" কোহিমা পাহাড় থেকে এক অনির্দেশ্য দিগন্তের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলো মাধোলাল, "আমরা তো আসাম্যু (সমতলের

লোক)। আমাদের দেশ থেকেও অনেক, অনেক দূরে সায়েবদের দেশ।"

"সে দেশে তুই গেছিস?"

"না।"

আচমকা সারুয়ামারু বললো, "তুই যে বললি লড়াই বেধেছে, তা বর্শা দিয়ে, সুচেন্যু দিয়ে, তীর-ধনুক দিয়ে মানুষ ফুঁড়ছে তো! মাথা কেটে মোরাঙে ঝোলাচ্ছে! বেশ মজা কিন্তু, আমাদের পাহাড়ে অমন লড়াই অনেকদিন বাধছে না।"

"তেমন লড়াই নয়। গান্ধীজীর লোকেরা সায়েবদের মারে না। সায়েবরাই তাদের মারে। এ দেশ থেকে সায়েবদের ভাগতে বললেন গান্ধীজী।"

"এ কেমন লড়াই! মার খাবে, অথচ মারবে না! তাই কখনো হয়। আমাদের পাহাড়ে লড়াই হলে সায়েবদের ফুঁড়ে ফেলতুম।" উত্তেজনায় ঝকমক করছে সেঙাইর চোখ দুটো। পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে।

"এ লড়াই তোমরা বুঝবে না। এ বড় মজার লড়াই। আমার ছেলেটা বললো, গান্ধীজীর লোকেরা মার খেয়ে খেয়ে জিতে যাচ্ছে।" একটু চুপচাপ। আবার বলতে শুরু করলো মাধোলাল, "ঐ দেখো খালি কথাই বলছি। এর কথা তো কিছু বললে না সারুয়ামারু। এ কে?" সেঙাইর দিকে তাকালো মাধোলাল।

"এ হলো সেঙাই। সিজিটোর ছেলে।"

"ও, রাম রাম। তারপর শোনো, আমাদের দেশে যেমন গান্ধীজী, তোমাদের এই পাহাড়ে তেমনি হলো রানী গাইডিলিও। সাহেবদের সেও দেখতে পারে না। তার কথা শুনে দেখো। এই কোহিমাতেই তো আছে রানী গাইডিলিও।" অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকালো বুড়ো মাধোলাল।

সেঙাই সারুয়ামারুদের প্রত্যক্ষ ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, সচেতন বোধ আর অনুভূতি এবং অস্ফুট ধারণার বাইরে বিস্ময়কর অনেক কিছু আছে। তার খবর দিয়েছে বুড়ো মাধোলাল।

গান্ধীজীর সঙ্গে সাহেবদের লড়াই, রানী গাইডিলিও—এই অদ্ভুত নামগুলি, মাধোলালের এই অপরূপ গল্প তাদের অস্পষ্ট বন্য চেতনাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছে। পাহাড়ী মনে দোলা লেগেছে। মগ্ন হয়ে গিয়েছে দুটি পাহাড়ী চৈতন্য।

সহসা সেঙাই শুধলো, "তোদের দেশে সায়েবদের সঙ্গে লড়াইটা বাধলো কেন? কী হয়েছিলো? ঘরের বউ ছিনিয়ে নিয়েছিলো নাকি?"

"ওরা বিদেশী। আমাদের দেশে এসে আমাদের মারবে, আমাদের খাবার কেড়ে নেবে। কতকাল সইবো? এই ধরো তোমাদের বস্তি, সেখানে কেউ যদি এসে সদ্দার হতে চায়, তোমাদের মারতে চায়, তাহলে সইবে?"

"না, না। একেবারে খতম করে ফেলবো।" গর্জে উঠলো সেঙাই।

"সায়েবরা এসেছে বিদেশ থেকে। এসেছিস থাক, তা নয়, সদ্দারী করতে শুরু করলো। এই দেখো না তোমাদের পাহাড়েও এসেছে। সদ্দারী করছে।"

সারুয়ামারু বললো, "তোরাও তো এসেছিস। তোরাও তো বিদেশী। তোরা আসান্যু (সমতলের লোক)।"

"হায়, রাম রাম—" মাপা আধ হাত জিভ কাটলো মাধোলাল, "আমরা আসান্যু (সমতলের লোক), তা ঠিক কথা। কিন্তু এ দেশটা আমাদের। তোমরা আমরা এক দেশী। আমরা থাকি নীচু জমিতে, তোমরা থাকো পাহাড়ে। দুইয়ে মিলিয়ে গোটা ভারত।"

"তবে ফাদার বলে যে আসান্যুরা (সমতলের বাসিন্দা) শয়তান, ওরা ভিনদেশী।"

"সব মিছে। তোমাদের রানী গাইডিলিওকে জিগ্যেস করে দেখো।"

কোহিমার আকাশে রাত্রি নামছে। অস্পষ্ট রঙের কুয়াশা বাতাসে মিশে যাচ্ছে। সামনের পাহাড়চূড়া অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে।

সেঙাই আর সারুয়ামারু উঠে পড়লো। সারুয়ামারু বললো, "আমরা যাই। সন্ধ্যা পেরিয়ে গেল। বড় শীত করছে।"

গ্যাসবাতি ধরাতে ধরাতে মাধোলাল বললো, "তোমরা আছো কোথায়?"

"ফাদারের কাছে।"

"ও।" বিড়বিড় করে অস্ফুট গলায় কী যে বললো মাধোলাল, বোঝা গেলো না। একটু পরেই সরব হয়ে উঠলো, "গান্ধীজীর কথা, রানী গাইডি-লিওর কথা তোমাদের ফাদারকে বোলো না কিন্তু। আর নিমকের দরকার হলে আমাদের দোকান থেকে নিয়ে যেও। অন্য সব দোকান থেকে দর সুবিধে করে দেবো।"

"আচ্ছা"

কোহিমার পথে পা বাড়িয়ে দিলো সেঙাই আর সারুয়ামারু।

চলতে চলতে সারুয়ামারু বললো, "মজার গল্প বলে মাধোলাল। গান্ধীজীর লড়াই, রানী গাইডিলিও। কী সুন্দর গল্প। ভারি ভালো।"

"হু-হু—" মাথা নাড়লো সেঙাই।

গান্ধীজীর যুদ্ধ! রানী গাইডিলিও! সেঙাইর বন্য পাহাড়ী মনে কি পাষাণলেখা পড়লো? আঁকা হলো দুর্বোধ্য কোন শিলালিপি?

পাহাড়ী মনের উত্তেজনা। সে তো ঘাসের ওপর শিশির কণার পরমায়ু। রাত্রিবেলা সিজিটোর ঘরে শুয়ে শুয়ে ছয় আকাশ ছয় পাহাড় একাকার করে ভেবেছে সেঙাই। পাশের মাচানে একটা বুনো মোষের মত ভোঁসভোঁস শব্দ করে ঘুমিয়েছে সারুয়ামারু। মসৃণ ঘুমে রাত্রিটা কাবার করে দিয়েছে।

কিন্তু অনেকটা সময় পর্যন্ত ঘুমাতে পারে নি সেঙাই। রাত্রি যখন গভীর হয়েছিলো, নিবিড় হয়েছিলো, ঠিক সেই সময় ঢেউটিনের চালের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলো সে। মোষের পিঠের মত ঘন কালো আকাশ। অনেক, অসংখ্য মিটমিট তারা। আঁচড়ের মত ফুটে বেরিয়েছে আবছা ছায়াপথ।

সন্ধ্যার সময় মাধোলাল কার সঙ্গে যেন সাহেবদের লড়াইর কথা বলেছিলো, রানী গাইডিলিওর কথা বলেছিলো। গাইডিলিও নাকি ডাইনী নয়। অথচ ফাদার বলেছে, সে ডাইনী। গ্রাম থেকে আসার সময় বুড়ো খপেগা বার বার বলে দিয়েছিল, রানী গাইডিলিওর সঙ্গে দেখা করতে। রানী গাইডিলিও আর ডাইনী গাইডিলিও—এই দু-টি নামের মধ্যে সেঙাইর পাহাড়ী মনটা অনেকক্ষণ দোল খেয়েছে। একটা স্থির সিদ্ধান্তে সে পৌঁছতে পারে নি। গাইডিলিওকে দেখবে কি দেখবে না।

একটার পর একটা ভাবনার ঢেউ চেতনার ওপর দিয়ে সরে সরে গিয়েছে। কার যেন লড়াইয়ের কথা বললো মাধোলাল। বর্শা দিয়ে ফুঁড়ছে না, সুচেন্যু দিয়ে কোপাচ্ছে না। মার খাচ্ছে অথচ মারছে না। আজব দেশ; সব যেন রূপকথা। কোথায় সেই দেশ? কোথায় সেই অদ্ভুত মানুষেরা? সব যেন মিথ্যে মনে হয়। বিভ্রান্তির মত লাগে। বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করে না। তাদের এই পাহাড়ী পৃথিবীর বাইরে আর কোথাও কোন সমতলের দেশ রয়েছে, সেখানে সাহেবদের সঙ্গে লড়াই চলছে, ভাবতেও কেমন লাগে পাহাড়ী জোয়ান সেঙাইর। নাঃ, এই পাহাড়, এই উপত্যকা, এই মালভূমি, এই বন-ঝরনা জলপ্রপাত আর এই কোহিমা শহরের বাইরে কোথাও কোন দেশ আছে, তা

তার ধারণার অতীত। প্রবল প্রতিবাদে বুনো মনটা অবিশ্বাসী হয়ে ওঠে সেঙাইর।

এক সময় গান্ধীজীর যুদ্ধ, রানী গাইডিলিও, বুড়ো মাধোলাল, এই সুন্দর কোহিমা শহর—সমস্ত কিছুই মন থেকে সরে গেলো সেঙাইর। মেহেলীর কথা মনে পড়লো। অনেকদিন আগে এক নিঃশব্দ ঝরনার পাশে তাকে প্রথম দেখেছিলো। সালুয়ালাঙ গ্রামে তাকে শেষবারের মত দেখে এসেছে সেঙাই। বন্য আদিম মানুষ। মনের চিন্তাগুলি অত্যন্ত দ্রুতগতিতে ক্রিয়া করে। নিমেষে এক ভাবনা থেকে অন্য ভাবনায় মনটা পরিবর্তিত হয়। সেঙাই ভাবলো, মেহেলীকে তার চাই। উন্মাদ ভোগে, উদ্দাম কামনায় শত্রুপক্ষের মেয়েকে পেতেই হবে। কোহিমা শহরের নিঃসঙ্গ বিছানায় মেহেলীর ভাবনায় সারাটা রাত্রি উত্তেজিত হয়ে রইলো সেঙাই।

কোহিমার পাহাড় তার জন্য এত সব বিচিত্র ভাবনা সাজিয়ে রেখেছিলো, তা কি জানতো সেঙাই!

আকাশে শেষ রাত্রির আবছা অন্ধকার লেগে রয়েছে তখনও। একটা উদাত্ত স্বর ভেসে এলো চার্চের চ্যাপেল থেকে। সেই অপূর্ব স্বরের মুর্ছনা সমস্ত চেতনাটাকে ভরে দিয়েছিলো সেঙাইর।

পাশের মাচান থেকে সারুয়ামারু বলেছিলো, "ছোট ফাদার যীশু-মেরীর গান গাইছে।"

"কী গান গাইছে? কী কথা বলছে রে?" সেঙাই জিজ্ঞাসা করলো।

"ওদের কথা বুঝি না।"

ছোট পাদ্রী অর্থাৎ পিয়ার্সন। পরম পিতার কাছে রাতপ্রভাতের প্রার্থনা জানাচ্ছে। একটি কথার অর্থও তার বোঝে না সেঙাই, পরমার্থও তার কাছে দুর্জ্ঞেয়। তবু পিয়ার্সনের সুললিত কণ্ঠে এমন একটা আবেগ রয়েছে যাতে তার মনটা বিবশ হয়ে যাচ্ছে। একটু আগে মেহেলীর কথা ভাবতে ভাবতে সমস্ত স্নায়ুগুলো উত্তেজিত হয়ে গিয়েছিলো। এখন এই গানের শান্ত মধুর সুরে বিচিত্র আবেশে সেঙাইর অস্ফুট মনটা ভরে গিয়েছে। মেহেলীর ভাবনা থেকে পিয়ার্সনের এই অদ্ভুত গানটা কত তফাত! এই গানের সঙ্গে মাধোলালের গল্পের একটা আশ্চর্য সঙ্গতি রয়েছে যেন। ঠিক ধরতে পারে নি সেঙাই।

এক সময় পুবের পাহাড়চূড়া আলো করে সূর্য উঠলো। কুয়াশা মুছে গেলো।

সিজিটোর ঘর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলো সেঙাই আর সারুয়ামারু। বাইরে বেরিয়ে এই সুন্দর সকালে মনটা বিষিয়ে গেলো সেঙাইর।

সবুজ ঘাসজমির ওপারে বসে রয়েছে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। তার পায়ের কাছে একদল পোষা কুকুরের মত ছত্রখান হয়ে বসেছে জনকয়েক পাহাড়ী সর্দার। তাদের সারাদেহে বিচিত্র ধরনের পোশাক আর অলঙ্কারের বাহার। মাঝখানে বসেছে সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দার।

বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী মুঠো-মুঠো টাকা পাহাড়ী সর্দারদের থাবায় গুঁজে দিচ্ছে। আর ফিসফিস করে কি যেন বলছে। হয়তো বা যীশু-মেরীর কোন গূঢ় মন্ত্র। আর পাহাড়ী সর্দারদের নির্লোম মুখে কখনো ভীষণ হাসি, কখনো নিষ্ঠুরতা ঝিলিক দিয়ে যাচ্ছে।

বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর দৃষ্টি ভয়ানক সজাগ এবং ধূর্ত। সারুয়ামারু আর সেঙাইকে সে ঠিকঠিক দেখে ফেললো, "আরে সেঙাই, এই যে সারুয়ামারু—তোমরা এসো।"

গুটিগুটি পায়ে পায়ে ঘাসের জমি পেরিয়ে ম্যাকেঞ্জীর কাছে এসে দাঁড়ালো দুজনে। সেঙাইর কঠোর থাবায় বিরাট বর্শাটা ধরা রয়েছে। দুটো তীক্ষ্ণ, ধারালো এবং নির্মম চোখ মেলে নির্নিমেষ সালুয়ালাঙের সর্দারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে সেঙাই।

সেঙাই! চমকে উঠেছিলো সালুয়ালাঙের সর্দার। কোনদিন সে সেঙাইকে দেখেনি। সালুনারুর কথায় সেদিন খাসেম গাছের মগডালে মেহেলীর ছোট্ট ঘরখানায় তাকে পুড়িয়ে এসেছিলো। পরে অবশ্য জেনেছিলো সেঙাই মরে নি। কোহিমার পাহাড়ে তার জন্য এমন একটা বিপজ্জনক বিস্ময় অপেক্ষা করে ছিলো, তা কি জানতো সে। মুখখানা ভয়ঙ্কর হলো তার। প্রখর মুঠিতে সামনের বর্শাটা চেপে ধরলো।

সেঙাই আর সালুয়ালাঙের সর্দার। দুই প্রতিপক্ষ। তিন পুরুষ ধরে পরস্পর শত্রু। কোহিমার পাহাড়ে মুখোমুখি হলো কেলুরি আর সালুয়ালাঙ। চতুর আর কুটিল হাসিতে পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর মুখখানা ভরে গেলো।

ম্যাকেঞ্জী বললো, "রাত্তিরে কেমন ঘুমোলে তোমরা?"

"ভালো, ভালো।" খুশী-খুশী গলায় সারুয়ামারু বললো।

ভুরু কুঁচকে বাঁ চোখটা ছোট করে সেঙাইর দিকে তাকালো ম্যাকেঞ্জী, "মেহেলীকে বিয়ে করতে চাও? কী ব্যাপার?"

"হু-হু, চাই তো। মেহেলীকে আমি ছিনিয়ে আনবো হুই সালুয়ালাঙ বস্তি থেকে।"

"কী বললি ?" ফুঁসে উঠলো সালুয়ালাঙের সর্দার।

ততক্ষণে বর্শাটাকে বাগিয়ে তাক করেছে সেঙাই। তার দুটো পিঙ্গল চোখে হত্যার প্রতিজ্ঞা জ্বলছে, "একেবারে শেষ করে ফেলবো তোকে। আহে ভু টেলো !"

"এই এই, এটা কী হচ্ছে ! এটা চার্চ !" হাঁ-হাঁ করে লাফিয়ে উঠলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী।

চার্চের পবিত্র চত্বরে পাহাড়ী রক্তের কলঙ্ক লাগবে। যেশাসের পুণ্যনাম কলুষিত হবে—সারপ্লিসের আড়ালে ম্যাকেঞ্জীর দেহটা কেঁপে উঠলো। ব্রেটনব্রুকশায়ারের সেই আউট-ল রক্ত নিয়ে মাতামাতির খেলায় প্রেরণা দিতে পারতো। কিন্তু সারপ্লিসের খোলস যখন থেকে দেহে উঠেছে, তখন থেকেই অনেকটা নিরুত্তেজ হয়ে পড়েছে ম্যাকেঞ্জী।

সাঁ করে সেঙাইর একটি হাত চেপে টানতে টানতে তাকে সিজিটোর ঘরে রেখে এলো ম্যাকেঞ্জী। আসার সময় বললো, "কোন ভয় নেই। মেহেলীকে তোমার সঙ্গে বিয়ে আমি দেবো। তবে একটা কাজ করতে হবে তোমাকে ?"

"কী কাজ ?"

"পরে বলবো।"

বাইরে বেরিয়ে সালুয়ালাঙের সর্দারের কাছে চলে এলো ম্যাকেঞ্জী।

তাকে নিয়ে আর একটি ঘরে ঢুকলো।

ম্যাকেঞ্জী বললো, "কোন চিন্তা নেই সর্দার। আমি যখন আছি, তখন মেহেলীকে তোমরা পাবেই। আরো অনেক টাকা দেবো। যে কাজের কথা বললাম, মনে আছে তো ?"

"হু-হু, নিমকহারামি আমরা করি না। আমরা পাহাড়ী মানুষ, টাকা নিয়েছি, বেইমানি করবো না।"

"এই তো চাই। বস্তিতে গিয়ে যে কথা বলেছি, তা চাউর করে দাও।"

"হু-হু, আমরা এবার যাই। কিন্তু তুই দেখিস ফাদার, হুই শয়তানের বাচ্চা সেঙাইটাকে একেবারে খতম করবো।" বলতে বলতে বাইরের ঘাসবনে নামলো সালুয়ালাঙের সর্দার। সেখান থেকে কোহিমার আঁকাবাঁকা পথে।

পরের দিনও সকাল থেকে শেষবেলা পর্যন্ত কোহিমার পথে পথে ঘুরে বেড়ালো সেঙাই আর সারুয়ামারু। চড়াই-উতরাইএ দোল-খাওয়া পথ। দোকানপসার। সমতলের বাসিন্দাদের বাণিজ্যমেলা। ইম্ফল আর ডিমাপুরের দিকে প্রসারিত পথের রেখা। বিচিত্র সব মানুষ। বিচিত্রতর ভাষার কলতান।

কেলুরি গ্রামের এক পাহাড়ী যৌবন প্রথম শহরে এসে একটার পর একটা বিস্ময়ের মুখোমুখি হয়ে মুগ্ধ হয়ে রইলো। সারুয়ামারু এই শহরে অনেকবার এসেছে। এই অভিজ্ঞতার মহিমায় সেঙাইকে উদয়াস্ত তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়াতে লাগলো সে।

সন্ধ্যার একটু আগেই ঘটনাটা ঘটলো।

বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী সেঙাই আর সারুয়ামারুকে ডাকিয়ে পাঠালো।

কোহিমার আকাশে এখনও খানিকটা আবছা আলো লেগে রয়েছে। সবুজ ঘাসের জমিটায় একটা বেতের চেয়ারে জাঁকিয়ে বসেছে ম্যাকেঞ্জী। দু পাশে দুটো মণিপুরী পুলিস। হাতে খাড়া রাইফেলের বেয়নেট্ উদ্ধত হয়ে রয়েছে। বিদেশী চার্চের শান্তি এদেশী মানুষের পাহারায় নির্বিঘ্ন। বেথেলহেমের ধ্রুবতারাটি কোহিমার পাহাড়ে সুরক্ষিত রয়েছে রাইফেলের হিংস্রতায়। যেশাস। মানবপুত্রের স্বপ্ন কি চরিতার্থ হলো এই পাহাড়ী টিলার দেশে, এই বনময় শৈলশিরে? এই রাইফেলের, এই বেয়নেটের পাহারায়? কে জানে?

ইতিমধ্যে সামনে এসে দাঁড়িয়েছে সেঙাই আর সারুয়ামারু। সারাদিন কোহিমার পথে পথে ঘুরে বেড়িয়েছে দুজনে। একটু আগে সিজিটোর ঘরে ফিরে এসেছিলো।

ম্যাকেঞ্জীর মুখে সস্নেহ হাসি, "এসো, এসো। এই যে সেঙাই। এই যে সারুয়ামারু। তারপর শহর কেমন দেখলে সেঙাই?"

"ভালো, খুব ভালো।"

একটু থামলো ম্যাকেঞ্জী। এক মুহূর্ত ভাবনার অতল তলায় তলিয়ে রইল সে। তারপর বললো, "কী চাই তোমার বলো দিকি সেঙাই? ক-টা কাপড়? কত টাকা?"

আশেপাশেই কোথায় যেন ছিলো পিয়ার্সন। বাঘের মত ঝাঁপিয়ে এসে পড়লো, "হোয়াটস্ দিস ফাদার?"

"কী হলো পিয়ার্সন!" ঘাড় ঘুরিয়ে বিরক্ত চোখে তাকালো ম্যাকেঞ্জী, "এত উত্তেজিত কেন?"

"এ ভারি অন্যায়। এ রকমভাবে লোভ দেখিয়ে ক্রিশ্চিয়ানিটি স্প্রেড্ করে কী লাভ? সেণ্টদের সারমন আছে, লোভ-রিপুকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।" উত্তেজনায় থরথর করে কাঁপছে পিয়ার্সন।

প্রায় হুমকে উঠলো ম্যাকেঞ্জী, "ডোণ্ট ইণ্টারফেয়ার। কিসে লাভ হবে বা না হবে, আমি তোমাদের কাছে জানতে যাবো না। লিভ দিস্ প্লেস অ্যাট্ ওয়ান্স—আই বিড্—"

"থ্যাঙ্কস।" উদ্ধত পা ফেলে সামনের রাস্তায় গিয়ে নামলো পিয়ার্সন।

পিয়ার্সনের গমনপথের দিকে আগ্নেয় চোখে তাকিয়ে ছিলো ম্যাকেঞ্জী। যখন একটা উতরাই পথের বাঁকে পিয়ার্সনের দেহটা অদৃশ্য হয়ে গেলো, ঠিক সেই সময় দৃষ্টিটাকে সেঙাইর মুখের ওপর এনে ফেললো ম্যাকেঞ্জী। নাঃ মেজাজটাকে একেবারে বিশ্রী করে দিয়ে গেল লোকটা। একটা ডেভিল। স্কাউণ্ড্রেল।

কী এক দুর্বোধ্য ভাষায় কথা বলছিলো সাদা মানুষ দুটো। এক বিন্দুও বুঝতে পারছিলো না সেঙাই কী সারুয়ামারু। অবাক এবং ভীরু দৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিলো তারা।

ম্যাকেঞ্জী বললো, "যে কথা বলছিলাম। বুঝলে সেঙাই, যা চাইবে তাই তোমাকে দেবো। কিন্তু একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ?"

"তেমন কিছু নয়। ঐ আসাহ্যুদের (সমতলের লোক) সঙ্গে মিশবে না। ওরা লোক বড় খারাপ। এই সারুয়ামারুকে বলে দিয়েছি, তোমার বাবা সিজিটোকে বলে দিয়েছি। কী সারুয়ামারু, বলে দিই নি?"

"হু-হু"—ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগলো সারুয়ামারু, "এ কথাটা ঠিক। হুই আসাহ্যুরা (সমতলের বাসিন্দা) ভারি শয়তান। হুই যারা ধুতি পরে, তারা একেবারে শয়তানের বাচ্চা।"

"ঠিক, ঠিক। যা বলে দিয়েছি, তোমার সব মনে রয়েছে, দেখছি।" আত্মপ্রসাদের হাসি ফুটলো ম্যাকেঞ্জীর মুখে, "যাক ও কথা। গাইডিলিওর কাছে যাও নি তো?"

"না, না।"

"ভালো করেছো। ও ডাইনী। একেবারে জানে খতম করে ফেলবে।" বিস্ময়কর কৌশলে মুখেচোখে আতঙ্কের সব ক-টি রেখা ফুটিয়ে তুললো ম্যাকেঞ্জী, "খবরদার, ওর কাছাকাছি ঘেঁষবে না তোমরা।"

"ডাইনী! কে বললে ডাইনী? তুই মিথ্যে বলেছিস। হুই যে মাধোলাল বললে, ও হলো রানী। খুব ভালো। গাইডিলিও রানী, ডাইনী নয়।" এবার সরাসরি চোখে তাকালো সেঙাই, "তুই সব মিথ্যে বলিস। তুই বড় শয়তান! মাধোলাল কত কী বললে?"

"মাধোলাল!" চমকে উঠলো ম্যাকেঞ্জী। "মাধোলাল কে?"

সারুয়ামারু বললো, "হুই যে দোকান আছে ডিমাপুর যাবার পথে। সেই দোকানের মালিক মাধোলাল। কত কথা বললে মাধোলাল। ও তো আসাহ্যু (সমতলের লোক), ধুতি পরে। অথচ কত ভালো। আমার বন্ধু হুই মাধোলাল। আমার বাবা ওর দোকান থেকে নিমক নিতো। আমার ঠাকুরদা—"

মধ্যপথে সারুয়ামারুকে থামিয়ে দিলো ম্যাকেঞ্জী, "থামো থামো। আর কী বললে মাধোলাল?" উত্তেজনায় চোখের কটা মণি দুটো যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে ম্যাকেঞ্জীর।

এবার সেঙাই বললো, "হু-হু, সায়েবদের সঙ্গে কোথায় যেন আসাহ্যুদের (সমতলের বাসিন্দা) লড়াই হচ্ছে। কার যেন নাম বললো মাধোলাল। কী রে সারুয়ামারু, বল না হুই আসাহ্যুদের সর্দারটার নাম। আমার মনে পড়ছে না।"

সারুয়ামারু বললো, "আসাহ্যুদের সর্দারটার নাম গান্ধীজী। মাধোলাল বললে, ওদের মহারাজ যেমন গান্ধীজী, আমাদের তেমনি রানী গাইডিলিও।"

গান্ধীজী! কী ভয়ঙ্কর একটি শব্দ! সমতলের দেশ থেকে সব বাধা, সব ব্যবধান পেরিয়ে এই বনময় গিরিচূড়ায় এসে পৌঁছেছে। এই পাহাড়ের টিলায় টিলায়, গুহা আর কন্দরে ঐ নামটা কী এক ইন্দ্রজালে বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে। গান্ধীজী! নাম নয়, একটা ভয়াল ভোজবাজি। একটা দুর্বোধ্য ভেলকি। এ ভোজবাজির রহস্য অন্তত পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর অজানা। নাম নয়, ম্যাকেঞ্জীর মনে হলো, বিচিত্র এক বিস্ফোরণ। কলকাতা, সবরমতী, মহারাষ্ট্র—হিমালয়ের পাদপীঠ থেকে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত বিশাল ভারতবর্ষের হৃৎপিণ্ড ঐ একটি নামের মধ্যে বিদীর্ণ হয়েছে। ঐ একটি নাম

দুর্গম নদী-বন-পাহাড়-সমতল অতিক্রম করে এই বুনো মানুষগুলির অস্ফুট চেতনায় কি অক্ষয় শিলালিপির মত আঁকা হলো? যেমন করে হোক, এই পাহাড়ী পৃথিবী থেকে ঐ নামটিকে, বন্য মানুষের চেতনা থেকে ঐ শব্দটিকে চিরকালের জন্য সরিয়ে দিতে হবে। নইলে উপায় নেই, রেহাই নেই। একটা দুর্বল রন্ধ্র পেলে ঐ নামটা দু-কূল ভাসিয়ে হু-হু বন্যা নিয়ে আসবে। কোন অতল তলায় তলিয়ে যাবে এই উত্তুঙ্গ নাগাপাহাড়। অন্তত খবরের কাগজ এবং মাধোলালের মত শয়তানের মুখে মুখে সেই ভয়াবহ খবরই দেশের শিরায় শিরায় ছড়িয়ে পড়ছে। ম্যাকেঞ্জী ভাবলো, আজই একবার পুলিস সুপার মিস্টার বসওয়েলের সঙ্গে দেখা করতে হবে। অবশ্যই। সেঙাই বলতে শুরু করলো, "তোরা সায়েব। মাধোলাল বললে, তোদের সব ওদের দেশ থেকে ভাগিয়ে দেবে। আমাদের রানী গাইডিলিও নাকি তোদের সঙ্গে লড়াই করবে।"

আশঙ্কার পাত্রটা এবার গলায় গলায় ভরে উঠেছে। রানী গাইডিলিও। লড়াই। বলে কী সেঙাই!

ব্রেটনব্রুকশায়ারের সেই দুর্দান্ত আউট ল এবং আজকের পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী জীবনে যেন প্রথমে ভয় পেয়েছে। আবছা, ঝাপসা গলায় সে বললো, "সব মিথ্যে। আমাদের সঙ্গে তো লড়াই নয়। আমরা তোমাদের বন্ধু, ওরা, ওই সমতলের বাসিন্দারা বিদেশী।"

সেঙাই বললো, "মাধোলাল যে বললো, তোরা অন্য দেশ থেকে এসেছিস, তোরা বিদেশী। তোরা এখানে কী করতে এসেছিস?"

মাধোলাল! নামটাকে দাঁতের ফাঁকে ফাঁকে কড়মড় করে চিবোতে লাগলো ম্যাকেঞ্জী। আচ্ছা, ঐ হাফনেকেড গান্ধীর চেলার সঙ্গে পরে দেখা হবে। বিড়বিড় করে কথাগুলো বলে একটা অখ্রীষ্টানসুলভ গালাগালি আওড়ালো ম্যাকেঞ্জী।

সেঙাই তখনও বলছে, "কী করতে এখানে এসেছিস তোরা?"

এ জিজ্ঞাসার উত্তর জানা আছে ম্যাকেঞ্জীর। কিন্তু সে উত্তর অন্তত এদের কাছে দেওয়া চলবে না। একটি অর্ধনগ্ন পাহাড়ী মানুষের প্রশ্ন যে এত মারাত্মক, এত জটিল, তা কি আগে জানতো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী?

সহসা মধুর হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে তুললো ম্যাকেঞ্জী। বললো, "আচ্ছা সেঙাই, সালুয়ালাঙ বস্তির সঙ্গে তোমাদের খুব ঝগড়া, তাই না?"

অন্য একটি প্রসঙ্গে সরে গেলো ম্যাকেঞ্জী।

সেঙাই মাথা নাড়লো, "হু-হু, ওরা আমাদের শত্রু।"

আচমকা চিৎকার করে উঠলো সারুয়ামারু, "কী রে সেঙাই, মাধোলাল না গান্ধীজীর লড়াই আর রানী গাইডিলিওর কথা বলতে বারণ করে দিয়েছিলো ?"

"হু-হু—" প্রবলবেগে মাথা দোলাতো লাগলো সেঙাই। তারপরেই রক্তচোখে তাকালো ম্যাকেঞ্জীর দিকে, "হুই শয়তানটা সব জেনে নিলো। ওর জান একেবারে খতম করে দেবো। হুই শয়তানটা আমাদের বেইমান করলো।"

"আমরা বিশ্বাসঘাতী হলাম। বেইমানি করলাম। কী রে সেঙাই ?"

"হু-হু, আহে ভু টেলো! আমরা পাহাড়ী মানুষ ; আমাদের কেউ অন্তত বেইমান বলতে পারে না। হু-হু, আনিজার গোঁসা এসে পড়বে। সব হুই শয়তান সায়েবটার জন্যে।" পাশ থেকে বর্শাটা তুলে নিলো সেঙাই। অব্যর্থ লক্ষ্য। সাঁ করে বর্শার ফলাটা কবজিতে গেঁথে গেলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর। এক ঝলক তাজা রক্ত ফিনকি দিয়ে বেরিয়ে এলো। চার্চের চত্বরে মানব-পুত্রের পবিত্র নামের ওপর এই পাহাড়ী পৃথিবী খানিকটা রক্তের কলঙ্ক মেখে দিলো।

"মার্ডার! মার্ডার! অ্যারেস্ট! অ্যারেস্ট—সন অব বীচ—"আর্তনাদ করে উঠলো ম্যাকেঞ্জী।

নিমেষে সেঙাইর ওপর মণিপুরী পুলিস দুটো ঝাঁপিয়ে পড়লো। একজনের বেয়নেটের আধাআধি ফলা কোমরে গেঁথে গিয়েছে সেঙাইর। রাইফেলের কুঁদো দিয়ে তার মাথায় প্রচণ্ড এক আঘাত বসিয়ে দিলো অন্য জন।

"আউ-উ-উ—" চিৎকার করে সবুজ ঘাসবনে লুটিয়ে পড়লো সেঙাই।

চার্চের খান-দুই বাড়ি তফাতে আউট পোস্ট।

ম্যাকেঞ্জী মণিপুরী পুলিস দুটোর দিকে তাকালো। যন্ত্রণায় তার মুখখানা বিকৃত হয়ে গিয়েছে। "শয়তানটাকে আউট পোস্টে নিয়ে যাও। পাহাড়ী তেজ সব কমে যাবে ঠিকমত ওষুধ পড়লে।"

কবজির ক্ষতের ওপর আঙুল টিপে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যাকেঞ্জী। আর এক পাশে বোধহীন, ভাবহীন অসহায় চোখে তাকিয়ে আছে সারুয়ামারু। ঘটনার আকস্মিকতায় একেবারে বোবা হয়ে গিয়েছে সে।

আবার চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাকেঞ্জী, "নিয়ে যাও, হারি-ই-আপ—"

প্রায় অচেতন দেহ। সেঙাইর হাত ধরে ঘাসবনের ওপর দিয়ে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চললো মণিপুরী পুলিস ছুটো।

আচমকা নিষ্ক্রিয় অবস্থাটা কাটিয়ে উঠলো সারুয়ামারু। মণিপুরী পুলিস ছুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে সেঙাইকে ছিনিয়ে নিলো সে, "ইজা হুবুতা! সেঙাইকে নিয়ে যাবে! একেবারে সাবাড় করে ফেলবো!"

সেঙাইকে ঘাসবনে ফেলে রেখে ফোঁসফোঁস করে বারকয়েক নিঃশ্বাস ফেললো সারুয়ামারু।

"মার্ডার, মার্ডার! পুলিস, পুলিস!" চার্চ থেকে ম্যাকেঞ্জীর চিৎকার আউট পোস্টের দিকে ধেয়ে গেলো।

কয়েকটি মুহূর্ত। কোহিমার পথে ভারী বুটের আওয়াজ শোনা গেলো। পাহাড়ী ঝড়ের মত বাঙালী, বিহারী আর আসামী পুলিসরা চার্চের নিরাপত্তায় ছুটে এলো।

সেঙাইকে কাঁধের ওপর তুলে পালিয়ে যায় নি সারুয়ামারু। এতক্ষণ তার চোখে শুধু পিঙ্গল আগুন ধকধক জ্বলেছে। সেঙাইর পাশে দাঁড়িয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সমানে খিস্তি করে গিয়েছে সে, "আহে ভু টেলো। সব টেফঙের বাচ্চা। সেঙাইকে একবার ধরলে সাবাড় করে ফেলবো। ফাদার হয়েছে! ক্রশ আঁকবো না। চাই না কাপড়। মাধোলাল ঠিক বলেছে, তোদের মত শয়তানের সঙ্গে লড়াই করতে হবে। আমাদের পাহাড়ে এসে আবার আমাদেরই মারবে!"

পরশুদিন বিকেলে সেঙাইকে খানকয়েক রঙচঙে বাহারে কাপড় দিয়েছিলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। সিজিটোর ঘর থেকে সেগুলো নিয়ে এসে ম্যাকেঞ্জীর গায়ের ওপর ছুঁড়ে মারলো সারুয়ামারু। প্রবল ঘৃণায় মুখখানা কুঁকড়ে গিয়েছে তার। একদলা থুথু ম্যাকেঞ্জীর মুখে ছিটিয়ে দিলো, "থুঃ থুঃ, এই নে তোর কাপড়। সেঙাইকে মারবে! আমাদের বস্তিতে একবার পেলে তোকে একেবারে ছিঁড়ে ফেলবো। থুঃ থু—"

মুখের ওপর একদলা থকথকে বিজাতীয় তরল। ককিয়ে উঠলো ম্যাকেঞ্জী, "ওহ্! সন্স্ অব্ ডেভিল। ব্যাস্টার্ড। হিলি হিদেনস। প্যাগনস্! আই অ্যাম্ এ তার্তার। আই মাস্ট সী—"

এতকাল গালাগালিগুলো বিড়বিড় করে উচ্চারণ করতো ম্যাকেঞ্জী। এমনই মহিমা যে, কেউ শুনতে পেতো না। আজ প্রথম সারপ্লিসের ছদ্মবেশ

ফালা-ফালা করে ছিঁড়ে ব্রেটনব্রুকশায়ারের সেই আউট ল আত্মপ্রকাশ করলো যেন। প্রচণ্ড ঘুঁষি বাগিয়ে সারুয়ামারুর দিকে ছুটে এলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। কিন্তু যত সহজে ঘুঁষিটা হানা যাবে ভাবা গিয়েছিলো, কাজটা আদপেই তত সহজ নয়। বর্শাটা থাবার মধ্যে বাগিয়ে ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছে সারুয়ামারু। তার দুটি পিঙ্গল চোখের মণিতে এক বিচিত্র শিকার ছায়া ফেলেছে। হুন্টশিঙ পাখির পালকের মত ধবধবে এক সাহেব। চোখের মণি দুটো কটা।

থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো ম্যাকেঞ্জী। পাহাড়ী মানুষের থাবায় বর্শার ফলা বড় বন্য, বড় আদিম এবং নিষ্ঠুর। এ সত্য তার জানা।

ভয়ানক কিছু একটা ঘটে যাওয়া একেবারেই অসম্ভব ছিল না। কিন্তু তার আগেই চারদিক থেকে বিহারী, আসামী আর বাঙালী পুলিসরা ঘিরে ধরেছে সারুয়ামারুকে। ঝকঝকে বেয়নেটের ফলাগুলো বুক, পিঠ—সারাদেহের দিকে হিংস্রভাবে উদ্যত হয়ে রয়েছে। অসহায় চোখে চনমন করে তাকালো সারুয়ামারু। পায়ের কাছে সেঙাই পড়ে রয়েছে। প্রায় অচেতন। সবুজ ঘাসের জমিতে তাজা এবং ঘন পাহাড়ী রক্ত জমে রয়েছে। থোকা থোকা লাল টোঘু টুঘোটাঙ ফুলের মত।

গর্জে উঠলো ম্যাকেঞ্জী, "শয়তানটাকে নিয়ে যাও আউট পোস্টে। ঐ ডেভিলের বাচ্চাটাকেও তুলে নিয়ে যাও।" সেঙাইর দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিল ম্যাকেঞ্জী, "আমি একটু পরেই যাচ্ছি। শয়তানটাকে আচ্ছা করে দাওয়াইর ব্যবস্থা করো। পাহাড়ী তেজ আমি উপড়ে দিয়ে যাবো, তবে আমার নাম ম্যাকেঞ্জী।"

অদ্ভুত করিৎকর্মা। নিমেষের মধ্যে সেঙাই আর সারুয়ামারুর দেহ দুটো টেনে টেনে, কোহিমার রুক্ষ, উঁচুনীচু পাথুরে পথের ওপর দিয়ে হিঁচড়ে হিঁচড়ে আউট পোস্টের দিকে নিয়ে গেলো পুলিসেরা।

আটাশ

খানিকটা পরেই আউট পোস্টে এলো ম্যাকেঞ্জী। কবজির ওপর বিরাট ব্যাণ্ডেজ।

"আসুন, আসুন ফাদার—" পুলিস সুপার বসওয়েল এখনও তার কোয়ার্টারে ফিরে যায় নি। ম্যাকেঞ্জীকে দেখে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালো। বললো, "কী ব্যাপার, পুলিসরা সব রিপোর্ট দিয়েছে। ব্লাডশেড ইন চার্চ! এ তো বড় সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার! এই হিদেনগুলো সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছে।"

কবজিটা সামনে তুলে ধরলো ম্যাকেঞ্জী। বিবর্ণ মুখে হাসলো। "এই দেখুন, বর্শা দিয়ে আমাকে ফুঁড়েছে।"

"চার্চে গিয়ে মিশনারীর গায়ে হাত দেওয়া। এ আমি বরদাস্ত করবো না। দরকার হলে নাগা হিলস থেকে পাহাড়ী শয়তানদের চিহ্ন আমি মুছে দেবো। হাউ ডেঞ্জারাস!" অব্যক্ত একটা আর্তনাদ করলো বসওয়েল।

"ডেঞ্জারাস। সত্যি ডেঞ্জারাস। তবে আমি ভাবছি অন্য কথা। বাছা বাছা সব জাঁদরেল লোককে গভর্নমেণ্ট পাঠিয়েছে এই নাগা পাহাড়ে। এই দেখুন, আপনি ফার্স্ট গ্রেট ওয়ারের লোক। আমার অতীত জীবনটা নিশ্চয়ই বীডস কাউণ্ট করে কাটে নি। তবু দেখুন, এই প্যাগানগুলোকে বাগে আনতে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি।"

"ছাটস্ রাইট। কোন সন্দেহ নেই।" সরবে সমর্থন জানালো বসওয়েল।

"এই দেখুন না, প্লেনসমেনদের সঙ্গে এদের মিশতে বারণ করেছি। কত সাবধান হয়ে এদের ওয়াচ করেছি কিন্তু যা হবার তা হয়েছে।" চোখেমুখে হতাশা ফুটে বেরুলো ম্যাকেঞ্জীর।

"কী হলো? কী ব্যাপার?" চেয়ারটাকে টেনে ম্যাকেঞ্জীর কাছাকাছি অন্তরঙ্গ হয়ে বসলো বসওয়েল।

"ডিমাপুরের পথের ওপর যে বাজারটা রয়েছে, সেখানে গান্ধীর এক চেলার দোকান আছে। লোকটার নাম মাধোলাল।"

"কী সর্বনাশ! ওহ ক্রাইস্ট!" চিৎকার করে উঠলো বসওয়েল, 'তারপর?"

"হ্যাট ডেভিলস সন পাহাড়ীদের মধ্যে গান্ধীর নন্‌-কো-অপারেশনের কথা প্রচার করছে। গাইডিলিওকে রানী বলে সকলকে মন্ত্র দিচ্ছে। যে পাহাড়ী দুটোকে একটু আগে এই আউট পোস্টে নিয়ে এসেছে পুলিসরা, সেই শয়তান দুটা ঐসব শুনে এসেছিলো। এই নিয়ে কথাবার্তা হতে হতে আমাকে বর্শা ছুঁড়ে মেরেছে সেঙাইটা।"

"ইজ ইট! মাধোলাল। গান্ধী। গাইডিলিও।" নামগুলিকে কড়মড় করে চিবিয়ে ছিন্নভিন্ন করে ফেলতে লাগলো পুলিস সুপার বসওয়েল, "আচ্ছা, আমি জানি কেমন করে গান্ধী আর গাইডিলিওকে পাহাড়ীদের মন থেকে মুছে দিতে হয়।" তারপরেই চড়া কর্কশ গলার স্বরটা চূড়ায় উঠলো বসওয়েলের, "চ্যাটার্জি, চ্যাটার্জি—"

ছোট দারোগা বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি জ্যা-মুক্ত তীরের মত ঘরের মধ্যে ছুটে এলো। বুটে বুটে খটাখট শব্দ করে একটা সন্ত্রস্ত সেলাম ঠুকলো, "ইয়েস স্যর—"

ছোট দারোগা বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি। নাকের নীচে একজোড়া কাঁচাপাকা ঘন গোঁফ সগৌরবে বিরাজ করছে। প্রান্ত দুটি সূক্ষ্ম এবং সূচীতীক্ষ্ণ। মোটা বদখত নাকটা সামনের দিকে ঝুলে রয়েছে। বুকের আর পেটের মাঝখানে চামড়ার চওড়া বেল্ট। পিতলের প্লেটটা ঝকমক করছে। তার ওপর কোহিমা পুলিসের নাম খোদিত রয়েছে। বেথাপ্পা চেহারা। বেঢপ আকৃতি। সমস্ত শরীরে রাশি রাশি কালো রোমশ মাংস। মাংসপিণ্ডগুলির এবং সুসংবদ্ধ ব্যবহার হয় নি। খুশিমত হাতে-পায়ে, বুকে-মুখে যেখানে ইচ্ছা লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে।

পুলিস সুপার বসওয়েল বললো, "চার্চ থেকে যে পাহাড়ী দুটোকে ধরে এনেছে পুলিসরা, তাদের একটু দলাই-মলাইর ব্যবস্থা করতে হবে।"

"দলাই-মলাই!"

"ইয়াস্‌। ওদের সারা গায়ে বড় ব্যথা। আই মীন্‌, সেই বেদনার জন্যে একটু ম্যাসেজ। বুঝলে তো!" অর্থপূর্ণ একটা ভ্রূকুটি হানলো বসওয়েল।

একটু ইতস্তত করলো বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি। আমতা-আমতার বেড়া ডিঙিয়ে সে বললো, "কিন্তু স্যর, এই পাহাড়ীরা তো বোঝে না, আপনাদের হুকুম

আমরা তামিল করি। ওরা মনে মরে, আমরা মারি, আমরাই দোষী। ওরা স্যর আমাদের দু চক্ষে দেখতে পারে না। আমরা এই ইণ্ডিয়ার প্লেন্‌স্‌ম্যানরা ওদের দু চোখের বিষ।"

ধক্‌ করে বসওয়েলের কপিশ চোখদুটো জ্বলে উঠলো। মাত্র একটি মুহূর্ত। তারপরেই বাৎসল্যের হাসি ছড়িয়ে পড়লো তার বিশাল এবং ভয়ানক মুখখানায়, "আইসোর! পাহাড়ীরা তোমাদের প্লেন্‌স্‌ম্যানদের দেখতে পারে না। বোঝোই তো, এরা হলো ওয়াইল্ড বীস্টস। যাক, সেদিন তুমি পাণ্ডুতে ট্রান্সফার হবার দরখাস্ত দিয়েছিলে না?"

"ইয়াস স্যর, তবে বড় ভালো হয়। বড় ভালো হয়।" একেবারে বিগলিত হয়ে গেলো বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি। সঙ্গে সঙ্গে হাত কচলাতে শুরু করলো।

"তোমাকে মাস কয়েক পরে ট্রান্সফার করবো। আর ছোট দারোগা নয়, এবারে ও. সি. হয়ে যাবে তুমি।" তির্যক দৃষ্টিতে বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জির খুশিটা জরিপ করতে লাগলো পুলিস সুপার বসওয়েল। দেখতে লাগলো কেমন করে তার কথাগুলো ঐ নিগার্ডটার সগুম্ফ মুখখানায় একটি লোলুপ প্রতিক্রিয়া আঁকছে।

ও. সি.! উল্লাসে প্রায় অব্যক্ত একটা শব্দ করে উঠলো বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি, "প্রমোশন স্যর!"

"ইয়াস, প্রমোশন। তার আগে ঐ পাহাড়ীগুলোকে একটু শায়েস্তা করতে হবে। বেশ ভালো করে। বোঝোই তো! দলাই-মলাইর ব্যাপারে তুমি তো পাকা আর্টিস্ট। যাও, যাও—" প্রেরণা দিতে লাগলো পুলিস সুপার বসওয়েল, "তোমার স্কিল দেখতে চাই।"

রীতিমত প্রেরণা পেয়েছে বৈকুণ্ঠ। প্রচণ্ড উৎসাহে ভারী বুটে খটখট আওয়াজ তুলে পাশের ঘরে চলে গেলো। পাকা আর্টিস্ট! নাঃ, অনেকদিন পর, অনেক অনেক বছরের শীত-বসন্ত পেরিয়ে, সজারুর কাঁটার মত কালো কালো গোঁফের প্রায় অর্ধেক পাকিয়ে ফেলেছে বৈকুণ্ঠ। কিন্তু বরাতটা এমনই বিশ্বাসঘাতক, ছোট দারোগা হয়েই বিশ বছর কাটিয়ে ফেললো সে। অথচ প্রমোশনটা আকাশের তারার মত নাগালের বাইরেই রয়ে গেছে। পাণ্ডু থানার ও. সি.! ধমনীতে ধমনীতে রক্তের কণিকাগুলি উত্তাল হয়ে ভেঙে পড়তে লাগলো। কোহিমা পাহাড়ের নিঃসঙ্গ বিছানায় দিনের পর দিন কাটিয়ে জীবনটা একেবারে বিস্বাদ হয়ে গিয়েছে বৈকুণ্ঠের। বউ রয়েছে গৌহাটী।

বছরে একবার তার সোহাগ, তার সেবা আদর এবং সোহাগ পায় কি না পায়; ছুটিই মেলে না। পাঁজরের হাড়ে হাড়ে যক্ষ বিরহীর প্রাণকে বন্দী করে এক জ্বালা ছুটির তৃষ্ণায় দিনের পর দিন গুণে যায় বৈকুণ্ঠ। ছটফট করে। তীক্ষ্ণ তীব্র যন্ত্রণায় মনটা ফালা-ফালা হয়ে যায় যেন। এই কোহিমা শহর। সমতল থেকে অনেক অনেক উঁচুতে এই পাহাড়চূড়া। চারপাশে চড়াই-উতরাই, টিলা-গুহা, কন্দর আর নিবিড় অরণ্য। উপত্যকা আর জলভূমি। ঋতুতে ঋতুতে এর রঙ বদলের পালা, এর বেশ বদল। ফুলে ফুলে লতায় পাতায় এর মনোরম সাজসজ্জা। বৈকুণ্ঠের মনে হয়, জন্মাবধি সে এই পাহাড়চূড়ায় নির্বাসিত হয়ে রয়েছে। এক এক সময় সন্দেহ জাগে বৈকুণ্ঠের, আর রক্তমাংসের শরীরী মানুষ নয়। একটা দেহী প্রেতের মত ঘুরে বেড়াচ্ছে কোহিমার পাহাড়ে পাহাড়ে।

শুধু নাগা আর নাগা। একটি মানুষ নেই কথা বলবার, একটি মানুষ নেই কথা শুনবার। মানুষ নয় সব যেন পাহাড়ী, বুনো জানোয়ার। তিন বছর এখানে এসেছে, তাদের ভাষা এখনও পুরোপুরি রপ্ত করে উঠতে পারে নি বৈকুণ্ঠ। এরা ছাড়া আর আছে সমতলের বেনিয়ারা। তাদের সঙ্গে আড্ডা জমানো বাদ দিয়ে আলাপ পরিচয় রাখতে ছোট দারোগার সূক্ষ্ম মর্যাদায় কোথায় যেন আঘাত লাগে। এক এক সময় এই কোহিমা পাহাড় থেকে পালিয়ে যেতে ইচ্ছা করে বৈকুণ্ঠের।

আপাতত খুশিতে ফুসফুসটা বেলুনের মত ফুলে ফুলে উঠছে। পাণ্ডু থানার ও. সি! এতদিনের লালিত স্বপ্নটা তবে হাতের মুঠোয় একটা পাহাড়ী আপেলের মত নেমে এসেছে। তার আগে একটা কর্তব্য বাকী রয়েছে বৈকুণ্ঠের। অদ্ভুত নৈপুণ্যে অভিভূত করে ফেলতে হবে পুলিস সুপারকে। সন্ধ্যার একটু আগে যে পাহাড়ী দুটোকে চার্চ থেকে টেনে টেনে নিয়ে এসেছে পুলিসরা তাদের সমস্ত দেহে চাবুক এবং হাণ্টারের আঘাতে তার নৈপুণ্যকে এঁকে রাখবে। অন্তর্নিহিত বীররসের প্রেরণায় ভারী বুটজোড়া পাথুরে মেঝের ওপর ঠুকতে লাগলো বৈকুণ্ঠ। শব্দ হতে লাগলো, খট খট।

উনত্রিশ

ঘরের মধ্যে একটা মণিপুরী পুলিস গ্যাসের আলো জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়েছে গ্যাসজলা তীব্র দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়েছে।

বসওয়েল তাকালো ম্যাকেঞ্জীর দিকে। বললো, "কী মনে হয় ফাদার?'

"কিসের কী?" দুচোখে কৌতূহল নিয়ে ম্যাকেঞ্জী তাকালো।

"এই যে ব্যাপারটা। দেখলেন তো, প্লেনস্‌ম্যানদের পাহাড়ীরা দেখতে পারে না। ঐ যে চ্যাটার্জি বলে গেলো।" একটু থামলো বসওয়েল। তারপর বিরাট মুখখানাকে ম্যাকেঞ্জীর কানের কাছে নিয়ে এলো, "খবরদার, ভুল করেও পাহাড়ীদের গায়ে আমাদের ব্রিটিশারদের হাত তোলা চলবে না। যদি ঠেঙাতে হয়, তবে প্লেনস্‌ম্যানদের দিয়েই এই অপ্রিয় কাজটি করতে হবে।"

অবাক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো ম্যাকেঞ্জী। কিছুই বুঝতে পারছে না সে

বসওয়েল বললো, "বুঝতে পারলেন না তো ফাদার, এটা ডিপ্লোম্যাটি পোলিটিকস্! প্লেনস্‌ম্যানদের সঙ্গে ঐ হিলি হিদেনগুলোর য়ুনিয়ন হলেই মুশকিল। রাজ্যপাট মাথায় উঠে যাবে। সব সময় প্লেনস্ আর হিলসের মধ্যে একটা ফিউড বাধিয়ে রাখতে হবে।"

"ব্রিলিয়্যান্ট! সত্যি, এটা আমার মনে স্ট্রাইক করে নি তো!" ম্যাকেঞ্জী গলা বিস্ময়ে অস্বাভাবিক শোনালো।

আইভরি পাইপের মধ্যে সুরভিত তামাক পুরতে লাগলো বসওয়েল অখণ্ড মনোযোগে। নির্বিকার গাম্ভীর্যে ম্যাকেঞ্জীর বিস্ময়টা উপভোগ করলো শুধু একটি আত্মপ্রসাদের হাসি তার সারা মুখে অদ্ভুতভাবে ফুটে রইলো।

সহসা ম্যাকেঞ্জী বললো, "বড় মুশকিল হয়েছে পিয়ার্সনকে নিয়ে। তলে ও এই পাহাড়ীদের সিম্প্যাথাইজ করে। প্রীচিঙের বিরুদ্ধে কথা বলে বুঝলেন মিস্টার বসওয়েল।"

"তাই নাকি? আচ্ছা, সব দেখা যাবে।" আত্মপ্রসাদের যে হাসিট এতক্ষণ ফুটে ছিলো বসওয়েলের মুখে, সেটা শ্লেটের লেখার মত মুছে গেলো গম্ভীর থমথমে গলায় বললো, "একটু ওয়াচ—"

আরো কিছু বলতো বসওয়েল, তার আগেই জন তিনেক নাগা সর্দার ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো। হাতের থাবায় বর্শা, মাথায় মোষের শিঙের মুকুট, সারা গায়ে দড়ির লেপ জড়ানো, গলায় সাপের হাড়ের মালা।

বসওয়েল গদগদ গলায় অভ্যর্থনা জানালো, "এসো সর্দারেরা। তারপর খবর কী ?"

তিনজনেই একসঙ্গে চিৎকার করে উঠলো, "না না, আমরা পারবো না। এই ত্যাখ, গাইডিলিওকে ডাইনী বলতে গিয়েছিলাম সিকুয়ামাক বস্তিতে। আমাদের বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে দিয়েছে।"

একজন পিঠ দেখালো। একজন হাত। আর একজন কণ্ঠার কাছের নরম জায়গা। বর্শার ফলায় তিনজন ক্ষতবিক্ষত হয়ে এসেছে। টোঘুটুঘোটাঙ ফুলের মত থোকা থোকা রক্ত জমে রয়েছে।

"এই নে তোর টাকা। গাইডিলিওকে ডাইনী বলতে গিয়ে শেষে জান দেবো নাকি ? বস্তির লোকেরা সব ক্ষেপে রয়েছে।" তিনজনেই কোমরের তলার গোপন থলে থেকে একরাশ রুপালী টাকা ঝনঝন করে ওক কাঠের পাটাতনে ছুঁড়ে দিলো।

নীচের কদাকার দাঁতের পাটিটার ওপর ওপরের পাটিটা নেমে এলো বসওয়েলের। চোয়াল কঠিন হলো। তামাটে ভুরু দুটো বেঁকে গেলো। চোখ দুটো দাবাগ্নির মতো ধকধক করে জ্বলছে।

আচমকা পাশের ঘরে পাহাড়-ফাটানো আর্তনাদ উঠলো, "আউ—উ—উ—।"

ছোট দারোগা বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জির দলন-মলন শুরু হয়েছে। এই হলো আদিপর্ব। চমকে উঠলো তিনজন পাহাড়ী সর্দার, "কী হলো রে সাহেব ? কাকে মারছে ?"

বসওয়েলের দুচোখে একটা কুটিল ছায়া খেলে গেলো। কপালের ওপর কয়েকটা জটিল রেখার হাবিজাবি ফুটে উঠলো। বিশাল এবং ভয়ানক মুখখানা তিনটি সর্দারের মধ্যে নামিয়ে আনলো। ফিসফিস গলায় বললো, "আসান্যুরা (সমতলের লোক) পাহাড়ীদের মারছে।"

"কেন ?" গর্জে উঠলো পাহাড়ী সর্দারেরা, "একেবারে সাবাড় করে ফেলবো শয়তানদের।"

"আরে চুপ চুপ। বেশী চেঁচামেচি কোরো না। আসান্যুরা (সমতলের

লোক) ভারি শয়তান। বন্দুক আছে ওদের। এক গুলিতে খতম করে ফেলবে।" অপরিসীম ভয়ের ভঙ্গি করে বসওয়েল বললো।

বন্দুকের মহিমা সম্বন্ধে অতিমাত্রায় সচেতন এই পাহাড়ী সর্দারেরা। কয়েকদিন আগেই তারা দেখেছে, কেমন করে একটা মণিপুরী পুলিস বড় বড় দুটো ময়াল সাপকে গুলি মেরে খতম করেছে। অতএব, অতএব একেবারেই নিবে গেলো তিনজন বন্য পাহাড়ী মানুষ। রুদ্ধ গলায় তারা বললো "তুই হুই আসাম্ন্যদের (সমতলের লোক) ভাগিয়ে দে। ওরা ভারি শয়তান। ওরা বন্দুক দিয়ে আমাদের মারবে।"

"হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভাগিয়ে দেবো। তা হলে একটা কাজ করতে হবে।"

"কী কাজ ?"

"যা বলেছি। ঐ গাইডিলিওর নামে বস্তিতে বস্তিতে ডাইনী বলে আসবে।" বসওয়েলের কথা শেষ হবার আগেই পাশের ঘরের আর্তনাদটা তুমুল হয়ে উঠলো। কিল, চড় আর ঘুঁষির সঙ্গে তাল মিলিয়ে মিলিয়ে ব্যাটনের ঘা পড়েছে। মাঝখানে প্ল্যাস্টারের দেওয়াল। সেটা যেন আঘাতের আওয়াজে আর আর্তনাদে এক নিমেষে টুকরো টুকরো হয়ে ভেঙে পড়বে।

এ ঘরে সন্ত্রস্ত হয়ে উঠেছে তিনটি পাহাড়ী সর্দার, "আসাম্ন্যরা (সমতলের লোক) মারছে কেন ?"

"গাইডিলিওকে ওই পাহাড়ীরা ডাইনী বলে নি, তাই মারছে। শিগগির টাকা নিয়ে বস্তিতে বস্তিতে গাইডিলিওর নামে ডাইনী বলে এসো। নইলে আসাম্ন্যরা রেহাই রাখবে না। ওরা কিন্তু আনিজার মত শয়তান।" এবার বেতের কেদারা থেকে পাহাড়ী সর্দারদের মধ্যে উঠে এলো বসওয়েল। অন্তরঙ্গ গলায় বললো, "আরো টাকা দেবো।"

ক্রিয়া হলো। কাঠের পাটাতন থেকে টাকাগুলো তুলে আবার কোমরের গোপন থলিতে চালান করে দিলো সর্দারেরা। তারপর উঠতে উঠতে বললো, "আমরা এবার যাই। তুই কিন্তু হুই বন্দুকওলা আসাম্ন্যদের (সমতলের বাসিন্দা) আমাদের পাহাড় থেকে ভাগিয়ে দিবি। নইলে আমাদের মেরে ফেলবে।"

নিজের কৃতিত্বে এবার লাফিয়ে উঠলো বসওয়েল, "নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই। ব্রাদার-ইন-ল'দের সব ভাগিয়ে দেবো পাহাড় থেকে। তোমাদের কিছু ভাবতে হবে না।"

বাইরে অজগরের দেহের মত কোহিমার আঁকাবাঁকা পথ। সেই পথে রাত্রির ঘন অন্ধকারে মিলিয়ে গেলো তিনটি পাহাড়ী সর্দার। শয়তানের তিনটি শিকার।

তারপর অনেকটা সময় পার হয়ে গিয়েছে। কোহিমার পাহাড়ে রাত্রি এখন গভীর হয়েছে, নিবিড় হয়ে নামছে অন্ধকার।

গ্যাসের আলোটা জ্বলছে। থেকে থেকে দমকা বাতাসে কাঁপছে। কটুঘ্রাণ দুর্গন্ধটা উগ্র হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে।

তিনটি পাহাড়ী সর্দার অনেকক্ষণ আগে মিলিয়ে গিয়েছ কোহিমার পথে। পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীও বিদায় জানিয়ে চার্চে চলে গিয়েছে। ঘরের মধ্যে একটি মানুষও আর নেই। সামনের টেবিলটার ওপর মাথা রেখে বসে রয়েছে বসওয়েল। একেবারেই নিশ্চল, একেবারেই নিথর। সমাধিস্থ। এতক্ষণ পাশের ঘরে পাহাড়ী দুটোর অবিরাম চিৎকার আর আঘাতের শব্দ সুন্দর সিমফোনির মত মনে হচ্ছিলো বসওয়েলের। নেশার মত মনোরম এক আনন্দে সেই সিমফোনি তার সারাটা চেতনাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিলো।

এখন আর পাশের ঘর থেকে প্ল্যাস্টারের দেওয়াল ভেদ করে একটু শব্দও আসছে না এদিকে। শুধু গ্যাসের আলোর চারপাশে একটা খারিমা পতঙ্গ চক্রাকারে ঘুরপাক খেয়ে চলেছে।

"স্যর—"

খাটসঙ কাঠের টেবিল থেকে মাথা তুললো বসওয়েল। সামনেই ছোট দারোগা বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি।

"কী ব্যাপার?"

"স্যর, যা বলেছিলেন, ঠিক ঠিক করেছি। একটুও এদিক-ওদিক হয় নি।" নিজের কৃতিত্বে অদ্ভুত এক ধরনের হিংস্র আনন্দে আত্মহারা হয়ে গেলো যেন বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি, "স্যর, পাহাড়ী দুটোকে টাটকা দাওয়াই দিয়েছি। একটা তো আধমরাই ছিলো, আর একটাকে আমাদের ব্রিজলাল, মাধু তেওয়ারী বেশ বানিয়েছে।"

"ভেরী গুড।"

"স্যর আমার প্রমোশন—" চ্যাটার্জির সগুম্ফ মুণ্ডটা বিগলিত হয়ে ঝুলে পড়লো নীচের দিকে। সমানে হাত কচলাতে লাগলো সে।

"ঠিক সময়েই হবে। ভাববার কিছু নেই। এখন তুমি যাও—"

দরজার দিকে একটা পা বাড়িয়ে এবাউট টার্নের ভঙ্গিতে সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো বৈকুণ্ঠ, "স্যর, একটা কথা—"

বিরক্ত একটা ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো বসওয়েলের মুখে, "কী হলো আবার ?"

একবার চোখ তুলেই সঙ্গে সঙ্গে নামিয়ে নিলো বৈকুণ্ঠ। হৃৎপিণ্ডটা যেন লাফিয়ে ঠোঁটের কাছে উঠে এলো তার। কণ্ঠনালীটা কেউ যেন কঠিন থাবায় চেপে ধরেছে, "স্যর, পাহাড়ী দুটো এতক্ষণ গোঙাচ্ছিলো, এখন আর শব্দ করছে না। ব্রিজলালটা বড় গোঁয়ার, ব্যাটন দিয়ে একটু বেশীই মার দিয়ে ফেলেছে স্যর।"

"ইজ ইট!" ভ্রূকুটিটা এবার তীক্ষ্ণ হয়েছে বসওয়েলের। এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলো সে, তারপর বললো, "ডোণ্ট ওরি। যাও, পাহাড়ী দুটোকে পথে ফেলে দিয়ে এসো। শিক্ষাটা ভালো করেই হোক।"

পাশের ঘরে চলে গেলো বৈকুণ্ঠ।

আর কোমরের পেছনে আঙুলে আঙুলে ফাঁস পরিয়ে মটকাতে মটকাতে বসওয়েল বিড়বিড় করে বললো, "আচ্ছা, সব দেখা যাবে। গাইডিলিও, গান্ধী—টরচারের গুঁতোয় পাহাড়ীদের মন থেকে ঐ নাম দুটো আমি উপড়ে ফেলে দেবো। তবে আমার খাঁটি ব্রিটিশ বার্থ।" একটা অশ্রাব্য এবং কুৎসিত শপথ আবৃত্তি করলো পুলিস সুপার বসওয়েল। কদর্য শপথ। অখ্রীষ্টানসুলভ প্রতিজ্ঞা।

ত্রিশ

দক্ষিণ দিকের পথটা পাকে পাকে পাহাড়ী শিলা বেয়ে মাওএর দিকে চলে গিয়েছে। মাও ডিঙিয়ে, অনেক পাহাড়চূড়া পেরিয়ে, অনেক ঘন বন চক্র দিয়ে পাওয়া যাবে মণিপুর, ইম্ফল। আর বাঁ দিকে সেই পথই দোল খেয়ে উঠে গিয়েছে কোহিমায়। কোহিমার পাহাড় ছুঁয়ে ডিমাপুরের দিকে। তারপর মণিপুর রোড স্টেশনে এসে ফুরিয়ে গিয়েছে।

পথের পাশে নিবিড়-বন টিলার চূড়ায় একটি ছোট্ট ঘর। বাঁশের দেওয়াল, ওপরে টোঘটুঘোটাঙ পাতার চাল। ওক কাঠের পাটাতন।

পাটাতনের ফাঁকে ফাঁকে গোটাতিনেক পেন্যু কাঠের মশাল জ্বলছে। স্নিগ্ধ আলো। সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছে একটি নারীমূর্তির ওপর। সামনের বাঁশের মাচানে স্থির হয়ে বসে রয়েছে সেই নারীমূর্তি। বিশাল কপাল; টানা টানা লম্বাটে চোখে দুগণ্ড নীলা যেন জ্বলছে। গলার চারপাশে এক পাঁজ মোটা কার্পাস তুলো জড়ানো রয়েছে। সারা দেহে মণিপুরী মেয়েদের মত ঢোলা পোশাক। আশ্চর্য উজ্জ্বল মুখখানা থেকে আলো ঠিকরে পড়ছে যেন। মনে হয়, এই মুখ থেকে কণা কণা আগুন সংগ্রহ করে ঐ পেন্যু কাঠের মশাল তিনটে জ্বলছে। বিচিত্র এই নারীমূর্তি। এ মুখের সঙ্গে কোহিমার আকাশে সন্ধ্যাতারাটির কোন মিল নাই। এ মুখের সঙ্গে পাহাড়ী ভূমিকম্পের যেন আশ্চর্য সঙ্গতি রয়েছে, মিল আছে আকাশ থেকে হঠাৎ-খসে-যাওয়া একটা উল্কার সঙ্গে। রানী গাইডিলিও।

পাশাপাশি বাঁশের আরো কয়েকটি মাচান। নারীমূর্তির চারপাশে সেই মাচানগুলো সাজানো। সেগুলোর ওপর বসে রয়েছে কয়েকটি তরুণ পাহাড়ী ছেলে। সমস্ত দেহে কেতাদুরস্ত সাহেবী পোশাক ঝলমল করছে।

গাইডিলিও বললেন, "আপনি তো কলকাতা থেকে এলেন, সেখানকার অবস্থা কেমন ?

একেবারে সামনের মাচানে বসে রয়েছে যে যুবকটি, তার নাম লিকোক্যুঙবা। সে বললো, "অবস্থা সাঙ্ঘাতিক। গান্ধীজীর নামে সারা দেশটা একেবারে

মেতে উঠেছে। আমাদের মেডিক্যাল কলেজের ছেলেরা, অন্য কলেজের ছেলেরা, স্কুল আর য়ুনিভার্সিটির ছাত্ররা কেউ বাদ যায় নি। স্ট্রাইক হচ্ছে, নন-কো-অপারেশনের ডাকে সবাই সাড়া দিয়েছে। আজব শহর কলকাতা; আন্দোলনের নামে একেবারে ক্ষেপে উঠেছে।"

"তারপর?"

"আমি নিজে গান্ধীজীর বক্তৃতা শুনেছি। ব্রিটিশরা ভারত না ছেড়ে যাওয়া পর্যন্ত আন্দোলন থামবে না। শুধু কলকাতায় নয়; বোম্বাই, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র—সমস্ত ভারতবর্ষ একেবারে পাগল হয়ে উঠেছে।"

"ঠিক।" রানী গাইডিলিওর দুচোখে দুখণ্ড নীলা জ্বলছে। কিন্তু কণ্ঠ কী শান্ত, কী গম্ভীর, "আমি অনেক ভেবে দেখেছি, আমাদের এই পাহাড় থেকে সাহেবদের হটিয়ে দিতে হবে। ওরা এসে জোর করে খ্রীষ্টান করছে, আমাদের ধর্ম নষ্ট করছে। সমতলের বাসিন্দাদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া বাধিয়ে দিচ্ছে। পাহাড়ে এসব চলবে না।"

"ঠিক, ঠিক কথা।" অনেকগুলো কণ্ঠ এক সঙ্গে সায় দিলো, "আমাদের নাগা পাহাড়ে একটা সাহেবকেও থাকতে দেবো না।"

গাইডিলিও বললেন, "একা একা দু-চারজনে এ কাজ করা সম্ভব নয়। তাছাড়া খুনখারাপি করে ওদের আমরা তাড়াবো না। আমাদের পথ হবে গান্ধীজীর মত অহিংস। এর জন্য পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে সব মানুষকে বোঝাতে হবে। সকলকে এক করতে হবে।"

"ঠিক ঠিক।"

"আপনারাও তো শিলং-গৌহাটির ছাত্র। সেখানকার খবর কী?" বাঁ পাশের যুবকদের দিকে তাকালেন গাইডিলিও।

"গোপীনাথ বড়দলৈ, রোহিনী চৌধুরীর লিডারশিপে নন-কো-অপারেশন শুরু হয়েছে।" একটি যুবক বললো।

"দেখুন, আমাদেরও পাহাড়ী মানুষদের সংগঠন করতে হবে। সাহেবরা পাদ্রীরা অনেককে টাকাপয়সা দিয়ে বশ করে ফেলেছে। সে যা হোক, আমাদের অনেক অসুবিধা। গ্রামের পাহাড়ীরা, যারা কোনদিন শহর দেখে নি, যেখানে এখনও মাথাকাটার দল রয়েছে, তাদেরও বোঝাতে হবে। তার জন্যে আপনাদেরই সব ভার নিতে হবে।"

"নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই।"

লিকোক্যুঙবা বললো, "আমি লোহটা নাগা। আমাদের গ্রামে ফিরে গিয়ে সাহেবদের মতলবের কথা বলবো। গান্ধীজীর কথা বলবো। গ্রামের লোকেরা বড় সরল, ওদের বুঝিয়ে দিলে ঠিকই বুঝবে।"

আর একজন বললো, "আমি অঙ্গামী নাগা, আমাদের গ্রামেও একথা বলবো।"

ডান দিক থেকে আর একটি কণ্ঠ ফুটে বেরুলো, "আমি সাঙটাম, আমাদের পাহাড়ও এ ব্যাপারে পিছিয়ে থাকবে না। কালই আমি রওনা হবো।"

"আমরাও, আমরাও—" অনেকগুলো গলার স্বর বেজে উঠলো।

আও, সাঙটাম, কোনিয়াক, অঙ্গামী, রেঙমা, লোহটা, সেমা। নাগা পাহাড়ের দিগ্‌দিগন্ত থেকে উদ্দীপ্ত তারুণ্য এই টৌঘটুঘোটাঙ পাতার ঘরে এসে সমবেত হয়েছে। কেউ কলকাতা থেকে, কেউ শিলং-গৌহাটি থেকে এক অপূর্ব প্রতিজ্ঞার অগ্নিকণা বুকে বুকে ধরে নিয়ে এসেছে, ধরে এনেছে এক বীর্যবান শপথ। সেই শপথের নাম গান্ধীজী। সেই প্রতিজ্ঞার নাম অসহযোগ। সেই শপথকে নাগা পাহাড়ের গুহায়-কন্দরে, মালভূমি আর উপত্যকায় বনাগ্নির মত ছড়িয়ে দেবে তারা।

আচমকা টৌঘুটুঘোটাঙ পাতার ঘরখানায় এসে ঢুকলো জনকয়েক কিম্ভুত মূর্তি। কার্পাস দড়ির লেপ দিয়ে সমস্ত দেহ জড়ানো। মাথার সামনে ঘোমটার মত ঢাকনা। তারা পাহাড়ী গ্রামের সর্দার। হাতের লম্বা লম্বা বর্শার ফলায় মশালের আলো ঝকমক করে উঠলো।

পাহাড়ী সর্দারেরা চেঁচামেচি করে উঠলো, "বুঝলি রানী, হুই শয়তান ফাদারেরা আর পুলিসেরা আমাদের টাকা দিতে চায়। বস্তিতে বস্তিতে তোর নামে ডাইনী বলতে বলে। তা আমরা কেন বেইমানি করবো! আমার ছেলে তোর ছোঁয়ায় ভালো হলো। কী ব্যারাম যে হয়েছিলো! তামুন্যু (চিকিৎসক) বলেছিলো, আনিজাতে পেয়েছে। খাদেই ফেলে দিতুম, তুই বাঁচিয়ে দিয়েছিস।"

আর-একটি গলা ফুটলো, "তোকে ডাইনী বলতে বলে। মনে হলো, বর্শা দিয়ে একেবারে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলি।"

"না, না।" প্রায় আর্তনাদ করে উঠলেন গাইডিলিও, "কক্ষনো মারামারি করবে না। ওরা মারলেও মারবে না।"

"কী বলছিস তুই? মারলে তার শোধ নেবো না! এ কেমন তাজ্জবের কথা।" অসহায় গলায় একটি সর্দার বললো।

"না।" সুকুমার একটি মুখ। সেই মুখের চারপাশে অপরূপ এক জ্যোতির্লেখা। সুঠাম মুখখানার আড়ালে কোথায় যেন একটা বজ্র লুকিয়ে রয়েছে। মণিপুরী পোশাকের আড়ালে ছোট্ট একটি প্রাণকণা টগবগ করে ফুটছে যেন গাইডিলিওর, "আমি সব বুঝি, সব জানি। তবুও ওদের গায়ে আমরা হাত তুলবো না। খুনোখুনি আমাদের পথ নয়। আর শোনো, বস্তির লোকদের বলে দেবে, ফাদারেরা ক্রুশ আঁকতে বললে যেন না আঁকে। তাহলে আমাদের আনিজা গোঁসা হবে। আর ঐ সাহেবদের কাছ থেকে কোন কিছু যেন মাগনা না নেয়।"

"কেন?"

"ওরা ভিক্ষে দেয়। তারপর আমাদের মনটাকে কিনে ফেলে। আমাদের ভিখিরী বানায়। একটু একটু করে খ্রীষ্টান করে ওদের রাজ্য বড় করে।" শাণিত বল্লমের মত গলাটা ঝকমক করে উঠলো গাইডিলিওর, "খাসিয়াদের করেছে, মিকিরদের করেছে, গারোদের করেছে, এখন এসেছে আমাদের এই নাগা পাহাড়ে।"

পেন্যু কাঠের মশাল থেকে স্নিগ্ধ আলো ছড়িয়ে পড়েছে ঘনপক্ষ্ম চোখে। পার্বতী কুমারী। বছর ষোলো বয়স; এখনও গাইডিলিওর দেহ থেকে কৈশোর একেবারেই মুছে যায় নি। উদ্ভিন্ন যৌবন। তবু তাঁর মুখের দিকে তাকানো যায় না। চোখের মণিতে দুটি জ্বলন্ত পরকলায় দৃষ্টি যেন ধাঁধিয়ে যায়। বার বার তাঁর দিকে তাকিয়ে তরুণ ছেলেরা দৃষ্টি অন্যদিকে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে।

অবাক চোখে পাহাড়ী সর্দারেরা তাকিয়ে রয়েছে রানী গাইডিলিওর দিকে। তাঁর একটু আগের কথাগুলো তারা ঠিকমত বুঝতে পারছে না। অত্যন্ত দুর্বোধ্য এবং রহস্যময় মনে হচ্ছে। তারা বললো, "তুই কি যে বলছিস, রানী, কিছুই বুঝতে পারছি না।"

গাইডিলিও বললেন, "বুঝতে পারছো না। আচ্ছা বুঝিয়ে দিচ্ছি, তোমরা ফাদারদের কাছ থেকে নিমক নাও। তার বদলে হরিণের ছাল, বাঘের দাঁত, বুনো মোষের শিঙ দাও?"

"না না। তার বদলে কিছু নেয় না ফাদারেরা।"

"মাগনা নাও কেন নিমক?"

"মাগনা কোথায়? ওরা যা বলে তাই করি। ক্রুশ আঁকি, যীশু-মেরীর নাম করি।"

"ওসব করবে না। ওসব ওদের ধর্ম, ওদের গেন্না। তাতে আমাদের আনিজারা রাগ করবে। বুঝলে?"

"ওদের গেন্না আমাদের দিয়ে করাচ্ছে? একেবারে ফুঁড়ে ফেলবো না! এবার আমাদের বস্তিতে ঢুকলে সাবাড় করে ফেলবো।" উত্তেজনায় চোখের মণি যেন ছিটকে বেরিয়ে আসবে পাহাড়ী সর্দারদের। এমন মনে হয়।

"না, খবরদার মারবে না। বস্তিতে গিয়ে বলবে, কেউ যেন ঐ ক্রশ আঁকা আর যীশু-মেরীর নামের বদলে নিমক কাপড় টাকা না নেয়। ওরা অনেক, অনেক দূর থেকে আমাদের দেশে এসেছে। এসেই একেবারে সর্দার হয়ে বসেছে।"

"না না। হুই সব হবে না।"

"ঠিক বলেছো। এমনি থাকতে চাও, থাকো। নইলে সর্দারি করতে গেলে ভাগতে হবে। এখন যেমন বাড়াবাড়ি শুরু করেছে, তাতে ভাগতেই হবে।" এক মুহূর্ত কী যেন ভাবলেন গাইডিলিও। তারপর বললেন, "শোনো সর্দারেরা, দরকার হলে তোমাদের বস্তিতে যাবো। থাকবার বন্দোবস্ত করবে তো?"

"তুই যাবি! তুই গেলে নতুন ঘর করে দেবো। নাচ দেখাবো, গান শোনাবো। আর বস্তির যত ব্যারামী মানুষ আছে, তাদের একবার খালি ছুঁয়ে দিবি। সব রোগ চলে যাবে। তুই যাবি তো?" পাহাড়ী সর্দারেরা চেঁচামেচি করে উঠলো।

"যাবো, যাবো।" সুন্দর শান্ত হাসিতে মুখখানা ভরে গেলো রানী গাইডিলিওর।

সহসা সামনের মাচান থেকে লিকোক্যুংবা বললো, "কী ব্যাপার? ওদের বস্তিতে যাবেন না কি?"

"কখন কাদের বস্তিতে যেতে হয়, তার কি ঠিকঠিকানা আছে? ব্রিটিশদের তাড়াবার জন্য আন্দোলন হবে। তারা কি সহজে ছেড়ে দেবে! আটক করবে, আন্দোলনকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করবে।"

"তা ঠিক।"

"পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে দেশের মানুষদের যদি ব্রিটিশদের মতলব, মিশনারীদের কাজকর্ম সম্বন্ধে খানিকটা বুঝিয়ে দিতে পারি, কাজ হবে। ধরুন, আমি আপনি আরো পাঁচজন হয়তো ধরা পড়লাম। সেই সঙ্গে সঙ্গে কি স্বাধীনতার আন্দোলন মরে যাবে? তা হয় না। আমরাও সমস্ত ভারতেরই

একটা অংশ। স্বাধীনতার জন্যে সবাই যখন অহিংসা দিয়ে লড়াই করছে, তখন আমাদের এই নাগা পাহাড় পিছিয়ে থাকবে কেন ?"

"ঠিক ঠিক।" সকলে মাথা নাড়লো।

টঘুটুঘোটাঙ পাতায় ছাওয়া ছোট্ট এই ঘরের দেওয়ালে দেওয়ালে এখনও গাইডিলিওর কথাগুলি অদ্ভুত রেশের মত ছড়িয়ে রয়েছে।

বৈদেহী কয়েকটি শব্দ। অথচ কী শরীরময়। দেহেমনে কথাগুলোর ছোঁয়া পর্যন্ত যেন পাচ্ছে তরুণ ছেলেরা।

কিছুক্ষণ চুপচাপ কাটলো।

কেউ কিছু বলার আগেই ঘটলো ঘটনাটা।

পাঁচ-ছজন পাহাড়ী মানুষ দুটো অচেতন নরদেহকে পাটাতনের ওপর এনে শুইয়ে দিলো।

বাইরের উপত্যকায় আর বনে, মাওএর দিকে অদৃশ্য-হয়ে-যাওয়া পথে নন্থ কেহেঙ মাসের রাত্রি ঘন হয়ে নামছে। আকাশে বিবর্ণ তারাগুলোর ফাঁকে ফাঁকে একটা কদর্য আঁচড়ের মত ফুটে বেরিয়েছে ছায়াপথটা। ফুটে বেরিয়েছে আনিজা উইখু।

গাইডিলিও তাকালেন পাহাড়ী মানুষ কজনার দিকে। বললেন, "কী ব্যাপার জদোনাঙ দাদা ? এরা কারা ?"

জদোনাঙ বললো, "জানি না, কোহিমার পথে পড়ে ছিলো। মানুষ দুটো ঠাণ্ডায় একেবারে হিম হয়ে গেছে। আর জ্ঞানও নেই।"

বাঁশের মাচান থেকে নীচের পাটাতনে নেমে এলেন গাইডিলিও, "পাটাতনে কেন ? মাচানে বিছানা করে শুইয়ে দাও। আমি স্যাঁক দেবার ব্যবস্থা করি।"

পেন্যু কাঠের মশালের আলো এসে পড়েছে নরদেহ দুটোর ওপর। থোকা থোকা রক্ত বেধে জমাট হয়ে রয়েছে সমস্ত দেহে। আর রয়েছে ভয়ানক সব ক্ষতচিহ্ন। মেরে ফাটিয়ে দেহ দুটোকে ক্ষতবিক্ষত করে দেওয়া হয়েছে।

অপলক চোখে তাকিয়ে আছেন গাইডিলিও। এতক্ষণ যে চোখ দুটো তাঁর জ্বলছিলো, এখন সে দুটো থেকে বিন্দু বিন্দু জল ঝরতে শুরু করেছে। ঝাপসা গলায় তিনি বললেন, "নিশ্চয়ই এদের কেউ মেরেছে।"

জদোনাঙ মাথা নাড়লো, 'আমারও তাই মনে হচ্ছে। মানুষ দুটো ঐ কোহিমার থানার কাছেই পড়ে ছিলো। পায়ে ঠেকতে তুলে নিয়ে এলাম।"

একত্রিশ

নন্থু কেহেঙ মাসের প্রথম দিকে সিঁড়িক্ষেতে জোয়ার বুনে এসেছিলো জোয়ান ছেলেমেয়েরা। তামাটে অঙ্কুরে অঙ্কুরে ভরে গিয়েছিলো পাহাড়ী উপত্যকা। সেই অঙ্কুর এখন ডাগর হয়েছে। সবুজ লাবণ্যে ঝলমল করে উঠেছে পাহাড়িয়া সিঁড়িক্ষেত। সিঁড়িক্ষেতের ফসলঘরগুলো আকাশের দিকে মাথা তুলে সারাদিন রোদ ঠেকায়। জোয়ারের চারাগুলো দিনে দিনে বেড়ে ঋতুমতী হবে। তারপর সারাদেহে শিশুশস্যের ভ্রূণ জন্মাবে। তার অনেক আগেই পাহাড়ী মানুষেরা জঙ্গল কাটতে যাবে। অরণ্যের শবদেহ পুড়িয়ে তৈরী হবে পাথুরে মাটির সার। সারাল মাটি চৌরস করে বীজধান বোনা হবে।

কেলুরি গ্রামে জঙ্গলকাটার তোড়জোড় চলেছে। চলেছে ধান বোনার প্রাথমিক প্রস্তুতি। কয়েকদিন পর থেকেই একরাশ 'গেন্না' শুরু হবে। ধারাবাহিক। অবিচ্ছিন্ন। মেথি গিন্ডা কেই কেন্যু গেন্না। টুসি চি কেতসান্যু গেন্না। টেসে ন্গা গেন্না। এমনি অনেক। গেন্না হলো উৎসবের অঙ্গ। অনুষ্ঠান।

বুড়ী বেঙসানু সিঁড়িক্ষেত পেরিয়ে মালভূমিতে গিয়েছিলো সকালবেলায়। বড় একটা মৌচাক কেটে এইমাত্র গ্রামে ফিরলো সে। সরাসরি ঘরে এসে গোটা দুই বর্শা নিয়ে আবার বেরুলো।

জোরি কেসুঙ থেকে তাকে দেখতে পেয়ে ফাসাও আর নজলি সাঁ-সাঁ করে ছুটে এলো। দুজনে দুদিক থেকে ঘিরে ধরলো বুড়ী বেঙসানুকে। "ঠাকুমা বড় খিদে পেয়েছে, খেতে দে।"

"খিদে পেয়েছে! তার আমি কী করবো? তোদের বাপ আছে, মা আছে, দাদা আছে, তাদের কাছে যা।" দাঁত খিঁচিয়ে একটা কদাকার মুখভঙ্গি করলো বেঙসানু, "হুই শয়তানের বাচ্চা সেঙাইটা সেই যে কোহিমা গেলো, আর ফিরবার নাম নেই। সিজিটোটা গিয়ে আর ফেরে নি। সেঙাইও ফিরলো না। জোয়ার বোনে নি। খাবি কী?"

"তা আমরা কী জানি? খিদে পেয়েছে।" বায়না শুরু করে দিলো ফাসাও আর নজলি।

"গায়ে কি জোয়ান কালের তাগদ আছে? তা থাকলে নয় শিকার-টিকার করে নিয়ে আসতাম। খাবি কী? আমার হাত-পা ঝলসে খা।"

"কেমন লাগবে তোর মাংস?" ফাসাও আর নজলির মুখেচোখে সবিস্ময় কৌতূহল।

"আরে শয়তানের বাচ্চারা, আমার মাংস গিলতে চাইছিস!" বুড়ী বেঙসানুর ঝাপসা চোখ দুটোর ওপর শঙ্কা ঘনিয়ে এলো। একটু পর আবার ধুকধুক গলায় বলতে শুরু করলো সে, "তোরা বাইরের ঘরে গিয়ে বোস্, আমি খাপেগা সদ্দারের বাড়ি থেকে চাল নিয়ে আসি। আর যদি পাই একটু মাংস।"

"তাড়াতাড়ি আসবি। খিদেতে পেট কামড়াচ্ছে।"

ফাসাও আর নজলি নিজেদের ঘরের দিকে চলে গেলো। আর বুড়ী বেঙসানু তিনটে বড় বড় টিলা ডিঙিয়ে এলো বুড়ো খাপেগার বাড়ি।

একখানা বাদামী রঙের পাথরের ওপর বসে রয়েছে বুড়ো খাপেগা। বাঁশের সরু চোঙায় তামাক পুড়ছে। তরিবত করে সেই চোঙার ফোকরে মুখ রেখে দীর্ঘ টান দিয়ে চলেছে খাপেগা। তামাকের মৌতাতে চোখদুটো বেশ ঢুলুঢুলু হয়ে উঠেছে।

বুড়ো খাপেগা এবার সরব হয়ে উঠলো, "আয় বেঙসানু, তারপর খবর কী বল?"

"খবর আবার কী! ঘরে একদানা খাবার নেই। আমি বুড়ী, আমি কোথা থেকে কী যোগাড় করবো, বল? দুই সিজিটো আর সেঙাইর মা মাগী তো কোহিমা গেলো। তারপর আজ কদিন হলো সেঙাইও গিয়েছে। একটারও ফিরবার নাম নেই। ফাসাও রয়েছে, নজলি রয়েছে। ওদের তো কিছু দিতে হবে খেতে।"

"হু-হু। তা তো ঠিকই।" সংক্ষিপ্ত জবাব। মৌজ করে সমানে তামাক টেনে চললো বুড়ো খাপেগা।

"তোর কাছে এলাম।" এবার সোজাসুজি বুড়ো খাপেগার দিকে তাকালো বেঙসানু।

"আমার কাছে! কেন?" বিরক্তি এবং সন্দেহে মুখচোখ কুঁচকে গেলো বুড়ো খাপেগার।

"কেন আবার? আমাকে খানিকটা মাংস আর চাল দে। নইলে কি না খেয়ে মরবো?"

"চাল ! মাংস ! কোথায় পাবো ? আমার নেই ওসব। তা ছাড়া চাল-মাংস ই নিবি কী ? আমাকেই বরং দিয়ে যাবি।" ভক্‌ভক্ করে একরাশ তামাকের ধোঁয়া ছাড়লো বুড়ো খাপেগা। ধোঁয়ায় ধোঁয়ায় তার মুখটা ঢেকে গেলো।

"আমি দেবো ? কেন ?" তেরছা নজরে তাকালো বুড়ী বেঙসানু।

"তোর নাতির বউকে খাওয়াচ্ছি। সেই খাওয়া দেবে কে ?"

"আমার নাতির বউ ! সে আবার কে ?" বিস্ময়ে বুড়ী বেঙসানুর গলা দ্ভুত শোনায়, "সেঙাইর আবার বিয়ে হলো কবে ?"

"হু-হু, সেঙাইর বউ। হুই পোকরি বংশের মেয়ে। নাম হলো মেহেলী। বিয়ে এখনো হয় নি। কোহিমা থেকে সেঙাই ফিরলেই হবে। সেই বউর খোরাক দিয়ে যাবি এবার থেকে।"

"ইজা রিহুগু !" কদর্য একটা খিস্তি আউড়ে বুড়ী বেঙসানু বললো, "আমার ঘরে একদানা খাবার নেই। তার ওপর নাতির বউকে খাওয়াবো, এখনও বিয়েই হয় নি যার সঙ্গে !"

এতক্ষণ গভীর সংযমের পরীক্ষা দিয়েছে বুড়ো খাপেগা। এবার সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "তোর নাতি জোয়ান ছুঁড়িটাকে নিয়ে মজা মারবে, আর আমি কি খাইয়ে খাইয়ে তাকে পুষবো ? তার রূপ আর যৌবন পাহারা দেবো ? আগনা ও সব হবে না।"

"তার আমি কী জানি। সেঙাই এলে তার কাছে চাল-মাংস চাইবি। তার বউ হবে, সে বুঝবে। সে তার বউকে খাওয়াবার আর পুষবার ভাবনা ভাববে। তুই আমাকে চাল দে, মাংস দে। ফাসাও আর নজলিটা না খেয়ে রয়েছে।" শেষদিকে কথাগুলো বড়ই করুণ শোনালো বুড়ী বেঙসানুর।

"চাল নিবি, মাংস নিবি, তার দাম এনেছিস ?"

"হু-হু—" পাশ থেকে জঙগুপি কাপড়ের একটা বোঁচকা সামনে টেনে খুলে ফেললো বেঙসানু। সদ্যকাটা একটা মৌচাক আর দুটো বর্শার ফলা রোদের আলোতে ঝকমক করে উঠলো।

আচমকা ঘটে গেলো ঘটনাটা। বাদামী রঙের পাথরখানা থেকে মৌচাক আর বর্শার ফলা দুটোর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো বুড়ো খাপেগা। সেগুলো তুলে নিয়ে সাঁ করে সামনের ঘরের ভিতর ঢুকে পড়লো নিমেষের মধ্যে।

প্রথমে ঘটনার আকস্মিকতায় থ মেরে গিয়েছিলো বুড়ী বেঙসানু। বোকা বোকা চোখে দেখছিলো, কেমন করে বুড়ো খাপেগার দেহটা সাঁ করে সামনের

ঘরখানায় অদৃশ্য হলো। মাত্র কয়েকটি মুহূর্ত। তারপরই বুড়ী বেঙসামু একটানা খিস্তি আওড়াতে শুরু করলো, "সাম্নুমেচু! ওরে শুয়োরের বাচ্চা, আমার বর্শা আর মৌচাক নিলি যে! এখুনি ফিরিয়ে দে। নইলে রেনজু আনিজা তোর গুষ্টিকে পাহাড় থেকে খাদে ফেলে সাবাড় করবে। মর, মর তুই। তোর ঘাড় মুচড়ে রক্ত খাবো। নে রিহুগু!"

বাইরের ঘরে ঢোকার পথটা একখানা অতিকায় পাথর দিয়ে বন্ধ করে দিয়েছে বুড়ো খাপেগা। এবার সেই নিরাপদ এলাকা থেকে সমানে সে জবাব দিতে লাগলো, "টেমে নটুঙ! যা, যা এবার। তোর নাতির বউকে পুষছি। তার দাম নিলাম।"

গালাগালিতে দু পক্ষই সমান ওস্তাদ। কেউ কারুর চেয়ে কম যায় না। খিস্তিখেউড়ে পাহাড়ী দুপুরটা কুৎসিত হয়ে উঠলো।

চারপাশের কেসুঙ থেকে মজা দেখতে সবাই এসে জমায়ত হয়েছে। গোল করে ঘিরে ধরেছে বুড়ো খাপেগার ছোট্ট বাড়িটাকে। ফিসফিস গলায় বলছে, "সদ্দারটা একটা সাম্নুমেচু (অত্যন্ত লোভী মানুষ)।"

"আমার মৌচাক আর বর্শা দে। আমি মেহেলীর সঙ্গে সেঙাইর বিয়ে দেবো না। তার খাবারও দেবো না।"

সাপের জিভের মত এক মাথা রুক্ষ চুল ছিঁড়ে, কদর্য খিস্তিগুলো নানা অঙ্গভঙ্গি করে আউড়ে, অনেক শাপশাপান্ত করে শ্রান্ত হয়ে পড়লো বুড়ী বেঙসামু। এতক্ষণ ঘোলাটে চোখদুটো তার দপদপ করে জ্বলছিলো; ধ্বংসশেষ কয়েকটা দাঁত কড়মড় শব্দ করছিলো। জীর্ণ, শুকনো বুকটা থরথর করে কাঁপছিল। এবার হাউ হাউ করে কেঁদে ফেললো বুড়ী বেঙসামু, "তোর গুষ্টি সব খতম হবে। ফাসাও আর নজলি খায় নি এখনও।"

কিন্তু সে কান্নায় কোন ফলই হলো না। এক মুঠো চাল কি দুখণ্ড মাংস দেওয়া দূরে থাক, মুখ বাড়িয়ে একবার উঁকিও দিলো না বুড়ো খাপেগা। বেঙসামুর কান্না তাকে টলাতে পারলো না, তার কঠোর কঠিন মনটাকে এতটুকু গলাতে পারলো না। বাইরের ঘরে চুপচাপ বসে রয়েছে বুড়ো খাপেগা। একটুও সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না তার।

অনেকটা সময় দেখে বিড়বিড় করে বকতে বকতে আর হাউ হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে তিনটে টিলা পেরিয়ে নিজেদের কেসুঙে ফিরে এলো বুড়ী বেঙসামু। দুপুরের রোদে তখন বিকেলের আমেজ লেগেছে।

কী ব্যাপার! দুটো চোখ জলে ঝাপসা হয়ে গিয়েছে। আবছা দৃষ্টিতে বেঙসাম্থু এক রূপবতী পাহাড়ী মেয়েকে দেখলো। উজ্জ্বল তামাটে দেহ। সুঠাম উরুতে একটি ভাঁজের চিহ্ন পর্যন্ত নেই। সামনের পাহাড়ী ঘাসের একফালি জমিতে বসে রয়েছে মেয়েটা। তাকে দুদিক থেকে ঘিরে ধরেছে ফাসাও আর নজলি। ঝরনার শব্দের মত কলকল হাসি, খুশী-খুশী কথার আমোদে মেতে রয়েছে তিনজনে।

থমকে দাঁড়িয়ে রয়েছে বুড়ী বেঙসাম্থু। কে মেয়েটা! কোনদিন একে দেখে নি। কোথা থেকে, কোন পাহাড় না বন থেকে, কি আকাশ ফুঁড়ে এই সুন্দর অবিশ্বাস্য মেয়েটা তাদের কেসুঙে এসে পড়েছে! ভেবে ভেবে থই পায় না বুড়ী বেঙসাম্থু।

আচমকা মেয়েটা তাকালো বুড়ী বেঙসাম্থুর দিকে। উঠে ছুটতে ছুটতে একটা বেতের ঝোড়া নিয়ে তার কাছে ছুটে এলো। বললো, "এই যে ঠাকুমা, চাল আর মাংস এনেছি।"

লাল লাল একরাশ চাল আর একখণ্ড শুয়োরের মাংস-সমেত বেতের ঝোড়াটা সামনের দিকে বাড়িয়ে দিলো মেয়েটা।

একটা ভোজবাজি। অবিশ্বাস্য এবং দুর্বোধ্য। এই ঢলে-পড়া দুপুরে স্বপ্ন দেখছে নাকি বুড়ী বেঙসাম্থু! হাত বাড়িয়ে ঝোড়াটা নিতে ভুলে গেলো সে।

ইতিমধ্যে ফাসাও আর নজলি পাহাড়ী ঘাসের জমিটা থেকে উঠে এসেছে।

মেয়েটা বললো, "আমি সদ্দারের পেছনের ঘর থেকে তোকে দেখেছি, তোর কথা শুনেছি। তাই এই চাল আর মাংস নিয়ে এলাম। এগুলো নে। আমি যাবো।"

"কে তুই?"

"আমি মেহেলী।" একটু থামলো মেহেলী। ইতিউতি তাকিয়ে আবার বললো, "আমি এবার যাই।"

অসীম কৃতজ্ঞতায় মনটা বিগলিত হয়ে গিয়েছিলো বুড়ী বেঙসাম্থুর। কিন্তু মেয়েটার নাম শুনেই স্নায়ুগুলো রাগে উত্তেজনায় টগবগ করে উঠলো। মেহেলী! পোকরি বংশের মেয়ে। পোকরি বংশ! যে বংশ তার আঠারো বছরের যৌবনকে ফালা ফালা করে সাবাড় করেছে। তার জীবনকে নিঃসঙ্গ করে দিয়েছে চিরকালের জন্য। তার স্বোয়ামী জেভেথাঙ ঐ পোকরি বংশের মেয়ে নিতিংস্থকে ছিনিয়ে আনতে গিয়ে লড়াই বাধিয়ে খতম হয়ে

গিয়েছে। সেই বংশের উত্তরকাল মেহেলী। একটু সংশয় পুঞ্জীভূত হলো মনে
অস্ফুট চেতনার ওপর দিয়ে কুটিল একটি সন্দেহের ছায়া ঘনিয়ে এলো। এ
মেহেলীকে নিয়ে পোকরি আর জোহরি বংশে নতুন আত্মীয়তা না নতুন
এক খণ্ডযুদ্ধের সূচনা? কিন্তু মেয়েটার মুখখানা কী সুন্দর! কী আশ্চ
নির্দোষ! স্নিগ্ধ লাবণ্যে ঝলমল করছে সারা দেহ। এই মেয়েই সেঙাইর
লগোয়া লেন্যু। পিরীতের জোয়ানী। সেঙাইর কামনার মানুষী। মোরাঙের
নারীহীন শয্যায় সেঙাইর মনে এই মেয়েই একটি সুখস্বাদ স্বপ্নের সঞ্চার করে
রাখে। এই মেয়েকে না ভালবাসা যেন অপরাধের। সহসা সব সংশয়, সব
সন্দেহ জলের লেখার মত মুছে গেলো বুড়ী বেঙসানুর চেতনা থেকে। প্রসন্ন
উদারতায় মনটা ভরে উঠলো।

মেহেলী। পোকরি বংশের মেয়ে। সালুয়ালাঙ গ্রামের মেয়ে। বিচিত্র
রহস্যময়ী। সে কেমন করে এলো এই কেলুরি বস্তিতে! কিসের প্রেরণায়?
এতক্ষণ তন্ময় হয়ে অনেক কিছু ভাবছিলো বুড়ী বেঙসানু। এবার সচেতন হয়ে
তাকালো সে। আশ্চর্য! কখন যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে মেহেলী। এ কী!
ফাসাও আর নজলিও নেই।

চারদিকে চনমন চোখে তাকালো বুড়ী বেঙসানু। তিনটে প্রাণীর একটিকেও
কোথাও খুঁজে বার করতে পারলো না সে। আচমকা কেসুঙের পেছন
থেকে খিলখিল হাসির রোল শোনা গেলো। চমকে ঘুরে তাকালো বুড়ী
বেঙসানু। তার চোখদুটো খুশিতে মোলায়েম হলো। মেহেলী, ফাসাও
এবং নজলি বিশাল খাসেম গাছটার আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে। গুটিগুটি পায়ে
সামনে এসে দাঁড়ালো বেঙসানু।

মেহেলী উঠে দাঁড়ালো, "আমি যাই।"

"যাবি কেন?"

"তুই তো আমাকে সেঙাইর বউ করবি না; তবে আর থেকে কী
করবো? চলেই যাই।"

কৌতুকের আভাস ফুটে বেরুলো বেঙসানুর চোখেমুখে। বললো, "গোঁসা
হয়েছিস? তুই কী করে জানলি, তোকে সেঙাইর বউ করবো না?"

"আমি সন্দারের ভেতরের ঘর থেকে সব শুনেছি।"

"হু-হু।" কাঁকড়ার দাঁড়ার মত জীর্ণ দুটো হাতের আঁজলে পরম মমতায়
মেহেলীর মুখখানা তুলে ধরলো বুড়ী বেঙসানু, "তোকে ছাড়া আর কারুকে

সেঙাইর পাশে মানায় না। তোকে তো আগে দেখি নি, আগে দেখলে কি ও কথা বলতাম ?"

সারাটা দেহে আনন্দের শিহরণ খেলে গেলো মেহেলীর। খুশী-খুশী মুখে তাকিয়ে রইলো পাহাড়ী মেয়ে। নির্বাক, একেবারেই চুপচাপ।

বুড়ী বেঙসান্থ বললো, "তুই যে এ বস্তিতে চলে এলি মেহেলী! আমরা তো তোদের শত্রু।"

রহস্যময় গলায় মেহেলী বললো, "তোর নাতিকে দেখে মন মজেছে। শত্রুর কথা ভুলে গেছি। আমার বাপ টেমি খামকোয়ামুার (বাঘমানুষ) সঙ্গে আমার বিয়ে দিতে চায়। সেঙাই ছাড়া আমি কারুকে বিয়ে করবো না। তাই নদী পেরিয়ে পালিয়ে এসেছি। তোদের সদ্দারকে ধরমবাপ ডেকে তার বাড়িতে রয়েছি।"

অকপট স্বীকারোক্তি। মনোরম একখানা মুখ। মুগ্ধ দৃষ্টিতে মেহেলীর দিকে তাকিয়ে রইলো বুড়ী বেঙসান্থ।

মেহেলী বললো, "সেঙাই কোহিমা থেকে কবে ফিরবো ঠাকুমা ?"

"কী জানি!" খিঁচিয়ে উঠতে গিয়েও পারলো না বুড়ী বেঙসান্থ। পোকরি বংশের মেয়েটা যেন জাদু করেছে তাকে। কোমল গলায় বললো, "বুঝেছি—"

"কী বুঝেছিস ?"

"সেঙাইকে ছাড়া সোয়াস্তি পাস না, ঘুম হয় না। লজ্জা কী? বয়সকালে আমাদেরও হতো না।" বুড়ী বেঙসান্থ মেহেলীকে দেখতে দেখতে তার যৌবনকালকে আস্বাদ করলো যেন। গাঢ় গলায় বললো, "ভয় নেই. সেঙাই ফিরলে জোড় বেঁধে দেবো তোদের।"

বত্রিশ

দু'দিন পর চোখ মেললো সেঙাই। টকটকে লাল চোখ। সেই চোখের মণিতে ছায়া পড়লো এক অপরূপ নারীমুখের। অনেকটা সময় নিষ্পলক তাকিয়ে রইলো সেঙাই। বিস্ময়ে কেমন যেন দিশেহারা হয়ে গিয়েছে সে। কথা বলতে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছে।

অপরিচিত নারীমুখ। পরম মমতার লাবণ্যে সে মুখখানা মাখামাখি হয়ে রয়েছে। মুখখানা আরো কাছাকাছি ঝুঁকে এলো। বললো, "এখন কেমন লাগছে?"

দু'দিন একেবারে বেহুঁশ হয়ে পড়ে ছিলো সেঙাই। তার নিশ্চেতন অবস্থার বাইরে কখন কোথায় কী ঘটেছে, তা সে জানে না। সব কেমন একটা অসত্য স্বপ্নের মত মনে হচ্ছে। একটা অবাস্তব বিভ্রমের মত আচ্ছন্ন চেতনার ওপর দিয়ে ছায়াছবির মিছিল সরে সরে গেলো সেঙাইর। মাধোলাল, গান্ধীজীর লড়াই, পাদ্রীসাহেব, সেই চার্চ, বেয়নেট নিয়ে মণিপুরী পুলিসের ঝাঁপিয়ে পড়া। তারপরও একটু একটু হুঁশ ছিলো তার, সারুয়ামারুর সঙ্গে কাদের যেন খানিকটা হাতাহাতি, হুমকি, চেঁচামেচি, গর্জন। তারও পর কারা যেন কোহিমার রুক্ষ, শক্ত এবং ধারাল পথের ওপর দিয়ে তাদের একটা ঘরে নিয়ে গেলো। আসাম্যুরা (সমতলের লোক) এলো। একটা লোকের বিরাট একজোড়া গোঁফ। আরো কয়েকটা লোক এসেছিলো অদ্ভুত এক ধরনের লাঠি নিয়ে। (এর আগে ব্যাটন দেখে নি সেঙাই)। গুঁফো লোকটা কী একটা বলবার সঙ্গে সঙ্গে তার পিঠের ওপর সেই লাঠির ঘা পড়তে লাগলো। একটার পর একটা, অনেক। তার পর আর জ্ঞান ছিলো না। ছবিগুলোর মধ্যে কোন মিল নেই, কোন ধারাবাহিকতা নেই। ছিন্নভিন্ন ছাড়া ছাড়া।

চেতনার ওপর এইসব ভয়ানক ছায়াছবির সঙ্গে এই মমতাময় মুখখানার কোন সঙ্গতিই খুঁজে বার করতে পারলো না সেঙাই। নির্নিমেষ চোখে তাকিয়েই রইলো। কেমন করে সেই পাদ্রী, সমতলের বাসিন্দা, মারধোর এবং আতঙ্কময় পরিবেশ থেকে এই করুণাময়ীর কাছে এলো, তা বুঝেই উঠতে

পারছে না সেঙাই। এ তার বুদ্ধির অগম্য। আবছা সন্ধ্যার এই ছায়াছায়া অন্ধকারে কি একটা অবিশ্বাস্য স্বপ্ন দেখছে নাকি সেঙাই?

নারীমুখটি আরো অনেকটা ঝুঁকে এলো, "নাম কী তোমার?"

"সেঙাই।" সহসা ব্যস্ত হয়ে উঠলো সেঙাই। মাচানের বিছানায় উঠে বসতে বসতে বললো, "সারুয়ামারু কই? সে তো আমার সঙ্গে ছিলো।"

"এই তো।" পাশের মাচানে একটা ক্ষীণ গলার স্বর শোনা গেলো। "একেবারে নড়তে পারছি না রে সেঙাই। শয়তানের বাচ্চারা মারের চোটে পাঁজরা একেবারে চুরচুর করে দিয়েছে।" কাতরাতে কাতরাতে উঠে বসলো সারুয়ামারু।

সেঙাই বললো, "শয়তানেরা মারাত্মক। ইজা হুবুতা।"

একটুক্ষণ চুপচাপ।

আচমকা সেঙাই চেঁচিয়ে উঠলো, "আমরা এখানে কী করে এলাম রে সারুয়ামারু?"

"রানী গাইডিলিওর লোকেরা নিয়ে এসেছে। আমাদের নাকি ছুই পুলিসরা কোহিমার রাস্তায় ফেলে দিয়ে গিয়েছিলো। একেবারে হুঁশ ছিলো না, এমন মার দিয়েছিলো রামখোর ছায়েরা।" একটু থামলো সারুয়ামারু। একসঙ্গে এতগুলি কথা বলে রীতিমত হাঁপানি ধরে গিয়েছে। ফুসফুস ভরে হুস্ হুস্ করে বার কয়েক বাতাস টেনে আবার বলতে শুরু করলো সারুয়ামারু, "রানী গাইডিলিও না থাকলে কোহিমার পাহাড়ে মরেই থাকতাম আমরা।"

"রানী গাইডিলিও! কে? কই?" বিস্ময়ে গলাটা কাঁপা কাঁপা শোনাতে লাগলো সেঙাইর।

"ছুই যে।" সামনের দিকে আঙুল বাড়িয়ে দিলো সারুয়ামারু।

সেই নারীমুখ। দুদিন পরে চোখ মেলে যাকে প্রথম দেখেছে সেঙাই। এক অপরূপ জ্যোতি সেই মুখের চারপাশে স্থির হয়ে রয়েছে। রানী গাইডিলিও। একে নিয়ে এক অদ্ভুত বিস্ময়কর গল্প বলেছিলো মাধোলাল। রানী গাইডিলিও। ওকে নিয়ে পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর সঙ্গে তার বচসা হয়েছিলো। ধারালো বিরাট বর্শা ছুঁড়ে ক্ষতবিক্ষত করেছিলো তার কবজি। সেই গাইডিলিও। যার ছোঁয়ায় দেহ থেকে মৃত্যু পলাতক হয়, জরা ফেরারী হয়। সেই গাইডিলিও! হাত বাড়িয়ে এখন তাঁকে ছোঁয়া পর্যন্ত যায়। বিস্ময়ে অদ্ভুত ধরনের ভয়ে

নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেঙাই। তার কপিশ চোখ দুটো যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসবে।

এমন সময় অস্ফুট গলায় চিৎকার করে উঠলো সেঙাই, "তুই রানী গাইডিলিও!"

নিরুত্তর দাঁড়িয়ে রইলেন রানী গাইডিলিও। শুধু একটি প্রসন্ন হাসি একটু একটু করে সারা মুখে ছড়িয়ে পড়লো তাঁর।

সারুয়ামারু তৎপর হয়ে উঠেছে, "হুই যে তোকে বলেছিলাম, রানী গাইডিলিও ছুঁয়ে দিলে সব রোগ সেরে যায়। দ্যাখ, হলো কী না? সায়েবের লোকেরা আমাদের মেরে তো বেহুঁশ করে দিয়েছিলো। কোহিমার পাহাড়ে পচে পচে মরে যেতাম। রানীর লোকেরা আমাদের তুলে নিয়ে এলো। রানী ছুঁয়ে দিলো। সব রোগ চলে গেলো। তাই না? এ দ্যাখ না, আমার তো কালই জ্ঞান ফিরেছে। তুই তখন ব্যথার ঘোরে বিড়বিড় করে কী যেন বকছিস্! ভাবলাম, আনিজাতে পেয়েছে।"

"তারপর!" আতঙ্কে শাসনালীটি যেন চেপে এলো সেঙাইর। মনের ওপর খোন্‌কের মুখখানা ভেসে উঠলো। সালুয়ালাঙ গ্রামের তামুন্যু (চিকিৎসক) ব্যারামের ঘোরে বিড়বিড় করার জন্য খাদে ফেলে দিয়েছিল খোন্‌কেকে। গ্রামে থাকলে তার বরাতেও খোন্‌কের মত অপঘাত ছিলো। ভয়ে, আতঙ্কে আর্তনাদ করে উঠলো সেঙাই, "তারপর কী হলো সারুয়ামারু?"

"হুই রানী গাইডিলিও তোকে বাঁচিয়ে দিয়েছে, আমাকে বাঁচিয়েছে। সব আনিজা ভেগে গিয়েছে।"

অসীম কৃতজ্ঞতায় পাহাড়ী জোয়ান সেঙাইর মনটা ভরে গেলো। আবার তাকালো সে রানী গাইডিলিওর মুখের দিকে। সহসা সেই মুখের ওপর আর একজনের ছায়া পড়লো। মেহেলী। মেহেলীও একদিন তাকে সালুয়ালাঙ গ্রামের অতল খাদ থেকে উদ্ধার করেছিলো। নিশ্চিত অপমৃত্যুর হাত থেকে তুলে এনে বাঁচিয়ে দিয়েছিলো। সেঙাই ভাবলো। তার ভাবনাটা সুষ্ঠু শৃঙ্খলাবদ্ধ না হলেও, এলোমেলো হলেও মোটামুটি এই রকম। মেহেলী আর গাইডিলিও। দুজনের মধ্যে এক জায়গায় মিল রয়েছে। সে মিলটি সেবার, মমতার। দুজনেই তাকে বাঁচিয়েছে। এ ছাড়া আপাতত অন্য কোন সঙ্গতি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না।

মেহেলীর সুন্দর তামাটে অঙ্গশ্রী সারাদেহের কামনাকে দাবানলের মত জ্বালিয়ে তোলে। আর গাইডিলিওর এই কমনীয় মুখখানার দিকে তাকালে রিপুর ফণারা টলে পড়ে। এতকাল ভয়, বিস্ময়, রোষ এবং প্রতিহিংসা ছাড়া অন্য কোন বোধ জাগতো না সেঙাইর মনে। এখন, এই মুহূর্তে গাইডিলিওকে দেখতে দেখতে স্থূল, অতি স্পষ্ট এবং আদিম কতকগুলি অনুভূতির সঙ্গে সভ্য জগতের একটা অদ্ভুত অনুভূতি মিললো। তার নাম সম্ভ্রম। পাহাড়ী মানুষ সেঙাইর অস্ফুট চেতনা সম্ভ্রমের এক অপূর্ব অনুভূতিতে ভরে গেলো। এমন অনুভূতি এর আগে আর কোনদিনই হয় নি তার।

মেহেলী আর গাইডিলিও। মেহেলী দুটি বাহুর মধ্যে দেহের ভোগ এবং উপভোগের জন্য একপিণ্ড কোমল সুস্বাদু নারীমাংস। গাইডিলিও ধরাছোঁয়ার মধ্যে থেকেও অনেক দূরের। তাঁর দিকে হাত বাড়ানো যায় না। অশুচি মন তাঁর উপস্থিতিতে অবশ, আড়ষ্ট হয়ে যায়।

আচমকা সেঙাই বললো, "তুই না কি সায়েবদের সঙ্গে লড়াই করবি?"

চমকে উঠলেন রানী গাইডিলিও, "কে বললে তোমাদের?"

"মাধোলাল। তুই যে কোহিমাতে তার দোকান রয়েছে।" সেঙাই বলে চললো, "মাধোলালের কাছে তোর আর গান্ধীজীর কথা শুনে এসেছিলাম। ফাদার আমাদের কাছ থেকে সব শুনে নিলো। মাধোলাল তোর আর গান্ধীজীর কথা বলতে বারণ করে দিয়েছিলো। তুই ফাদার আমাদের বেইমান বানালো। বিশ্বাসঘাতক করলো।" উত্তেজনায় সেঙাইর চোখ দুটো ঝকমক করতে লাগলো।

স্মিতমুখে তাকালেন রানী গাইডিলিও, "আমি সব শুনেছি সারুয়ামারুর কাছ থেকে। ওরা এমন শয়তান, মানুষকে বেইমান বানায়। মানুষের বিশ্বাসকে, মনুষ্যত্বকে কয়েকটা টাকা দিয়ে কিনে নিতে চায়।"

অর্ধস্ফুট বুদ্ধি, অপরিণত বন্য মন। রানী গাইডিলিওর ভাষার জটিলতা ঠিক বুঝতে পারলো না সেঙাই এবং সারুয়ামারু। তবু ঐ জটিল শব্দগুলো দুটো পাহাড়ী মানুষকে তুমুলভাবে নাড়া দিলো।

গাইডিলিও বলে চলেছেন তখনও, "আমরা পাহাড়ী মানুষ, ওরা আমাদের ধর্ম নষ্ট করছে। টাকা-পয়সা-কাপড়ের ঘুষ দিয়ে পাপের পথে নিয়ে যাচ্ছে। ওদের কথামত না চললে মারছে।"

গাইডিলিওর কথাগুলি স্নায়ুতে স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়লো সেঙাইর। ঝাঁকড়া

মাথাখানা প্রবলবেগে নাড়িয়ে সে বললো, "হু-হু, তুই ঠিক বলেছিস আমাদেরও টাকা দিতে চেয়েছিলো হুই ফাদারটা। তুই লড়াই বাধিয়ে দে রানী। আমাদের বস্তি থেকে বর্শা নিয়ে আসবো, জোয়ান ছেলেদের ডেকে আনবো। পাহাড় থেকে শয়তানের বাচ্চাদের ফুঁড়ে ফুঁড়ে খাদে ফেলে দেবো। শয়তানেরা আমাদের পাহাড়ে এসে আমাদেরই মারে! এই ছাখ।"

তড়িৎগতিতে কোমরটা অনাবৃত করে দেখালো সেঙাই। কোমরের ওপর একটা বিশাল ক্ষত। দিনদুয়েক আগে সেই মণিপুরী পুলিসটা বেয়োনেটের আধ হাত ফলা ঢুকিয়ে দিয়েছিলো। সেই বীরকীর্তি দগদগে ঘা হয়ে গিয়েছে। সেঙাই এখনও থামে নি, "হুই মণিপুরী আর আসান্যা (সমতলের লোকে), দু দলকেই খেদিয়ে দিবি। ওরাই মেরেছে আমাদের।"

চকিত হয়ে উঠলেন গাইডিলিও। বললেন, "সব দোষ ঐ সাহেবদের। ওরা বলেছে, তাই আসান্যরা (সমতলের লোকেরা) তোমাদের মেরেছে। ঐ সাহেবরাই হলো শয়তান। ওদের সঙ্গেই আমাদের লড়াই হবে।"

"কবে? কবে?" রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলো সেঙাই, "কবে লড়াই বাধবে?"

"বেধে গিয়েছে। গান্ধীজী বাধিয়ে দিয়েছেন। আমাদের পাহাড়েও বোধ হয় বেধেছে কাল থেকে।"

"লড়াই বেধেছে। কটা মরেছে?"

"একজনও নয়। এ লড়াইতে মারামারি হয় না। আমরা মারি না, মারবোও না। কিন্তু সাহেবরা আমাদের ধরে নিয়ে আটক করে রাখবে। রাখছে। মারছে।" রানী গাইডিলিওর কোমল সুকুমার দেহটা পাথরের মত কঠিন এবং ভীষণ হয়ে উঠেছে। একটু আগে যে চোখ দুটো স্নেহে মমতায় কোমল ছিল, এখন তারা জলছে। গাইডিলিও বললেন, "এই লড়াইতে তোমাদেরও আসতে হবে সেঙাই।"

"মাধোলাল বলছিলো, গান্ধীজীর লোকেরা নাকি মার খাচ্ছে কিন্তু মার দিচ্ছে না। এ কেমন লড়াই! তুইও একথা বলছিস। আমরা পাহাড়ী মানুষ। লড়াই হবে, অথচ মানুষ মরবে না। এমন কথা তো সদ্দার বলে নি কোনদিন। তবে কি তুই গান্ধীজীর লোক?"

"আমরা সবাই গান্ধীজীর লোক।" একটু থামলেন গাইডিলিও। দেখতে লাগলেন তাঁর কথাগুলি দুটো সহজ পাহাড়ী মুখের ওপর কী প্রতিক্রিয়া

করছে। তারপর বললেন, "গান্ধীজীই বলেছেন, এ লড়াইতে সাহেবদের আমরা মারবো না। মার যদি খাই, মার খেয়ে খেয়ে আমরা জিতে যাবো।"

"এই কথা মাধোলালও বলেছিলো।"

অদ্ভুত এই সংগ্রাম। বর্শা নেই, তীরধনুক নেই। নিরীহ দেহটিকে সাহেবদের হাতিয়ারের সামনে অসহায়ভাবে তুলে ধরতে হবে। বন্য মন ঠিক সায় দেয় না। পাহাড়ী মানুষ ঠিক প্রেরণা পাচ্ছে না। অথচ গাইডিলিও বলছেন। তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে সবাক প্রতিবাদ জানাবার মত দুঃসাহস নেই সেঙাইর। মাধোলালের কাছে গান্ধীজীর আজব লড়াইর গল্প শুনে মনটা অবিশ্বাসে ভরে গিয়েছিলো। এই মুহূর্তে রানী গাইডিলিওর কথা শুনতে শুনতে একটা কিনারাহীন অথৈ সমস্যার মধ্যে হাবুডুবু খেতে লাগলো পাহাড়ী জোয়ান সেঙাই। গাইডিলির এই যুদ্ধকে অবিশ্বাস করার মত ভরসা পর্যন্ত নেই সেঙাইর। কোন সমাধানই সে খুঁজে পাচ্ছে না।

গাইডিলিও বললেন, "আমাদের এই লড়াইতে তোমরাও আসবে তো সেঙাই? আমাদের সঙ্গে মিলবে?"

সারুয়ামারু কুণ্ঠিত গলায় বললো, "একবার সদ্দারকে জিগ্যেস করে নি।"

"সদ্দারকে জিগ্যেস করে নি! টেমে নটুঙ!" আচমকা ভয়ানক উত্তেজিত হয়ে উঠলো সেঙাই, "সদ্দার তোকে কোহিমার পথ থেকে বাঁচিয়েছিলো?"

"না না।"

"রানী আমাদের বাঁচিয়েছে। রানী আমাদের যা বলবে, তাই করবো। বেহুঁশ হয়ে যখন ছিলাম, তখন আমাকে আনিজাতে ধরেছিলো। বস্তিতে থাকলে খোনকের মত নির্ঘাত আমাকে খাদে ফেলে দিতো তামুন্যু (চিকিৎসক)।" দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে গাইডিলিওর মুখের ওপর এনে ফেললো সেঙাই। একটু আগের উত্তেজনা চলে গিয়েছে। সেঙাই বললো, "তুই আমাদের বাঁচিয়েছিস। তুই যা বলবি, তাই করবো। মরতে বললে তাই করবো।"

মমতায় মুখখানা স্নিগ্ধ দেখালো গাইডিলিওর। বললেন, "এই দেখো এত কথা বললাম, আসল কথাই জানা হয় নি। তোমরা কোন বস্তির লোক?"

"কেলুরি বস্তির।"

"দরকার হলে তোমাদের বস্তিতে যাবো। থাকতে দেবে তো?" সরল

পাহাড়ী জোয়ান সেঙাইর মধ্যে একটা নিশ্চিত বিশ্বাসের ভিত্তি খুঁজে পেয়েছেন গাইডিলিও। তাকে বিশ্বাস করা যায়। তার ওপর আস্থা রাখা চলে।

"হু-হু—" প্রচণ্ড উৎসাহে মাচানটা থেকে প্রায় লাফিয়ে উঠলো সেঙাই, "তোর জন্যে নতুন ঘর বানিয়ে দেবো।"

"না না, একথা বেশী চাউর কোরো না।"

"হু-হু। তুই যখন বলছিস।"

বাইরের আকাশ থেকে ছায়া-ছায়া অন্ধকার সরে গিয়েছে। টঘুটুঘোটাঙ পাতায়-ছাওয়া এই ঘরখানার চার পাশ থেকে রাশি রাশি রোমশ থাবার মত নেমে আসছে অন্ধকার। ভয়াল সন্ধ্যা। ভয়ালতর পাহাড়ী রাত্রি। চারিদিকে গহন বন। খাসেম আর ভেরাপাঙ। আতামারী লতার বাঁধনে বাঁধনে জটিল হয়ে বন কখনও উঠেছে তুঙ্গ টিলায়। ঘন হয়ে কখনও একটা ঢেউএর মত দোল খেয়ে নেমেছে উপত্যকার দিকে। ভয়ানক গলায় চেঁচিয়ে উঠছে আউ পাখির ঝাঁক। ক্কঁক্ ক্কঁক্ শব্দে ককিয়ে উঠছে খারিমা পতঙ্গের দল। শুকনো পাতার ওপর দিয়ে সর্‌সর্‌ করে চলেছে পাহাড়ী অজগর। খাটসঙ গাছের শাখায় শাখায় লাফিয়ে চলেছে বানরেরা। চিতাবাঘ আর বাঘেরা দল পাকিয়ে গর্জাচ্ছে। পাখি-পতঙ্গ-সরীসৃপ—সবাই এখন নীড়মুখি। বিশৃঙ্খল পাহাড়ী অরণ্যের সংসারেও সবাই নিয়মের শাসনে শাসিত। সে নিয়ম গুহায় কি নীড়ে, গাছের ফোকরে কি শাখায় একটি নিভৃত আবাসের আশ্রয়ে ফিরে যাবার চিরন্তন নিয়ম।

ঘরের মধ্যে একটা পেন্যু কাঠের মশাল জ্বালিয়ে দিয়েছেন গাইডিলিও। সামনের প্রবেশ-পথের ওপর ঝুলিয়ে দিয়েছেন বাঁশে বাঁশে ফাঁস পরানো একটা ছিদ্রহীন ঝাঁপ।

নাগা পাহাড় গাঢ় অন্ধকারে তলিয়ে গিয়েছে। সামনে মাও-গামী পথের আঁকাবাঁকা রেখা। চারপাশে আদিম হিংসা। অরণ্যের বিভীষিকা। তার মধ্যে টঘুটুঘোটাঙ পাতায়-ছাওয়া ছোট্ট একটি ঘরে পেন্যু কাঠের মশালে একবিন্দু আলো। একবিন্দু আলো! আলো নয়, ও যেন নাগাপাহাড়ের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা। সব অন্ধকার থেকে সে আলোকে দেহ-মন-আত্মা-প্রতিজ্ঞা মেলে পাহারা দিয়ে রাখছে একটি প্রাণ। সে প্রাণের নাম গাইডিলিও। এই মশালের শিখাটিকে নাগা পাড়াড়ের উপত্যকা আর মালভূমিতে দাবানলের

মত ছড়িয়ে দিতে হবে। টঘুটুঘোটাঙ পাতায়-ছাওয়া ঘরখানায় তারই নিভৃত দীক্ষা।

ঝাঁপের ওপর একটা ঝড় এসে আছড়ে পড়লো সহসা। চমকে উঠলেন গাইডিলিও। তীক্ষ্ণ গলায় বললেন, "কে ?"

"আমি লিকোক্যুংবা। শিগগির ঝাঁপ খুলুন।"

তাড়াতাড়ি মাচান থেকে পাটাতনে নামলেন গাইডিলিও। ঝাঁপটা খুলতে খুলতে বললেন, "আসুন, আসুন।"

ঘরের মধ্যে এসে ঘন ঘন কয়েকটা নিশ্বাস ফেললো লিকোক্যুংবা। বললো, "সর্বনাশ হয়ে গিয়েছে। পুলিস জানতে পেরেছে, আপনি এখানে রয়েছেন।"

গাইডিলিও চকিত দৃষ্টিতে তাকালেন লিকোক্যুংবার দিকে। সমস্ত মুখখানা রক্তে মাখামাখি হয়ে রয়েছে। সাদা জামাটা রক্তে ভিজে গিয়েছে। কপাল থেকে ফিনকি দিয়ে এখনও তাজা রক্ত বেরুচ্ছে। আর্তনাদ করে উঠলেন গাইডিলিও, "এ কী হয়েছে! একেবারে খুন করে ফেলেছে, দেখছি!"

লিকোক্যুংবা হাসলো। দু পাটি ঝকঝকে দাঁত পেন্স্য কাঠের স্নিগ্ধ আলোতে ঝকমক করতে লাগলো, 'কোহিমা থানার সামনে আজ জাতীয় পতাকা তোলা হচ্ছিলো। পুলিশ বেয়নেট চালিয়েছে। তারই চিহ্ন। যাক ও সব। এখনই এ ঘর ছেড়ে আপনাকে যেতে হবে। অঙ্গামীদের গ্রামে লুকিয়ে থাকার একটা ব্যবস্থা করেছি।"

"কিন্তু আপনার মাথায় এত বড় আঘাত—" একটু ইতস্তত করলেন গাইডিলিও।

"অঙ্গামীদের গ্রামে গিয়ে সব ব্যবস্থা হবে। থানার সামনে অনেককে অ্যারেস্ট করেছে। পুলিস এদিকে আসছে। আর দেরি করা ঠিক হবে না।"

"এ আস্তানার খবর পুলিস কী করে পেলো ?"

"যে সব সদ্দাররা এখানে আসে, তাদের মধ্যে কেউ পুলিসের চর রয়েছে। সে-ই আমাদের এই উপকারটুকু করেছে। সে যা হোক, এক্ষুণি আমাদের এ আস্তানা ছেড়ে চলে যেতে হবে। আপনার অ্যারেস্ট হওয়া কিছুতেই চলবে না। তা হলে নাগা পাহাড়ের স্বাধীনতা আন্দোলন একেবারে নিবে যাবে। সমস্ত ভারতবর্ষ স্বরাজের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে। আমাদের এই নাগা পাহাড়কে পিছিয়ে থাকলে কিছুতেই চলবে না।" আশ্চর্য এক কাঠিন্য নেমে এসেছে

লিকোক্যুঙবার কণ্ঠে। চোখমুখ ধারালো বর্শার ফলার মত ঝকঝক করছে। সে বলতে লাগলো, "সমতলের দেশের জন্য রয়েছে গান্ধীজীর নেতৃত্ব। আমাদের পাহাড়ী মানুষেরা আপনাকে দেবীর মত মানে। আপনি জীবিত থাকতে দেশের লোক শয়তানের শিকার হয়ে থাকবে? একটু একটু করে আমাদের ধর্ম যাবে? সরল মানুষগুলো শঠ হবে? টাকা খেয়ে বিশ্বাসঘাতক হবে? বেইমান হবে? না না, এতবড় অন্যায় সহ্য করা অসম্ভব।"

"ঠিক।" বারুদের ওপর মশালের শিখা এসে লাগলো। দপ করে জ্বলে উঠলেন গাইডিলিও, "ঠিক কথা। রক্ত দেখে আমার যেন কেমন লাগছিলো। রক্তের পথ তো আমাদের পথ নয়। মনটা তাই ধক্ করে উঠেছিলো। সে যাক, আমি যাবো।"

লিকোক্যুঙবা হাসলো। বিচিত্র হাসি। সে হাসির মধ্য দিয়ে একটি দাউ-দাউ-জ্বালা প্রাণের প্রতিচ্ছায়া পড়লো, "রক্তের পথ আমাদের নয়। পিকেটিংএ একটি পাহাড়ী মানুষও সাহেবদের গায়ে হাত তোলে নি। আমরা হাত তুলবো না বলে তো ওরা ছাড়বে না। ওরা এ আন্দোলনকে মেরে-ধরে যেমন করে হোক, থামবার চেষ্টা করবে।" একটু থামলো লিকোক্যুঙবা। কী যেন ভাবলো একবার। রক্তাক্ত মুখখানার ওপর কয়েকটা রেখা আড়াআড়ি ফুটে বেরুলো। সে বললো, "আজ শুনলাম গান্ধীজীকে নাকি অ্যারেস্ট করবে।"

"কী বললেন? গান্ধীজীকে আটক করবে!" প্রায় চিৎকার করে উঠলেন গাইডিলিও।

"হাঁ, তাই তো শুনলাম। এবার চলুন। পেছনের খাদে অঙ্গামী সর্দার তার লোকজন নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে।" লিকোক্যুঙবা অধীর হয়ে উঠলো. "এবার আমাদের কাজ শুরু হলো। অনেক দায়িত্ব, অনেক সমস্যা, অনেক, অনেক কাজ।"

বিস্মিত চোখে সেঙাইরা তাকিয়ে ছিলো গাইডিলিও আর লিকোক্যুঙবার দিকে। পাহাড়ী ভাষায় তারা কথা বলছে। সব কটা কথা পরিষ্কার বুঝতে পারছে সেঙাই। কিন্তু সেই কথা চোলাই করে একটি উত্তেজনা ছাড়া বিশেষ কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারে নি। যত দুর্বোধ্যই হোক, আর একটি অর্থ সে খুঁজে পেয়েছে। সে অর্থ রক্তের অক্ষরে আঁকা রয়েছে লিকোক্যুঙবার কপালে। লড়াই বেধেছে। মারামারি হচ্ছে।

সেঙাই বললো, "কাদের সঙ্গে লড়াই বেধেছে রে? অমন করে ওকে মারলো?"

"সাহেবদের সঙ্গে।" গাইডিলিও তাকালেন সেঙাইর দিকে। বললেন, "সেঙাই, আমাদের চলে যেতে হবে এক্ষুনি। সাহেবদের সঙ্গে লড়াই বেধেছে। তারা ঐ দেখ, ওঁকে মেরেছে। আমাদের ধরতে আসছে।"

"পালাতে হবে! কেন? আমরা পাহাড়ী মরদ না!" চেঁচিয়ে উঠলো সেঙাই, "আসুক সায়েবরা। আমাকে মেরেছে, তোর লোককে মেরেছে। তিনটে মাথা রেখে দেবো।"

"না না। পাগলামি করো না। ওদের বন্দুক আছে, গুলি করে মারবে।"

পাশের মাচান থেকে সারুয়ামারু আলোকদান করলো। বন্দুকের মহিমা সম্বন্ধে সে অতিমাত্রায় সচেতন। "না রে, দূর থেকে তাক করে বন্দুক দিয়ে আমাদের সাবাড় করবে। অত দূরে বর্শা ছুঁড়লেও লাগবে না। তার চেয়ে পালাই চল। আমাদের বস্তিতে কি পাহাড়ে জুতমত একবার পেলে ফুঁড়ে খাসেম গাছের মগডালে ঝুলিয়ে রাখবো সায়েবদের।"

শিউরে উঠলেন গাইডিলিও। বললেন, "খবদ্দার, কেউ সায়েবদের মারবে না। ওরা মারুক। মারতে মারতে ওরাই একদিন কাহিল হয়ে পড়বে। কত মারবে? সে যাক, আমরা তো যাচ্ছি। তোমরা বস্তিতে ফিরে যেতে পারবে? তোমাদের শরীর খারাপ। কিন্তু এ ঘর না ছাড়লে সাহেবরা ধরে ফেলবে।"

"পারবো, খুব পারবো। খাদে একবার পড়ে গিয়েছিলাম না! হাড়গোড় চুরচুর হয়ে ভেঙে গিয়েছিলো। তার পরদিন সালুয়ালাঙ বস্তি থেকে আমি ভেগে এলাম না?" সগৌরবে নিজের কৃতিত্বের কথা বললো সেঙাই।

কেন খাদে পড়ে গিয়েছিলো? সালুয়ালাঙ বস্তি কোনটা? এসব কৌতূহল প্রকাশের বিন্দুমাত্র সময় নেই গাইডিলিওর। বেয়নেট বাগিয়ে বুনো মোষের ঝাঁকের মতো ছুটে আসছে পুলিস। কিছুতেই ধরা দেওয়া চলবে না। এখনই পালিয়ে যেতে হবে। নাগা পাহাড়ের একটি নিভৃত প্রাণকোষে স্বাধীনতার প্রখর আকাঙ্ক্ষার যে অঙ্কুরটি জন্ম নিয়েছে, তাকে কোনমতেই দলিত পিষ্ট হতে দেওয়া যাবে না। সযত্নে লালন করে নাগা পাহাড়ের দিকে

দিকে তার শাখা প্রশাখাকে ছড়িয়ে দিতে হবে। সে আকাঙ্ক্ষাকে অগ্নিবীজের মত নাগাদের প্রাণে প্রাণে ছিটিয়ে দিতে হবে।

গাইডিলিও বললেন, "তবে চলো। আর দেরি করার সময় নেই।" বলতে বলতে পেন্ন্য কাঠের মশালটা পাটাতন থেকে তুলে নিলেন।

একসময় চারজনে বাইরে এসে দাঁড়ালো। গাইডিলিও আবারও বললেন, "তোমাদের বস্তির নাম তো কেলুরি, দরকার হলে যাবো। এবার তোমরা সামনের পথে যাও। আমরা পেছনের খাদে নামবো।"

"হু-হু, আমাদের বস্তিতে যাবি। সদ্দার খুব খুশী হবে। আমরা গান-বাজনা শোনাবো, নাচ দেখাবো। তুই আমাদের জান বাঁচিয়েছিস। তোকে সম্বরের মাংস খাওয়াবো।"

"আচ্ছা, আচ্ছা।" মধুর হাসিতে মুখখানা ভরে গেলো গাইডিলিওর।

একটু পরেই সেঙাই আর সারুয়ামারু মাও-গামী পথের দিকে পা বাড়িয়ে দিলো। আর একটি পেন্ন্য কাঠের মশাল আঁকাবাঁকা পাহাড়ী পথের উতরাই বেয়ে নীচের খাদে নামতে লাগলো। কবে, কবে নাগা পাহাড়ের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা হয়ে গাইডিলিওর হাতের ঐ ক্ষুদ্র অগ্নিবিন্দুটি দিকে দিকে বনবহ্নির মত ছড়িয়ে পড়বে? প্রাণে প্রাণে একটি আগ্নেয় প্রতিজ্ঞার দাবানল ছড়াবে? কবে, কত কাল, কত দিন-মাস-বছর পেরিয়ে সেই পরম শুভময় মুহূর্ত?

তেত্রিশ

বুড়ো খাপেগার কেসুঙে কেলুরি গ্রামের সব মেয়েপুরুষ জমায়ত হয়েছে। নানা বংশের প্রাচীন মানুষেরা এসেছে। বাহারে সাজে সেজে এসেছে কুমারী মেয়েরা। কোমরের খাঁজ থেকে নিটোল জানু পর্যন্ত খামেরু সু কাপড়। বাঁশের চাঁচারি দিয়ে আঁটো করে বাঁধা চুল। মাথার দু পাশে আউ পাখির পালক এবং আতামারী ফুল গোঁজা। গলায় হাতীর দাঁতের আরুখা হার। চ্যাপটা নরম হাতে বাদামী হাড়ের বালা। জীয়ন্ত পাহাড়ী কাব্য সব। তাদের বাহার কত। অফুরন্ত যৌবনের ফুর্তিতে সবাই যেন টগবগিয়ে ফুটছে। এসেছে জোয়ান ছেলেরা। মাথায় মোষের শিঙের মুকুট। পরনে জুঙগুপি কাপড়। আর এসেছে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা। চুল উঁচু করে বেঁধে লাল টুকটুকে খাসেম ফুল গেঁথে দেওয়া হয়েছে। তারা খাপেগার কেসুঙের চারপাশে লালঝুঁটি মুর্গীর মত ঘুরে বেড়াচ্ছে।

কেসুঙের ঠিক পিছনেই ঘন বনের ফাঁকে একটা জলপ্রপাত। পাহাড়ের উঁচু চূড়া থেকে প্রবল উচ্ছ্বাসে জলধারা নীচের খাদে আছড়ে পড়ছে। স্তব্ধ নিঝুম বনভূমি সেই গর্জনে আর প্রতিধ্বনিতে ভরে গিয়েছে। দুপুরের রোদ মাছের আঁশের মত ঝকঝকে। সেই রোদ প্রপাতের দেহে মাখামাখি হয়ে রূপালী তরল রেখা সৃষ্টি করেছে।

প্রপাতের গমগম আওয়াজ ছাপিয়ে বুড়ো খাপেগার কেসুঙে উল্লসিত হল্লা হচ্ছে।

"ও সদ্দার, মোষের মাংস খাবো।"

"না না, সাদা শুয়োরের কাবাব খাবো।"

"ও সদ্দার, রোহি মধু দে।"

একখণ্ড পাথরে বসে ক্ষয়ে-আসা ভাঙা দাঁতের ফাঁকে কাঁচা তামাকপাতা রেখে ঝিমুচ্ছিলো বুড়ো খাপেগা। নেশার মৌতাতে চোখজোড়া বুঁজে আসছিলো। চেঁচামেচিতে তার মেজাজ বিগড়ে গেলো। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ধমকে

উঠলো, "রোহি মধু গিলবে, সাদা শুয়োরের কাবাব খাবে শয়তানের বাচ্চার
এখন পর্যন্ত বুড়ী বেঙসান্থটা এলো না বউপণের বর্শা নিয়ে। ইদিকে ভোজ
গিলবার জন্যে চেঁচিয়ে টেফঙেরা পাহাড় ফাটাচ্ছে। এখন আমি কী করি
বেঙসান্থটার গলা টিপে এখানে নিয়ে আসবো না কি ?"

কয়েকটা গলা ফিসফিস করে ফুটেই বাতাসে মিলিয়ে গেলো।

"সর্দারটা একটা আস্ত সাসুমেচু (অত্যন্ত লোভী মানুষ)।"

জনকয়েক অস্ফুট শব্দ করে সায় দিলো, "হু-হু--"

"শত্তুরদের মেয়েটাকে নিজের ধরম-মেয়ে বানিয়ে শয়তানটা বউপণ
বাগাচ্ছে।"

"এখন যদি সেঙাই থাকতো, মজাটা জমতো ভালো। ছোঁড়াটা আজও
ফিরলো না কোহিমা থেকে।"

আচমকা জোয়ান-জোয়ানীরা খুশী গলায় হল্লা করে উঠলো, "হুই তো
হুই তো সেঙাইর ঠাকুমা আসছে।"

"কই ? কই ?" সকলকে ধাক্কা মেরে, গুঁতিয়ে, মেয়েপুরুষের জটলাকে
লণ্ডভণ্ড করে সামনের দিকে এগিয়ে এলো বুড়ো খাপেগা। তার লোলুপ
চোখজোড়া জ্বলছে।

সামনের বড় টিলাটা পেছনে রেখে খাপেগার কেসুঙে চলে এলো বুড়ী
বেঙসানু। তার কাঁধে এক রাশ খারে বর্শা। বেঙসানুর পেছনে নাতি
নাতনী দুটোও রয়েছে। ফাসাও এবং নজলি। তাদের পেছন পেছন
এসেছে ওঙলে। তার কাঁধে খানকয়েক আধুনিক গড়নের বর্শা। বুড়ী
বেঙসানু একলা একলা এত বর্শার বোঝা নিয়ে আসতে পারবে না। তাই
সকাল বেলায় ওঙলেকে বেঙসানুর কাছে পাঠিয়েছিলো খাপেগা।

বর্শাগুলোর দিকে তাকিয়ে ঘোলাটে চোখজোড়া জ্বলতে লাগলো খাপেগার
গদগদ গলায় বললো, "আয়, আয় বেঙসানু। কী খাবি বল ? রোহি মধু
না শুয়োরের কাবাব। না ঝলসানো হরিণের মাংস ?"

"না না, অত খাতিরের দরকার নেই। বউপণ এনেছি। তাই নিয়ে নে
তুই তো একটা সাসুমেচু (ভয়ঙ্কর লোভী মানুষ)। পরের মেয়েকে কয়েকদিন
পুষে তার যৌবনের দর হেঁকেছিস দশটা খারে বর্শা। কী আর করি
মেয়েটাকে দেখে চোখ মজেছে, মেয়েটার গুণ দেখে মন নরম হয়েছে। কী
আর করি !" নির্লোম ভুরু দুটো কুঁচকে বেঙসানু তাকালো।

"হু-হু।" দুটি মাত্র শব্দ করে চুপ হয়ে গেলো বুড়ো খাপেগা। শুধু ঘন ঘন মাথা ঝাঁকাতে লাগলো।

"তা ছাড়া সেঙাই ওকে বিয়ে করতে চায়। দুজনে দুজনের পিরীতের মানুষ। তাই এই খারে বর্শা দিয়ে বউপণ দিলুম। এই খারে বর্শা আমার বাপ আমার বিয়ের সময় পেয়েছিলো আমার শ্বশুরের কাছ থেকে। সেঙাইর ঠাকুরদা পেয়েছিলো—" পুরনো কেচ্ছা টেনে আনলো বুড়ী বেঙসান্থ।

"হু-হু—" সমানে মাথা দুলিয়ে চলেছে বুড়ো খাপেগা, "সে সব আমি জানি বেঙসান্থ।"

কেসুঙের চারপাশে খুশী-খুশী চিৎকার, "ভোজ দে, রোহি মধু দে—"

"ও সদ্দার, শুয়োরের কাবাব দে—"

"থাম শয়তানের বাচ্চারা—" খেঁকিয়ে উঠতে গিয়ে ভাঙা ক্ষয়া দাঁতে হেসে ফেললো বুড়ো খাপেগা, "আজ যদি সেঙাইটা থাকতো। ওর বিয়ে, অথচ ছোঁড়াটা জানতেই পারলো না।"

তেরছা চোখে খাপেগাকে দেখতে দেখতে বেঙসান্থ বললো, "তা হলে কোহিমা থেকে সেঙাইটা ফিরলেই বউপণ নিস। আজ থাক।"

তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো খাপেগা। কাঁপা খোশামুদির গলায় বললো, "হু-হু, কী যে বলিস বেঙসান্থ! সেঙাই আসার আগেই বউপণের ল্যাঠা চুকিয়ে রাখ। এলেই বিয়ে হবে।"

কুৎসিত মুখভঙ্গি করে বেঙসান্থ চেঁচালো, "বউপণ বাগাবার জন্যে তর আর সইছে না শয়তানের।"

খাপেগা মাথা নাড়লো, "হু-হু—"

একটু ক্ষণ চুপচাপ।

বুড়ী বেঙসান্থর কোঁচকানো মুখখানায় রহস্যময় হাসি ফুটলো, "শয়তানটা এসে একেবারে তাজ্জব বনে যাবে। মেহেলী তার বউ হবে। খুশিতে টেফঙটা আবার সাবাড় না হয়ে যায়! সে যাক। তেলেঙ্গা সু মাসেই ছোঁড়াছুঁড়ির বিয়ে দিয়ে দেবো।"

"হিঃ-হিঃ-হিঃ—" অমানুষিক গলায় হেসে ফেললো বুড়ো খাপেগা।

"হু-হু, অনেক বেলা হয়েছে। দুপুর পেরিয়ে গেলো। এবার তা হলে বউপণের বর্শাগুলো হিসেব করে গুণে নে।"

"হু-হু।" মাথা ঝাঁকালো বুড়ো খাপেগা। তার দুটো ঘোলাটে চোখ

লোভে আনন্দে জলজল করতে লাগলো। কোনদিনই কি সে ভেবেছিলো, সালুয়ালাঙ গ্রামের শত্রুপক্ষের মেয়েটা নগদ এতগুলি খারে বর্শার বউপণ নিয়ে তার ঘরে আসবে? ভাবলো, সালুয়ালাঙের সঙ্গে তিনপুরুষের শত্রুতা এবার মিটিয়ে ফেলবে কি না।

রূপকথার মত অপরূপ। কি তার চেয়েও অনেক বেশি বিস্ময়কর। বুড়ো খাপেগার কেসুঙের ঠিক পেছনেই বিশাল একটা টিলা। তার গায়ে ইতস্তত ছড়ানো গোটা কয়েক খাসেম গাছ, আতামারী লতা আর রিলুক কাঁটার ঝাড়। দুর্গম কাঁটাবন ফুঁড়ে দুটো মানুষ বেরিয়ে এলো। সেঙাই আর সারুয়ামারু। সরাসরি বুড়ো খাপেগার কেসুঙের সামনে এবড়ো খেবড়ো চত্বরটায় এসে দাঁড়ালো।

প্রচণ্ড বিস্ময়ে প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলো গ্রামের মানুষগুলো। বিস্ময়ের ঘোরটা কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে একটা আনন্দিত হল্লা তালগোল পাকিয়ে উঠলো।

"সেঙাই এসেছে, সেঙাই এসেছে।"

"সারুয়ামারু এসেছে, সারুয়ামারু এসেছে।"

"কী মজা! কী মজা!"

বুড়ী বেঙসানুর চোখ দুটো খুশিতে চিকচিক করছে। তড়িৎবেগে কালো পাথরখানা থেকে লাফিয়ে ছুটে এলো সে। দুটো শীর্ণ মাসহীন হাত দিয়ে সেঙাইর গলাটা জড়িয়ে বললো, "এতদিন কোহিমাতে কী করলি রে সেঙাই? এই দ্যাখ, তোর বউপণ দিতে এসেছি খাপেগাকে। তোর বাপ সেই সিজিটো শয়তানটা কই? তোর মা মাগী মরেছে না কি?"

প্রথম যখন জীবনের কিছু কিছু স্থূল রহস্য একটু-আধটু বুঝতে শিখলো সিজিটো, নিজের শরীরটার একটা উৎকট দাবি সম্বন্ধে স্পষ্ট এবং প্রবল আলোড়ন জাগলো মনে, ঠিক তখনই মোরাঙের নারীহীন বিছানায় তাকে শুতে পাঠিয়েছিলো বুড়ী বেঙসানু। আর সেদিন থেকেই তার সঙ্গে সম্পর্কটা শিথিল হয়ে গিয়েছে বুড়ী বেঙসানুর।

সিজিটো কেমন এক ধরনের বিচিত্র মানুষ। এই পাহাড়, এই উপত্যকা, এই বুনো মালভূমি থেকে পালিয়ে নিরালায় বসে বসে কী যেন ভাবতো। তার চোখদুটি কেলুরি বস্তি ডিঙিয়ে, ছয় আকাশ আর ছয় পাহাড় পেরিয়ে অহরহ কী যেন খুঁজে বেড়াতো। তার হদিস পেতো না বুড়ী বেঙসানু।

কিন্তু যেদিন কোহিমা গিয়ে পাদ্রীসাহেবদের মন্ত্র কানে নিয়ে সিজিটো বস্তিতে ফিরে এলো, সেদিন থেকেই ব্যবধান আরো বাড়লো। কী বুদ্ধিই যে দিলো পাদ্রীরা! ঘন ঘন শহরে যেতো সিজিটো। এত বদলে গেলো যে, সমস্ত বোধ, বুদ্ধি এবং অসংখ্য বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে তার নাগাল পেতো না বেঙসান্থ। বেঙসান্থর কাছে সিজিটো দুর্বোধ্য, অস্পষ্ট, ধরাছোঁয়া-যায়-না এমন এক রহস্য হয়েই রইলো। সহজ মানুষ বেঙসান্থ তার বুনো মন দিয়ে শহুরে সিজিটোর পরিবর্তনের মাপ নিতে হিমসিম খেয়ে সে চেষ্টাই ছেড়ে দিলো।

কিন্তু এসব সত্ত্বেও একটা বিস্ময় ছিলো। যেদিন সারুয়ামারুর বউ জামাতসুর বিছানায় উঠে নিজের পাহাড়ী রক্তের আদিমতার প্রমাণ দিলো সিজিটো, সেদিন জামাতসুর ইজ্জতের দাম দিতে দিতে বুড়ী বেঙসান্থর মনে হয়েছিলো, সিজিটো দুর্বোধ্য নয়, অস্পষ্ট নয়। সে তারই ছেলে। বড়ই আপনার। অত্যন্ত কাছের মানুষ। একটুও বদলায় নি সে। কিন্তু নাঃ, সিজিটো সুদূরই রয়ে গেলো। পরের বউএর ইজ্জত নিয়ে লড়াই বাধাবে, বর্শা দিয়ে মানুষ গাঁথবে, দু-চারটে মুণ্ডু ধড় থেকে খসে পড়বে। তা নয়, এই পাহাড়ের চিরাচরিত রীতিকে অপমান করে একটা ভীরু কুত্তার মত কোথায় পালিয়ে গেলো শয়তানটা!

প্রবল বিতৃষ্ণায় সামান্য খোঁজখবর নিয়েই সিজিটোর প্রসঙ্গকে বরবাদ করে দিলো বুড়ী বেঙসান্থ। বললো, "তোর বউপণ দিতে এসেছি সেঙাই।"

"বউপণ দিতে এসেছিস!" দপ করে জ্বলে উঠলো সেঙাই, "মেহেলী ছাড়া অন্য কোন মাগীকে আমি বিয়ে করবো না। সে হলো আমার পিরীতের জোয়ানী। খবরদার!"

"বিয়ে করবি না! তোকে করতেই হবে।" মিটিমিটি চোখে তাকিয়ে রঙ্গ করতে লাগলো বুড়ী বেঙসান্থ।

"আমি করবো না, সিধে কথা। বেশি ফ্যাকর ফ্যাকর করবি না ঠাকুমা। বর্শা দিয়ে সাবাড় করে ফেলবো। হু-হু।" হুমকে উঠলো সেঙাই। ফোঁস ফোঁস করে বার কয়েক শব্দ করলো।

সারুয়ামারু একপাশে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলো। এবারে সে বললো, "এটা কেমন কথা। মেহেলীর সঙ্গে সেঙাইর পিরীত। এই পাহাড়ের সবাই সে খবর জানে। সেঙাই কোহিমা গিয়ে ফাদারকেও বলে এসেছে। অন্য মাগীর সঙ্গে তার বিয়ে দেওয়া চলবে না।"

"চলবে তো।" নির্বিকার গলায় বুড়ী বেঙসাঙ্গু বললো।

"খবরদার!" গর্জে উঠলো সেঙাই।

কিছু একটা ঘটে যেতো। ভয়ঙ্কর একটা কিছু। তাজা পাহাড়ী রক্ত বুড়ো খাপেগার কেস্থুণ্ডটা রাঙিয়ে দিতে পারতো। কিন্তু তার আগেই কেলুরি গ্রামের মানুষগুলো আকাশ ফাটিয়ে কলরব করে উঠলো। এতক্ষণ তারা চুপচাপ বসে বুড়ী বেঙসাঙ্গু এবং সেঙাইর রঙ-তামাশা উপভোগ করছিলো।

কেস্থুণ্ড-কাঁপানো কোলাহল। কেলুরি গ্রামের কুমারী জোয়ানীরা আর জোয়ান ছেলেরা সমস্বরে বললো, "মেহেলীর সঙ্গেই তোর বিয়ে হবে রে সেঙাই। তোর ঠাকুমা মস্করা করছে।"

"মেহেলীর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে!" নিজের গলাটা নিজের কানেই কেমন যেন বেখাপ্পা শোনালো সেঙাইর। কেমন যেন অবিশ্বাসী।

"হু-হু—" খুশী গলায় সকলে সায় দিলো, "সেই জন্যেই তো বউপণ নিচ্ছে সদ্দার।"

এক টুকরো কুটিল সন্দেহে সেঙাইর মনটা কালো হয়ে গেলো। বললো, "মেহেলী তো সালুয়ালাঙ বস্তির মেয়ে। তার জন্যে আমাদের বস্তির সদ্দার কেন বউপণ নেবে? বউপণ নেবে তো মেহেলীর বাপ।"

"তুই জানিস না। যেদিন তুই কোহিমা চলে গেলি, সেদিনই মেহেলী আমাদের বস্তিতে পালিয়ে এসেছে।" কনুই দিয়ে ভিড় ঠেলে পথ করতে করতে সামনে এগিয়ে এলো ওঙলে। কেমন করে মেহেলী এ গ্রামে এলো, কেমন করে বুড়ো খাপেগার সঙ্গে ধরমবাপ সম্পর্ক পাতালো, তারপর সেঙাইর প্রতীক্ষায় দিনের পর দিন কেমন করে কাটাচ্ছে, তার নিখুঁত সরস এবং আদ্যন্ত বিবরণ দিলো।

বিস্ময়ে আর আনন্দে চোখের মণি দুটো ঝিকমিক করে উঠলো সেঙাইর। এই মুহূর্তে তার অস্ফুট চেতনায় সমস্ত পাহাড়ী পৃথিবীটা আশ্চর্য সুন্দর হয়ে গিয়েছে। বড় ভালো লাগছে দুপুরশেষের গেরুয়া রোদ। কুমারী জোয়ানীদের ফুলসাজ ভালো লাগছে। ভালো লাগছে ওঙলেকে। এমন কি এই বিশেষ নিমেষের জাদুতে বুড়ো খাপেগা আর বেঙসাঙ্গুর ভাঙা বাঁকা কদাকার মুখ দুটোও সুন্দর দেখাচ্ছে। সমস্ত দেহের পেশীগুলিকে এবং তাজা রঙদার মনটাকে আলোড়িত করে সুখের শিহরণ খেলে যেতে লাগলো সেঙাইর।

আবিষ্ট গলায় সেঙাই বললো, "বলিস কী? মেহেলী কোথায়?"

জবাবটা এবার আর ওঙলে দিলো না। সামনে এগিয়ে এলো বুড়ো খাপেগা। ফোকলা মুখে কৌতুকের স্বর বাজাতে বাজাতে সে বললো, "কী রে শয়তানের বাচ্চা, ইজা হুবুতা! খুশিতে যে ডগমগ। পছন্দের মাগীকে পাবি। বিয়ের কথা শুনে তো ফোঁস করে উঠেছিলি।"

অন্য দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। নির্দিষ্ট একটা লক্ষ্যে সেঙাইর মনোযোগ স্থির হয়ে রয়েছে। সে বললো, "মেহেলী কোথায়? তাকে দেখবো।"

"মেহেলী ভেতরের ঘরে মাচানে শুয়ে রয়েছে। তার সঙ্গে এখন দেখা হবে না তোর।"

"কেন? আমার বউর সঙ্গে দেখা করবো তো।"

"বিয়ে না হতেই বউ!" কুৎসিত মুখভঙ্গি করলো বুড়ো খাপেগা, "মেহেলী এখনো তোর বউ হয় নি। ও এখন আমার ধরমমেয়ে। এখন ওর সঙ্গে দেখা হবে না, সিধে কথা।"

"হু-হু।" অসহ্য হৃদয়াবেগকে দুটি শব্দের মধ্যে মুক্তি দিলো সেঙাই, "আচ্ছা।"

কেসুঙের বাইরে এবড়োখেবড়ো পাথুরে চত্বর থেকে একটা বড় চেনা চেনা গলার স্বর ভেসে আসছে। সে স্বরে দুনিয়ার সব সুস্বাদ, সব আনন্দ যেন মেশানো রয়েছে।

ভেতরের ঘরে বাঁশের মাচানে রোগের তাড়নায় শুয়ে রয়েছে মেহেলী। তার সমস্ত ইন্দ্রিয় দুটি কানের মধ্যে একত্র হয়ে সেঙাইর গলার স্বরটাকে যেন চুমুক দিয়ে শুষে নিচ্ছে। শেষ পর্যন্ত সেঙাই এসেছে। সেঙাইর জন্য গ্রাম ছেড়েছে সে। বাপ-মা-সই-প্রিয়জন-পরিজন সবাইকে ছেড়ে শত্রুপক্ষের গ্রামে পালিয়ে এসেছে। কত প্রতীক্ষা করেছে। সেঙাইর ভাবনায় কত দিনরাত্রি পার করে দিয়েছে।

সেঙাই। নামটা যেন তার বুকে ধুকধুক হয়ে বাজতে শুরু করলো। এই ধারালো এবং নিঃসঙ্গ বাঁশের মাচান থেকে ছুটে সেঙাইর বুকে নিজের তাজা যুবতী দেহটাকে ছুঁড়ে দিতে ইচ্ছা করছে। কিন্তু তার উপায় নেই। তামুন্যুর নিষেধ, মাচান থেকে কিছুতেই ওঠা চলবে না। কী এক উদ্ভট রোগ। গায়ের চামড়ায় অসহ্য তাপ, হাত রাখলে যেন পুড়ে যায়। তামুন্যুর (চিকিৎসক) নির্দেশে ভাত-মাংস খাওয়া পর্যন্ত বন্ধ হয়েছে।

সেঙাইর কাছে যাবার প্রবল ইচ্ছাটার তাড়নায় ছটফট করছে মেহেলী। শিরায় শিরায় যেন রক্ত ফুটছে। হতাশায় এবং অদ্ভুত এক যন্ত্রণায় ফোঁস ফোঁস করতে লাগলো সে। ভাবলো, এই ভেতরের ঘর, বাঁশের দেওয়াল, বাইরের ঘর পেরিয়ে যে রুক্ষ পাথুরে চত্বর, সেখানে বসে রয়েছে সেঙাই। তার গলা শুনতে পাওয়া যাচ্ছে। কত সামনে অথচ কত দূরে সেঙাই। তাকে ধরাছোঁয়ার কোন উপায়ই নেই।

এক সময় বউপণ দেওয়া-নেওয়ার পালা শেষ হলো। বাঁশের পানপাত্রে রোহিমধু, কাঠের বাসনে শুয়োরের মাংসের কাবাব সাজিয়ে সকলকে খেতে দিলো খাপেগা।

একমাত্র ভাইপো ওঙলে ছাড়া সংসারে আর কেউ নেই বুড়ো খাপেগার। তাই এই দুর্ভোগ। সকালবেলায় বসে বসে নিজের হাতে কাবাব বানাতে হয়েছে। অবশ্য সারুয়ামারুর বউ জামাতসু এবং গ্রামের কয়েকটি মেয়ে সাহায্য করতে এসেছিলো।

তারিয়ে তারিয়ে রোহিমধু খেতে খেতে কে যেন বললো, "পছন্দের মাগী তো বউ হলো তোর, কী রে সেঙাই ? একটা মাথা কাটা গেলো না, রক্ত পড়লো না পাহাড়ে। স্বোয়াদ পাচ্ছি না এ বিয়েতে। কেমন যেন নিমকছাড়া!"

"হু-হু," মাথা ঝাঁকালো বুড়ো খাপেগা, "বিয়ের আমোদে ঢিলে দিলে চলবে না। কখন যে সালুয়ালাঙ বস্তির শত্তুররা বর্শা নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়বে, তার কি কিছু ঠিক আছে ? ওরাও তো পাহাড়ী, ওদের মেয়েকে আমাদের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিচ্ছি। সহজে কি ছাড়বে ? লড়াই একটা বাধবে বলেই মনে হচ্ছে।"

"হু-হু, আমাদের তৈরী থাকতে হবে।" অনেকগুলো গলায় একই ঘোষণা বাজলো।

বুড়ো খাপেগা বললো, "তারপর কোহিমায় কি হলো সেঙাই, সে গল্প বল।"

সেঙাইর মন গন্ধমাতাল মৌমাছির মতো একটা মনোহর মুখের চারপাশে পাক খাচ্ছিলো। সে মুখ মেহেলীর। কোন দিকে, কোন গল্পে, কোন কথায় তার আকর্ষণ নেই। তার সমস্ত মনোযোগ, সকল উৎসাহ একটি মুখকে দেখার জন্য ব্যগ্র হয়ে উঠেছে। ঐ একটি মুখে কত সুখ। কত কুহক। ফিসফিস অন্যমনস্ক গলায় সেঙাই বললো, "কোহিমার কথা অনেক, মোরাঙে বসে রাত্তিরে বলবো।"

চৌত্রিশ

নানকোয়া গ্রাম থেকে রাঙসুঙ সরাসরি এসে উঠলো পোকরি কেসুঙে। সাঞ্চামখাবার বাইরের ঘরে জাঁকিয়ে বসলো। রাঙসুঙের সঙ্গে জনকয়েক জোয়ান ছেলে এসেছে। তাদের হাতে বড় বড় বর্শার ফলাগুলো ঝকমক করছে।

রাঙসুঙ মেজিচিজুঙের বাপ।

সমস্ত কেসুঙটাকে কাঁপিয়ে একটা হুঙ্কার ছাড়লো রাঙসুঙ, "নসু কেহেঙ মাসে বউপণ পাঠালুম। এখনও তোর মেয়ের বিয়ে দিলি না। থারে বর্শাগুলো মেরে দেবার মতলব নাকি? এদিকে আমার ছেলেটা পাহাড়ে বাঘ নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। ঘরে থাকে না।"

"বিয়ে তো দেবো, কিন্তু আমার মেয়েটা যে উধাও হয়েছে।"

"তোর মেয়ে!"

"হু-হু, মেহেলীটা কেলুরি বস্তিতে পালিয়ে গিয়েছে। হুই বস্তির সেঙাইকে বিয়ে করতে চায়।"

"সেঙাইকে বিয়ে করলেই হলো! আমরা আগে মেয়ের বায়না দিয়ে গিয়েছি।" রক্তচোখে তাকালো রাঙসুঙ।

অপরাধী গলায় সাঞ্চামখাবা বললো, "হু-হু, সে কথা তো একশো বার মানি। মেহেলীটা বস্তিতে থাকলে এই মাসেই বিয়ে দিতুম। কিন্তু এখন কী করি, তোরাই বল?"

হুঙ্কারটা এবার আরো জোরালো শোনালো। প্রথমে ধিক্কারে গলাটা দপ করে জ্বলে উঠলো রাঙসুঙের, "তোরা একেবারে মাগীরও অধম। ঘর থেকে মেয়ে কেমন করে পালায়! বর্শা ছিলো না? ফুঁড়ে রাখতে পারলি না!"

"ছিলো। বর্শা হাঁকড়েই তো রাখতে চেয়েছিলাম মেহেলীকে, কিন্তু তার আগেই যে শয়তানের বাচ্চাটা জঙ্গলে ভাগলো।"

"হুঃ!" বিকট শব্দ করে রাঙসুঙ বললো, "তারপর?"

"তারপর সেদিন সন্ধ্যের সময় পলিঙা এসে খবর দিলো, মেহেলী হুই কেলুরি বস্তিতে ভেগেছে। আমরা কি করি বল?" সাঞ্চামথাবাকে বড়ই ম্রিয়মাণ দেখাতে লাগলো।

"হুঃ—" হুস করে আবার একটা লম্বা আওয়াজ করলো রাঙসুঙ। খরধার বর্শার বাজুটা বাগিয়ে ধরলো। বললো, "একেবারে ছাগী হয়ে গেছিস তোরা। কত বড় বংশ তোদের! তোদের বংশের মেয়ে ছিনিয়ে নিতে এসে কেলুরি বস্তির জেভেথাঙ মরেছিলো। মেয়ে নিতে এসে তোদের কাছে কত মানুষ মাথা রেখে গিয়েছে। এমন বনেদী বংশ তোদের! সেই বংশের নামডাক শুনে একটা মেয়ে নিয়ে ছেলের বউ করবো, ভেবেছিলুম।"

"হু-হু, বংশটা আমাদের সত্যিই বনেদী। লোটারা, সাঙটামরা, আওরা, কোনিয়াকরা—এই নাগা পাহাড়ের সব জাতের মানুষই আমাদের বংশকে খাতির করে চলে। কথাটা ঠিকই বলেছিস রাঙসুঙ।" বংশগৌরবে রীতিমত উৎসাহিত হয়ে উঠলো সাঞ্চামথাবা।

রাঙসুঙের মেজাজটা বড়ই বেয়াড়া ধরনের। নিমেষে সাঞ্চামথাবার উৎসাহটা নিবিয়ে দিলো। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হুমকে উঠলো রাঙসুঙ; "থাম থাম, বেশি ফ্যাকর ফ্যাকর করতে হবে না। হুই মুখে মুখেই তোদের বংশের যত কেরামতি। না হলে ঘরের মেয়ে পিরীতের ঠেলায় শত্তুরদের বস্তিতে গিয়ে উঠতে পারে! মাগীটাকে আর ওর পিরীতের ছোঁড়াটাকে কুপিয়ে মুণ্ডু কেটে মোরাঙে ঝুলিয়ে রাখতে পারলি না?"

"হু-হু, কী আর করি বল? কেলুরি বস্তিতে তাগড়া তাগড়া সব জোয়ান ছোকরা রয়েছে। বর্শা কী হাঁকড়ায়! সুচেন্যুর একটা কোপ ঝাড়লে অনিজার বাপের সাধ্যি নেই যে বাঁচায়!" কেমন যেন নিস্তেজ হয়ে পড়লো সাঞ্চামথাবা।

"কী বললি! জানের ভয়ে বস্তির ইজ্জত, বংশের ইজ্জত সব সাবাড় করতে হবে! এমন মরদ তুই! আহে ভু টেলো।" সমস্ত কেসুঙটাকে কাঁপিয়ে, ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ সালুয়ালাঙকে আচমকা ভয় পাইয়ে দিয়ে বীভৎস গলায় গর্জে উঠলো রাঙসুঙ, "ওরে টেফঙের বাচ্চা, তোর মেয়েটার জন্যে যখন বউপণ পাঠিয়েই দিয়েছি, তখন ও আমার ছেলের বউ হয়ে গিয়েছে। আমাদের বস্তি তো বেশি দূর নয়। তিনটে চড়াই আর দুটো খাড়াই পাহাড় পেরুলেই যাওয়া যায়। একটা লোক পাঠিয়ে দিতে পারলি না! পাঁচশো জোয়ান

এনে মাগীটাকে ছিনিয়ে নিয়ে আসতাম। হুই সেঙাই ছোকরাটাকে এনে ওর মাংস দিয়ে কাবাব বানিয়ে খেতাম।"

"হু-হু, ঠিক বলেছিস। এই বুদ্ধিটা তখন ঠিক যোগায় নি। নইলে ঠিক খবর দিতুম। যাক ওসব। তোর মেজাজটা বিগড়ে গিয়েছে। একটু রোহিমধু গিলে মেজাজটাকে চাঙ্গা করে নে।" ভীরু ফিসফিস গলায় সাঙ্কামখাবা বললো।

"হু-হু, তাই নিয়ে আয়। ইজা হুবুতা!" নির্বিকার ভঙ্গিতে গালাগালিটা আউড়ে কটমট করে তাকালো রাঙসুঙ। বললো, "খবরটা শুনে বুদ্ধিটা একেবারে খিঁচড়ে গিয়েছে। মনে হচ্ছে, তোর মুণ্ডুটাই বর্শার মাথায় গিঁথে বস্তিতে নিয়ে যাই।"

"আহে ভু টেলো!" কুৎসিত গলায় খেউড় গেয়ে উঠলো সাঙ্কামখাবা। এতক্ষণ চুপচাপ, ভীরু এবং কুণ্ঠিত হয়ে থাকার পর চিৎকার করে উঠলো সে। তার গলায় যেন বাজ চমকালো, "ওরে টেফঙের বাচ্চা, আমার মুণ্ডু কেটে নিয়ে যেতে এসেছিস!"

"এসেছি তো।" বাদামী পাথরখানা থেকে লাফিয়ে উঠলো রাঙসুঙ। বিরাট মাথাটা ঘন ঘন নড়ছে। দোলানিতে আউ পাখির পালকের অদ্ভুত মুকুটটা দুলছে। পরনে আরি পী কাপড়। নরমুণ্ড, বাঘের মাথা, চিতাবাঘের থাবা, বুনো মোষের শিঙ—পাহাড়ী পৃথিবীর ভয়াল ভীষণতা সেই কাপড়ে আঁকা রয়েছে। ছোট ছোট চাপা চোখে পিঙ্গল রঙের মণিদুটো জ্বলছে। পুরু পুরু কালো ঠোঁট দুটোর ফাঁকে লালচে দাঁতগুলো ভয়ানক ভাবে খিঁচিয়ে রয়েছে। বর্শার হাতলে থাবাটা প্রখর, আরো প্রখর হয়ে বসছে রাঙসুঙের। বর্শার ফলায় হত্যার প্রতিজ্ঞাটা যেন ঝকমক করছে। নানকোয়া বস্তি থেকে আসার আগে সে কি ভাবতে পেরেছিলো, তার থাবার এই বর্শাটার জন্য এমন একটা রক্তের ভোজ এই সালুয়ালাঙ পাহাড়ে অপেক্ষা করছে? রাঙসুঙ প্রচণ্ড শব্দ করে গর্জন করলো, "আজ তোর রক্ত নিয়ে গিয়ে মোরাঙ চিত্তির করবো। আর মুণ্ডু গেঁথে রাখবো টেটসে আনিজার চত্বরে।"

সামনে দাঁড়িয়ে খোঁচা খাওয়া জখমী জানোয়ারের মতো ফুলছিল সাঙ্কামখাবা। উত্তেজনায়, রোষে কোমর থেকে জঙগুপি কাপড়ের বাঁধন শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। শরীরের পেশীতে পেশীতে একটা আদিম অসভ্য ক্রোধ থেকে থেকে ফুলে ফুলে উঠছে। চক্ষের পলকে বাঁশের দেওয়াল থেকে সেও একটা বিশাল সুচেন্যু টেনে নিলো।

মুখোমুখি দুই প্রতিপক্ষ। দুই পাহাড়ী হিংসা। সালুয়ালাঙ আর নানকোয়া বস্তি। সাঞ্চামখাবা আর রাঙসুঙ। একটু আগে তাদের দুজনের মনে একটা মধুর সম্পর্ক পাতাবার কামনা ছিলো। রাঙসুঙ আর সাঞ্চামখাবা পরস্পরের ঘনিষ্ঠ হতে চেয়েছিলো, আত্মীয় হতে চেয়েছিলো। কিন্তু পাহাড়ী মন দ্রুত পরিবর্তনশীল। নিমেষে নিমেষে তার মেজাজ বদলে যায়। এই মুহূর্তে সাঞ্চামখাবা আর রাঙসুঙ দুটি প্রবল প্রতিপক্ষ। পরস্পরের পক্ষে সাঙ্ঘাতিক শত্রু।

পশ্চিম পাহাড়ের চূড়ায় বেলাশেষের রোদ নিবে আসতে শুরু করেছে। উপত্যকা-মালভূমি-বন—সব আবছা, ঝাপসা দেখাচ্ছে। ধূসর রঙের পর্দার নীচে একটু একটু করে তলিয়ে যেতে শুরু করেছে এই ছোট্ট পাহাড়ী জনপদ সালুয়ালাঙ, দূরের নীলদেহ টিজু নদী, আরো দূরের কেলুরি গ্রাম। ছয় আকাশ ছয় পাহাড়ে ঘেরা এই নাগা পাহাড় দৃষ্টির সামনে থেকে একটু একটু করে মুছে যাচ্ছে।

বেলাশেষের খানিকটা ফ্যাকাশে আলো যাই-যাই করেও এখন পর্যন্ত বাইরের ঘরটায় আটকে রয়েছে। সেই আলোতে সাঞ্চামখাবা আর রাঙসুঙের দুজোড়া চোখের মণি দপদপ করে জ্বলছে। আর জ্বলছে একটি সুচেন্যু আর একটি বর্শার খরধার ফলা।

মারাত্মক কিছু একটা ঘটে যেতে পারতো। এই পোকরি কেসুঙটা রক্তে মাখামাখি হতো। কিন্তু তার আগেই সাঁ করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দার। সুচেন্যু আর বর্শার শাণিত ফলায় দুটো নিশ্চিত হত্যার শপথ আচমকা বিচলিত হয়ে গেলো। চমকে উঠলো রাঙসুঙ এবং সাঞ্চামখাবা।

পাথরকাটা রুক্ষ মেঝেতে বসে হুস্ হুস্ করে বার কয়েক নিশ্বাস ছাড়লো বুড়ো সর্দার। হাঁপাতে হাঁপাতে ঘোলাটে চোখে দুজনকে দেখতে দেখতে হাঁ-হাঁ করে উঠলো, "ইজা হুবুতা! এই বিকেলবেলা দুই বেয়াই খুনখারাপি করবি নাকি? কী রে রাঙসুঙ? এই সাঞ্চামখাবা! বর্শা আর সুচেন্যু নামা রে মরদেরা। ওসব দেখলে মেজাজ বিগড়ে যায়।"

"টেমে নটুঙ!" সাঞ্চামখাবা গর্জে উঠলো "তুই এসেছিস সর্দার, খুব ভালো হয়েছে। এই ছাখ না, ছই শয়তানের বাচ্চা রাঙসুঙটা আমার মুণ্ডু নিয়ে যেতে চায়!"

রাঙস্থঙও তারস্বরে চেঁচালো, "কদ্দিন হলো, বউপণ পাঠিয়ে দিয়েছি। এখনও মেয়ে বিয়ে দেবার নাম নেই। খারে বর্শাগুলো গায়েব করার মতলব। মেয়ে না পেলে ওর মুণ্ডু নেবোই নেবো। তুই কী বলিস সদ্দার?"

"হু-হু, সে তো ঠিক কথাই। মুণ্ডু না নিলে মরদের ইজ্জত থাকে।" ঘন ঘন মাথা নেড়ে সায় দিতে লাগলো বুড়ো সর্দার।

ভয়ানক চোখে তাকালো রাঙস্থঙ, "তবে বর্শা হাঁকড়াই সদ্দার?"

হুঙ্কার দিলো সাঞ্চামখাবা, "তুই যখন বলেছিস সর্দার, তখন রাঙস্থঙটার ঘাড়ে একটা স্থচেন্যুর কোপ ঝাড়ি? নানকোয়া বস্তি থেকে এখানে ফুটুনি ফুটোতে এসেছে!"

বিশাল দুখানা হাত দুদিকে বাড়িয়ে দিলো বুড়ো সর্দার! বললো, "থাম শয়তানের বাচ্চারা। নানকোয়া, সালুয়ালাঙ—দু বস্তিতে কতকালের খাতির। কতদিনের দোস্ত আমরা। নিজেদের মধ্যে রক্তারক্তি করলে চলবে কী করে!"

উল্কি-আঁকা বীভৎস মুখ। সেই মুখটায় একটা বিজ্ঞ-বিজ্ঞ ছায়া পড়েছে বুড়ো সর্দারের, "বোস তোরা, অত মুণ্ডু নিতে হবে না। খুব হয়েছে। আমার কথা শোন। মজাদার সব খবর আছে।"

"কী খবর? কিসের খবর?" হল্লা করতে করতে দু পাশে ঘন হয়ে বসলো সাঞ্চামখাবা আর রাঙস্থঙ। বুড়ো সর্দার দুজনের হাত থেকে বর্শা এবং স্থচেন্যুখানা ছিনিয়ে নিলো।

বুড়ো সর্দারের কাছে মনোরম গল্প আছে। গল্প! গল্প! গল্প! পাহাড়ী মানুষেরা এই গল্পের নামে অদ্ভুত এক মৌতাতের সন্ধান পায়।

"হু-হু।" হুন্টসিঙ পাখির পালকের মুকুটটা মৃদু-মৃদু দুলিয়ে বুড়ো সর্দার বললো, "সে সব অনেক খবর, অনেক গল্প। একটু রোহি মধু নিয়ে আয় সাঞ্চামখাবা। গলাটা ভিজিয়ে নিই। সেই সঙ্গে গোটাকয়েক আউ পাখি ঝলসে আনিস। বড় খিদে পেয়েছে। মেজাজটাকে একটু চাঙ্গা করে নিতে হবে। কী বলিস রাঙস্থঙ?"

"হু-হু।" সমস্ত দেহ নাড়িয়ে স্বীকৃতি জানালো রাঙস্থঙ, "আমারও বড় খিদে পেয়েছে। সেই নানকোয়া বস্তি থেকে কখন বেরিয়েছি। অনেক চড়াই-উতরাই ডিঙিয়ে আসতে হয়েছে। পেটটা খিদেতে কামড়াচ্ছে।"

সাঞ্চামখাবা বললো, "আউ পাখি নেই, বনমোরগ আছে।"

"খুব ভালো, খুব ভালো। শিগগির নিয়ে আয়।" লোভে, খুশিতে ঘোলাটে চোখজোড়া জ্বলতে লাগলো বুড়ো সর্দারের।

সাঞ্চামখাবা ভেতরের ঘরে চলে গেলো।

খানিকটা পর বাঁশের তিনটে চোঙা রোহি মধুতে টইটম্বুর করে এবং কাঠের বাসনে কাবাব আর ঝলসানো বনমোরগের স্তূপ সাজিয়ে বাইরের ঘরে চলে এলো সাঞ্চামখাবা। সদ্য ঝলসানো বনমোরগ। ধোঁয়া উড়ছে। লালচে রঙ। রোহি মধুর মাদক গন্ধে সমস্ত পোকরি কেসুঙটা আমোদিত হয়ে উঠেছে। তর সইছে না। বুড়ো সর্দার লাফিয়ে উঠলো। সাঞ্চামখাবার হাত থেকে মাংস আর রোহি মধু ছিনিয়ে নিতে নিতে অস্ফুট লুব্ধ গলায় বললো, "হু-হু, ভালো, খুব ভালো।"

নানকোয়া বস্তি থেকে জনকয়েক জোয়ান ছেলে এসেছিলো রাঙসুঙের সঙ্গে। তারা জঙ্গলের দিকে বেড়াতে গিয়েছে। রাঙসুঙ বললো, "খাবারগুলো শিগগির সাবাড় করে ফেলি। নইলে শয়তানরা এসে ভাগ বসাবে।"

একসময় তিনজনে তরিবত করে রোহিমধু খেতে শুরু করলো। সেই সঙ্গে থাবা থাবা বনমোরগের মাংস মুখে পুরতে লাগলো।

ধারালো নখ দিয়ে একপিণ্ড মাংস ছিঁড়তে ছিঁড়তে বুড়ো সর্দার বললো, "মেহেলীকে এবার কেলুরি বস্তি থেকে ছিনিয়ে আনতে পারবো রে সাঞ্চামখাবা।"

"কেমন করে?" উত্তেজনায় সাঞ্চামখাবার হাতের চোঙাটা থেকে খানিকটা রোহি মধু চলকে পড়লো।

"হু-হু, কোহিমা শহর থেকে ফাদার আসবে, ফাদারের লোক আসবে, বন্দুক আসবে। হু-হু, হুই কেলুরি বস্তির ফুটুনি একেবারে খতম করে দেবো না! আমাদের বস্তির মেয়ে ভাগিয়ে আটক করে রাখে! নখ দিয়ে কলিজা ফেঁড়ে রক্ত খাবো।" বুড়ো সর্দার দরজার কাছে ছুটে গেলো। কেলুরি বস্তির দিকে মুখ করে দাঁত খিঁচিয়ে কুৎসিত ভঙ্গি করে চেঁচাতে লাগলো, "আসছি টেফঙের বাচ্চারা, তোদের সব কটাকে ফুঁড়বো। সব কটার মাথা নিয়ে আসবো।"

"ফাদার আবার কে রে সদ্দার!" রাঙসুঙের দু চোখে অপার বিস্ময়, "বন্দুক কী জিনিস?"

ফাদার, বন্দুক—অপরিচিত দুটি শব্দ, রহস্যময় দুটি নাম। এই মুহূর্তে

অদ্ভুত বিস্ময়কর শব্দ দুটো রাঙসুঙের অস্ফুট পাহাড়ী চেতনাকে আচ্ছন্ন করে ফেললো।

নিজের জায়গায় ফিরে বুড়ো সর্দার বললো, "হু-হু, সব বুঝতে পারবি। আগে তো আমাদের বস্তিতে ফাদারকে নিয়ে আসি। তারপর মেহেলীটাকে কেড়ে আনি কেলুরি বস্তি থেকে, তখন টের পাবি, ফাদার কে? বন্দুক কি?" সহসা গলাটা করুণ এবং ঢিমে হয়ে গেলো, "আমার মেয়েটা তো বেপাত্তা হয়েই রইলো। বাঘের পেটে গেলো, না বুনো মোষের গুঁতোয় সাবাড় হলো, কিছুই বুঝতে পারলাম না। থাক, লিজোমুর কথা এখন থাক। লিজোমু যখন নেই, মেহেলীই আমার মেয়ে। কেলুরি বস্তি থেকে ওকে এনে বিয়েটা দিতে পারলে হয়।" একটা গরম লম্বা নিশ্বাস বুড়ো সর্দারের বুকটাকে ফুঁড়ে বেরিয়ে এলো।

এবার দস্তুরমত উৎসাহিত হয়ে উঠেছে রাঙসুঙ। এবড়োখেবড়ো মেঝের ওপর দিয়ে ভারী দেহটাকে টানতে টানতে বুড়ো সর্দারের কাছে ঘন হয়ে বসলো। বললো, "হু-হু, খুব ভালো হবে। এই তো সেদিন আমার ছেলেটার সঙ্গে বিয়ে দেবার জন্যে সাঞ্চামথাবাকে বউপণ পাঠিয়ে দিলুম। খারে বর্শা, এরি কাপড়, আরুগা, কড়ি আর শঙ্খের কত গয়না দিলুম। তুই ফাদার না কি, তাকে এনে মেহেলীকে ছিনিয়ে আন কেলুরি বস্তি থেকে। কেলুরি বস্তির সঙ্গে লড়াই বাধলে আমরা তোদের দলে থাকবো।

"হু-হু।" গম্ভীর মুখে মাথা নাড়লো বুড়ো সর্দার। বললো, "ঠিক, ঠিক কথা বলেছিস। তোরা আমাদের দলে থাকবি। আমরা তোদের বন্ধু।"

"হু-হু, বন্ধু। একশো বার বন্ধু।" তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো রাঙসুঙ, "তা ছাড়া তোরা আমাদের কুটুম হতে যাচ্ছিস।"

"ভালো কথা বলেছিস রাঙসুঙ, বড় খুশির কথা। মেহেলীকে তোর ছেলের সঙ্গে নির্ঘাত বিয়ে দেবো। সাঞ্চামথাবা বউপণ নিয়েছে। কথার খেলাপ করা কিছুতেই চলবে না। তবে আমার একটা কথা তোকে রাখতে হবে রাঙসুঙ।" ভুরু দুটো কুঁচকে, ঘোলাটে চোখে কুটিল দৃষ্টি ফুটিয়ে বুড়ো সর্দার তাকালো।

"কী কথা?"

"ফাদারকে তোদের বস্তিতে যেতে দিবি তো?"

"নির্ঘাত দেবো, ফাদার আমার ছেলের বউকে কেলুরি বস্তি থেকে এনে দেবে, আর তাকে যেতে দেবো না! তেমন বেইমান আমরা পাহাড়ীরা নই রে সর্দার।"

"বেশ, বেশ। ভালো কথা বলেছিস। দেখিস, তোদের বস্তির কেউ যেন ফাদারকে বর্শা হাঁকড়ে না বসে।"

"কে হাঁকড়াবে? একেবারে জানে খেয়ে ফেলবো না তাকে? আমি হলাম নানকোয়া বস্তির সর্দ্দার। আমার ছেলে মেজিচিজুঙ বাঘমানুষ। সবাই আমাদের ভয় করে। আমরা যা বলবো, তাই হবে। কেউ ওস্তাদি করতে গেলে মোষের মত ছাল উপড়ে ফেলবো।" ক্রুদ্ধ জানোয়ারের মত গর্জে উঠলো রাঙসুঙ।

"ভালো বলেছিস। আরো একটা কথা আছে। সে কথাটাও তোকে রাখতে হবে। তা না হলে তোর ছেলের সঙ্গে মেহেলীর বিয়ে দেবো না।"

"আবার কি কথা!" চোখমুখের ভঙ্গি এবার ভীষণ বিরক্ত হয়ে উঠলো রাঙসুঙের।

"তোদের বস্তির পাশে তো অনেক বস্তি আছে। তাদের সঙ্গে খাতির রেখেছিস তো?"

"হু-হু, সব বস্তির সঙ্গেই আমাদের খাতির আছে। জুকুসিমা বস্তি, পেরুমা বস্তি, ইটিলাক বস্তি, এ ছাড়া আরো অনেক আছে। কিন্তু কেন রে সর্দ্দার?"

"শোন তবে।" যেমন করে গোপন মন্ত্র দেওয়া হয়, ঠিক তেমনি সতর্ক ভঙ্গিতে রাঙসুঙের কানের কাছে মুখটাকে নামিয়ে আনলো বুড়ো সর্দার। বললো, "কোহিমা পাহাড়ে এক ডাইনী আছে, তার নাম হলো গাইডিলিও। খবদ্দার, তার কাছে কেউ যেন না যায়। এই কথাটা খাতিরের লোকদের মধ্যে রটিয়ে দিবি। বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে বলে আসবি। যদি এই কাজটা করতে পারিস, তা হলে তোদের বরাতে অনেক মজা আছে। ফাদারের কাছে অনেক কিছু পাবি। খাবার পাবি, কাপড় পাবি, টাকা পাবি।"

"ডাইনী গাইডিলিও!" বিড়বিড় করে শব্দ দুটো উচ্চারণ করলো রাঙসুঙ। তারপর চেঁচিয়ে বললো, "তাই করবো। বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে হুই কোহিমা পাহাড়ের গাইডিলিও ডাইনীর নাম রটিয়ে দেবো।"

"ভালো, খুব ভালো।" পরম খুশির আবেশে গলাটা জড়িয়ে জড়িয়ে আসছে বুড়ো সর্দারের।

বাইরের আকাশ, ছয় পাহাড়ের উপত্যকা আর বুনো মালভূমি জুড়ে সন্ধ্যা নিবিড় হয়ে নামছে। ঘন হচ্ছে পার্বত্য অন্ধকার। পোকরি কেসুঙের এই

ছোট্ট ঘরখানায় ফ্যাকাশে আলোটুকু নিবে গিয়েছে। তিনটি ছায়াদেহ বড় নিষ্ঠ হয়ে বসেছে।

হিংস্র আনন্দে একজোড়া ঘোলাটে চোখ ময়ালের চোখের মত জ্বলছে। এইমাত্র রাঙসুঙ নামে এক পাহাড়ী সারল্যকে লোভ দিয়ে, লিপ্সা দিয়ে শিকার করে ফেলেছে বুড়ো সর্দার।

পঁয়ত্রিশ

উপত্যকা আর মালভূমি। চড়াই আর উতরাইতে তরঙ্গিত এই নাগ পাহাড়। সেই পাহাড়ের ওপর কয়েক দিনের মধ্যেই নেমে এলো লো শী মাস এলো ফসল বোনার ঋতু। এই শিলাময় পৃথিবীর কঠিন আবরণের নীচে জীবনরসের ধারা বয়ে চলেছে। সে খবর জানা আছে নাগা কৃষাণীদের তারা জানে সেই প্রাণরস লক্ষ শিকড়ের জিভ দিয়ে শুষে শুষে বীজদানা থেকে সবুজ ফসল জন্ম নেবে। প্রাণের মহিমায় পুলকময়ী হয়ে উঠবে পার্বত্য মৃত্তিকা।

লো শী মাস। বীজ বোনার মরশুম। পরিশ্রমের মরশুম। লো শী মাসের এই বীজদানা লো ফু মাসে বিশাল নাগা পাহাড়কে সোনালী লাবণ্যে ভরে দেবে। সেই ফসলের প্রত্যাশায়, অদ্ভুত খুশির মৌতাতে পাহাড়ী মানুষগুলো বুঁদ হয়ে থাকে।

সালুয়ালাঙ গ্রামেও বীজ বোনার ধুম পড়েছে। উপত্যকায় উপত্যকায় শোরগোল শোনা যাচ্ছে। জোয়ান ছেলেরা, যুবতী মেয়েরা ধাপে ধাপে কাটা সিঁড়িক্ষেতে 'বিউলা' ধানের বীজ বুনছে।

লো শী মাসের রোদ আশ্চর্য উজ্জ্বল। বর্শার ফলার মতো ঝকমকে। দীপ্ত পাহাড়ে পাহাড়ে সেই রোদ ছড়িয়ে পড়েছে।

এক সময় সিঁড়িক্ষেতে গানের সুর শোনা গেলো। একই গানে সকলে সুর মিলিয়েছে। পাহাড়ী গান, পাহাড়ী সুর, পাহাড়ী গমক। গানের সুরটা বাতাসে দোল খেতে খেতে দক্ষিণ পাহাড় পেরিয়ে সুদূর আকাশের দিকে উধাও হয়ে যাচ্ছে।

ম্যুখে রেনি হুখেশে লে হো,
হুলে ফুচুলুগি।
এল হো নায়েঙ কোহালুগি লে হো,
আমহু রেমিন্যু !

কয়েকটা জোয়ানী পরস্পরের কাঁধ ছুঁয়ে নাচের ভঙ্গিতে পা ছুঁড়ে ছুঁড়ে আলপথ ধরে এগিয়ে এলো। তাদের সুরেলা গলায় গানের ধুয়ো।

সুলে ফুচুলুগি।

সুলে ফুচুলুগি।

একপাশে একখণ্ড বড় পাথরের ওপর জাঁকিয়ে বসে রয়েছে বুড়ো সর্দার। কোঁচকানো মুখে খুশির ভঙ্গি। মাথা ঝাঁকিয়ে, বিরাট বর্শাটা হাত দিয়ে দুলিয়ে, কখনও উঠে কখনও বসে গানটার তারিফ করতে লাগলো।

এদিক-সেদিক গোটাকয়েক পোষা শুয়োর ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে চরে বেড়াচ্ছে। ধারালো ঠোঁটের ঘায়ে মাটি চিরে বীজদানা খুঁজছে লালঝুঁটি মোরগের ঝাঁক। কিছু খাদ্যের আশায় পাথরের ভাঁজে ভাঁজে হন্যে হয়ে শুঁকে বেড়াচ্ছে পোষা কুকুরেরা।

"হা-আ-আ-হুরে ; ও কে ? কে রে ?" গানের তারিফ থামিয়ে চিৎকার করে উঠলো বুড়ো সর্দার।

সঙ্গে সঙ্গে ফসল বোনার গানটা ফালা-ফালা হয়ে ছিঁড়ে গেলো। সকলে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লো।

একটা জোয়ান বললো, "এটোঙা বলেই তো মনে হচ্ছে রে সদ্দার !"

"এটোঙা !" তড়াক করে বাদামী পাথরখানা থেকে লাফিয়ে উঠলো বুড়ো সর্দার।

এতক্ষণ দক্ষিণ পাহাড়ের চূড়ায় একটা চলমান বিন্দুর মত দেখাচ্ছিলো। একটু একটু করে সেই বিন্দুটা স্পষ্ট, আরো স্পষ্ট হলো। সিঁড়িক্ষেতে এসে একটা পরিচিত মানুষের রূপ নিলো। এটোঙা।

এটোঙার চারপাশে গোল হয়ে দাঁড়ালো সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ান ছেলেমেয়েরা। সকলের চোখে-মুখে বিস্ময়, কৌতূহল এবং কিছুটা ভয় মেশানো কৌতুক ফুটে বেরিয়েছে।

এটোঙার সমস্ত দেহে অদ্ভুত সাজ-পোশাক ঝলমল করছে। নীলচে হাফ প্যান্ট, মাথায় সাহেবী টুপি, সবুজ জামা, কাঁধ থেকে কোমর পর্যন্ত ঝোলানো একটা মণিপুরী ঝোলা। পায়ে পাশুটে রঙের বুট জুতো। প্যান্ট, টুপি শার্ট, জুতো—পাহাড়ী মানুষের জ্ঞানে অভিজ্ঞতায় এই রহস্যময় বস্তুগুলোর অস্তিত্ব নেই। পাহাড়-বন-ঝরনা-সিঁড়িক্ষেত ছাড়া এই সব অদ্ভুত অদ্ভুত জিনিস তারা কোনদিনই দেখে নি। কেউ কেউ ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

আবার অনেকেই সসম্ভ্রম দূরত্ব বজায় রেখে নির্নিমেষ চোখে এটোঙাকে দেখছে।

বুড়ো সর্দার জোয়ান ছেলেমেয়েদের জটলাটাকে কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে ভেঙে-চুরে সামনে এগিয়ে এলো। সালুয়ালাঙ গ্রামের সে-ই সবচেয়ে প্রাচীন মানুষ। প্রাজ্ঞও বটে। জীবনে তার অনেক অভিজ্ঞতা। অনেক কিছু দেখেছে সে। অজস্র ভূয়োদর্শন হয়েছে। কোহিমা শহরে, জুনোবট, মোক-কচঙ এবং আখ্যুনেটিতে এমন সব সাজ-পোশাকের বাহার সে অসংখ্য বার দেখেছে।

বুড়ো সর্দার এটোঙার বুকে একখানা হাত রেখে বললো, "হু-হু, অ্যাদ্দিন তুই কোথায় ছিলি রে এটোঙা?"

মৃদু হাসলো এটোঙা। বললো, "তা অনেক বছর হলো বস্তি থেকে ভেগে-ছিলুম, কী বলিস সর্দার? কতদিন হবে বল দিকি?"

"অত হিসেব জানি না। তবে অনেক বছর তুই বস্তিতে ছিলি না। ছিলি কোথায়? যে অঙ্গামী মাগীটাকে নিয়ে দক্ষিণের পাহাড়ে সাত মাস কাটিয়েছিলি, সেটা গেলো কোথায়?"

"চার বছর ইম্ফলের জেলখানায় কাটালাম। অঙ্গামী মেয়েটাকে তার বাপ নিয়ে গিয়েছে তাদের বস্তিতে। পরে সব বলবো। সে অনেক কেচ্ছা।" একটু থেমে এটোঙা বললো, "আমার বাপ-মা কোথায়? আমাদের কেসুঙটা কোনদিকে? চার বছরে বস্তির অনেক কিছু বদলে গিয়েছে, দেখছি। আমাদের কেসুঙের খবর বল। বাপ-মার খবর দে।"

পাঁজরটা চুরমার করে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো বুড়ো সর্দারের, "তোদের কেসুঙ কি আর আছে? সেবার পাহাড়ে সুঙকেনি (ভূমিকম্প) হলো। পাথর চাপা পড়ে তোদের ঘর গুঁড়ো-গুঁড়ো হয়ে গেলো। একটা খাসেম গাছের তলায় পড়ে তোর বাপ-মা চ্যাপটা হলো। সবই বরাত। তোদের অতবড় বনেদী নগুসোরি বংশটা একেবারে লোপাট হয়ে গেলো। আর তোরও কোন পাত্তা নেই।"

"হু-হু, ভালোই হলো। দুনিয়ার সব লোপাট হয়ে যাওয়াই ভালো। বল্ দিকি, বাপ-মা কেমন করে চ্যাপটা হয়েছিলো। ছবিটা এঁকে নি।" ক্ষিপ্র হাত চালিয়ে মণিপুরী ঝোলার মধ্য থেকে খানকয়েক সাদা কাগজ আর সরু পেন্সিল বার করলো এটোঙা।

"ছবি! ছবি কী হবে!' কৌতূহলে এবং আগ্রহে আরো কাছে এগিয়ে এলো বুড়ো সর্দার।

"হু-হু, সব দেখবি।" গম্ভীর মুখে এটোঙা বললো।

চারপাশ থেকে জোয়ান-জোয়ানীরা আরো ঘন হয়ে এসেছে। সকলে সমস্বরে চেঁচামেচি শুরু করে দিলো, "তোর হাতে ওগুলো কি রে এটোঙা?"

"এগুলোর নাম হলো কাগজ আর এটার নাম হলো পেন্সিল। এইবার ছাখ কী করি? আমার বাপ-মা আতামারী গাছ চাপা পড়ে মরেছিলো তো! ছাখ, ছাখ—" সাদা কাগজের ওপর কালো পেন্সিলের দাগে একটা গাছ-চাপা বিধ্বস্ত পুরুষ এবং নারীর ছবি ফুটিয়ে তুললো এটোঙা। সামনের দিকে কাগজটা বাড়িয়ে দিয়ে বললো, "কী রে সর্দার, অনেকটা এই রকম না?"

"হু-হু!" মাথা ঢুলিয়ে, সমস্ত দেহটা ঝাঁকিয়ে ছবিটার তারিফ করলো বুড়ো সর্দার। সাদা কাগজ এবং পেন্সিলের কয়েকটি নগণ্য টানেটোনে এমন ভেলকি যে লুকিয়ে থাকতে পারে, এ কথা ভেবে সে একেবার তাজ্জব বনে গেলো। সালুয়ালাঙ গ্রামের সবচেয়ে পুরনো মানুষ সে। হিসেবহীন বয়সের জীবনে অনেক কিছুই দেখেছে কিন্তু এমনটি দেখে নি। সম্ভ্রমে, বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলো বুড়ো সর্দার।

কিন্তু একটু পরেই বিস্ময়ের ঘোর কেটে গেলো। ভুরু দুটো কুঁচকে গেলো। সন্দেহ-ভরা দৃষ্টি দিয়ে এটোঙার দেহটা ফুঁড়ে তন্নতন্ন করে কি যেন খুঁজলো। ভাবতে লাগলো, এই চারটে বছরে কোনো ডাইনীর কাছ থেকে এই ভোজ-বাজি শিখে এলো নাকি এটোঙা!

চারপাশের জোয়ান ছেলেমেয়েরাও চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে। লো শী মাসের এই উজ্জ্বল রোদের দিন এমন একটা মজাকে তাদের সালুয়ালাঙ গ্রামে নিয়ে আসবে, তা কি তারা জানতো?

"হু-হু, হুই ইম্ফলের জেলখানায় একটা মণিপুরীর কাছ থেকে এই ছবি আঁকা ভালো করে শিখেছি রে সর্দার। মণিপুরীটার নাম থাম্বাল সিং। আমার চেয়ে থাম্বাল অনেক সুন্দর ছবি আঁকে।"

অদ্ভুত এক কাহিনী শুরু হলো। এটোঙা গল্প আরম্ভ করলো। বিচিত্র গল্প। সে গল্প এটোঙার চার বছরের অজ্ঞাত এবং রহস্যময় জীবনের নেপথ্যের গল্প। ইম্ফলের জেলখানার চার-চারটে বছর বাদ দিয়েও একুশ বছরের একটা বিপুল অতীত আছে এটোঙার। সালুয়ালাঙ গ্রামের মানুষদের সেই একুশ

বছরের অতীত সম্বন্ধে যতটা ধারণা আছে, তার চেয়ে রয়েছে অনেক বেশি বিস্ময়। অনেক বেশি কৌতূহল এবং আগ্রহ। এই রহস্যময় মানুষটা সম্বন্ধে তারা বিশেষ কিছুই জানে না। এই না-জানার ফাঁকটুকু বুনো মনের অস্ফুট কল্পনা দিয়ে ভরিয়ে তুলতে না পেরে তারা হিমসিম খায়।

এখন যেখানে খোখিকেসারি কেসুঙ, ঠিক তার পাশ থেকেই পাটল রঙের বিরাট একখণ্ড পাথর খাড়া উঠে গিয়েছে। সেই পাথরের মাথাটা সমতল, সেখানে ঘন ওক-বন ছিল এক কালে। জায়গাটা নিঝুম, শান্ত। ওক বনের ঠাণ্ডা ছায়ায় ছিল নগুসোরি বংশের বাড়ি। সোনালী খড়ের চাল, মোটা মোটা ইজুম বাঁশের দেওয়াল, এবড়ো-খেবড়ো মেঝে। এই ঘরেই একদিন বুনো মায়ের কামনা এবং পাহাড়ী বাপের আদিম পৌরুষ রক্তে মিশিয়ে জন্ম নিয়েছিলো এটোঙা।

কবে, কোনদিন এই পাহাড়ী পৃথিবীর ছোঁয়া প্রথম পেয়েছিলো, বুক ভরে এর বাতাস নিয়েছিলো, সে কথা অন্য দশটা জোয়ানের মত তারও মনে নেই।

মায়ের কোল থেকে একদিন মাটিতে নামলো এটোঙা। একটু একটু করে তার বিচরণের সীমানা বড় হতে লাগলো। এই পাহাড়ের আলো-বাতাস-রোদ, বন-ঝরনা-উপত্যকা থেকে কণায় কণায় প্রাণরস গ্রাস করলো।

শিশু এটোঙা থেকে কিশোর এটোঙা। তারপর যৌবন এলো। পেশী সবল হলো। চামড়ায় চিকণ আভা ফুটলো। মনের মধ্যে বয়সের ধর্ম তার কতকগুলো স্থূল দাবির জানান দিয়ে গেলো। এটোঙার দেহমনের কোষে কোষে জন্ম নিলো এক রূপময় বুনো জোয়ান।

কিন্তু আশ্চর্য! সালুয়ালাঙ গ্রামের অন্য জোয়ানদের থেকে সে আলাদা। একেবারেই স্বতন্ত্র। মোরাঙের বাঁশের মাচানে সকলের সঙ্গে সে-ও পাশাপাশি শোয়। অবিবাহিত জোয়ান ছেলের অবশ্য পালনীয় প্রথাগুলিকে মেনে চলে। দেহমনকে পাপের গ্রাস থেকে বাঁচাতে নারীর লালসা এবং রিপু থেকে রক্ষা করতে মোরাঙ হলো সবচেয়ে নিরাপদ জায়গা। অন্যান্য ছেলেরা পাশাপাশি শুয়েছে, তাদের গরম নিশ্বাস পড়েছে গায়ে। তবু ভুল করেও কোনদিন তাদের সঙ্গে রসরঙ্গ কি তামাশার কথা বলতো না। পারতপক্ষে মোরাঙে রাত্রি কাটাবার সময় ছাড়া তাদের কাছে ঘেঁষতো না। মোট কথা, সকলকে এড়িয়ে চলতো এটোঙা। নিজের চারপাশে একটা দুর্জ্ঞেয় রহস্য সৃষ্টি করে রাখতো।

এই বন্য জীবনের আশা-নিরাশা, এই পাহাড়ী পৃথিবীর ভয়াল ভীষণতা সম্পর্কে কোন মোহই ছিলো না এটোঙার মনে। কৌতূহলও নয়। লম্বা বর্শা বাগিয়ে ঘন বনে বাঘ কি হরিণ শিকার করতে কোনদিনই সে যেতো না। মোরাঙের সামনে অগ্নিকুণ্ড জ্বালিয়ে বুনো মোষ ঝলসে সকলের সঙ্গে আধপোড়া মাংস খাবার উৎসাহ ছিলো না তার। শত্রুর মুণ্ডু কেটে আনার পর সমস্ত গ্রামে যে আদিম উল্লাস জাগতো, হুল্লোড় হতো, তার মধ্যে কোনদিন নিজেকে একাকার করে মিলিয়ে দিতে পারে নি এটোঙা।

এটোঙার বাপ রিজিমাখুঙ দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে গর্জে উঠতো, "তুই কী হয়েছিস বল দিকি? শিকারে যাবি না, সিঁড়িক্ষেতে বীজদানা বুনতে যাবি না, মোষ বলির সময় মোরাঙে থাকবি না, কারো বাড়ি ভোজ খেতে যাবি না, আবাদ করবি না; তা হলে কী করে কী হবে? আমাদের এতবড় নগুসোরি বংশ! দু-চারটে শত্রুর মুণ্ডু কেটে না আনলে ইজ্জত থাকে না! একটা ব্যাঙ মারতে পারিস না তো শত্রুর মুণ্ডু! আমাদের সব ইজ্জত তুই ডোবাবি।"

"আমি ওসব পারবো না।" চক্ষের পলকে সামনে থেকে উধাও হয়ে যেতো এটোঙা।

"একটা টেফঙের বাচ্চা। আহে ভু টেলো।" চাপা-চাপা চোখদুটো জ্বলে উঠত রিজিমাখুঙের, "শয়তানটাকে পেলে কুপিয়ে কুপিয়ে সাবাড় করবো। হু-হু।" ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে একটা বর্শা বাগিয়ে এটোঙাকে ধাওয়া করতো রিজিমাখুঙ।

তিনটে ঢেউখেলানো চড়াই আর ছোট ছোট দুটো পাহাড় পেরিয়ে রোজ সকালে দক্ষিণের পাহাড়ে চলে যেতো এটোঙা। একখানা বাদামী রঙের পাথরের ওপর বসে দুটি মুগ্ধ চোখের দৃষ্টি দিয়ে পাহাড়ের বড় ভয়ঙ্কর অথচ সুন্দর রূপটি শুষে নিতো। নিচে, অনেক নিচে আঁকাবাঁকা টিজু নদী গর্জে গর্জে বইতো। আকাশে খণ্ড ছিন্ন সোনামুখি মেঘ ভেসে বেড়াতো। আতামারী ঝোপের ফাঁকে হরিণের চোখ দেখা যেতো। কোথায়ও ভয়ানক প্রস্রবণ। কোথায়ও নিঃশব্দ ঝরনা। সব মিলিয়ে এই পাহাড়, এই নদী-ঝরনা-বন-উপত্যকা, এই নিসর্গ এটোঙার অর্ধস্ফুট বন্য চৈতন্যে দুর্বার আবেগে রিমঝিম করতো। দক্ষিণের এই পাহাড়-চূড়া প্রতিদিন কী এক ভালো-লাগার নেশায় মাতিয়ে তাকে টেনে আনতো।

এক সময় সকাল পেরিয়ে যেতো। রোদ ঝকঝকে হতো। সামনের বন

থেকে বুনো কলা আর টক-টক আখুশি ফল ছিঁড়ে খেতে শুরু করতো এটোঙা। পাহাড় থেকে যখন দিনের রঙ মুছে যেতো, আবছা অন্ধকারে ঢেকে যেতো নাগা পাহাড়, তখন গ্রামে ফিরতো এটোঙা। এ একেবারে নিয়মিত। এ নিয়মের ব্যতিক্রম ছিলো না।

খাড়া খাড়া বাদামী পাথরের দেওয়াল। আশ্চর্য! একদিন নিজের অজান্তেই সেই পাথরের দেওয়ালে এক টুকরো নুড়ি দিয়ে দাগ কেটে কেটে টিজু নদী আঁকলো, আঁকলো সম্বরের মাথা, আতামারী বন। তারপর ছবিগুলোর দিয়ে তন্ময় হয়ে তাকিয়ে রইলো।

নিজের উদাস মনটার মধ্যে শিল্পের যে আবেগটি সঙ্গোপনে লুকিয়ে ছিলো, তার প্রকাশ দেখতে পেয়ে মোহিত হয়ে গেলো এটোঙা।

এর পর থেকে অদ্ভুত নেশায় পেয়ে বসলো এটোঙাকে। খাড়া খাড়া পাহাড়ের গায়ে নরম নুড়ি দিয়ে দেগে দেগে নদী-বন-পশু-পাখি আঁকতে লাগলো। রাশি রাশি ছবির অক্ষরে নিজের আবেগকে মূর্তি দিলো এটোঙা।

এই সব ছবি, নিজের মধ্যে শিল্পীকে খুঁজে পাওয়ার আমোদ, সুন্দর আকাশ-পাহাড়, এগুলো বাদ দিয়ে আরও একটা বিস্ময় ছিলো। আজও সেই বিস্ময়কর বিকেলটা শিরায়, স্নায়ুতে এবং রক্তে রক্তে কাঁপে এটোঙার। ভালো লাগে। খুব ভালো। মন, এই সতেজ সবল শরীর ঝিমঝিম করে।

দক্ষিণ পাহাড়ের চড়াইতে অঙ্গামীদের বিরাট গ্রাম সাঙ্খ্‌বট। জঙ্গলের মধ্য দিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এবং টক আখুশি ফল খেতে খেতে সাঙ্খ্‌বট গ্রামের বুড়ো সর্দারের মেয়ে পাহাড়ের চূড়ায় এসে পড়েছিলো। মুগ্ধ বিস্মিত চোখে খাড়া পাথরের গায়ে নদী-বন-ঝরনার ছবি দেখছিলো।

বিশাল উপত্যকাটা বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে উঠতে এটোঙার ছোট ছোট চাপা চোখজোড়া মোহিত হয়ে গিয়েছিলো। দক্ষিণ পাহাড়ের চূড়ায় শেষ বেলার আমেজী রোদে উজ্জ্বল তামাটে রঙের একটি যুবতীর দেহ দাঁড়িয়ে রয়েছে। সেদিনের সেই বিকেল এমন একটা সুন্দর মোহ নিয়ে তার জন্য যে অপেক্ষা করছিলো, তা কি আগেভাগে জানতো এটোঙা? অবাক, নির্নিমেষ—কিছু সময় দাঁড়িয়ে রইলো সে। একটু পরে এই আবেশের ভাবটা কেটে গেলে মনের মধ্যে সন্দেহ উঁকি মারলো। মেয়েটা কে? তাদের সালুয়ালাং বস্তিতে কোনোদিন একে তো দেখে নি! কী জন্য, কী মতলব নিয়ে এসেছে মেয়েটা, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না।

নিমেষে মন থেকে সন্দেহটা ঝেড়ে সামনের বড় টিলাটা বেয়ে চূড়ায় উঠে এলো এটোঙা। মেয়েটার কাছ থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে দাঁড়ালো। বললো, "কে তুই ?"

চমকে বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো মেয়েটা। তীক্ষ্ণ অবিশ্বাসী দৃষ্টিতে এটোঙার সমস্ত দেহ ফুঁড়ে হাড়-মজ্জা-স্নায়ু এমন কি তার ভাবনা এবং চিন্তাগুলোকেও যেন তন্নতন্ন করে দেখে নিলো। ছোট, চাপা কপালটা গভীর সন্দেহে কুঁচকে গিয়েছিলো।

অনেকক্ষণ ধরে পরস্পর পরস্পরকে যাচাই করে নিলো। এক সময় সন্দেহ ঘুচলো, সংশয় চুকলো।

দুটো ছোট ছোট পিঙ্গল চোখের মণিতে প্রশ্রয়ের হাসি ঝিকঝিক করে উঠেছিলো। আউ পাখির মতো সুডৌল ঘাড়খানা বাঁকিয়ে, কানের লতায় নীয়েঙ গয়নায় দোলন দিয়ে, সুঠাম দেহটিকে বাঁকা ছাঁদে ঘুরিয়ে মেয়েটা বললো, "আমার নাম হ্যাজাও, অঙ্গামী সদ্দারের মেয়ে। ওই সাঙ্খুবট বস্তিটা আমাদের।"

এটোঙা বলেছিল, "আমাদের বস্তি হলো সালুয়ালাঙ। আমরা রেঙমা। নগুসোরি বংশ। আমার নাম এটোঙা।"

এপারে সালুয়ালাঙ, ওপারে চড়াই উপত্যকায় অঙ্গামীদের বড় গ্রাম সাঙ্খুবট। মধ্য দিয়ে বিশাল একটা বর্শামুখের মতো উঠে গিয়েছে দক্ষিণের পাহাড়-চূড়া। দুই ভিন সম্প্রদায়ের একটি ছেলে আর একটি মেয়ে মুখোমুখি হয়েছিলো দুই গ্রামের মাঝামাঝি জায়গায়।

হ্যাজাও বলেছিলো, "রোজ তোকে দেখি এই পাহাড়ে আসিস। আমি ওই আখুশি ঝোপে দাঁড়িয়ে সব দেখি। নুড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে কী সব দাগ কাটিস। খালি ভাবি, এসে দেখবো, কী করিস তুই। কিন্তু সাহস পাই না।"

"কেন রে হ্যাজাও, সাহস পাস না কেন ?" এক-পা দু-পা করে হ্যাজাওর পাশে এসে দাঁড়ালো এটোঙা।"

"ভয় হয়, হয়তো তোর কাছে বর্শা রয়েছে। যদি হাঁকড়ে দিস, একেবারে জানে সাবাড় হয়ে যাবো। সেই জন্যেই তো আসি না।"

"আরে না না। সুচেন্যু, বর্শা আমার ভালো লাগে না। রক্তারক্তি, খুনোখুনি, শিকার, এ সবে মজাও পাই না। মেজাজও বিগড়ে যায়। একা

একা এই পাহাড়ে এসে মুড়ি দিয়ে পাথরের গায়ে বন, পাহাড়, নদী আঁকতে বড় ভালো লাগে।"

"খুব ভালো। আমার হুই সব খুনখারাপি ভালো লাগে আবার তোর এই দাগগুলোও ভালো লাগে। তোর দাগগুলো ভারি সুন্দর! এটা ঠিক চিতাবাঘের মতো হয়েছে। আরে, এটা ঠিক সম্বর হরিণের মতো। আর এটা, এটা কী? ময়াল নাকি? না আশুমি?" হ্যাজাওর দৃষ্টিটা পাথরের দেওয়ালের গায়ে সারি সারি ছবির ওপর দিয়ে সরে সরে যেতে লাগলো।

"আরে না না—" একেবারে হাঁ-হাঁ করে উঠলো এটোঙা। ব্যস্ত হয়ে হ্যাজাওর ভুলটা শুধরে দিলো, "এটা ময়ালও নয়, আশুমিও নয়। এটা হলো টিজু নদী।"

"হু-হু"। পাথরের গায়ে এটোঙার ছবিগুলো দেখতে দেখতে অঙ্গামী সর্দারের মেয়ের চোখজোড়া মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলো। তার খুশী-খুশী গলায়, চোখমুখের ভঙ্গিতে প্রচুর মজা পাওয়ার আভাষ রয়েছে, "তুই কী সুন্দর দাগ কাটিস! একেবারে চিতাবাঘ, ঠিক ঠিক হরিণ হয়ে যায়। কী মজার লোক তুই! আমি রোজ তোর কাছে আসবো।"

"হু-হু, খুব ভালো। রোজ আসবি তুই। তোকে আমার মনে ধরেছে। তোতে আমাতে খুব মিল হবে, কী বলিস হ্যাজাও?" অদ্ভুত চোখে হ্যাজাওর দিকে তাকিয়ে রইলো এটোঙা। তাকিয়েই থাকলো।

"হু-হু।" হ্যাজাও মাথা নেড়ে স্বীকৃতি দিলো, "খুব মিল।"

তারপর দক্ষিণ পাহাড়ের ওপর দিয়ে একটার পর একটা দিন উধাও হয়ে গেলো। রোদের ঋতু সেন্যুঙ, বৃষ্টিঝরা মৌসুমী বাতাসের দিন, তুষারঝরা সাঙসু ঋতুর মাসগুলি একে একে চলে গেলো।

অনেক ঘনিষ্ঠ হলো এটোঙা এবং হ্যাজাও। অঙ্গামী আর রেঙমা সম্প্রদায়ের দুটি মুগ্ধ পাহাড়ী যৌবন। বাদামী পাথরগুলো মুড়ির আঁকে আঁকে ভরে গেলো। আরো মোহিত হয়ে ছিলো হ্যাজাও, আরো আবিষ্ট হয়েছিলো এটোঙা। দক্ষিণ পাহাড়ের বুনো চূড়াটা দুটো পাহাড়ী মানুষ-মানুষীর ভালোবাসার উত্তাপে মধুর হয়ে গিয়েছিলো। পাহাড়ের খাড়া গায়ে খেয়ালের ছবি আঁকতে আঁকতে কখন যে হ্যাজাওর মনে দুর্বার কামনার অব্যর্থ ছবিটা এঁকে ফেলেছিলো এটোঙা, আজ আর মনে নেই।

সাঙসু ঋতুর এক হিমাক্ত দুপুরে ওক বনের ছায়ায় চুপচাপ বসেছিলো

এটোঙা। সামনের ঢালু উপত্যকাটা বেয়ে সাঁ-সাঁ করে ছুটে আসছিলো হাজাও। চমকে এটোঙা তাকিয়েছিলো, "কী রে হাজাও, কী ব্যাপার ?"

"সব্বনাশ হয়েছে।" ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলে হাজাও হাঁপাতে লাগলো।

'কী সব্বনাশ হলো ?" জিজ্ঞাসু চোখে তাকালো এটোঙা।

"ওরা সব জানতে পেরেছে। আমাদের বস্তির ঐই হালুং শয়তানটা তোকে আমাকে দেখে বস্তিতে গিয়ে বলে দিয়েছে। হালুংটা আমাকে বিয়ে করতে চায়। আমি রাজী হই নি। তোকে বিয়ে করতে চাই। সেই রাগে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের দেখে বাপের কাছে বলেছে। আমার বাপ বস্তির সদ্দার। আমাকে পেলে সাবাড় করবে। বস্তির ছোঁড়ারা আমাকে খুঁজছে, তাই তোর কাছে পালিয়ে এলুম।"

"ঠিক করেছিস। হু-হু, আমাদের বস্তির সদ্দারও জানতে পেরেছে। তোর সঙ্গে আমার এই পিরীত তার দু চোখের বিষ। তোরা আমরা তো ভিন জাত। তোরা অঙ্গামী, আমরা রেঙমা। তাই সদ্দার আমাকে বস্তি থেকে ভাগিয়ে দিয়েছে। আমি শিকার করি না, বস্তির জোয়ান ছোকরাদের সঙ্গে মিশি না, জমিতে আবাদ করতে যাই না, সেই জন্য সবাই আমার ওপর গোঁসা হয়ে রয়েছে। আমি ঠিক করেছি, এখান থেকে আর যাবো না।"

"আমিও যাবো না। তোর কাছেই থাকবো। তুই শিকার করতে পারিস না। আমি পারি। তুই পাথরের গায়ে নুড়ি ঘষে মজার মজার দাগ কাটবি। আমি বন থেকে হরিণ মেরে আনবো, পাখি ফুঁড়ে আনবো, ফলপাকুড় নিয়ে আসবো। দুজনে ভাগ করে খাবো। কেমন ?" গোল তামাটে ঘাড়খানা বাঁকিয়ে অদ্ভুত চোখে তাকিয়েছিলো হাজাও। বসবার ভঙ্গিটি ছিলো বড়ই অন্তরঙ্গ। তার দুটি কপিশ চোখের মণিতে তখন একটি অনুগত পাহাড়ী জোয়ানের ছায়া পড়েছিলো।

"ভালো, হু-হু, খুব ভালো।" আরো কাছাকাছি সরে এসেছিলো এটোঙা। দ্বিধাভরা গলায় বলেছিলো, "কিন্তু এই খোলা পাহাড়ে কোথায় থাকবো ? যা শীত! রাত্তিরে আবার বরফ পড়ে।"

খিলখিল শব্দ করে তাচ্ছিল্যের হাসি হেসেছিলো হাজাও, "পাহাড়ী জোয়ান না একটা ধাড়ী টেফঙ তুই ?"

"কেন ?" এটোঙার চোখজোড়া ধক করে জ্বলে উঠেছিলো, "ইজা হুবুতা! খবরদার হাজাও, খিস্তি খেউড় করবি না। একেবারে আছাড় মেরে খাদে ফেলে দেবো।"

"খিস্তি করবো না তো কী করবো শুনি ? বেশি ফ্যাকর ফ্যাকর করবি না এটোঙা। তোর রেঙমারা বড় বোকা। একটু যদি মগজ থাকতো তোদের। এই পাহাড়ে কত সুড়ঙ্গ রয়েছে। তার মধ্যে ঢুকে আতামারী পাতা বিছিয়ে আমরা শোবো।"

"ঠিক বলেছিস, ঠিক বলেছিস। হু-হু, তোদের অঙ্গামীদের বুদ্ধি বড় সাফ।" মাথা নেড়ে তারিফ করতে লাগলো এটোঙা, "জানিস হাজাও, দুই পাথরের গায়ে নুড়ির দাগ কাটা ছাড়া অন্য কিছু আমার মাথায় ঢোকে না। হু-হু—" মাথাটা এত ঝাঁকাতে লাগলো এটোঙা, মনে হলো, এ ঝাঁকানি আর থামবে না।

এর পর দক্ষিণের পাহাচূড়ায় দুটি পাহাড়ী মানুষ-মানুষী সংসার পাতলো। অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে আদিম মানুষের সংসার। ওপরে নীরেট পাথরের ছাদ, নিচে এবড়ো খেবড়ো ধারালো মেঝে। সামনের দিকে সুড়ঙ্গের মুখ। হামাগুঁড়ি দিয়ে ভেতরে ঢুকতে হয়।

সুড়ঙ্গের মধ্যে মা-গি কাঠ এলো। পেন্যু কাঠের মশাল এলো। সমস্ত শীতকালটার জন্য খাবার যোগাড় করলো হাজাও। বুনো মোষের মাংস, সম্বরের মাংস, পাহাড়ী আপেল, নীল্চে রঙের বুনো কলা। রাশি রাশি আখুশি আর তেরুঙা ফল। পাথরের খাঁজে খাঁজে আর মেঝেটার ওপর স্তূপাকার করে রাখা হলো মোষের ছাল, বাঘের ছাল, হরিণের ছাল। রাত্রির অন্ধকারে অঙ্গামীদের গ্রাম থেকে কিছু খড় যোগাড় করে এনেছিলো হাজাও। সেগুলো বিছিয়ে অসহ্য শীতের বিছানাকে উত্তপ্ত করে রাখা হলো।

রেঙমা সম্প্রদায় কি অঙ্গামী সমাজ, কেউ এটোঙা এবং হাজাওর সংসারকে মেনে নেয় নি, স্বীকৃতি দেয় নি তাদের উষ্ণ আরামের যুগল শয্যাকে। তবু রেঙমা আর অঙ্গামীদের সমস্ত রোষ, রাগ এবং ভয়ঙ্কর বর্শাগুলিকে অগ্রাহ্য করে দুটি মুগ্ধ পাহাড়ী যৌবন দক্ষিণ পাহাড়ের সুড়ঙ্গে তাদের নিজেদের অন্তরঙ্গ জগৎ সৃষ্টি করেছিলো।

সাঙসু ঋতুর শেষে আকাশ থেকে বরফঝরার সমস্ত কারসাজি বানচাল করে আবার উজ্জ্বল রোদের দিন এলো। এটোঙার রোমশ বুকে মুখ ঘষে

সোহাগ করতে করতে সুন্দর একটা কথা বলেছিলো হাজাও, "আমার বাচ্চা হবে রে এটোঙা। তুই বাপ হবি, আমি মা হবো।"

"ঠিক বলছিস!" বিস্ময়ে খুশিতে চেঁচিয়ে উঠেছিলো এটোঙা।

"হু-হু—" আবেগে চোখজোড়া বুঁজে আসছিলো হাজাওর।

বিস্ময়টা থিতিয়ে এলে এটোঙার মনে সন্দেহ দেখা দিলো। বললো "কী করে বুঝলি, তোর ছানা হবে?"

"শুধু শুধু কি তোকে খিস্তি করি! তুই একটা টেফঙের বাচ্চা। হু-হু, দেখছিস না, আমার পেট আর কোমরটা কেমন ফুলেছে!"

"হু-হু—" বোকা বোকা অবাক দৃষ্টিতে হাজাওকে দেখতে লাগলো এটোঙা। স্ফীত উদর, গুরুভার পাছা, টসটসে স্তন। তামাটে দেহটা চাপাছাপি করে ভরে উঠেছে। অনেক সুন্দর হয়েছে হাজাও। চামড়া মসৃণ হয়েছে। আগে চঞ্চল ছিলো। বিদ্যুতের মতো পাহাড়ে-বনে চমক দিয়ে ছুটে বেড়াতো। এখন দেহ থেকে বিদ্যুৎ মুছে গিয়েছে। মদিরতা এবং গাম্ভীর্য এসেছে। আলস্যের ভারে চোখের পাতা দুটো ভারী হয়েছে। অপলক চোখে তাকিয়ে রইলো এটোঙা। তাকিয়েই থাকলো।

হাজাও বললো, "আমার মেয়ে হবে।"

আরো খানিকটা ঘেঁষে বসলো এটোঙা। বললো, "কী করে বুঝলি?"

"কাল রাত্তিরে মজার স্বপ্ন দেখেছি। একটা ময়াল সাপ চিতি হরিণের মাথা গিলছে হাঁ করে।"

"হু-হু—" অবাক হয়ে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে এটোঙা বললো, "সবই তো বুঝলুম, তাতে হলো কী?"

"আমার মা বলেছে, পোয়াতি মাগী স্বপ্নে যদি ময়াল সাপকে হরিণের মাথা গিলতে দেখে, তার মেয়ে হয়। কী মজা বল দিকি? মেয়ের জন্যে তুই অনেক পণ পাবি।" খুশী গলায় কথাগুলো বলতে বলতে মুখচোখ করুণ হলো হাজাওর। উজ্জ্বল মুখখানায় কালো ছায়া এসে পড়লো। একেবারে চুপ করে গেলো সে।

"কী রে, কথা বলতে বলতে থামলি কেন? কী হলো তোর?" ভুরু কুঁচকে দু চোখে সংশয় ফুটিয়ে এটোঙা বললো।

"মেয়ে তো হবে। কিন্তু তার বিয়ে দেবো কেমন করে? আমরা এই সুড়ঙ্গে লুকিয়ে রয়েছি। তোদের বস্তিতে যাবার উপায় নেই। আমাদের

বস্তিতে ঢুকলেও বাপ টুকরো টুকরো করে কাটবে। তা হলে মেয়ের বিয়েতে পণ পাবি কী করে?"

"পণের দরকার নেই। বস্তিতে আমরা যাবো না। ভিন জাত হয়ে পিরীত করেছি বলে সর্দারেরা যখন আমাদের কোপাতে চায়, তখন দুই সব শয়তানদের বস্তিতে গিয়ে কী হবে? আমাদের মেয়েটা এই সুড়ঙ্গেই বড় হবে। কেউ যদি পিরীত করে বিয়ে করতে চায়, তাকেই দেবো মেয়েটাকে। তার বদলে একটা বর্শাও নেবো না।" হুস্ হুস্ শব্দ করে এটোঙা বললো। খুব দ্রুত বারকয়েক শ্বাস টানলো। শান্ত, নির্লিপ্ত মানুষ এটোঙার চোখজোড়া তখন জ্বলছিলো।

কিছু সময় চুপচাপ। একটু পরে আবার এটোঙা বলতে শুরু করলো, "তুই মা হবি, আমি বাপ হবো। এবার আমরা একটা ঘর বানিয়ে নিই। খাদে বাঁশ আছে। সাঙলিয়া লতা আছে। রাত্তির বেলায় আমাদের দুই সালুয়ালাঙ বস্তি থেকে খড় নিয়ে আসবো। একখানা খাসা ঘর হবে। সুড়ঙ্গের মধ্যে সাতটা মাস লুকিয়ে রয়েছি। আর ভালো লাগছে না হাজাও। মেয়েটা জন্মাবে। এই সুড়ঙ্গের মধ্যে অন্ধকারেই হয়তো সাবাড় হয়ে যাবে।"

"টেমে নটুঙ!' হাজাও দাঁত খিঁচিয়ে হুমকে উঠলো, "এমনি এমনি বলি, তুই একটা টেফঙের বাচ্চা। সাত মাস এই সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়ে না থাকলে বেঁচে থাকতে পারতি? কতবার তুই বস্তির শয়তানেরা আমাদের খোঁজে এসেছিলো, মনে নেই? এই সুড়ঙ্গটা তারা খুঁজে বার করতে পারে নি। পারলে—"

"হু-হু, ঠিক বলেছিস।" এটোঙা শিউরে উঠলো। তার চোখের সামনে দিয়ে কতকগুলো ছায়া সরে গেলো। সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকে দেখেছে, যেদিন থেকে হাজাওকে নিয়ে সে এই সুড়ঙ্গের মধ্যে লুকিয়েছে, ঠিক সেই দিনটি থেকে সালুয়ালাঙ এবং অঙ্গামীদের গ্রাম সাঙ্ঘবট থেকে হাতের থাবায় বর্শা বাগিয়ে দলে দলে জোয়ান ছেলেরা এসেছে। বর্শা, সুচেন্যু, তীর, দা। ভীষণ হিংস্র এবং সাঙ্ঘাতিক। একটি পাহাড়ী জোয়ানী আর একটি বুনো জোয়ান —এই দুটো মানুষের হৃৎপিণ্ড উপড়ে নেবার জন্য, এই দুটো অনাচারী প্রেমের প্রাণকে শিকার করে নিয়ে যাবার জন্য বার বার দক্ষিণ পাহাড়ের চূড়ায় এসে তারা হানা দিয়েছে। কিন্তু অত্যন্ত সাবধান হয়ে পরস্পরকে পাহারা দিতো হাজাও আর এটোঙা। সুড়ঙ্গ থেকে বেরিয়ে চারপাশ ভালো করে দেখে

নিঃসন্দেহ হয়ে তারা খাবারের সন্ধানে উপত্যকায় নামতো। বাঁশের চোঙা ভরে জল আনতে যেতো দূরের টিজু নদীতে। এই সাতটা মাস ইন্দ্রিয়গুলোকে সজাগ রেখে দুটি পাহাড়ী জীবন পরস্পরকে নিরাপদ রেখেছে। দুটি বিদ্রোহী বন্য প্রেম পরস্পরকে নির্বিপদ করেছে। দুই গ্রামের বর্শাগুলোর কথা মনে পড়তেই আতঙ্কে শরীরটা ছমছম করে।

"অনেকদিন তুই পাথরের গায়ে দাগ কাটিস না এটোঙা। তোর দাগগুলো কিন্তু ভারি সুন্দর।" সাঙসু ঋতুর এক সকালে এটোঙাকে জড়িয়ে সোহাগ করতে করতে হাজাও বলেছিলো।

"কেমন করে দাগ কাটবো? তুই তো আমাকে এই সুড়ঙ্গের ভেতর থেকে বেরুতেই দিস না।"

"হু, বেরুতে দিলে কেউ যদি তোকে সাবাড় করে। এখন ওসব দাগ কাটা থাক; মেয়েটা বিইয়ে নিই। তখন এই পাহাড় থেকে অন্য কোথাও চলে যাবো। সেখানে যত পারিস দাগ কাটাকাটি করিস।"

"হু-হু, ঠিক বলেছিস।" একটু ক্ষণ চুপচাপ থেকে আচমকা উৎসাহিত হয়ে উঠলো এটোঙা, "দ্যাখ হাজাও, আমার একটা বুদ্ধি খুলে গিয়েছে। পাথর খুদে খুদে আমাদের বাচ্চাটাকে ফুটিয়ে তুলবো। আমার কাছে একটা চোখা লোহা আছে। সেটা দিয়েই খোদাই করবো।"

"হু-হু, খুব ভালো হবে।" এটোঙার বুকের কাছে আরো নিবিড় হয়ে বসলো হাজাও।

"ভালো হবে! ইজা হুবুতা!" সুড়ঙ্গমুখের সামনে একটা গর্জন শোনা গেলো। সে গর্জনে মনে হলো, এই পাহাড়টা ফেটে চৌচির হয়ে যাচ্ছে।

সুড়ঙ্গের মধ্যে শিউরে উঠলো হাজাও। চমকে উঠলো এটোঙা। দুটি বিদ্রোহী পাহাড়ী প্রেম পরস্পরের দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে বসে রইলো। তাদের শিরায় শিরায় জলদ্ বাজনার মত রক্ত গুরু-গুরু শব্দে বাজতে লাগলো। ভয়ে আতঙ্কে দুজনেই কাঁপছে।

ফিসফিস গলায় এটোঙা বললো, "কী রে হাজাও, ব্যাপারটা কী? আনিজার গলা নাকি?"

"বেশি ফ্যাকর ফ্যাকর করিস না শয়তান। ভাবগতিক বুঝতে দে।" সুড়ঙ্গমুখের দিকে চোখ রেখে উৎকর্ণ হয়ে বসলো হাজাও।

সুড়ঙ্গমুখের কাছে এবার অনেক গলার শোরগোল শোনা যাচ্ছে। প্রচণ্ড শোরগোল। উদ্দাম, বিশৃঙ্খল, ভয়ানক চিৎকার।

সামনের দিকে বিরাট একখণ্ড পাথর দিয়ে সুড়ঙ্গের মুখটা আটকানো। ভেতরে পেম্‌যু কাঠের মশাল জ্বলছে। অদ্ভুত, রহস্যময় আলো পাথরের ভাঁজে ভাঁজে নড়ছে। হ্যাজাও এবং এটোঙার ছায়া সঙ্কীর্ণ, চাপা সুড়ঙ্গে কাঁপছে।

মনে হলো, পাহাড়ে যেন ধস নামতে শুরু করেছে। সুড়ঙ্গমুখের কাছে শোরগোলটা আরো ভয়ানক হয়ে উঠেছে।

"হু-হু সদ্দার, এই সুড়ঙ্গটার মধ্যেই দুটোতে রয়েছে। একটু আগেই কথা শুনছিলাম।"

"রামখোর বাচ্চা!" ভীষণ গর্জন শোনা গেলো এবার। সুড়ঙ্গের মধ্যে আতঙ্কে আশঙ্কায় বুকটা ছমছম করে উঠলো হ্যাজাওর। এ গলা তার অত্যন্ত পরিচিত। এ গলা অঙ্গামী সর্দারের। তার বাপের।

বাপের চেহারাটা একবার ভাববার চেষ্টা করলো হ্যাজাও। চওড়া পুরু থাবায় একটা লম্বা বর্শা। মোষের শিঙের মুকুটে আউ পাখির পালক গোঁজা। কোমর থেকে জানু পর্যন্ত ঢোলা আরি পী কাপড় ছাড়া সারা দেহে আর কিছু নেই। লাল লাল অসমান দাঁতের সারি। গলায় বুনো বাঘের গর্জন। কোমর থেকে বাঁশের খাপে ধারাল সুচেন্যু ঝুলছে। দুটো ঘোলাটে চোখ সব সময় জ্বলে। এই তার বাপ। না না, একটা মারাত্মক আনিজা!

সেই আনিজার গলা আবার হুমকে উঠলো। সুড়ঙ্গের মধ্যে থেকেও পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে। দাঁতমুখ খিঁচিয়ে অঙ্গামী সর্দার চেঁচাচ্ছে, "সুড়ুঙ্গের মধ্যে থাকলে টেনে বার কর। না না, টেনে নয়। বর্শা দিয়ে শয়তান দুটোকে ফুঁড়ে বার কর। সাত মাস ধরে দুটোকে খুঁজে বেড়াচ্ছি। এই পাপ আর সইবো না।"

হ্যাজাও আর এটোঙার হৃৎপিণ্ড ধক্ করে থেমে গেলো যেন। সুড়ঙ্গমুখ থেকে পাথরের ঢাকনাটা সরিয়ে দিয়েছে বাইরের মানুষগুলো। খানিকটা আবছা ফ্যাকাশে আলো এসে পড়লো গুহার ভেতর।

অঙ্গামীরা সুড়ঙ্গমুখের কাছে হিংস্র গলায় হট্টগোল করছে। সাত-সাতটা মাস দক্ষিণ পাহাড়ের অন্ধিসন্ধি তন্নতন্ন করে খুঁজেও পাত্তা পায় নি। এতদিন পর বর্শার সীমানায় হ্যাজাও এবং এটোঙা নামে দুটো শিকারকে পেয়ে গিয়েছে তারা। আজ তাদের উদ্দাম আনন্দের দিন বৈ কি!

"হুই, হুই যে শয়তান দুটো জড়াজড়ি করে বসে রয়েছে।"

"রামখোর বাচ্চা দুটোকে ফুঁড়ে ফেল তোরা।" অঙ্গামী সর্দার হুমকে উঠলো।

সুড়ঙ্গের মধ্যে সেই আবছা, ছেঁড়া-ছেঁড়া অন্ধকারে ভয়ে আতঙ্কে সমস্ত শরীরটাকে দলা পাকিয়ে এটোঙার বুকের মধ্যে গুঁজে রেখেছিলো হাজাও। নিরাপদ আশ্রয় খুঁজেছিলো। আর দুটো কঠিন হাত দিয়ে হাজাওর দেহটাকে ঘিরে, বর্শার তীক্ষ্ণ ফলা থেকে আড়াল করে নির্নিমেষ চোখে সামনের দিকে তাকিয়ে ছিলো এটোঙা।

এটোঙার বুকের মধ্যে নিজের দেহটাকে লুকিয়ে চিৎকার করে উঠেছিলো হাজাও, "আমাদের মারিস না বাপ, আমাদের মারিস না!"

"মারবো না!" দাঁতমুখ খিঁচিয়ে চোখদুটো কুঁচকে চেঁচিয়ে উঠলো অঙ্গামী সর্দার।

"না না, আমার পেটে তোর নাতি রয়েছে।"

"নাতি! হাঃ—হাঃ—হাঃ—" বিরাট মাথাটা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে বিকট অট্টহাসি হেসে উঠলো অঙ্গামী সর্দার। সেই হাসিতে সামনের খাসেম বন থেকে ডানা ঝটপট করে এক ঝাঁক আউ পাখি উড়ে গেলো। ভয় পেয়ে গোটা কয়েক দাঁতাল শুয়োর চেঁচিয়ে উতরাইএর দিকে ছুটে পালালো।

মোটা মোটা বেঢপ ঠোঁট দুটোকে দু ফালা করে লাল লাল দাঁতের পাটি বেরিয়ে পড়লো অঙ্গামী সর্দারের, "টেফঙের বাচ্চারা, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কী দেখছিস? দে আমার কাছে খারে বর্শাটা। কেমন করে ফুঁড়তে হয়, দেখিয়ে দিচ্ছি।"

সামনের একটা জোয়ান ছেলের হাত থেকে খারে বর্শাটা নিজের থাবায় ছিনিয়ে নিয়েছিলো অঙ্গামী সর্দার। এই পাহাড়ে করুণা নেই, মমতা নেই। সমাজের বিচারে অন্যায় কিংবা পাপ সাব্যস্ত হলে তার একমাত্র শাস্তি হলো মৃত্যু। এই অমোঘ বিধানের হেরফের হবার উপায় নাই। অঙ্গামী সর্দারও সমাজপতি। সব রকম দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। তার মুখখানা ভয়ানক হয়ে উঠলো। নিমেষের মধ্যে থাবা থেকে বর্শাটা সাঁ করে সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকলো। অব্যর্থ লক্ষ্য। সঙ্গে সঙ্গে একটা অমানুষিক আর্তনাদ শোনা গেলো। সে আর্তনাদ সঙ্কীর্ণ সুড়ঙ্গের মধ্যে পাক খেয়ে খেয়ে গোঙাতে লাগলো।

-উ-উ-উ—"

এটোঙা লুটিয়ে পড়েছিলো। তার কণ্ঠার হাড়ের ফাঁক দিয়ে খারে বর্শাটা বঁড়শির মত আটকে রয়েছে।

আশ্চর্য! এতটুকু চিৎকার করে উঠলো না হ্যাজাও। যে হাত দুটো দিয়ে তাকে ঘিরে বসেছিলো এটোঙা, বর্শামুখ থেকে বাঁচাচ্ছিলো, সে দুটোও শিথিল হয়ে ঝুলে পড়েছে। সেদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। আচমকা চোখ দুটো ধক্ করে জ্বলে উঠলো। পাশ থেকে একটা ধারাল সুচেন্যু হাতে তুলে নিলে হ্যাজাও। সুচেন্যুর ফলাটা কী ভয়ানক! কী নিষ্ঠুর!

হ্যাজাও ভাবলো। পাহাড়ী মানুষের ভাবনা সুষ্ঠু কিংবা শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। হ্যাজাওর এখনকার ভাবনাগুলি একত্র করলে মোটামুটি এইরকম দাঁড়ায়। তার দেহের রক্ত-মাংস-হাড়-স্নায়ুতে একটি প্রাণকণা আলোড়ন তুলেছে। সেই প্রাণকে যে উপহার দিয়েছে, তার যৌবনকে যে প্রথম মাতৃত্ব দিয়েছে, সেই এটোঙাকে তার বাপ বর্শা দিয়ে ফুঁড়েছে। হোক তার বাপ। তবু প্রতিশোধ চাই। ভয়ঙ্কর প্রতিশোধ। একটা জখমী বাঘিনীর মত ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগলো হ্যাজাও।

সুচেন্যুর হাতলটা হাতের মুঠিতেই ধরা রইলো। সেটা দিয়ে তাক করার আগেই আর একটা বর্শা সাঁ করে সুড়ঙ্গের মধ্যে ছুটে এলো। প্রাণফাটা চিৎকার করে এটোঙার অসাড় দেহের ওপর লুটিয়ে পড়লো হ্যাজাও।

"হাঃ-হাঃ-হাঃ—" অঙ্গামী সর্দারের অট্টহাসি এবার আরো ভীষণ হয়ে উঠলো। সেই হাসি উপত্যকা এবং চড়াই-উতরাইতে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে টিজু নদীর দিকে মিলিয়ে গেলো। "আমি হলাম অঙ্গামী সর্দার। হু-হু, লোহ্টাদের সঙ্গে, সাঙটামদের সঙ্গে, ডাফলাদের সঙ্গে কত লড়াই আমি করেছি। আর আমার মেয়ে হুই শয়তানের বাচ্চাটা আমাকেই কোপাতে চায় সুচেন্যু দিয়ে! হাঃ—হাঃ—হাঃ—"

বর্শার লম্বা বাজুদুটো বাইরে বেরিয়ে ছিলো। সে দুটো ধরে অঙ্গামী জোয়ানেরা হিঁচড়ে হিঁচড়ে হ্যাজাও এবং এটোঙাকে সুড়ঙ্গের মধ্য থেকে বার করে এনেছিলো। এটোঙার কণ্ঠার ফাঁকে আর হ্যাজাওর পাঁজরায় বাঁকা বঁড়শির মত ফলা দুটো গাঁথা রয়েছে। দেহ দুটো রক্তে মাখামাখি। দুজনেরই জ্ঞান নেই। কিছুই শুনতে বুঝতে বা দেখতে পাচ্ছে না তারা।

অঙ্গামী সর্দার আবার অট্টরোলে হেসে উঠলো। সাফল্যে উল্লাসে তার অস্ফুট বুনো মনটা উন্মাদ হয়ে গিয়েছে। সাত-সাতটা মাস ধরে যে শিকার

টার খোঁজে জানোয়ারের মত পাহাড়ে পাহাড়ে তারা ঘুরে বেড়িয়েছে, ইমাত্র তাদের অব্যর্থ লক্ষ্যভেদে ফুঁড়তে পেরেছে।

অঙ্গামী সর্দার বললো, "শয়তানের বাচ্চা রেঙমা হয়ে অঙ্গামী মাগীর দিকে নজর দেয়। এই পাপ রাখবো না। দুটোকেই সাবাড় করবো।"

"না না, জানে মারিস না রে সদ্দার। সায়েবরা বারণ করে দিয়েছে। রেঙমা শয়তানটাকে ধরে সায়েবদের হাতে তুলে দেবো। তারাই ওটাকে সাবাড় করবে।" পাশ থেকে একটা জোয়ান ছেলে বললো।

এতক্ষণ নিষ্পলক চোখে হাজাওর সমস্ত দেহে তন্নতন্ন করে কী যেন খুঁজছিল অঙ্গামী সর্দার। এবার সে হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "গ্যাখ গ্যাখ, হুই রেঙমা শয়তানটা আমার মেয়েটার পেটে বাচ্চা বানিয়েছে। খুনই করে ফেলে দি। হু—" উত্তেজনায় রাগে রোষে একটা লোহার মেরিকেতসু ধাঁ করে এটোঙার মাথার ওপর তুলে ধরলো অঙ্গামী সর্দার। সঙ্গে সঙ্গে পাশের জোয়ান ছেলেটা হাতিয়ারসহ তার হাত দুটো সাপটে জড়িয়ে ধরলো।

জোয়ান ছেলেটা বললো, "কী করছিস সদ্দার! জানিস না, মানুষ খুন করার জন্যে সায়েবরা সেদিন ইমপাঙ বস্তি থেকে দশটা পাহাড়ীকে ধরে নিয়ে গেয়েছে। খবদ্দার, ওকে মারিস না। তার চেয়ে ওকে হিঁচড়ে হিঁচড়ে বস্তিতে নিয়ে চল।"

রক্তাভ রুষ্ট চোখে জোয়ান ছেলেটির দিকে তাকালো অঙ্গামী সর্দার। লাল লাল দাঁতগুলো খিঁচিয়ে বদখত মুখভঙ্গি করে গর্জে উঠলো, "ইজা হুবুতা! ন, শয়তান দুটোকে টানতে টানতে বস্তিতে নিয়ে চল।" বলতে বলতে উদ্যত মেরিকেতসুটা একান্ত অনিচ্ছায় নামিয়ে ফেললো অঙ্গামী সর্দার।

কণ্ঠার হাড়ের ফাঁকে বাঁকা বঁড়শির মত বর্শার ফলা। বাজু ধরে টানতে টানতে ঢালু উপত্যকার দিকে দৌড়াতে শুরু করলো অঙ্গামী জোয়ানেরা। দুটো দেহ, দুটো পাহাড়ী প্রেম—হাজাও এবং এটোঙা, বর্শার ফলায় বিদ্ধ হয়ে বন্ধুর পাথুরে পথে আছাড় খেতে খেতে নীচের দিকে নামতে লাগলো। দলের আগে আগে বিরাট একটা বল্লম আকাশের দিকে বাগিয়ে ধরে সদর্পে পা ফেলে ফেলে এগিয়ে চলেছে অঙ্গামী সর্দার।

বিদ্রোহী পাহাড়ী প্রেম। এই পার্বতী পৃথিবীর মতই আদিম। ভয়ঙ্কর এবং দুর্বার। এ প্রেম সমাজের শাসন শাস্তি এবং বিধান মানে না। এ প্রেম বর্শার ফলা কিংবা কোনো রকম প্রতিকূলতাকে পরোয়া করে না। রেঙমা এবং

অঙ্গামী—এটোঙা আর হাজাও নামে দুটো বুনো প্রেম সমাজের সমস্ত অনুশাসন উপেক্ষা করে দক্ষিণ পাহাড়ের সুড়ঙ্গে সংসার পেতেছিলো। দুটো মানুষ-মানুষীর হৃদয়ের উত্তাপে সে সংসার বড় মধুময়। পরস্পরের ওপর নির্ভরতায় সে সংসার সুন্দর।

কিন্তু পাহাড়ী পৃথিবী এবং তার সমাজ বড় নির্মম, বড় নিষ্ঠুর। সেখানে একটুকু ক্ষমা, এতটুকু করুণা আশা করা যায় না। এইমাত্র একটা অসামাজিক এবং অসঙ্গত পিরীতকে হত্যা করে, সুড়ঙ্গগর্ভের সুখী অথচ অবৈধ দম্পতির সংসারকে একপাল দাঁতাল শুয়োরের মত ছিন্নভিন্ন করে উল্লাসে মাতোয়ারা হয়ে উঠলো এই পাহাড়; এই পাহাড়ের ভীষণ বিচারবোধ।

"তারপর কী হলো? অঙ্গামীরা তোকে সাবাড় করে ফেলল!" চারপাশে জোয়ান ছেলেমেয়েরা শ্বাসরোধী অবস্থায় দাঁড়িয়ে ছিলো। এটোঙা থামতে সকলে সমস্বরে জিজ্ঞাসা করলো। সিঁড়িক্কেতে কেউ নেই। সবাই এটোঙাকে ঘিরে ধরেছে। এমন কি শিকারী কুকুর এবং পোষা শুয়োরগুলো পর্যন্ত খাদ্যের খোঁজ ছেড়ে দিয়ে ভিড় জমিয়েছে।

হো-হো করে হেসে উঠল এটোঙা। বললো, "তোরা সব এক-একটা টেফঙের বাচ্চা। মগজে যদি একটু বুদ্ধিও তোদের থাকতো! আমাকে মেরে ফেললে এখানে এলুম কী করে?"

"হু-হু, ঠিক বলেছিল। মগজটা তোর খাসা। তারপর কী হলো, তাই বল।" সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার আরো ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। খুশী-খুশী আমেজী গলায় বললো, "গল্পটা বেড়ে জমেছে রে এটোঙা। অঙ্গামীরা তোকে যে এমন করে ফুঁড়েছে, তা তো জানতাম না। আমরাও তোকে ফুঁড়তে গিয়েছিলাম। অঙ্গামী মাগীটাকে নিয়ে লুকিয়ে ছিলি। খুব রাগ হয়েছিলো। তুই আমাদের বস্তির ছেলে। তোকে আমরা যা খুশি করবো। মারবো, ফুঁড়বো, দরকার হলে সাবাড় করবো। তাই বলে ভিন জাতের শয়তানের কোপাবে? টেমে নটুঙ! নাঃ, এর শোধ তুলতেই হবে। সাঙ্খবট বস্তি থেকে তিনটে অঙ্গামীর মুড়ো চাই। হু-হু।" উত্তেজনায় বুড়ো সর্দারের দেহটা থরথর করে কাঁপছে। কুপিত, ভয়ানক দৃষ্টিতে ফুলকি ফুটছে।

"হো-ও-ও-ও-আ-আ—অঙ্গামীদের তিনটে মুণ্ডু চাই।" চারপাশ থেকে জোয়ান-জোয়ানীরা হট্টগোল করতে লাগলো।

"থাম এবার।" এটোঙা বলতে শুরু করলো, "একেবারে জ্ঞান ছিলো না। যখন জ্ঞান ফিরলো, দেখি আমি কোহিমায় শুয়ে রয়েছি। চারদিকে সাদা সাদা অনেক মানুষ। পরে জেনেছিলুম, ওরা সব সায়েব। সারা গা কেটে কুটে একশা হয়ে গিয়েছিলো। দিনকয়েক পর আমাকে ইম্ফলে চালান করে দিলো। সেখানে চার বছর কাটিয়ে আজ বস্তিতে ফিরছি।"

"ইম্ফলে কোথায় ছিলি?" সমস্বরে সকলে জিজ্ঞাসা করলো।

"জেলখানায়। সারি সারি ঘর। সেখানে একটা মণিপুরী চোর ছিলো। তার কাছে ছবি আঁকাটা ভালো করে শিখে এসেছি।"

বুড়ো সর্দার বলল, "জেলখানা কী রে? সেখানে মানুষ থাকে কেন?"

"হুই সায়েবরা জেলখানা বানিয়েছে। চুরি করলে, খুন করলে, মেয়েমানুষের ইজ্জত নিলে হুইখানে আটক করে রাখে সায়েবরা। ভারি মজার জায়গা। জেলখানার গল্প আর একদিন বলবো।" চারপাশে একবার চনমন চোখে তাকালো এটোঙা। বলল, "কী রে সদ্দার, আমার বাপ-মা মরেছে, কেসুঙটাও লোপাট হয়েছে। তাই না?"

"হু-হু।" মাথা নাড়িয়ে জানালো বুড়ো সর্দার।

"আমি তবে যাই।"

"কোথায় যাবি?"

"হুই দক্ষিণ পাহাড়ের ডগায়। দেখি, যদি হাজাগুকে পাই। চার-চারটে বছর ওর সঙ্গে দেখা নেই। ওর পেটে আমার বাচ্চা ছিলো। নিশ্চয়ই সে বাচ্চাটা অ্যাদ্দিনে বড়সড় হয়েছে।" বলতে বলতে দক্ষিণ পাহাড়ের দিকে পা বাড়িয়ে দিলো এটোঙা। পাহাড়ী মানুষগুলোকে বিস্মিত মুগ্ধ এবং অবাক করে দিয়ে টুপি-প্যান্ট-জুতো-পরা এই অদ্ভুত মানুষটা সামনের উপত্যকায় ছোট, আরো ছোট হতে হতে অদৃশ্য হয়ে গেলো। চার বছর আগের সেই জানাশোনা পাহাড়ী ছেলে কী এক ভোজবাজিতে দুর্বোধ্য এবং রহস্যময় হয়ে গিয়েছে। বুনো মানুষগুলো ভাবতে ভাবতে দিশাহারা হয়ে যেতে লাগলো।

ছত্রিশ

মোরাঙের মধ্যে একখানা তিনকোণা পাথরের ওপর বসে গল্প বলছে সেঙাই। মজাদার গল্প। কোহিমা শহরের গল্প। পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী এবং পিয়ার্সনের গল্প। মাধোলালের গল্প। রানী গাইডিলিওর গল্প। অস্ফুট পাহাড়ী মনের সবটুকু রসবোধ কৌতুক এবং ব্যঙ্গ মিশিয়ে মিশিয়ে সে গল্পকে রীতিমত রসালো করে তুলেছে সেঙাই। কখনও বিভীষিকার রঙ মিশিয়ে ভয়ানক করছে।

বুড়ো খাপেগা এখনও মোরাঙে আসে নি। পাহাড়ী জোয়ানেরা গল্পের মৌতাতে বুঁদ হয়ে সেঙাইর চারপাশে গোল হয়ে বসেছে। মাঝে মাঝে চুক চুক শব্দ করে রোহি মধু খাচ্ছে। অদ্ভুত, বিস্ময়কর সব গল্প। এমন সব গল্প এর আগে তারা কোনোদিনই শোনে নি। শুনতে শুনতে তাদের তামাটে মুখগুলোর ওপর দিয়ে কখনও বিস্ময়ের কখনও রোষের আবার কখনও ব্যথার ভঙ্গি ফুটে উঠছে। কপিশ চোখগুলো ঝকমক করছে। কখনও কুপিত পেশীগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। হাতের থাবাগুলো কঠিন হচ্ছে। আবার খুশিতে পাথুরে মুখে হাসি ফুটছে।

দুদিকে পেন্যু কাঠের মশাল জ্বলছে। বাইরের উপত্যকায় পাহাড়ী রাত্রি একটু একটু করে ঘন হচ্ছে। বাতাসে এখনও শীতের দাপট মিশে রয়েছে। চড়াই-উতরাইএর ওপর দিয়ে জঙ্গলের মাথাগুলোকে এলোপাথাড়ি ঝাঁকিয়ে হু-হু বাতাস ছুটছে। আছড়ে পড়ছে দূরের, আরো দূরের বনভূমিতে।

এখন সাঙসু ঋতুর শেষের দিক। কিছুদিন পরেই ঝুম আবাদের পার্বণ শুরু হবে। আসবে মরশুমী খেয়ালখুশির দিন।

সেঙাইর ডানপাশের মাচান থেকে ওঙলে বললো, "তুই যে গাইডিলিওর কথা বললি ; বেশ খাসা মেয়ে, না ?"

"হু-হু—" মাথা নেড়ে নেড়ে সায় দিলো সেঙাই।

"দেখতে কেমন ?"

"খুব ভালো। হু-হু।"

"পিরীত-টিরীত জমিয়ে এসেছিস না কি? কী রে? কোহিমায় গিয়ে আর একটা ভালাবাসার জোয়ানী বাগিয়ে ফেললি?" লোভার্ত কুতকুতে চোখে পিটপিট করে তাকাতে লাগলো ওঙলে।

"কী বললি? আহে ভু টেলো!" সেঙাই গর্জে উঠলো, "জানে খতম করে ফেলবো তোকে। গাইডিলিওকে পিরীতের জোয়ানী বলছিস! জানিস সে হলো এই পাহাড়ের রানী। শয়তানের বাচ্চা—" পাশ থেকে সাঁ করে একটা বর্শা তুলে নিলো সেঙাই। বললো, "গাইডিলিওর ইজ্জত তুলে কথা বলছিস ধাড়ী টেফঙ!"

মুহূর্তে মোরাঙের মধ্যে গল্পের আমেজটা ছিঁড়ে ফালা-ফালা হয়ে গেলো। একটা খণ্ডযুদ্ধের সূচনা। ওপাশ থেকে তড়াক করে লাফিয়ে উঠেছে ওঙলে। রক্তারক্তি করার উৎসাহে তার শিরাস্নায়ুগুলোও চনচন করে উঠেছে।

ঘটনার আকস্মিকতায় চারপাশের জোয়ানেরা হতবাক হয়ে গিয়েছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। চকিতে সকলে লাফিয়ে উঠলো। তারপর মোরাঙ ফাটিয়ে হল্লা করতে লাগলো, "হো-ও-ও-ও-আ-আ—"

পাহাড়ী মনের উত্তেজনা। যে-কোনো মুহূর্তে যে-কোনো ঘটনায়, যে-কোনো কথায় দপ করে জ্বলে উঠতে পারে। কেলুরি গ্রামের এই মোরাঙে সাঙ্ঘাতিক কিছু ঘটে যেতে পারতো। বর্শা নিয়ে দু দলে ভাগ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েছিলো জোয়ান ছেলেরা। কিন্তু তার আগেই মোরাঙের মধ্যে ঢুকে পড়লে বুড়ো খাপেগা।

বুড়ো খাপেগা হুমকে উঠলো, "এই শয়তানের বাচ্চারা, মোরাঙের মধ্যে চিল্লাচিল্লি বাধিয়েছিস কেন?" ঘোলাটে দৃষ্টিতে সকলকে দেখতে দেখতে চেঁচামেচির কারণটা খুঁজতে লাগলো খাপেগা। "কী হয়েছে? কী ব্যাপার?"

"ইজা হুবুতা!" দাঁতমুত খিঁচিয়ে বিকট ভঙ্গি করলো সেঙাই, "হবে আবার কী? ওঙলেটাকে আমি খুন করবো।"

ওপাশ থেকে ওঙলের গলায় একই দাবি শোনা গেলো, "সেঙাইটাকে সাবাড় করবো।"

"জানিস, এটা হলো মোরাঙ। এখানে খুনখারাপির কথা হলে আনিজার গোঁসা এসে পড়ে। বেশি ফ্যাকর ফ্যাকর করলে দুটোকেই বর্শা দিয়ে ফুঁড়বো।" বুড়ো খাপেগা গর্জে উঠলো।

কনুই দিয়ে গুঁতিয়ে পথ করে বুড়ো খাপেগার কাছাকাছি এসে দাঁড়ালো

সেঙাই। বললে, "হুই ওঙলেটা রানী গাইডিলিওকে আমার পিরীতের মেয়ে বললো। ওকে বর্শা হাঁকাবো না? তুই একবার হুকুম ঝাড় সর্দার।"

ক্ষয়া বদখত কয়েকটা দাঁত কড়মড় শব্দ করে বেজে উঠলো। রক্তচোখে তাকালো বুড়ো খাপেগা, "হু-হু, তাতে কী হয়েছে সেঙাই? গাইডিলিওকে তোর পিরীতের জোয়ানী বলতে অমন অরে রুখে উঠলি কেন?"

"জানিস সর্দার, হুই গাইডিলিও হলো এই নাগা পাহাড়ের রানী। ওর দিকে তাকালে পিরীতের কথা মনে আসে না। কোহিমায় যখন আসান্যুরা (সমতলের বাসিন্দা) আমাকে মারলো তখন হুই রানী গাইডিলিও আমাকে বাঁচালো। এই পাহাড়ের সব ব্যারামী মানুষ তার ছোঁয়ায় বেঁচে ওঠে। তার ইজ্জত নিয়ে কথা বলবো, এমন বেইমান আমি না।" একটু একটু করে সম্ভ্রম এবং অস্ফুট মনের সবটুকু আনুগত্য মিশিয়ে কোহিমা পাহাড়ের, রানী গাইডিলিওর, মাধোলাল ও পাদ্রীসাহেবদের গল্প নতুন করে বললো সেঙাই।

সব শুনে বুড়ো খাপেগা বললো, "খবদ্দার ওঙলে, গাইডিলিও রানীকে নিয়ে আর কোনো দিন পিরীতের কথা বলবি না। বললে মাথা কেটে মোরাঙে ঝোলাবো।

একটু পরে সকলে বসে পড়লো।

সেঙাই বললো, "জানিস সর্দার, হুই সায়েবেরা একটুও ভালো না।"

"কেন? কী করে বুঝলি?" তীক্ষ্ণ চোখে তাকালো বুড়ো খাপেগা।

"ওদের জন্যেই তো আমাকে আর সারুয়ামারুকে মারলো আসান্যুরা (সমতলের বাসিন্দা)। তা ছাড়া মাধোলাল বললে, রানী গাইডিলিও বললে, হুই সায়েবরা অনেক দূর দেশ থেকে এসে আমাদের এখানে সর্দারি করতে চায়।"

একটু আগে মোরাঙের মধ্যে যে উত্তেজনা ছিলো, এখন আর নেই। নতুন গল্পের নেশায় জোয়ানেরা আবার মেতে উঠেছে।

আচমকা বুড়ো খাপেগা চিৎকার করে উঠলো, "তোর বাপ সায়েবচাটা সিজিটোটাকে আমি আগেই বলেছিলাম, সায়েবেরা লোক ভালো নয়। শয়তানেরা এখানে সর্দারি ফলাচ্ছে। সিধে কথা। হুই সব আমাদের পাহাড়ে চলবে না। পাথরের চাঁই মেরে মেরে সায়েবদের শেষ করবো।" একটু থেমে খাপেগা আবার বললো, "তোকে মেরেছে, না রে সেঙাই?"

"হু-হু, এমন মেরেছে, জ্ঞান ছিলো না। হুই গাইডিলিও রানী আমাকে বাঁচিয়ে দিলো। ও না থাকলে বস্তিতে আর ফিরে আসতে হতো না।"

বুড়ো খাপেগা হুঙ্কার ছাড়লো, "তোকে মেরেছে সায়েবরা। দুই সায়েবদের দশটা মাথা চাই। এর বদলা নিতে হবে। অনেক দিন বড় রকমের লড়াই বাধছে না। হাতটা নিসপিস করছে। শয়তানদের মুণ্ডু এনে মোরাঙের সামনে বর্শার মাথায় গেঁথে রাখবো। রক্ত দিয়ে দেয়াল চিত্তির করবো। বুড়ো বয়সে রক্তটা ঝিমিয়ে এসেছিলো। মনে মনে আবার তাগদ পাচ্ছি রে সেঙাই।" বুড়ো খাপেগা একটু থামলো। দৃষ্টিটাকে চালের ফোকর দিয়ে ঝাপসা আকাশের দিকে ছুঁড়ে দিলো। তার ঘোলাটে চোখের সামনে যেন এই পাহাড় কিংবা জনপদ নেই। এই বনময় উপত্যকা, চড়াই-উতরাইএ দোল-খাওয়া পাহাড়ী পৃথিবীর এক ভয়াল অতীতে সে ফিরে গেলো। কেলুরি গ্রামের অতীত কাল সে। আবেগভরা গলায় পুরানো দিনের কথা বলতে লাগলো, "এই পাহাড় থেকে সে সব দিন চলে যাচ্ছে রে। লড়াই বাধতো অঙ্গামীদের সঙ্গে, কোনিয়াকদের সঙ্গে, সাঙটামদের সঙ্গে। পাহাড়ের মাথা আর টিজু নদী রক্তে লাল হয়ে যেতো। সে সব দিনকাল আর নেই; সে সব রেওয়াজও উঠে যাচ্ছে। আগে শত্তুরদের দুটো মাথা কেটে না আনলে জোয়ান ছেলেরা বিয়ের জন্যে মেয়ে পেতো না। সেবার তো অঙ্গামীদের সঙ্গে লড়াই বাধলো। শোন তবে সে গল্প।"

ফেলে-আসা দিনগুলোর নানা তাজ্জবের কাহিনী শুরু হলো। সে কাহিনী পাহাড়ী মানুষের হৃৎপিণ্ড-ছেঁড়া রক্তে রক্তাক্ত। বুড়ো খাপেগা বলতে লাগলো, "দক্ষিণ পাহাড়ের দুই দিকে অঙ্গামীদের বস্তি সাঙ্খ্যবট। একবার হলো কি, ওদের একপাল গোরু এসে আমাদের সিঁড়িক্ষেত থেকে পাকা ধান খেয়ে গেলো। তখন আমার জোয়ান বয়স। মোরাঙে বসে বসে জোয়ানদের সঙ্গে জটলা করলাম। আমাদের বস্তির সদ্দার ছিলো সিজিটোর ঠাকুরদা। সে বললো, ওদের গোরু আমাদের ধান খেয়েছে। সাঙ্খ্যবট বস্তি থেকে দুটো মাথা কেটে আনতে হবে। অঙ্গামীদের বস্তিতে গিয়ে দেখি, একটা ঘরে শয়তানের বাচ্চারা মড়ার মত ঘুমুচ্চে। একটুও শব্দ করলাম না। সুচেন্যু দিয়ে কুপিয়ে চারটে মাথা চুলের ঝুঁটি ধরে নিয়ে এলুম। সদ্দার আমাকে খুব সাবাস দিলে, রোহিমধু দিলে, কুকুরের মাংসের কাবাব দিলে গরম গরম, আর সেই সঙ্গে তার সুন্দর মেয়েটাকে আমার সঙ্গে বিয়ে দিলে। আমার বিয়ে তো হলো। তার দিনকতক বাদেই নড্রিলোদের বাড়ি থেকে মড়াকান্না উঠলো। রাত্তিরবেলা অঙ্গামীরা তাদের সাতটা মাথা নিয়ে গিয়েছে। শোধ তুললুম

দু বছর বাদে অঙ্গামীদের কুড়িটা মাথা এনে। এককুড়ি মাথার শোধ এখনও ওরা তুলতে পারে নি। কত বছর পার হলো, অত হিসেব আর মনে নেই। তখন কাঁচা জোয়ান ছিলুম; এখন বুড়ো হয়েছি। যাক সে সব কথা। অঙ্গামী শয়তানেরা এখনও তাকে তাকে রয়েছে। বাগে পেলে রেহাই রাখবে না। খুব সাবধান।"

কেলুরি গ্রামের একালের জোয়ানেরা এ গল্প অনেকবার শুনেছে। বার বার শুনেও তাদের অরুচি ধরে না। যতবার শোনে ততবারই ভালো লাগে, নতুন লাগে।

সেঙাই বললো, "সে সব কথা অ্যাদ্দিনে অঙ্গামীরা ভুলে গেছে।"

"আরে না, না। পাহাড়ী নাগা অত সহজে মাথা কাটার কথা ভোলে না। এক জন্মে না হোক আর এক জন্মে, বাপ না পারুক ছেলে, ছেলে না পারুক নাতি তার শোধ তুলবেই। এই তো সালুয়ালাঙের খান্‌কেকে মেরে তোর ঠাকুরদাকে মারার শোধ তুলে এলি। অঙ্গামীরা লোপাট হোক, সায়েবদের সঙ্গে লড়াইটা তা হলে বাধছে?" উল্লাসে বুড়ো খাপেগার চোখজোড়া চকচক করতে লাগলো।

সেঙাই বললো, "হু-হু, আসান্যারা (সমতলের বাসিন্দা) লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে।"

"কে বললে?" বাদামী পাথরখানায় খাড়া হয়ে বসলো বুড়ো খাপেগা।

"কোহিমা পাহাড়ের মাধোলাল বলছিলো। আসান্যদের (সমতলের বাসিন্দা) সদ্দারটার নাম গান্ধা—না কী জানি? আমি ঠিক জানি না। সারুয়ামারু জানে। নামটা সে বলতে পারবে।"

"সারুয়ামারু, এই সারুয়ামারু—" তারস্বরে চিৎকার করে উঠলো বুড়ো খাপেগা. "আসান্যদের (সমতলের বাসিন্দা) সদ্দারটার নাম জানা দরকার। লড়াই বাধলে তার কাছে লোক পাঠাতে হবে।"

ওঙলে বলল, "সারুয়ামারু মোরাঙে আসে নি।"

"আচ্ছা থাক, কাল সকালেই তার কাছ থেকে নামটা জেনে নেবো।"

আচমকা সেঙাই চেঁচিয়ে উঠলো, "নামটা মনে পড়েছে রে সদ্দার; গান্ধীজী। সে লড়াই বাধিয়ে দিয়েছে সায়েবদের সঙ্গে।"

"হু-হু, সাবাস দিতে হয় লোকটাকে। আমরা পাহাড়ী মানুষগুলো হুই সায়েবদের সঙ্গে এখনও লড়াই বাধাই নি। আর আসান্যরা (সমতলের

বাসিন্দা) বাধিয়ে দিলে !" আক্ষেপে আপসোসে হা-হুতাশ করতে লাগলো বুড়ো খাপেগা।

"আমরাও বাধিয়েছি। হু-হু।" গম্ভীর গলায় সেঙাই বললো।

"আমরা আবার কবে বাধালুম !" বিস্ময়ের ধাক্কায় বুড়ো খাপেগার গলাটা কেমন যেন শোনায়।

"হু-হু, রানী গাইডিলিও বাধিয়ে দিয়েছে। আমাদের বস্তিতে সে আসবে, বলেছে।" নতুন বিস্ময়কর একটা খবর দিয়েছে, সেই গৌরবে মিটিমিটি উজ্জ্বল হাসিটা সেঙাইর মুখে ঝিকমিক করতে লাগলো, "আমাদের বস্তিতে আসতে বলেছি রানীকে। ভালো করি নি ? তুই আবার রাগ করে বর্শা হাকড়াবি না তো সদ্দার ?"

"আরে না না। এই কদিন শহরে থেকে তোর মগজটা একেবারে খুলে গিয়েছে রে সেঙাই। যাক অ্যাদ্দিনে রানীকে দেখা যাবে। ওর ছোঁয়ায় নাকি সব ব্যারাম সেরে যায় ?"

"হু-হু। এই ছাখ না, আমাকে আর সারুয়ামারুকে কী মার দিলে সায়েবের লোকেরা। সারা গা ফেটে রক্তে মাখামাখি হয়েছিলো। হুঁশ ছিলো না। রানীই আমাদের বাঁচালে। তার ছোঁয়াতেই তো সেরে গেলুম। হু-হু—" অসীম কৃতজ্ঞতায় সেঙাইর মনটা ভরে গেলো।

বুড়ো খাপেগা বললো, "রানী গাইডিলিও যখন সায়েবদের সঙ্গে লড়াই বাধিয়েছে, তখন আমরা তার দলে। তোদের দুজনকে সে বাঁচিয়ে দিয়েছে, তার হয়েই আমরা লড়বো। হুই সায়েবেরা পাহাড়ী জোয়ানদের ফুসলে পর করে দিচ্ছে। আমাদের সিজিটোটাকে কেমন করে দিয়েছে। সে আর বস্তিতেই ফেরে না। হুই সায়েবরা হলো এক-একটা আনিজা। এক-একটা ডাইনী।" একটু থামলো বুড়ো খাপেগা। একদলা থুথু সামনের অগ্নিকুণ্ডটার দিকে ছুঁড়ে আবার বললো, "আমাদের বস্তিতে রানী গাইডিলিও আসবে। কাল থেকে বর্শা, সুচেন্যু আর তীর-ধনুক বানাতে শুরু করে দে তোরা।"

"হো-ও-ও-ও-অ-আ—" জোয়ানদের গলায় ঝড় বাজলো। আসন্ন একটা লড়াইয়ের সূচনা। নাগা পাহাড়ের শিখরে শিখরে আছাড় খেতে খেতে জোয়ানদের গর্জন দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়লো। চক্ররেখার ওপর যে করাল রাত্রি স্তব্ধ হয়ে রয়েছে, তার হৃৎপিণ্ড শিউরে উঠলো, চমকে উঠলো।

সাঁইত্রিশ

ডাইনী নাকপোলিবার গুহা।

এখান থেকে দক্ষিণ পাহাড়ের ঢালু উপত্যকাটা অনেক নীচে নেমে সমতল হয়ে গিয়েছে। ওদিকে টিজু নদীর বাঁকা রেখাটা একটা নীল ঝিলিকের মত দেখায়। খানিকটা হালকা সাদা কুয়াশা পাহাড়ের চূড়াটা ঘিরে ঝুলছে। চারপাশে ভয়ানক গলায় চিৎকার করে উঠছে আউ পাখির ঝাঁক। খাসেম বনে তীক্ষ্ণ ঠোঁট দিয়ে ঠকঠক শব্দ করছে খারিমা পতঙ্গের দল। নাকপোলিবার গুহা থেকে যতদূর নজর ছড়ানো যায়, শুধু একটানা, অবাধ এবং উদ্দাম বন। সেই বনে পৃথিবীর প্রাণশক্তির আদিম শ্যামায়িত প্রকাশ।

নাকপোলিবার গুহা থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে পাহাড়ী জনপদগুলি গড়ে উঠেছে।

পাহাড় থেকে একটু একটু করে অন্ধকার সরে যাচ্ছে। পুবের আকাশটা আবছা দেখাতে লাগলো। তারপর ছায়া-ছায়া রঙের আলো এসে পড়লো সামনের বনে।

গুহার মধ্যে চুপচাপ বসে রয়েছে দুটি উলঙ্গ নারীদেহ। ডাইনী নাকপোলিবা আর সালুনারু। দু জোড়া চোখ সামনের দিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে রয়েছে।

পাথরের ভাঁজে ভাঁজে রক্তাভ আগুনের আভাস। একপাশে একটা অগ্নিকুণ্ড। খাটসঙ কাঠ পুড়ছে। রহস্যময় আলো ছড়িয়ে রয়েছে গুহার মধ্যে।

ডাইনী নাকপোলিবা শীর্ণ শরীরটাকে ঘষতে ঘষতে সালুনারুর কাছাকাছি টেনে আনলো। এর মধ্যে সালুনারুর সমস্ত দেহে, গলায়, বুকে পেটে, জানুতে আরেলা পাতার রস দিয়ে রাশি রাশি উল্কি আঁকা হয়েছে। পৃথিবীর আদিম শিল্প। কঙ্কাল, বুনো মোষের মাথা, বাঘের থাবা এবং বানরের চোখের ছবি।

সালুনারুর বুকের ওপর একটা কঙ্কালসার হাত বিছিয়ে দিলো ডাইনী নাকপোলিবা। কিছুদিন আগে হলেও আতঙ্কে হৃৎপিণ্ডটা ধক্ করে উঠতো

সালুনারুর। কিন্তু এর মধ্যে দেহেমনে অনেকখানি দুঃসাহস সঞ্চয় করে নিয়েছে সালুনারু।

নির্দাত দুটো মাড়ি খিঁচিয়ে নাকপোলিবা বললো, "এই কদিনে তুই সব মন্ত্রতন্ত্র শিখে নিলি। মাগী-মরদ বশ করার মন্ত্র। বুকের রক্ত জল করার মন্ত্র। আনিজা ডাকার মন্ত্র। ভূমিকম্প থামানোর মন্ত্র। ঝড়তুফান ডাকার মন্ত্র। বাঘ আর বুনো মোষ পোষ মানাবার মন্ত্র। বৃষ্টি থামাবার, বৃষ্টি নামাবার মন্ত্র। পাহাড়ের ধস্ থামাবার মন্ত্র। রক্ত বমি করাবার মন্ত্র। মাগীদের বিয়োবার সময় আসান দেবার মন্ত্র।"

"হু-হু।" মাথা ঝাঁকিয়ে ঝাঁকিয়ে সায় দিলো সালুনারু। তারপর নির্নিমেষ ভয়ানক দৃষ্টিতে নাকপোলিবার দিকে তাকিয়ে রইলো।

নাকপোলিবা আবারও বললো, "তুই তো এখন রীতিমত ডাইনী হয়ে গেলি। কত বছর ধরে এই গুহায় বসে রয়েছি, তার কি হিসেব আছে! সেবার ভূমিকম্পের দাপটে টিজু নদীর মুখ ঘুরে গেলো। আগে কি এখানে বন ছিলো? ছিলো না। সেই বন গজাতে দেখলুম। দক্ষিণ পাহাড়ের মাথায় অঙ্গামীদের বস্তি ঘেঁষে লাল রঙের একটা পাহাড় উঠলো। তা দেখলুম। সে সব ব্যাপার তিরিশ কি পঞ্চাশ বচ্ছর আগের। আগে তো গুহা থেকে বের হতুম। পাহাড়ের ডগায় দাঁড়িয়ে দেখতুম অঙ্গামীদের বস্তিতে সাদা ধবধবে সব মানুষ আসতে লগলো। হুন্টসিঙ পাখির পালকের মত ধবধবে রঙ। তাদের নাম না কি সায়েব। কত দেখলুম রে সালুনারু। কত বছর ধরে এই পাহাড়ে বেঁচে রয়েছি।" জীর্ণ হাড়সার দেহটাকে প্রবল ঝাঁকানি দিয়ে একটা দীর্ঘশ্বাস পড়লো নাকপোলিবা ডাইনীর।

একটু সময় চুপচাপ কাটলো। তারপর আবার শুরু করলো নাকপোলিবা, "এতদিন তো এই পাহাড়ে রইলুম। এত মন্ত্র শিখলুম, এত গুণতুক শিখলুম। এত ওষুধ করা শিখলুম। সারাদিন এই গুহায় বসে থেকে থেকে ভাবতুম, কাকে এই সব মন্ত্র, এত ওষুধ শিখিয়ে যাই। তোকে এসব দিয়ে এবার ভাবনা দূর হলো। অনেক কাল বাঁচলুম। এবার নির্ঘাত লোপাট হয়ে যাবো।"

এই ক-টা মাসের প্রতিটি মুহূর্তে পরম মনোযোগে, অখণ্ড একাগ্রতায় ডাইনী নাকপোলিবার কাছ থেকে পৃথিবীর আদিম মন্ত্রগুপ্তির সন্ধান নিয়েছে সালুনারু। একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পাঠ নিয়েছে ভীষণের, ভয়ঙ্করের, মন্ত্রের, তন্ত্রের এবং ওষুধের। এই পাহাড়ের কোন অন্ধিসন্ধিতে, কোন গুহায় কি সুড়ঙ্গে, কোন

উপত্যকায়, কোন জঙ্গলের আড়ালে-আবডালে রয়েছে গুণ্‌ পাতা, রয়েছে সাঙলিক লতা, রয়েছে খুঙা গাছ, কোন জলপ্রপাতের নীচে রয়েছে কমলা-রঙের পাথর, কোথায় রয়েছে সাদা পিঁপড়ের ঢিবি, রয়েছে তিনশো বছরের পুরনো মানুষের করোটি, রয়েছে মন্ত্রসিদ্ধির অসংখ্য উপকরণ—বানরের মেটলী, বাঘের হাড়, তাজা জোয়ানের হলদে মগজ, জোয়ানী মেয়ের কলিজা, সব, সবই জেনে নিয়েছে সালুনারু।

সালুনারু বললো, "সবই তো শিখলুম। এবার এই মন্ত্র আর ওষুধ কেলুরি আর সালুয়ালাঙ বস্তির সব শয়তানগুলোর ওপর চাপাবো। সব কটার রক্ত জল করে খতম করবো। হু-হু, তবে আমি পাহাড়ী ডাইনী।" চোখের মণিদুটো বনবন করে পাক খেতে লাগলো সালুনারুর। এই মুহূর্তে তাকে একটা জখমী সাপিনীর মত ভীষণ দেখাচ্ছে। গলার শিরাগুলো ফুলিয়ে সে চেঁচাতে লাগলো, "কেলুরি বস্তির সদ্দার আমাকে ভাগিয়ে দিলো। সালুয়ালাঙ বস্তির উপকার করতে গেলুম। সেখানেও শয়তানরা আমাকে ফুঁড়তে চায়। আমার মাংস দিয়ে কাবাব বানিয়ে বস্তিতে ভোজ দিতে চায়। দুটো বস্তির একটা কুত্তাকেও আমি জ্যান্ত রাখবো না। হু-হু—" উল্কি-আঁকা কুপিত বুকখানা ফুলে ফুলে উঠতে লাগলো সালুনারুর। উত্তেজনায় দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ হতে লাগলো। বললো, "একটা বস্তিতেও আমাকে টিকতে দিলো না টেফঙের বাচ্চারা।"

কোটরের মধ্যে দু টুকরো জলন্ত অঙ্গার। নাকপোলিবার চোখ। একটু একটু করে চোখজোড়া বুঁজে এলো। মাথা নাড়তে নাড়তে নাকপোলিবা বললো, "হু-হু, আমাকেও একদিন বস্তিতে টিকতে দেয় নি শয়তানেরা।"

"কেন, তোর আবার কী হলো? তুই কেন বস্তিতে যাবি? জন্মেই তো তুই ডাইনী হয়েছিস। লোকে বলে, তুই এই গুহার মধ্যে থেকেছিস সারা জনম।" সালুনারুর গলাটা বিস্ময়ে কেঁপে গেলো।

"ইজা হুবুতা!" দাঁতহীন মাড়িজোড়া বের করে খেঁকিয়ে উঠলো নাকপোলিবা, "জন্মেই কি কেউ ডাইনী হয় না কি? আমি যখন জন্মেছিলুম তখন এই কেলুরি বস্তিও ছিলো না, সালুয়ালাঙও নয়। দুটো মিলিয়ে একটা বড় বস্তি ছিলো। তার নাম কুরগুলাঙ। সেই কুরগুলাঙ বস্তিতে আমার জন্ম। আমার সময়কার একটা মানুষও আজ বেঁচে নেই।"

"থাক ওসব কথা।" অসহিষ্ণু গলায় সালুনারু বলে উঠলো, "তুই কেমন

করে ডাইনী হয়েছিস সেই গল্পটাই বল দিকি। বড় মজা লাগছে সে কথা শুনতে।” আগ্রহে, প্রবল ঔৎসুক্যে নাকপোলিবার কাছে এগিয়ে এলো সালুনারু।

“শোন তবে। আমিও এককালে তোদের মত জোয়ান মাগী ছিলুম। মনে সোয়ামী পুত্তুর আর ঘরের জন্যে সাধ আহ্লাদ ছিলো।”

আশ্চর্য! ডাইনী নাকপোলিবার চোখজোড়া এখন আর জ্বলছে না। কী এক কোমল আবেগে মনটা তার মাখামাখি হয়ে গেলো। একটা কঙ্কালদেহ। নিখাদ হাড় আর চামড়ার কাঠামো। মাংসের এতটুকু ভেজাল নেই নাকপোলিবার শরীরে। একটা ভয়ঙ্কর ডাইনী, একটা জীবন্ত প্রেতিনী। কিন্তু এই মুহূর্তে তাকে একেবারে মন্দ দেখাচ্ছে না। জীর্ণ বুকের নীচে ধুকধুক হৃৎপিণ্ডে এককালে যে আর দশটা কুমারী মেয়ের মতই বাসনা এবং কামনা জলদ্ বাজনার মত একযোগে বেজে উঠতো, তা যেন মিথ্যে নয়। ডাইনী নয়, এই মুহূর্তে নাকপোলিবার মধ্য থেকে চিরকালের এক বুভুক্ষু নারীমন হাহাকার করে উঠছে। সে নারীর সুঠাম দেহে রূপ ছিলো। মনের পরতে পরতে রঙ ছিলো। আশা ছিলো ভোগের। বাসনা ছিলো উপভোগের। কামনা ছিলো একটি বলিষ্ঠ পুরুষের। একটি প্রেমিক স্বামীর। তার নির্দয় পেষণের, নির্মম সোহাগের।

ভাঙা ভাঙা, কিছুটা বা বিষণ্ন গলায় নাকপোলিবা বলে চললো, “বিয়েও হয়েছিলো। কিন্তু তখনও কি জানতাম, আমি বাঁজা! এক বছর গেলো, দু বছর গেলো। তিন বছর সোয়ামীর সোহাগ ভোগ করেও একটা বাচ্চার জন্ম দিতে পারলুম না। বর্শা উঁচিয়ে সোয়ামী আমাকে ভাগালে। বাঁজা বউ ঘরে পুষলে না কি আনিজার গোঁসা এসে পড়ে। চলে এলুম বাপের কাছে। বাপ লম্বা দা বাগিয়ে ধরলে। তিন বছর সোয়ামীর ঘর করে যে মাগী বাচ্চা বিয়োতে পারে না, নির্ঘাত তার ওপর আনিজার খারাপ নজর আছে। তাকে ঘরে জায়গা দিলে সব জানে সাবাড় হয়ে যাবে। ভয়ে এই দক্ষিণ পাহাড়ে পালিয়ে এলুম। তিন দিন তিন রাত বনে বনে ঘুরে আখুশি ফল খেয়ে কাটিয়ে দিলুম। তারপর দেখা হলো ডাইনী রসিলটাকের সঙ্গে।”

“রসিলটাক আবার কে?” অপরিসীম কৌতূহলে এবং গল্প শোনার নেশায় আরো ঘন হয়ে বসলো সালুনারু।

“এই গুহায় সে থাকতো। সে-ও ডাইনী ছিলো। আমাকে সব মন্ত্রতন্ত্র

শেখালো সে, ওষুধ শেখালো, গুণতুক শেখালো। পোয়াতি মাগীর পেট খসাবার কায়দা শেখালো। সব শিখে সোয়ামীকে মারলুম আগে। তারপর বাপকে।" ডাইনী নাকপোলিবা থামলো। উত্তেজনায় তার ছোট্ট জীর্ণ বুকটা ওঠানামা করছে। ঘন ঘন, দ্রুততালে বুক ভরে বার কয়েক বাতাস নিলো নাকপোলিবা। বললো, "একদিন রসিলটাক মরলো। তার জায়গায় আমি রয়েছি। বাঁজা বলে সোয়ামী আর বাপ ঘরে থাকতে দিলে না। নইলে কি আর ডাইনী হতুম! যাক সে সব কথা। আমি মরলে আমার জায়গায় তুই থাকবি। তোর মরার সময় তোর জায়গায় নতুন ডাইনী বানিয়ে যাবি। যারা আমাদের বস্তিতে থাকতে দেয় না, তাদের শায়েস্তা করতে হবে। নিজেদের দোষ নেই; এই ধর আমি বাঁজা, তুই আনিজার নামে রুখে উঠেছিলি, অমনি আমাদের বস্তি থেকে ভাগিয়ে দিলো। ওরাই তো আমাদের ডাইনী করে। যেমন আমাদের ডাইনী বানায়, তেমনি তার ঠ্যালা সামলাক।"

"হু-হু, ঠিক বলেছিস।" মাথা নেড়ে নেড়ে নাকপোলিবার কথায় সায় দিলো সালুনারু। বললো, "হুই রামখোর বাচ্চারাই তো আমাদের ডাইনী বানায়। একটু একটু করে তার শোধ তুলবো। তোর কাছে ওষুধ শিখলুম, মন্তর শিখলুম। এবার কেলুরি আর সালুয়ালাঙ বস্তির সব শয়তানগুলোর ওপর সেই মন্তর আর ওষুধ ঝাড়বো। হু-হু—"

"হু-হু, সব লোপাট করে দে। এই পাহাড়ে একটা মানুষও জ্যান্ত রাখবি না। সবগুলোকে মেরে তাদের হাড়ের ওপর মাংসের ওপর বসে বসে মজা করে খুলি বাজাবি। এই পাহাড়ী শয়তানগুলো আমাদের ঘর দেয় নি, একটু থাকবার জায়গা দেয় নি। একটু পিরীত করে নি। তাদের সঙ্গে কোন খাতির নেই। তুই আর আমি সব সাবাড় করে এই পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াবো। কী বলিস? হিঃ-হিঃ-হিঃ—" বীভৎস গলায় টেনে টেনে হেসে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা। সালুনারুর মনে হলো, হাসির দমকে বুকের হাড়গুলো তার মটমট করে ভেঙে যাবে।

অবিরাম হাসি। খরধার হাসি। সে হাসি গুহার ছমছম আলোছায়ায় মিশে যেতে লাগলো। একটু আগে ডাইনী নাকপোলিবার হিসাবহীন বয়সের অতল থেকে যে কোমল নারীমনটি, যে সুন্দর আকাঙ্ক্ষাগুলি উঁকি মেরেছিলো, এই ভীষণ হাসির হুমকিতে তারা আবার পলাতক হয়েছে।

কিছুদিন আগে হলেও ভয়ে আতঙ্কে শিউরে উঠতো সালুনারু। কিন্তু

এতদিন ধরে নাকপোলিবার শরীরে শরীর ঠেকিয়ে, একান্ত ঘনিষ্ঠ হয়ে বসে মন্ত্রতন্ত্র, গুণতুক, বশীকরণ শিখতে শিখতে ভয়ডর চলে গিয়েছে। আজকাল নাকপোলিবাকে তেমন ভয়ঙ্কর মনে হয় না। হয়তো মনেপ্রাণে নাকপোলিবার সঙ্গে একাকার হয়ে গিয়েছে সালুনারু। নির্বিকার ভঙ্গিতে পাথরের ওপর বসে রইলো সালুনারু। অপলক চোখে দেখতে লাগলো, কেমন করে ডাইনী নাকপোলিবার কোটরচোখে একজোড়া আগুনের গোলক জ্বলছে আর নিবছে।

এক সময় হাসি থামলো। আশ্চর্য সহজ গলায় নাকপোলিবা বললো, "আচ্ছা সালুনারু, আমার সব বিদ্যে তো তোকে দিলুম। একেবারে প্রথমে কার ওপরে এই বিদ্যে হাঁকড়াবি? কী রে?" সুন্দর অন্তরঙ্গতার সুর ফুটে উঠলো কথাগুলোতে।

"কার ওপর হাঁকড়াবো?" ক্রূর চোখে তাকালো সালুনারু। তার তামাটে কোমল দেহটা একটু একটু করে কঠিন, ভয়ানক এবং নির্মম হয়ে উঠতে লাগলো। মুখটা হিংস্র হয়ে উঠলো। একটা আদিম এবং কুটিল প্রতিজ্ঞা জ্বলতে লাগলো দুচোখে। দাঁতে দাঁত ঘষে ভুরু কুঁচকে সালুনারু বললো, "সবচেয়ে আগে হাঁকড়াবো তোর ওপর। তুই আমার সোয়ামীকে খাদে ফেলে মেরেছিস। সোয়ামী মরেছে বলে আমি বস্তিতে টিকতে পারলুম না। আমাকে ডাইনী হতে হলো। তোকেই- "

"আহে ভু টেলো!" সাঁ করে একপাশে সরে গেল ডাইনী নাকপোলিবা। বললো, "আমাকে মারবার জন্যে এখানে এসে ডাইনী হয়েছিস!" মাড়ি খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো নাকপোলিবা। তারপরেই পাশ থেকে একটা বুনো মোষের হাড় বের করে আনলো। হাড়টার দু পাশ পাথরে ঘষে ঘষে রীতিমত ধারালো করা হয়েছে। প্রচণ্ড গলায় গর্জে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা, "আমাকে সাবাড় করতে এসেছিস? এই গুহার মধ্যে থেকে জান নিয়ে আর ফিরতে হবে না। একেবারে টুকরো টুকরো করে কাটবো তোকে।" মোষের হাড়খানা সালুনারুর মাথার ওপর তুলে ধরলো নাকপোলিবা।

ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যেতো। কিন্তু তার আগেই প্রবলভাবে গুহাটা কেঁপে উঠলো। বাইরে বিরাট বিরাট পাথরের চাঁই নামার আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। গমগম শব্দ হচ্ছে।

কাতর গলায় চেঁচিয়ে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা, "ভূমিকম্প, ভূমিকম্প শুরু হয়েছে লো সালুনারু।"

চমকে উঠলো সালুনারু। একটি মাত্র মুহূর্ত। সঙ্গে সঙ্গে হামাগুঁড়ি দিয়ে গুহার মধ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে গেলো একটা উলঙ্গ যুবতীদেহ। সামনের উপত্যকায় যে বন নিবিড় হয়ে রয়েছে, তার মধ্যে নিমেষের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো সালুনারু।

গুহার মধ্যে একটা করুণ গলা শোনা গেলো। ডাইনী নাকপোলিবা ককিয়ে উঠেছে, "তুই একা যাস নি সালুনারু। আমাকে বাঁচা; পাহাড়টা নেমে আসছে। আমি যে বেরুতে পারছি না।"

শুধু গুম গুম শব্দ করে বিরাট বিরাট পাথর নামার শব্দ হচ্ছে। বিকট আওয়াজে পাহাড়ী অরণ্য ধরাশায়ী হচ্ছে। এগুলোর সঙ্গে জলপ্রপাতের গর্জন একাকার হয়ে মিশে গিয়েছে। একটা ভয়ঙ্কর প্রলয় এই পাহাড়কে গুঁড়িয়ে চুরমার করে দেবার জন্যই যেন হু-হু করে ধেয়ে আসছে। এই সমস্ত শব্দ ছাড়া উপত্যকা থেকে মানুষের গলা শোনা গেলো না। আশেপাশে কোথায়ও নেই সালুনারু।

পাহাড়ী ভূমিকম্প। ভয়াল এবং ভয়ঙ্কর। নির্মম। নিষ্ঠুর। নাকপোলিবার গুহার ছাদ একটু একটু করে নেমে আসছে। ভাঁজে ভাঁজে পাথর ফেটে প্রচণ্ড শব্দ হচ্ছে। পেন্যু কাঠের মশাল দুটো নিবে গিয়েছে। নিশ্ছেদ অন্ধকার। সেই কঠিন জমাটবাঁধা অন্ধকারে এই গুহার একটা আদিম প্রাণকে খতম করে দেবার আনন্দে পাহাড়টা নেমে আসছে মাথার ওপর।

বিকট গলায় আর্তনাদ করে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবা। কিন্তু সেই আওয়াজ ধসনামা আর বনভাঙার শব্দের মধ্যে চাপা পড়ে গেলো। নাকপোলিবা গোঙাতে গোঙাতে বলতে লাগলো, "আমি তোকে মারবো না সালুনারু। তুই আমাকে বাঁচা। আমি পথ দেখতে পাচ্ছি না। সব অন্ধকার। ছাদটা যে নেমে আসছে! আ-উ-উ-উ—"

এবড়ো-খেবড়ো ছাদটা নেমে আসছে। হাত থেকে বুনো মোষের হাড়খানা খসে পড়লো ডাইনী নাকপোলিবার। কয়েকটা মাত্র নিষ্ক্রিয় মুহূর্ত। তারপরেই ধারাল পাথুরে মেঝের ওপর দিয়ে বুকে হেঁটে হেঁটে সুড়ঙ্গমুখের দিকে এগুতে লাগলো নাকপোলিবা।

বাইরে প্রচণ্ড শব্দ করে পাথরের চাঙড় নামছে। ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে খাসেম বন। অসংখ্য শিকড় মেলে পাথুরে মাটি আঁকড়ে যে পাহাড়ী বন উদ্দাম হয়ে উঠেছিলো, ভূমিকম্পের এলোপাথাড়ি বাড়ি খেয়ে তারা লুটিয়ে পড়ছে।

বুক হিঁচড়ে সামনের দিকে এগুতে এগুতে আচমকা সমস্ত শরীরটা ঝংকার দিয়ে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবার। জীর্ণ বুকের মধ্যে যে নিথর হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করে শব্দিত হতো, সেটাকে ঝাঁকিয়ে কাঁপিয়ে অদ্ভুত শিহরণ খেলে গেলো। শুকনো শরীরের শীর্ণ শিরায় শিরায় আচমকা রক্তের মাতামাতি ছুটাছুটি শুরু হলো। এগিয়ে আসতে আসতে থমকে গেলো ডাইনী নাকপোলিবা। এতক্ষণে তার মাথাটা গুহার মধ্য থেকে বাইরে বেরিয়ে এসেছে। কিন্তু দেহটা সুড়ঙ্গের মধ্যেই রয়ে গিয়েছে।

একটু আগে সে ভয় পেয়েছে। পাহাড়ী ভূমিকম্প তাকে মৃত্যুর আতঙ্কে জর্জর করে তুলেছিলো। ডাইনীর জীবনে, তার দেহ-মন-বোধ কিংবা চেতনায় এবং ভাবনায় এগুলোর অস্তিত্ব নেই। ভয় নামে কোন অনুভূতি, আতঙ্ক নামে কোন শিহরণ, মৃত্যু নামে কোন বিভীষিকা ডাইনীর মনে থাকতে নেই।

ডাইনী নাকপোলিবা। এই পাহাড়ী জগতের সমস্ত মন্ত্র-তন্ত্র, সমস্ত আদিমতা এবং হিংসাকে শ্রুতিতে, স্মৃতিতে, ভাবনায় এবং ধারণায় ধারণ করে এই গুহায় নির্বাসিত হয়ে রয়েছে। সে নিজেই তো এক বিভীষিকা, ভয়ের জীবন্ত মূর্তি। এই পাহাড়ের সমস্ত মৃত্যু এবং অপঘাত তো তারই একটি ইঙ্গিতের অপেক্ষায় ওত পেতে থাকে। সে ডাইনী নাকপোলিবা। সে ভয় পেয়েছে। তার শিক্ষাদীক্ষা এবং কর্তব্য সে ভুলে গিয়েছিলো। ভীষণ এক অপরাধবোধে, মারাত্মক এক ধরনের পাপাচরণের অনুভূতিতে সমস্ত অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো ডাইনী নাকপোলিবার। ডাইনী হওয়ার যোগ্যতা তার নেই। রসিলটাকের মন্ত্রশিষ্যা হওয়ায় বিন্দুমাত্র সামর্থ্য তার নেই। রসিলটাকের নির্দেশগুলো সে ভুলে যাচ্ছে। ভুলে যাচ্ছে সমস্ত মন্ত্র। সমস্ত তন্ত্র।

আচমকা বহুকাল আগের এক জোয়ানী মেয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠলো। বাঁজা হওয়ার অপরাধে এই পাহাড় তাকে আশ্রয় দেয় নি। সোয়ামী স্বীকৃতি দেয় নি স্ত্রীর। বাপ স্বীকৃতি দেয় নি মেয়ের। সেদিন সেই জোয়ানী জনপদ থেকে অনেক, অনেক দূরে দক্ষিণ পাহাড়ের এই নির্জন উপত্যকায় এই গুহায় ডাইনী রসিলটাকের কাছে আশ্রয় নিয়েছিলো। রসিলটাকের উত্তরকাল সে। সেই যৌবনবতী নারীর ভাবনা এই মুহূর্তে বড়ই অসত্য, বড়ই অবাস্তব এবং নিছক মনোবিলাস ছাড়া আর কিছু নয়। তবু নাকপোলিবা তার কথা ভাবলো। কেন ভাবলো, সে-ই জানে। আরো

ভাবলো, সেদিনের তামাটে রঙের বাঁজা জোয়ানীর চেয়ে আরো একটা ভয়ানক সত্য আছে। সেই সরস যুবতী আজ মিথ্যে এবং অতীত। ডাইনী নাকপোলিবাই আজ সত্য, ভীষণ এবং সাত্ঘাতিক সত্য।

ডাইনী নাকপোলিবা ভয় পেয়েছে। তবে কি এই পাহাড়ে অসংখ্য বছর কাটিয়ে জীবনের অন্তিম সময়ে আনিজার কোপ এসে পড়লো তার ওপর! বুকের মধ্যটা কি ভয়ে ছমছম করে উঠছে ডাইনী নাকপোলিবার!

না। ভয় পেলে তার চলবে না। রসিলটাকের শিক্ষা এবং এই পাহাড়ের আদিম মন্ত্রতন্ত্রগুলিকে সে ব্যর্থ হতে দেবে না। রসিলটাক তাকে ভূমিকম্প থামানোর মন্ত্র শিখিয়েছিলো। মন্ত্র পড়ে এই ভূমিকম্পকে দক্ষিণ পাহাড় থেকে চিরকালের জন্য খেদিয়ে দেবে নাকপোলিবা। গুহা থেকে সে বাইরে যাবে না। কিছুতেই এখান থেকে সে পালাবে না।

পাহাড়ের অন্তরাত্মা থরথর করে কাঁপছে। গুহাটা টলমল করছে। ওপর থেকে নীরেট ছাদটা নেমে আসছে। না, কিছুতেই ছাদকে আর নামতে দেওয়া হবে না। সুড়ঙ্গের বাইরে মাথাটা এবং ভিতরে বাকি দেহটা পড়ে রয়েছে ডাইনী নাকপোলিবার।

নাকপোলিবা ভাবলো, রসিলটাকের এই গুহাকে কিছুতেই ধ্বংস হতে দেওয়া যাবে না। আচমকা তীব্র তীক্ষ্ণ একটানা গলায় মন্ত্র পড়তে শুরু করলো সে।

ওহ ই-য়ি—এ-হে—এ-এ
ওহ ই-ই-য়ি—সুঙকেনি—ই-ই-ই—
আমহু লেথসু—সুঙকেনি—ই-ই-ই—
অমুকেবঙ সঙ—সুঙকেনি—ই-ই-ই—
ওহ ই—ই-ই-য়ি—এ-হে-এ-এ
সঙ—সুঙকেনি—ই-ই-ই—

ছাদটা আরও নেমে আসছে। ডাইনী নাকপোলিবার পিঠে তার হিমাক্ত ছোঁয়া এসে লেগেছে।

বাইরে ধস নামার গর্জন। অরণ্য ধ্বংসের আর্তনাদ। জলপ্রপাতের গর্জন। সব মিলিয়ে একটা বিকট প্রলয়। সমস্ত কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে নাকপোলিবার গলা। অনেক, অনেক দিন পর সে মন্ত্র পড়তে শুরু করেছে। একটু আগে ভয় পেয়ে শিক্ষাদীক্ষা সব ভুলে গিয়েছিলো ডাইনী নাকপোলিবা।

এই মুহূর্তে তার প্রায়শ্চিত্ত করতে হচ্ছে। আরো, আরো জোরে দেহমনের সমস্ত উত্তেজনা ও শক্তি গলায় একত্র করে চিৎকার করতে লাগলো ডাইনী নাকপোলিবা। না, রসিলটাকের শিক্ষাকে, এই নাগা পাহাড়ের গুহায়-সুড়ঙ্গে-উপত্যকায়-মালভূমিতে আদিম জীবনের যে মন্ত্রগুপ্তি ছড়ানো রয়েছে, তাকে বিফল হতে দেওয়া যাবে না। কিছুতেই নয়। এই ভূমিকম্পকে সে শাসন করবে।

পাথুরে ছাদটা আরো, আরো নেমে এলো। আচমকা, একান্তই আচমকা ডাইনী নাকপোলিবার মন্ত্র থেমে গেলো। একটা ভয়ঙ্কর আদিম প্রাণ চিরকালের জন্য স্তব্ধ হলো।

আটত্রিশ

উপত্যকায় উপত্যকায় ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রি। ছায়া-ছায়া ফিকে জ্যোৎস্না। মোরাঙের এই মাচাগুলো থেকে দূরের বন এবং পাহাড়ের চূড়াকে বড় রহস্যময় মনে হয়। টিজু নদীর আঁকাবাঁকা নীল শরীরটাকে আবছা দেখায়। পুব-পশ্চিম-উত্তর-দক্ষিণের পাহাড়ের মাথায় মাথায় বিবর্ণ চাঁদের আলো পাতলা পর্দার মত জড়িয়ে রয়েছে।

বাঁশের মাচানে শুয়ে শুয়ে দূরের পাহাড়ে দৃষ্টিটা ছড়িয়ে দিয়েছিলো সেঙাই। তার চোখে আকাশ-নদী-বন-পাহাড়ের ছবি পড়ছিলো না। সে ভাবছিলো, তার মনে হচ্ছিলো, সামনের বনে আরেলা ফুলের মত একটি পরম রমণীয় মুখ ফুটে রয়েছে। সে মুখ মেহেলীর। সে মুখের রূপে এই তুঙ্গ পাহাড়ী পৃথিবী সুন্দর হয়ে উঠেছে। শুধু এই পাহাড়ই নয়, সেঙাইর অস্ফুট বুনো মনটাও আমোদিত হয়ে উঠেছে।

সেঙাই ভাবলো। মাঝখানে আর দুটো মাত্র মাস। একটি মাত্র ঋতুর ব্যবধান। নট্‌সে ঋতু। বর্ষার মরশুম। অশ্রান্ত বৃষ্টির দিনগুলো পেরিয়ে আসবে তেলেঙ্গা সু মাস। সেই মাসের শেষের দিকে তাদের বিয়ে। মেহেলী। এক অপরূপা জোয়ানী। এক পার্বতী মনোরমা। সালুয়ালাঙ গ্রামের মেয়ে সে। তাদের শত্রুপক্ষ। দুটো মাস পরেই নট্‌সে ঋতুর উৎসব শেষ হলে মেহেলী তার কাছে ধরা দেবে। দেহমন সঁপে দেবে। নিবিড় হবে। অন্তরঙ্গ হবে। এই মোরাঙের মাচানে শুয়ে শুয়ে তার যে পৌরুষ সমস্ত রাত্রি অতৃপ্ত, উত্তেজিত হয়ে থাকে, তাকে তৃপ্ত শান্ত এবং সার্থক করে তুলবে মেহেলী।

খাসেম বনের ঘনছায়ায় একটি নিভৃত সংসার। খড়ের চাল, বাঁশের দেওয়ালে ঢাকা সুন্দর ঘর। সামনে দুষ্ট আনিজা বিতাড়নের জন্য গোলাকার বিড়ুই পাথর পোঁতা থাকবে। ঘরের পাটাতনের নীচে বাঁশের খাটাল বানিয়ে শুয়োর আর বনমোরগ রাখা হবে। সুস্বাদু গৃহস্থালির কল্পনায় মনটা উদ্বেল হয়ে উঠলো সেঙাইর।

বুড়ো খাপেগা আর বুড়ী বেঙসানু দুটো পাকা মাথা এক করে, রোহি মধু

ভরা বাঁশের চোঙায় তারিয়ে তারিয়ে চুমুক দিতে দিতে তাদের বিয়ের দিন ঠিক করে দিয়েছিলো। তেলেঙ্গা সু মাসে আকাশে যেদিন স্পষ্ট হয়ে ছায়াপথটা ফুটবে, তারায় তারায় আকাশ ছেয়ে যাবে, চাঁদ উঠবে, সেই সু-লু (শুক্ল) পক্ষে তাদের বিয়ে হবে।

উত্তর দিকে গোটা পাঁচেক পাহাড় পেরিয়ে গেলে ইটিয়াগা নামে একটা বড় রকমের গ্রাম পাওয়া যায়। সেখানে আশেপাশের বিশটা গ্রামের বিয়ের পুরুত বুড়ো হিবুটাক থাকে। সকলের কাছে তার খুব খাতির। বুড়ো খাপেগা এবং বুড়ী বেঙসানু বিয়ের মন্ত্র পড়ার দরুন নগদ দশটা বর্শা, চাকভাঙা খাঁটি মধু আর খান-দুই এড়ি কাপড় আগাম দিয়ে এসেছে।

বুকের মধ্যটা দুমড়ে-মুচড়ে একটা হাহাকার যেন বেরিয়ে আসতে চায় সেঙাইর। দু-দুটো মাসের ব্যবধান। কতদিন পর বিয়ের সময় আসবে! অধীর অস্থির এবং শেষ পর্যন্ত উত্তেজিত হয়ে উঠলো সেঙাই। বিয়ের রীতি অনুযায়ী এই দুটো মাস তার সঙ্গে মেহেলীর কথাবার্তা বলা কিছুতেই সম্ভব নয়। যে তারিখে বিয়ের লগ্ন ধার্য হয়, তার পর থেকে সেই লগ্ন না আসা পর্যন্ত পাত্রপাত্রী মুখোমুখি হলে কিংবা একজন অপরকে দেখে ফেললে সে বিয়ে অসিদ্ধ হয়। সে বিয়েতে পাপের স্পর্শ লাগে। কলঙ্ক লাগে স্খলনের, চরিত্র-পাতের। পাহাড়ী প্রথা বড় নির্মম, নিষ্ঠুর। সেখানে এতটুকু মমতা নেই।

দু-দুটো মাস। অথচ মাত্র পাঁচটা টিলা পেরিয়ে গেলে বুড়ো খাপেগার কেসুঙ পাওয়া যাবে। সেখানে ভেতরের ঘরে মেহেলী রয়েছে।

আচমকা সেঙাইর মনটা যেন কেমন করে উঠলো। কোহিমা থেকে ফিরে আসার পর মনের মধ্যে নতুন এক ধরনের উপসর্গ দেখা দিয়েছে। ভাবতে শিখেছে সেঙাই। শুয়ে বসে কিংবা অলস পায়ে হাঁটতে হাঁটতে ভাবতে বেশ লাগে। নিজের অজান্তেই ভাবনার ক্রিয়া চলে।

এতকাল প্রত্যক্ষ জগৎ, স্থূল ইন্দ্রিয়গোচর বস্তুগুলো ছাড়া অন্য কোন কথা ভাবতে পারতো না সেঙাই। কিন্তু কোহিমায় গিয়ে তার চিন্তাধারায় এবং ভাবনার জগতে তীব্র আলোড়ন লেগেছে। আজকাল দৃষ্টিগ্রাহ্য বস্তু ছাড়া আরো অনেক কিছু সে ভাবে, ভাবতে পারে। অন্তত ভাবতে চেষ্টা করে। ভাবনাগুলো নিয়মিত, সুশৃঙ্খল হয় না। তবু সেঙাই ভাবে। ভাবতে ভালো লাগে।

এখন, এই মুহূর্তে মেহেলীর মনের কথা ভাবতে লাগলো সেঙাই। মেহেলী

কি তারই মত ক্ষয়িত চাঁদের আকাশে দৃষ্টি ছড়িয়ে তার কথাই ভাবছে? সেঙাই যেমন ভাবছে, অস্থির ও উত্তেজিত হয়ে রয়েছে, ঠিক তেমনিই কি মেহেলী ভাবছে? অস্থির এবং উত্তেজিত হচ্ছে?

চোখদুটোকে বাইরের আকাশ থেকে মোরাঙের মধ্যে নিয়ে এলো সেঙাই। মোরাঙের দেওয়ালে দেওয়ালে বুনো মোষের মাথা, মানুষের করোটি, কালো রক্তের চিত্তির এবং হরিণের মুণ্ড গাঁথা রয়েছে। ক্ষয়িত চাঁদের আবছা আলোতে মোরাঙকে ভৌতিক দেখায়।

এখন মাঝরাত। আকাশ, চারপাশের পাহাড় এবং বনস্থলী আশ্চর্য নিঃশব্দ, নিথর।

পাশের মাচানগুলোতে অঘোরে ঘুমোচ্ছে জোয়ান ছেলেরা। ভোঁস ভোঁস শব্দে নাক ডাকছে। নাক ডাকার শব্দটা কেমন যেন লাগে সেঙাইর। জোয়ানদের মুখের উপর দৃষ্টিটাকে পাক খাইয়ে আনলো সেঙাই। বুড়ো খাপেগা আজকাল মোরাঙে শুতে আসে না। মেহেলী তাকে ধরমবাপ ডেকেছে। তার চরিত্র রক্ষার জন্য, বিয়ের আগে পর্যন্ত তার কৌমার্যকে অক্ষত রাখার জন্য সমস্ত রাত বুড়ো খাপেগা তাকে পাহারা দেয়।

সেঙাইর বাঁ পাশের মাচানে শুয়ে রয়েছে ওঙলে। নাক ডাকার প্রতিযোগিতায় সে-ই সবচেয়ে বেশি সশব্দ। সবচেয়ে প্রচণ্ড।

আচমকা ওঙলের নাকডাকা থেমে গেলো। মাচানের ওপর আড়মোড়া ভেঙে উঠে বসলো। ঢুলুঢুলু চোখে চারদিকে তাকাতে তাকাতে ঘুমমাখা গলায় ওঙলে ডাকলো, "সেঙাই, এই সেঙাই—"

"কী বলছিস ওঙলে? ঘুম ভাঙলো?"

"ওরে শয়তানের বাচ্চা। ঘুম আমার ভাঙলো? তুই তো জেগে বসে আছিস!" দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে ওঙলে বললো, "জেগে জেগে কী করছিস সেঙাই?"

"ভাবছি।" নির্বিকার ভঙ্গিতে সেঙাই বললো।

"কী ভাবছিস? পাহাড়ী জোয়ান হয়ে রাত্তির জেগে ভাবছিস! এ তো বড় তাজ্জবের কথা!" ছিলাছেঁড়া ধনুকের মত সাঁ করে উঠে দাঁড়ালো ওঙলে।

নির্লিপ্ত গলায় সেঙাই বললো, "মেহেলীর কথা ভাবছি।"

"হু-হু, সে তো ভাববার কথাই। দু মাস পরে তোর বিয়ে হবে। বউ পাবি। তোর কী মজা! আমাদের তো বিয়ে হবে না। এই মোরাঙের

মাচানে শুয়ে শুয়েই সারা জনম কাবার করতে হবে।" বুকের হাড়গুলোকে মটমট করে গুঁড়িয়ে বড় রকমের একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এলো ওঙলের।

"তোরও বিয়ে হবে। সদ্দার তোর বিয়েও ঠিক করে দেবে।" সেঙাই সান্ত্বনা দিল।

"না রে না! হুই সদ্দার হলো আস্ত একটা সাম্যুমেচু (ভয়ানক লোভী মানুষ)। ও কিছুতেই আমার বিয়ে দেবে না। আমার বিয়ে দিতে হলে ঘর থেকে যে নগদ বউপণ খসাতে হবে। জান থাকতে একটা বর্শা খরচ করবে হুই সদ্দার! হু!" নিরাশা-ব্যঞ্জক একটা শব্দ করে থেমে গেলো ওঙলে। আবছা আলোতে তার চোখজোড়া জ্বলতে লাগলো। সেঙাইর কাঁধে ঝাঁকানি দিয়ে ওঙলে আবার বললো, "দেখছিস না, মেহেলীর জন্যে তোদের কাছ থেকে কতগুলো খারে বর্শা বাগালো সদ্দার। মেহেলী তো ওর মেয়েই নয়। শত্তুরদের মেয়ে। তবু রেহাই দিলে না তোদের। হুঃ, ও দেবে আমাকে বিয়ে!"

একটুক্ষণ চুপচাপ। এক সময় শান্ত গলায় ওঙলে বলতে শুরু করলো, "আমার বিয়ের কথা চুলোয় যাক। যা বলছিলাম, মেহেলীর কথা কী ভাবছিলি রে সেঙাই?"

"দু মাস পরে বিয়ে হবে। এই দুটো মাস মাগীটার সঙ্গে তো দেখাও করতে পারবো না। মনটা কেমন জানি করছে। ছুঁড়িটার মুখটা খালি দেখছি। একদম ঘুম আসছে না।" কাতর মুখভঙ্গি করলো সেঙাই।

"মোটে তো দুটো মাস। দেখতে দেখতে কেটে যাবে। তারপরেই তেলেঙ্গা সু মাস। তুই ঘর বানিয়ে বউ নিয়ে মোরাঙ থেকে ভাগবি। এর জন্য আবার পাহাড়ী জোয়ান ভাবে না কি! কোহিমা থেকে ফিরে তোর ভাবাভাবিটা বড় বেড়েছে রে সেঙাই। তাগড়া জোয়ান, রাক্ষসের মত গিলবি। ভোঁস ভোঁস করে ঘুমুবি। ভাববার আবার কী আছে এর মধ্যে?" ওঙলে বলতে লাগলো, "নে, বকর বকর থামা। এবার ঘুমো দিকি। মাঝরাত পার হয়ে গিয়েছে অনেকক্ষণ।" বাঁশের মাচানে টান-টান হয়ে শুয়ে পড়লো ওঙলে। সঙ্গে সঙ্গে তার নাকডাকা শুরু হয়ে গেলো। ঘুমটাকে প্রচুর সাধনায় আয়ত্ত করেছে ওঙলে।

মাচানের ওপর উঠে বসলো সেঙাই। ব্যগ্র গলায় সে ডাকলো, "এই ওঙলে, এই, ঘুমিয়ে পড়লি নাকি? এই তো কথা বলছিলি!"

ওঙলে নিরুত্তর। নাকের গর্জন তার প্রমত্ত হয়ে উঠেছে। মাচান থেকে

নেমে ওঙলের পাঁজরায় একটা ধারালো নখ বসিয়ে দিলো সেঙাই, "এই ওঙলে, এই—"

"আহে ভু টেলো!" লাফিয়ে উঠলো ওঙলে। চেঁচিয়ে বললো, "টেফঙের বাচ্চাটা তো ঘুমুতে দেবে না দেখছি!" বিরক্তিতে ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো ওঙলের।

মোলায়েম গলায় সেঙাই বললো, "থাম থাম শয়তানের বাচ্চা। বেশি চেঁচামেচি করলে বর্শা হাঁকড়ে সাবাড় করে ফেলবো। এই জনমে আর ঘুমুতে হবে না। যা বলছি তার জবাব দে দিকি?"

ভারি রগচটা মানুষ ওঙলে। নির্নিমেষ রক্তাভ চোখে তাকিয়ে ছিলো।

দাঁতে দাঁত ঘষে সেঙাই বললো, "তুই তো রোজ সদ্দারের বাড়ি যাস: মেহেলী কী বলে রে? কেমন করে? তার কাছে যাওয়া আমার বারণ। সেই ফাঁকে মাগীটার সঙ্গে পিরীত-টিরীত জমাস নি তো?"

মাচানের পাশ থেকে সাঁ করে একটা বর্শা টেনে নিলো ওঙলে। হুমকে উঠলো, "একেবারে লোপাট করে ফেলবো। পরের মাগীর সঙ্গে আমি পিরীত জমাই না।"

"সে কথা তো আমি ভাবি। তুই আমার আসাহোয়া (বন্ধু)। তুই কি তা করতে পারিস! চেঁচামেচি করছিস কেন? বর্শাটা নামিয়ে রাখ। আপোসে কথা বল।"

মাথার ওপর উদ্যত বর্শার ফলা। অথচ গলাটা একটুও কাঁপছে না সেঙাইর, একটুও ভয় পায় নি। সেঙাই বললো, "দু মাস ছুঁড়িটার সঙ্গে দেখা হবে না। কী করি বল তো?"

"কী আবার করবি, মোরাঙে পড়ে পড়ে ঘুমুবি। আর যদি তা না পারিস লুকিয়ে লুকিয়ে দেখা করবি। নে, এবার ঘুমুতে দে। আবার যদি খুঁচিয়ে জাগাস, তা হলে জানে বাঁচতে হবে না।" ভয়ানক গলায় সেঙাইকে শাসিয়ে মাচানের ওপর লম্বা হয়ে শুয়ে পড়লো ওঙলে। শুয়ে শুয়ে গজগজ করতে লাগলো, "কেসুঙে গেলে হুই মেহেলী ছুঁড়িটা সেঙাইর কথা বলবে। আর মোরাঙে এলে এই শয়তানটা হুই মাগীটার কথা বলবে। টেফঙের বাচ্চা দুটো মেজাজটাকে খিঁচড়ে দিচ্ছে। ছুঁড়িটাকে ব্যারামে ধরে ঘ্যানঘ্যানানি বেড়েছে।"

তরিবত করে শোয়ার ফিকিরে ছিলো সেঙাই। ওঙলের শেষ কথাগুলো শুনে সাঁ করে ঘুরে বসলো, "কী ব্যারাম? কার ব্যারাম রে ওঙলে?"

বিড়বিড় করে ঘুমজড়ানো গলায় ওঙলে বললো, "কার আবার ব্যারাম। হুই সালুয়ালাঙের মাগীটার, তোর বউ হবে যে, তার। চোখ লাল, গায়ে আগুন ছুটছে। সকালে তামুন্থ্য (চিকিৎসক) এসেছিলো। খাওয়া বন্ধ করে দিয়েছে। শুয়ে শুয়ে মাগীটা কী যেন বকে দিনরাত।" বলতে বলতে থেমে গেলো ওঙলে। নির্ঘাত ঘুমিয়ে পড়েছে সে।

আর চুপচাপ নিথর হয়ে বসে রইলো সেঙাই। মেরুদাঁড়া বেয়ে ঠাণ্ডা হিমধারা ছুটলো যেন তার। ব্যারাম হয়েছে মেহেলীর। চোখ লাল। শরীরে ভয়ানক তাপ। প্রলাপ বকছে। তবে কি খোন্‌কের মত তার বোন মেহেলীকেও আনিজাতে পেলো? কেলুরি গ্রামের তামুন্থ্যও (চিকিৎসক) কি তাকে খাদে ফেলে দেবার বিধান দেবে? ভাবতে ভাবতে অস্ফুট বুনো মনটা কেমন যেন অসাড় হয়ে গেলো সেঙাইর।

খানিকটা সময় কাটলো। আচমকা সেঙাইর মনে পড়লো রানী গাইডিলিওর কথা। চওড়া চ্যাপ্টা কপাল। দুটো টানা চোখে মধুর মমতা। তাঁর ছোঁয়ায় রক্ত-মাংস-হাড়ের দেহ থেকে রোগ-ব্যারাম, আধিব্যাধি নিমেষে পালিয়ে যায়। রানী গাইডিলিওকে আজ বড় দরকার সেঙাইর। তার মন একটা স্থির এবং স্পষ্ট সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছে। কোহিমা পাহাড়ে যে দিন সাহেবদের নির্দেশে মণিপুরী, বাঙালী আর আসামী পুলিসেরা বেয়নেট আর ব্যাটনের বাড়িতে তার দেহটাকে ফাটিয়ে কোহিমার হিমাক্ত পথে ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছিলো, সেদিন রানী গাইডিলিও তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছিলেন।

মেহেলীর ব্যারামের কথা শোনার আগ পর্যন্ত সেঙাইর মনটা কামনায় বাসনায় রঙদার হয়ে ছিলো। ভবিষ্যতের কথা ভেবে, নিজের সংসারের কথা ভেবে আবেগে খুশিতে সমস্ত চৈতন্য বুঁদ হয়ে ছিলো। বনস্থলীর ছায়ায় তারা ঘর বাঁধবে। সুখী জোয়ান-জোয়ানীর আশায় আনন্দে চেঁচামেচিতে সে ঘর ভরে থাকবে। কিন্তু কোথায় লুকিয়ে ছিলো এই ভয়ঙ্কর দুর্বিপাক? খোন্‌কের রোগের পরিণাম দেখেছে সেঙাই। সে ছবি তার মনে শিলালিপির মত অক্ষয় হয়ে রয়েছে। মেহেলীও কি তবে খোন্‌কের মত খাদের নীচে পড়ে মরবে?

নাঃ। মনটা কঠিন হয়ে গেলো সেঙাইর। নিমেষে সমস্ত চৈতন্য একাগ্র হয়ে উঠলো। স্নায়ুতে, শিরায়, মেদমজ্জায়, রক্তে রক্তে একটা প্রতিজ্ঞা ঝনঝন করে বাজতে শুরু করলো। মেহেলীকে কিছুতেই মরতে দেবে না সে।

মেহেলীর মৃত্যুর মধ্যে নিজের যৌবনের স্বপ্নকে খতম হতে দেবে না। দেহমনের সমস্ত শক্তি দিয়ে মেহেলীর মৃত্যুকে সে আটকাবে।

আপাতত রানী গাইডিলিওকে দরকার থাকলেও পাওয়া যাবে না। কিন্তু পাঁচটা টিলা পেরিয়ে এখনই বুড়ো খাপেগার ভেতরের ঘরে মেহেলীর কাছে তাকে যেতে হবে।

চারপাশের মাচানগুলোর ওপর দিয়ে চোখদুটোকে একবার ঘুরিয়ে আনলো সেঙাই। জোয়ান ছেলেরা নাক ডাকিয়ে ঘুমুচ্ছে। কানের কাছে বাজ পড়লেও এ ঘুম টুটবে না।

বাঁশের দেওয়াল থেকে একটা বর্শা নিলো সেঙাই। তারপর বনবিড়ালের মত সন্তর্পণে পা টিপে টিপে বাইরের উপত্যকায় অদৃশ্য হয়ে গেলো।

তিনটে টিলা পেরিয়ে এসে একটা উদ্দাম বুনো কলার বন আর পাহাড়ী আপেলের ঝাড় শুরু। এই উপত্যকার জল-বাতাস-রোদ থেকে কণায় কণায় প্রাণ সঞ্চয় করে উচ্ছ্বসিত হয়ে রয়েছে। এই ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রিতেও পরিষ্কার নজরে আসে, থরে থরে ফল পেকেছে। বুনো কলা এবং আপেলের বন থেকে একরাশ ফল ছিঁড়ে নিলো সেঙাই। তারপর আরো দুটো বড় বড় টিলা পেরিয়ে বুড়ো খাপেগার কেসুঙের পাশে এসে দাঁড়ালো।

সমস্ত উপত্যকাটা নিঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে। চাঁদের আবছা আলো বন এবং পাহাড়ের মাথায় মাখামাখি হয়ে রয়েছে। পেছনের উতরাই থেকে জলপ্রপাতের গর্জন আসছে। কোথায় একটা ডোরাকাটা হুমকে উঠলো। পাশের খাসেম বনে ময়ালের ফোঁসফোঁসানি শোনা যাচ্ছে। সুখাই ঘাসের ওপর সরসর শব্দ করে কী একটা খাদের দিকে নেমে গেলো।

একটু সময় চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সেঙাই। তারপর সামনের পাথুরে চত্বরটা পেছনে ফেলে মেহেলীর ঘরখানার সামনে এসে পড়লো। এদিকে এসেই চমকে উঠলো সেঙাই। ফিকে, অস্পষ্ট আলো। তবু ঠিক ঠিক দেখা গেলো। বুড়ো খাপেগার কেসুঙের পাশে দুটো পাহাড়ী জোয়ান সতর্কভাবে পা ফেলে ফেলে কী যেন খুঁজে বেড়াচ্ছে।

চট করে বাঁশের দেওয়ালের পাশে সরে গেলো সেঙাই। প্রখর থাবায় বর্শার বাজুটা চেপে ধরলো। উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস উঠছে, নামছে। বুকটা

নাচছে, কাঁপছে। চোখের মণিতে শিকারের ছায়া পড়েছে। সে শিকার দুটো পাহাড়ী জোয়ান।

ওপাশ থেকে ফিসফিস গলার আওয়াজ ভেসে আসছে।

"হু-হু, নির্ঘাত কেলুরি বস্তির সর্দারের ঘরে রয়েছে মেহেলী। ঠিক খবর নিয়ে তবে এসেছি, বুঝলি ইমটিটামজাক ?"

আর একটা গলা শোনা গেলো, "ঠিক ঠিক, মেহেলীকে আজ যেমন করে পারি, আমাদের বস্তিতে নিয়ে যাবো। না নিতে পারলে সর্দার আমাদের খতম করবে।"

"হু-হু, খাঁটি কথা। আমাদের বস্তির মেয়ে অন্য বস্তিতে লুকিয়ে থাকবে, এ কেমন ধারা ব্যাপার ? এতগুলো জোয়ান ছোকরা রয়েছি আমরা, গায়ে লাল রক্ত আছে, তবু বসে বসে দেখছি। ইজ্জত লোপাট হয়ে গেলো সালুয়ালাঙ বস্তির। মান আর রইলো না।" গলাটা একটু থামলো। তার পরেই আবার পর্দায় পর্দায় চড়তে লাগলো, "আশেপাশের সবাই জানতে পেরেছে। অঙ্গামীরা জেনেছে। সাঙটামরা জেনেছে। মেহেলী যে কেলুরি বস্তিতে পালিয়ে এসেছে, এ খবর জানতে কারো আর বাকি নেই।"

"কী করে বুঝলি, ওরা জেনেছে ?" অপর জোয়ানটা কৌতূহলী হয়ে উঠলো।

"সেদিন বর্শা বদল করে অঙ্গামীদের বস্তি থেকে মাটির হাঁড়ি, কোদাল আর নীয়েঙ তুল আনতে গিয়েছিলুম। ওরা বদলে দিলো না। তারপর গেলুম সাঙটামদের বস্তি ইটিয়াগাতে। তারাও দিলে না।"

"কেন দিলে না ? একেবারে বর্শা হাকড়ে সাবাড় করে ফেলবো না রামখোর বাচ্চাদের !" অন্য জোয়ানটা ভয়ানক গলায় চেঁচিয়ে উঠলো।

"চুপ চুপ। খবর্দার চিল্লাবি না। গলা টিপে ধরবো। এটা সালুয়ালাঙ বস্তি নয়।" চাপা ভীষণ গলায় ইমটিটামজাক ধমক দিলো।

"চিল্লাবি না তো কি ! সাঙটমরা, অঙ্গামীরা আমাদের হাঁড়ি দেবে না, কোদাল দেবে না, নীয়েঙ তুল দেবে না। আমাদের কী করে চলবে তা হলে ? কী বলেছে অঙ্গামীরা ? কেন জিনিস দিতে চায় না সাঙটমরা ?"

"ওরা বললে, তোদের বস্তির মাগী পালিয়ে অন্য বস্তিতে গিয়ে থাকে ; তোদের আবার ইজ্জত আছে না কি ? তোদের সঙ্গে আমরা কোন কারবার রাখবো না। সিধে কথা। সেই জন্যেই তো আমাদের সর্দার মেহেলীকে

কেলুরি বস্তি থেকে ছিনিয়ে নেবার জন্যে বলেছে। আজ সাঙটমরা আর অঙ্গামীরা জিনিস বদল করছে না। কাল যদি কোনিয়াকরা এ খবর জানতে পেরে ধান না দেয়, তা হলে না খেয়ে সবাইকে লোপাট হতে হবে। হু-হু, বস্তির মেয়ে যদি বস্তির মধ্যেই আটকে না রাখতে পারি, তা হলে কেমন পাহাড়ী মানুষ আমরা!"

ক্ষয়িত চাঁদের রাত আরো নিবিড় হয়েছে। উত্তেজনায় সেঙাইর শিরায় শিরায় ঝাঁ ঝাঁ করে রক্ত ছুটছে। বুকটা তোলপাড় হচ্ছে। বিরাট থাবা দিয়ে বর্শার বাজুটা আরো প্রখরভাবে চেপে ধরেছে।

একটু সময় চুপচাপ। জলপ্রপাতের আওয়াজ ছাড়া সমস্ত পাহাড় এবং বনভূমি একেবারেই নিস্তব্ধ।

তার পরই ওপাশ থেকে একটি জোয়ানের গলা ভেসে এলো, "নে, আর দেরি করিস নি। আজ কদিন ধরে মেহেলীর তল্লাসে আসছি কেলুরি বস্তিতে। মাগীটাকে যে নিয়ে যাবো, তেমন জুত করে উঠতে পারছি না। আজ যেমন করে পারি, নেবোই। আয়, এতক্ষণে এই বস্তির খাপেগা সদ্দারটা নির্ঘাত ঘুমিয়ে পড়েছে। হুই বুড়ো শয়তানটা সারা রাত ধরে মেহেলী ছুঁড়িটাকে পাহারা দেয়। শুনেছি, ওর বর্শার তাক না কি মারাত্মক। কাছে ঘেঁষতে ভয় হয়। আয় আয়, আর দেরি করিস নি। ভেতরের ঘরেই শুয়ে রয়েছে মেহেলী—"

ঘোঁত ঘোঁত করে খাপেগা সদ্দারের ভেতরের ঘরের দিকে এগিয়ে এলো দুটো পাহাড়ী জোয়ান।

রাগ হিংস্রতা, উত্তেজনা—আদিম মনের সমস্ত বৃত্তিগুলিকে এতক্ষণে অতি কষ্টে সংযত করে রেখেছিলো সেঙাই। এবার বাঁশের দেওয়ালের পাশ থেকে সাঁ করে বেরিয়ে এলো। তার পরেই তার হাতের মুষ্টি থেকে বর্শাটা ছুটে গেলো নির্ভুল লক্ষ্যে। ফলাটা একটা পাহাড়ী জোয়ানের কোমরে গেঁথে গেলো।

চোয়ালটা কঠিন হলো। দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ হলো। হিংস্র গলায় সেঙাই গর্জে উঠলো, "ইজা হুবুতা! মেহেলীকে নিতে এসেছে! একেবারে খতম করে ফেলবো।"

"আ-উ-উ-উ-উ—" ক্ষয়িত চাঁদের রাতটাকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো জোয়ানটা। তার পরেই রুক্ষ ধারালো পাথুরে টিলাটার ওপর লুটিয়ে পড়লো।

আর অন্য জোয়ানটা নিজের প্রাণটাকে বাঁচাবার আদিম এবং একমাত্র তাড়নায় সামনের উতরাইটার দিকে ছুটে গেলো। সেখান থেকে বিরাট খাসেম বনটার মধ্যে মিলিয়ে গেলো। উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে টিলা-বন-চড়াই-উতরাই পার হয়ে যাচ্ছে সে। সালুয়ালাঙ গ্রামের নিরাপদ সীমানায় না পৌছানো পর্যন্ত এ দৌড় বোধ হয় থামবে না।

"আ-উ-উ—" জোয়ান ছেলেটার চিৎকার থেমে গিয়েছে। এখন গোঙাচ্ছে।

পী ম্যাঙ কাপড়ের ভাঁজ থেকে বুনো কলা আর নীলচে আপেলগুলো পড়ে গিয়েছিলো। পাথুরে মাটির ওপর সেগুলো ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ফলগুলো কুড়িয়ে কোঁচড়ে ভরে জোয়ান ছেলেটার কাছে এসে দাঁড়ালো সেঙাই। পাহাড়ী জোয়ানের তাজা রক্তে পাথুরে মাটি লাল টকটকে হয়ে গিয়েছে।

নিজের কীর্তি দেখে খুশিতে আনন্দে হিংস্রতায় চোখ জোড়া জ্বলে জ্বলে উঠতে লাগলো সেঙাইর। একদলা থুথু জোয়ান ছেলেটার মুখে ছুঁড়ে দিলো সে। তারপর সমস্ত মুখে একটা ঘৃণার ভঙ্গি ফুটিয়ে, ধিক্কার দিয়ে বললো, "থু—থু—আহে ভু টেলো! এই মুরোদ নিয়ে আমার বৌকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিস! থু-থু, চোরের মত চুরি করে নিতে এসেছিস! লড়াই করে ছিনিয়ে নেবার সাহস নেই।"

জোয়ানটার গায়ে আর একদলা থুথু ছিটিয়ে, পায়ের নখ দিয়ে পাঁজরায় খোঁচা দিয়ে বুড়ো খাপেগার বাড়িটার দিকে চলে গেলো সেঙাই।

ভেতরের ঘরটা পাথুরে মাটির চত্বর থেকে অনেকটা উঁচুতে। নীচে আস্ত বাঁশের পাটাতন। পাটাতনের নীচে এসে দাঁড়ালো সেঙাই। বুকের মধ্যটা দুরু দুরু করে উঠলো। বুড়ো খাপেগা কি জেগে রয়েছে এখনও? রাত জেগে জেগে পাহাড়ী দুনিয়ার কাম-রতি-লালসা থেকে মেহেলীর কৌমার্যকে পাহারা দিচ্ছে? সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ভাবনা মনের মধ্যে ছটফট করতে লাগলো। তাদের বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। বিয়ের আগের দিনগুলিতে ভাবী বরবউর মেলামেলা সমাজ এবং ধর্মের চোখে মারাত্মক অপরাধের। এতে টেটসে আনিজা গোঁসা হয়। আশঙ্কায় শিরায় শিরায় কী একটা যেন ছুটাছুটি করতে লাগলো। তারপরেই কর্তব্য ঠিক করে ফেললো সেঙাই। মাথার ওপর

বাঁশের পাটাতন। তার ওপর বাঁশের মাচানে শুয়ে রয়েছে মেহেলী। বাতাসে তার নিশ্বাস, তার দেহের গন্ধ মিশে রয়েছে।

কী এক দুর্বোধ্য তাড়নায় দেহমন বিকল হয়ে যাচ্ছে। চারিদিকে একবার চনমন চোখে তাকালো সেঙাই। পাটাতনের নীচে শুয়োরের খোঁয়াড়। শীতের আমেজ-লাগা রাত্রিতে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়োরগুলো ঘুমুচ্ছে। গাদাগাদি দিয়ে ঘন হয়ে শুয়েছে গোটাকয়েক পোষা কুকুর। একটু উত্তাপের আশায় গায়ে গা লাগিয়ে দলা পাকিয়ে রয়েছে জানোয়ারগুলো।

টেটসে আনিজা! তার গোঁসা! তার কোপ! সমস্ত শরীরটা থরথর করে কেঁপে উঠলো সেঙাইর। তেলেঙ্গা সু মাসে মেহেলীকে নিয়ে সে ঘর বাঁধবে, গৃহস্থালি পাতবে। সমাজ তার সংসার ও বিবাহিত জীবনকে মেনে নেবে। যদি সেই ঘর গৃহস্থালির ওপর টেটসে আনিজার কোপ এসে পড়ে! তার বিবাহিত জীবন যদি ছারখার হয়ে যায়! তার আর মেহেলীর পাহাড়ী কামনার মধ্যে যে সুন্দর স্বপ্নটা ফুটি-ফুটি করছে, তা যদি সাবাড় হয়!

কী করবে, কী না করবে, স্থির এবং স্পষ্টভাবে কিছুই ভেবে উঠতে পারছে না। .কিছুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সেঙাই।

আচমকা বাঁশের পাটাতনের ওপাশে গোঙানি শোনা গেল, "আ-উ-উ-উ।"

চমকে উঠলো সেঙাই। এ গোঙানি নির্ঘাত মেহেলীর। আচমকা, একান্তই আচমকা, নিজের অজান্তেই সেঙাই ডেকে ফেললো, "মেহেলী, এই মেহেলী—"

"কে?" পাটাতনের ওপাশে একটা গলা চমকে চেঁচিয়ে উঠলো, "কে?"

"আমি সেঙাই। কতদিন তোকে দেখি না। মেজাজটা একেবারে বিগড়ে রয়েছে। একবার বাইরে আয় না! টিলায় বসে বসে গল্প করবো।" শান্ত গলায় সেঙাই বললো।

"না না, তোর আমার বিয়ে ঠিক হয়ে গিয়েছে। তোর সঙ্গে এখন আমার দেখা হওয়া ঠিক না। টেটসে আনিজা ক্ষেপে যাবে। মাঝখানে তো মাত্র দুটো মাস। এই ক-টা দিন শিকার করে, বন পুড়িয়ে আর ঘুমিয়ে কাটা। তেলেঙ্গা সু মাসে বিয়ে তো হবেই। যা যা—খাপেগা সদ্দার আবার পাশের ঘরে শুয়ে রয়েছে। তার ঘুম ভারি ঠুনকো।"

"টেমে নটুঙ! বেরিয়ে আয় মাগী। এই রাত্তিরে আরামের ঘুম ছেড়ে

টয়াখোনা (ধর্মকথা) শুনতে এলুম বুঝি !" সেঙাই হুমকে উঠলো। বললো, কদ্দিন তোকে দেখি না। বলছি, মেজাজটা বেয়াড়া হয়ে রয়েছে। চেহারাখানা ঠিক রেখেছিস তো! মনটা আবার খিঁচড়ে যাবে না তো চেহারার দিকে তাকালে!"

"ইজা হুবুতা!" মেহেলীর ক্ষীণ গলাটা এবার গর্জে উঠলো, "খুব যে চিল্লাচ্ছিস, আমার কি তোকে দেখতে ইচ্ছা করে না! খুব করে। আবার ভাবি, টেটসে আনিজা যদি আমাদের ওপর খারাপ নজর দেয়!"

"আহে ভু টেলো! আমি হুই সব টেটসে আনিজা মানি না। নিজের বউর সঙ্গে গল্প করবো, হুই টেটসে আনিজা বাগড়া দেবে কেন?" কথাগুলোর মধ্যে সেঙাইর মনের তীব্র অসন্তোষ ফুটে বেরুলো।

"কোহিমা থেকে ফিরে তোর কী হলো! আনিজাকে মানছিস না! এমন কথা বলতে নেই রে সেঙাই। দু মাস পরে আমাদের বিয়ে হবে। ঘর বাঁধবো। ছেলে হবে। টেটসে আনিজা আমাদের ওপর ক্ষেপে গেলে সব লোপাট হয়ে যাবে। দুটো মাস সবুর কর।" ক্ষীণ অথচ মধুর গলায় আগামী দিনের একটি পরম সুন্দর স্বপ্নের কথা বলে যেতে লাগলো মেহেলী, "তখন আমাকে তুই কত দেখবি, কত আদর করবি। আমি তোকে কত আদর করবো। যা, এবার যা। খাপেগা সদ্দার টের পেলে কিন্তু আস্ত রাখবে না। খুন করে ফেলবে।" একটু থেমে আবার বললো মেহেলী, "আমার ব্যারাম হয়েছে। তামুন্যু (চিকিৎসক) কিছু খেতে দেয় না। শরীরটা বড় খারাপ লাগছে। একদম জোর পাচ্ছি না।"

"হু-হু, তোর ব্যারামের কথা ওঙলে বলেছে। এই নে, তোর জন্যে বন থেকে ফল এনেছি। আপেল আর বুনো কলা। খেয়ে গায়ে তাগদ কর।"

"কই? দে দে—" পাটাতনের ফাঁক দিয়ে একটা নরম হাত বেরিয়ে এলো। খুশী-খুশী ব্যগ্র গলায় মেহেলী বললো, "বড় খিদে পেয়েছে রে সেঙাই, পেটটা জ্বলে যাচ্ছে।"

নীলচে রঙের পাহাড়ী আপেল এবং একরাশ বুনো কলা মেহেলীর হাতে দিতে দিতে সেঙাই বললো, "তোর ব্যারাম, রানী গাইডিলিওকে এনে একবার যদি তোকে ছুঁইয়ে দিতে পারতাম, সেরে যেতো।"

"রানী গাইডিলিও! সেটা আবার কে?"

"হু-হু, জানবি, পরে জানবি। আমাদের বস্তিতে সে আসবে বলেছে। সায়েবদের সঙ্গে তার লড়াই বেধেছে। হু-হু"—রহস্যময় গলায় সেঙাই বললো।

একটু পরে বলার ভঙ্গিটা সহজ করে ফেললো, "যাক সে কথা। আমি রোজ রাত্তিরে তোর খাবার দিয়ে যাবো। কী বলিস মেহেলী?"

খুশী-খুশী গলায় মেহেলী সায় দিলো, "রাজ দিয়ে যাবি।"

একটু সময় চুপচাপ। তারপর সেঙাই বলতে শুরু করলো, "জানিস মেহেলী, তোদের সালুয়ালাঙ বস্তি থেকে তোকে চুরি করে নেবার জন্যে দুটো শয়তানের বাচ্চা এসেছিলো। এই ঘরটার কাছেই ঘুরঘুর করছিলো।"

"বলিস কী?" মেহেলীর গলাটা চমকে উঠলো। বেশ বোঝা যায়, ধড়মড় করে পাটাতনের ওপর উঠে বসলো মেহেলী। উত্তেজনায় আশঙ্কায় গলার স্বরটা কাঁপতে লাগলো, "তারপর কী হলো?"

"কী আবার হবে! বর্শা দিয়ে একটাকে ফুঁড়লাম। আর একটা জান নিয়ে জঙ্গলের দিকে পালালো। হু-হু।" বলতে বলতে আক্ষেপের সুর ফুটলো সেঙাইর, "বড় আফসোস হচ্ছে রে মেহেলী, আর একটাকে বর্শা হাঁকড়ে রাখতে পারলাম না।"

এবার অনেকটা স্বস্তি পেলো মেহেলী। বড় রকমের একটা নিশ্বাস ফেলে বললো, "আফসোসের আর কী আছে! একটাকে তো ফুঁড়তে পেরেছিস। আমারও মনে হচ্ছিলো, শয়তানের বাচ্চারা সালুয়ালাঙ বস্তি থেকে আমার খোঁজে আসবে।" একটু ক্ষণের জন্য থামলো মেহেলী। তারপর আবার বলতে শুরু করলো, "মেজাজটা বিগড়ে ছিলো রে সেঙাই। আমি হলুম সালুয়ালাঙ বস্তির সবচেয়ে সেরা মেয়ে আর তুই হলি কেলুরি বস্তির সেরা ছেলে। তোর আমার বিয়েতে একটু রক্ত পড়বে না? আমার সোয়ামী দু-একটা শত্তুরকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়বে না—এ কেমন কথা! তুই শয়তানদের ফুঁড়েছিস। শুনে মেজাজটা খাসা হয়ে গিয়েছে।"

"হাঃ-হাঃ-হাঃ—" ক্ষয়িত চাঁদের রাত্রিকে ভীষণভাবে চমকে দিয়ে শব্দ করে হেসে উঠলো সেঙাই। বললো, "হু-হু, বড় মজার কথা বলেছিস মেহেলী। তুই হলি এই পাহাড়ের সবচেয়ে সেরা মেয়ে। তোর জন্যে একটা নয়, আরও অনেক মানুষের কলিজা ফুঁড়তে হবে। বুঝলি মেহেলী—"

ওপাশের ঘরে বুড়ো খাপেগা গর্জে উঠলো, "কে? কোন রামখোর বাচ্চা এসেছে? আমার ধরমমেয়ের ইজ্জত নিচ্ছে কে? এই মেহেলী, এই টেফঙের ছা, সুচেন্যু দিয়ে কুপিয়ে একেবারে সাবাড় করবো। দাঁড়া, মশালটা ধরিয়ে আমি যাচ্ছি।"

পাটাতনের নীচে হাসি থেমে গেলো। বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো সেঙাই। মেহেলীর বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ডটা যেন হঠাৎ জমাট বেঁধে থেমে গেলো। নিঝুম হয়ে সে-ও পাটাতনের ওপর পড়ে রইলো। এই মুহূর্তে একটি পাহাড়ী জোয়ান এবং একটি জোয়ানীর শিরা-স্নায়ু-ইন্দ্রিয় অথর্ব হয়ে গিয়েছে। দেহমনে কোন সাড় নেই।

পাশের ঘরে বুড়ো খাপেগা ভাঙা ফ্যাসফেসে এবং ঘুম-ঘুম গলায় সমানে চেঁচাচ্ছে, "এই মেহেলী, কথা বলছিস না যে! কে এসেছে তোর ঘরে? কোন শয়তানের বাচ্চা? বল্ না মাগী।"

একেবারে নিথর হয়ে পড়েছিলো মেহেলী। এবার মুখখানাকে পাটাতনের বাঁশে ঠেকিয়ে ফিসফিস করে সে বললো, "এই সেঙাই, ভেগে যা। ধরমবাপ তোকে দেখলে খুন করবে। তোর সঙ্গে কথা বলছি, দেখলে বিয়ে ভেঙে দেবে। যা এখন, কাল আবার আসিস।"

"ইজা হুবুতা!" পাটাতনের নীচে চাপা গলায় হুমকে উঠলো সেঙাই, "নিজের বউর সঙ্গে কথা বলবো, তা-ও শয়তানের বাচ্চারা বাগড়া দেবে? আমি যাবো না এখান থেকে।"

"ওরে ধাড়ী টেফঙ, এখন যা। কাল আবার আসবি।" মেহেলী অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো।

"কাল আমার সঙ্গে পশ্চিমের চড়াইতে বেড়াতে যাবি তো?"

"তুই যখন বলছিস, নির্ঘাত যাবো। এখন পালা, সদ্দার তোকে দেখলে একেবারে সাবাড় করে ফেলবে। পালা, পালা—" করুণ গলায় অনুনয় করতে লাগলো মেহেলী।

"যাচ্ছি। কাল কিন্তু আমার সঙ্গে পশ্চিমের পাহাড়ে বেড়াতে যাবি।"

কাল ক্ষয়িত চাঁদের আলোতে উপত্যকা-মালভূমি-উতরাই পেরিয়ে মেহেলীকে নিয়ে সেঙাই যাবে পশ্চিমের চড়াইতে। বুনো ঝরনার পাশে ঘুরতে ঘুরতে বিয়ের কথা, ভবিষ্যৎ জীবনের কথা, ঘর-সংসার, বিয়ের সময়কার উৎসব-ভোজের কথা বলবে। অস্ফুট পাহাড়ী মন রতিকলায় এবং উদরপূর্তিতে চরম আনন্দ পায়। পরিতৃপ্ত হয়। দৈহিক এবং মানসিক—স্থূল ভোগের জন্য মদ-মাংস-খাদ্য, যে যে উপকরণের দরকার, সেগুলোর কথা বলবে সেঙাই। ভাবতে ভাবতে একান্ত অনিচ্ছুক পায়ে সামনের চড়াইটার দিকে উঠে গেলো সে।

পাশের ঘরে একটা পেম্ব্য কাঠের মশাল দপ করে জ্বলে উঠলো। বুড়ো খাপেগা হুঙ্কার ছাড়লো, "কী রে মেহেলী, কথা বলছিস না যে? কে এসেছে তোর ঘরে?"

নির্জীব গলায় মেহেলী বললো, "কই, কেউ আসে নি তো। তুই দেখে যা না ধরম বাপ।"

"তবে মানুষের গলা শুনলুম যে!" বিড়বিড় করে বকতে শুরু করলে বুড়ো খাপেগা, "ভুল শুনলুম না কি? নাঃ, এমন মৌজের ঘুমটা ভেঙে গেলো।" বকতে বকতে বিরক্ত গলায় ধমকে উঠলো, "নে, এবার ঘুমো মেহেলী। শয়তানের বাচ্চারা যদি জ্বালায়, আমাকে ডাকিস।"

"আচ্ছা।"

পেম্ব্য কাঠের মশালটা নিবে গেলো। বাঁশের মাচানটা মচমচ করে শব্দ করলো। মেহেলী বুঝলো, বুড়ো খাপেগা আবার শুয়েছে।

আর উঁচু চড়াইটার মাথায় পৌছে চোখ দুটো স্থির হয়ে গেলো সেঙাইর একটু আগে সালুয়ালাঙ গ্রামের যে জোয়ানটাকে সে বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে গিয়েছিলো, এই ক্ষয়িত চাঁদের আলোতে তার চিহ্নমাত্র নেই কোথায়ও শুধু খানিকটা তাজা রক্ত পাথুরে মাটির ওপর সেঙাইর আদিম হিংস্রতার সাক্ষী হয়ে জমাট বেঁধে রয়েছে।

উনচল্লিশ

কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটির কলনেড কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে পুরো সাত ফুট দীর্ঘ একটা দেহ একদিন হাঁটতো। মেরুদাঁড়াটা ঋজু হয়ে মাথার দিকে উঠে গিয়েছে। চওড়া কঠিন একখানা ঘাড়। কাঁধ বুক পিঠ এবং উরুতে রাশি রাশি পেশী; থরে থরে সাজানো। গ্রেট ব্রিটেনের কোন এক ডিউক পরিবারের ছেলে। সেদিনের সেই সাত ফুট ঋজু মানুষটা আকাশ ফাটিয়ে হো-হো করে অট্টহাসি হেসে উঠতে পারতো। সে মানুষটা শখ করলে কাঁধের ওপর ধনুক আর তূণীর নিয়ে, বুকের সামনে গণ্ডারের চামড়ার শীল্ড ঝুলিয়ে মধ্যযুগের কোন লিজেণ্ডের নায়ক হতে পারতো। অ্যাডভেঞ্চারের নেশায় সে পারতো তুষার মেরুর দেশে পাড়ি জমাতে। ফলেন এঞ্জেলের মত আলপ্‌সের চূড়া থেকে ঝাঁপিয়ে পড়তে পারতো কোন অতল পাতালে। সে পারতো উন্মাদ সমুদ্রে 'জীবনতরী ভাসিয়ে দিতে'।

কী সে চেয়েছিলো? রোমান্স না অ্যাডভেঞ্চার? কী সে হতে চেয়েছিলো! রবিন হুড না অডিসিয়স? লিজেণ্ড না এপিকের নায়ক?

কিছুই পেলো না। কিছুই হওয়া গেলো না। বলা যায়, কিছুই হতে পারলো না সে। শুধু অসহ্য এক কৌতুকে সাত ফুট ঋজু মানুষটা কেম্ব্রিজ য়ুনিভার্সিটির কলনেড ডিঙিয়ে একদিন সরাসরি চার্চের চ্যাপেলে চলে গেলো। সেখানে সুনীতি সংযম শিক্ষা করে, শুদ্ধ জীবনের দীক্ষাকাল কাটিয়ে কোহিমার পাহাড়ে এসে পড়লো।

রবিন হুড নয়, অডিসিয়সও নয়। লিজেণ্ড কি এপিকের নায়কও নয়। তার জীবনের ভূমিকা হলো নিরুত্তেজ শান্ত স্নিগ্ধ মিশনারীর ভূমিকা।

আশ্চর্য! কোহিমা শহর থেকে মাও-গামী পথের দিকে যেতে যেতে অতীত জীবনটাকে একটা অসত্য স্বপ্নের মত মনে হয়। কী সে হতে চেয়েছিলো? আর কী সে হয়েছে? স্বাভাবিক নিয়মে পিয়ার্সনের মনে অতীত এবং বর্তমান জীবনের একটা তুলনামূলক বিচার চলছিলো। বলা যায়, চাওয়া এবং পাওয়া, খেয়াল মর্জি স্বপ্ন এবং বাস্তবের মধ্যে তুমুল ধুন্ধুমার চলছিলো।

পিয়ার্সনের মনে যে পরিমাণে ভাবাবেগ রয়েছে সেই পরিমাণে বিশ্লেষণ করার প্রবণতা নেই। ভাবাবেগই তার চরিত্রের মূল লক্ষণ। কিন্তু আজকাল সে ভাবে, মোটামুটি বিশ্লেষণ করে, বিচার করে। একটু নিরালায় এলে কিংবা নিঃসঙ্গ হয়ে পড়লে আপনা থেকেই কতকগুলি সূক্ষ্ম এবং তীক্ষ্ণ চিন্তা মনের মধ্যে ভিড় জমায়। এই জীবনের কথা সে ভাবে। কোহিমা পাহাড়ে এই মিশনারীর ভূমিকার কথা ভাবে।

নাগা পাহাড়ে আসার আগে কী ধারণা ছিল মিশনারী জীবন সম্বন্ধে? প্রেমে ক্ষমায় শুদ্ধাচারে পবিত্র এক জীবন। অন্তত সেই শিক্ষাদীক্ষাই সে দেশের চার্চে পেয়ে এসেছে। কিন্তু এখানে এসে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীকে দেখতে দেখতে তার সেই সুন্দর ধারণাটাই উলটেপালটে কিম্ভুত হয়ে গিয়েছে। সব মোহ সব কল্পনা রঙীন একটা বুদ্বুদের মত ফেটে চৌচির হয়ে গিয়েছে।

সাত ফুট দীর্ঘ দেহটার মধ্যে একটা জ্বালা, একটা আক্ষেপ অবিরাম ছুটে বেড়ায়। শিরায় স্নায়ুতে, মেদে-মজ্জায়, ভাবনায়-চিন্তায় একটা অসহ্য বিক্ষোভ টগবগ করে ফোটে। পিয়ার্সন ভাবে, এই নাগা পাহাড়ে আসার আগে পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীকে দেখার কথা সে কি কস্মিনকালে ভাবতে পেরেছিলো?

আর্চারী! হ্যাঁ এককালে আর্চারী শিখেছিলো পিয়ার্সন। সেদিনের স্পোর্টস্‌ম্যান পিয়ার্সনের দৃষ্টিতে জীবনের সংজ্ঞার্থ একেবারেই স্বতন্ত্র ছিলো। সেদিন তার রাইফেলের নিশানা কী অব্যর্থ ছিলো! কী নির্ভুল ছিলো স্পীয়ারের লক্ষ্য! স্পোর্টস্, গেম, শিকার রোমান্স অ্যাডভেঞ্চার। ভাবাবেগের সকল নেশাতেই মন ভরপুর ছিলো। তাই সুন্দর একটা খেয়ালের খেলার মত এই সহজ স্নিগ্ধ মিশনারী জীবনের ভূমিকা গ্রহণ করতে অসুবিধা হয় নি। এতটুকু দ্বিধা হয় নি স্পোর্টস্‌ম্যান পিয়ার্সনের। প্রীচিঙকে কৌতুককর এক ধরনের গেমের মত মনে হয়েছে। বেঁড়ে টাট্টুর পিঠে চড়ে পাহাড়ীদের গ্রামে ঘুরে ঘুরে গলা ফাটিয়ে খ্রীষ্ট-মাহাত্ম্য শোনাতে হয়। সাপ-পাথর-নুড়ি পুজোর বিপক্ষে, মোষ কি মুর্গী বলির বিপক্ষে বুনো নাগাদের বিবেককে রীতিমত তাতিয়ে তুলতে হয়। শয়তান এবং অন্ধকারের এই অসহায় শিকারগুলোকে খ্রীষ্টধর্মরূপ আলোর সড়কে নিয়ে আসার জন্য আপ্রাণ কসরত করতে হয়। ভাবতেই আমোদ পায় পিয়ার্সন। মজা লাগে। সারা দিন ঘুরে ঘুরে কপালে চোখে লালচে চুলে এবং ভুরুতে পাথুরে পথের ধুলো মেখে, সর্বাঙ্গ পাহাড়ী বাতাসে জুড়িয়ে টক টক ঝাঁঝালো রিলক ফল চিবুতে চিবুতে চার্চে ফিরতে

ফিরতে অদ্ভুত নেশায় মনটা বুঁদ হয়ে থাকে। বেশ লাগে পিয়ার্সনের। অতীত জীবনের চেয়েও এই মিশনারী জীবনে যেন অনেক বেশী মাদকতা অনেক বেশী মোহ রয়েছে।

চলতে চলতে পিয়ার্সন ভাবে, দেশে থাকতে তার ধারণা ছিলো মিশনারী জীবন বড়ই স্নিগ্ধ সরল এবং পবিত্র। কিন্তু কোহিমা পাহাড়ে এসে স্নিগ্ধতা, সরলতা এবং পবিত্রতার লেশমাত্র খুঁজে পায় নি পিয়ার্সন।

মিশনারী জীবন তার সারা গায়ে সাদা সারপ্লিস এবং হাতে জপমালা দিয়েছে। পিয়ার্সন শিক্ষা পেয়েছে, অকারণে, অকারণে কেন, কোনক্রমেই দেহমনকে উত্তেজিত করে তোলা ধর্মপ্রচারকের পক্ষে অপরাধের কাজ। নিজের ইন্দ্রিয়-গ্রাম যে সংযত করে রাখতে না পারে, প্রশান্তি উদারতা যার মধ্যে নেই, সে কেমন করে অপরকে শীলাচরণ এবং প্রবৃত্তির শাসনের কথা শেখাবে? পিয়ার্সন এ সব ভাবে, জানে। তবু সে উত্তেজিত হয়। চড়াই-উতরাই-মালভূমি-উপত্যকায় ছড়ানো বিশাল বিস্তীর্ণ এই নাগা পাহাড়ে মিশনারী জীবনের ভূমিকা সহজ নয়, সুন্দর নয়, পবিত্র নয়। অন্তত বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীকে দেখে এই ধারণা হয়েছে পিয়ার্সনের। মিশনারী জীবনের গতি এখানে বক্র এবং কুটিল। রোষে রাগে সমগ্র সত্তা, বুকের মধ্যে অন্তরাত্মাটা অহরহ যেন চিৎকার করতে থাকে পিয়ার্সনের। সে ভাবে, পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর মত কতকগুলি জীব দিন দিন খ্রীষ্ট মাহাত্ম্যকে কতখানি খর্ব করে দিচ্ছে? যেশাসের পবিত্র নামে কী পরিমাণ কলঙ্ক মাখাচ্ছে? ভাবে, ভাবতে ভীষণ কষ্ট হয়। যীশু সম্বন্ধে এই একান্ত সরল নাগাদের মধ্যে কী হীনতার ধারণারই না সৃষ্টি করেছে পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী! অবশ্য এই পাহাড়ী মানুষগুলোর মন এত সরল এবং এত অপরিণত যে হীন কি মহৎ, কোন কিছুর তারতম্য বোঝার ক্ষমতাই নেই। তবু পিয়ার্সনের বিশ্বাস, আজ হোক কাল হোক, দশ-বিশ বছর পরেই হোক, এই পাহাড়ীরা শিক্ষাদীক্ষা পাবে। তাদের অজ্ঞতা ঘুচবে। মন পরিণত হবে। সমস্ত কিছু বুদ্ধি দিয়ে বিচার দিয়ে বিশ্লেষণ করে করে দেখতে শিখবে। সেদিন? ভাবতেও শিউরে ওঠে পিয়ার্সন। সেদিন যীশুর নাম ধুলোয় লুটোবে। ঘৃণিত অপমানিত ক্রাইস্টের কথা কল্পনা করতেও ভীষণভাবে চমকে ওঠে পিয়ার্সন। সে ভাবে, দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ হয়। বিড়বিড় করে বলে, "আর একটা জুডাস, ম্যাকেঞ্জীটা আর একটা জুডাস।"

কোহিমা থেকে আঁকাবাঁকা পথ ধরে দক্ষিণ পুব দিকে অনেকখানি এসে

পড়েছে পিয়ার্সন। সাদা কপালের ওপর এক আস্তর পাহাড়ী ধুলো জমেছে। সারপ্লিসটাকে হাঁটু পর্যন্ত গুটিয়ে মাও-গামী সড়ক থেকে নীচের উপত্যকায় নেমে গেলো পিয়ার্সন। গোটা দুই ছোট টিলা, একটা আতামারী জঙ্গল এবং তিনটে ঝরনা পেরিয়ে গেলেই লাংফু গ্রামের সীমানা শুরু। লাংফু, তারপর ইয়াগুচি, লাঞ্চু, ফচিয়াগা। এমনি অনেক, অসংখ্য পাহাড়ী গ্রাম। আজ কয়েকদিন ধরে এই সব গ্রামে নিয়মিত আসছে পিয়ার্সন। সাঙসু ঋতুর সমস্ত দিনটা গ্রামে গ্রামে কাটিয়ে সন্ধ্যার একটু আগে সে কোহিমার চার্চে ফেরে।

চারদিকে একবার তাকালো পিয়ার্সন। ডান পাশে একটা পাথর-ঢাকা আধো-গোপন ঝরনা, ঝোপে ঝোপে উঁচু উঁচু টিলার মাথায় যে সব বন রয়েছে, সেখানে রঙবেরঙের রাশি রাশি ফুল ফুটেছে। নীলচে রঙের সোমু ফুল, হলদে রিলক ফুল, থোকা থোকা সবুজ রঙের আরেলা ফুল। যতদূর চোখ যায়, শুধু ফুল আর পাতা, পাতা আর ফুল। রঙে রঙে পাহাড় এবং বন বাহারে হয়ে রয়েছে। আশ্চর্য নীল আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া পাপড়ির মত ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে গুটসুঙ পাখির ঝাঁক। আতামারি বনের ওপাশে প্রপাতের গমগম শব্দ শোনা যাচ্ছে।

এতক্ষণ ম্যাকেঞ্জীর চিন্তায় সমস্ত মনটা উত্তেজিত হয়ে ছিলো। এখন মনটা শান্ত প্রসন্ন হয়ে গেলো। সাঙসু ঋতুর এই উজ্জ্বল সকালে নাগা পাহাড়ের উপত্যকাটিকে বড় ভালো লাগছে। এই বনে, আকাশে, সাঙসু ঋতুর পরিপূর্ণতার মধ্যে যেন পরম পিতার নীরব অস্তিত্ব রয়েছে। নিজের অজান্তে সমগ্র সত্তার মধ্যে গুনগুন শব্দে যীশু-মেরীর ভজনার সুর বাজতে শুরু করলো। খানিকটা পরে উঁচু গলায় গাইতে শুরু করলো পিয়ার্সন। প্রশান্তিতে সমস্ত চৈতন্য ভরে গিয়েছে তার।

উপত্যকার ওপর দিয়ে আচ্ছন্নের মত চলতে চলতে একবার থমকে দাঁড়ালো পিয়ার্সন। নির্জন উতরাই। এতক্ষণ খেয়াল হয় নি, আচমকা মনে হলো, সরীসৃপের মত সর্‌সর্‌ শব্দ করে কী একটা তার পিছু পিছু আসছে। স্বাভাবিক নিয়মেই যীশু-মেরীর ভজন থামিয়ে সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো পিয়ার্সন। আর ঘুরেই চোখে পড়লো মোটা একটা খাসেম গাছের আড়ালে নিজের বেঢপ শরীরটাকে লুকোবার চেষ্টা করছে স্টুয়ার্ট।

তির্যক দৃষ্টিতে তাকালো পিয়ার্সন, "কী ব্যাপার স্টুয়ার্ট! লুকোচ্ছো কেন?"

মুখের ওপর একটা অসহায় ভঙ্গি ফুটিয়ে তাকিয়ে রইলো স্টুয়ার্ট।

রক্তমাংসের শরীরটাকে বায়বীয় করে বাতাসে মিলিয়ে দেওয়া যায় কিনা, হয়তো সেই কথাই ভাবছিলো সে। ভাবতে ভাবতে ঘেমে উঠেছিলো।

মাথার চুল নিরপেক্ষভাবে ছাঁটা। গায়ের রঙ তামাটে। বেয়াড়া রকমের বেঁটে শরীরটার ওপর বিরাট এক মাথা। ঢলঢলে সারপ্লিসটা পায়ের পাতা ছাপিয়ে আধ হাত খানেক পাথুরে মাটিতে লুটোচ্ছে। ছোট ছোট কুতকতে দুটো পিঙ্গল চোখ। সে চোখ সব সময় কুঁচকেই রয়েছে।

স্টুয়ার্ট লোকটার অতীত ইতিহাস জানে পিয়ার্সন। বছর তিনেক আগেও লোকটার নাম ছিলো ইয়ুথ্ জেমী। বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর ভাষায় এই হিলি হিদেনদেরই রক্তবীজের বংশধর। কিন্তু ম্যাকেঞ্জীই তাকে তিন বছরের প্রাণান্ত সাধনায় স্টুয়ার্ট নামের মহিমা দিয়েছে। সাদা সারপ্লিসের গৌরব দিয়েছে।

ইয়ুথ্ জেমী থেকে স্টুয়ার্ট। অদ্ভুত এক জন্মান্তর। এই তিনটে বছরে ধবধবে সারপ্লিস, জপমালা আর ঘন ঘন ক্রশ আঁকার মধ্যে এক জ্যোতির্ময় পৃথিবীর আলো দেখতে পেয়েছে স্টুয়ার্ট। এক এক সময় নিজের সারপ্লিসপরা দেহটার দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে নিজেকে যেশাসের বড় অন্তরঙ্গ মনে হয় স্টুয়ার্টের।

এতক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে স্টুয়ার্টকে দেখছিলো পিয়ার্সন। তার দুটি চোখের নীল মণি দুটি নীল তীর হয়ে স্টুয়ার্টের হাড়-মাংস শিরা-স্নায়ু, মেদ-মজ্জা-গুলিকে ফুঁড়ে ফুঁড়ে দিচ্ছিলো। বেথেলহেমের সেই উজ্জ্বল তারাটির কাছাকাছি পৌঁছতে আর কতটা দেরি আছে স্টুয়ার্টের? বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর কাছে তার কতটা পাঠ বাকী?

আচমকা, একান্তই আচমকা পিয়ার্সনের মনে একটা কুটিল সন্দেহের ছায়া পড়লো। ভ্রূদুটো বেঁকে গেলো। চোখদুটো আরো তীক্ষ্ণ হলো।

মোটা খাসেম গাছটার আড়ালে দেহটাকে সঙ্কুচিত করতে করতে হিমসিম খাচ্ছিলো স্টুয়ার্ট। ভয়ে আশঙ্কায় কপাল বুক এবং বাহুসন্ধি ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রশ আঁকতে শুরু করলো। পিয়ার্সনের চোখের আগুনে সে যেন ঝলসে যাচ্ছে। বেশ বুঝতে পারছে স্টুয়ার্ট, সমস্ত শরীরটা একটু একটু করে কুঁকড়ে যাচ্ছে তার।

চড়া গলায় পিয়ার্সন ডাকলো, "স্টুয়ার্ট—"

"ইয়াস ফাদার—" খাসেম গাছের ওপাশ থেকে ভীরু ফিসফিস গলায় সাড়া দিল স্টুয়ার্ট।

"গাছের আড়ালে লুকোচ্ছো কেন?"

"নো, ইয়াস—ফাদার, আমি—মানে—" থতমত খেতে লাগলো স্টুয়ার্ট, "আমি এদিকে এসেছিলুম। হুই লাংফু বস্তির দিকে—"

"লাংফু বস্তির দিকে তো আমিও যাচ্ছি। তা তুমি লুকোচ্ছো কেন?"

"হুই বড় ফাদার বলে দিয়েছে যে।"

মনের ওপর যে সন্দেহটা এতক্ষণ হাল্কা ছায়ার মত ছড়িয়ে ছিলো, এবার সেই ছায়াটা ঘন হলো, কুটিল হলো। ভ্রূদুটো আরো ভীষণভাবে বেঁকে গেলো। উষ্ণ প্রখর গলায় সে বললো, "বড় ফাদার মানে ম্যাকেঞ্জী তোমাকে পাঠিয়েছে?"

"হু-হু—ছোট ফাদার—" ঘন ঘন বিরাট মাথাটা দোলাতে লাগলো স্টুয়ার্ট।

"ওহ্! স্পাইং! হরিবল!" সাঙসু ঋতুর উজ্জ্বল সকালটাকে কাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলো পিয়ার্সন।

এতক্ষণ পিয়ার্সনের জ্বলন্ত চোখদুটোর দিকে তাকাতে পারছিলো না স্টুয়ার্ট। মাথা নীচু করে দাঁড়িয়ে ছিলো। একবার পিয়ার্সনের দিকে কুতকুতে চোখে তাকালো। তার পরেই খাসেম গাছটার আড়াল থেকে ঊর্ধ্বশ্বাসে সামনের টিলাটার দিকে দৌড় দিলো।

ঘটনার আকস্মিকতায় প্রথমে অবাক হয়ে গিয়েছিলো পিয়ার্সন। বিস্ময়ের ঘোরটা কাটলে রক্তে রক্তে যেন সাইক্লোন বেজে উঠলো তার। চক্ষের পলকে সাদা সারপ্লিসটা খুলে পাথুরে মাটিতে ছুঁড়ে দিলো। তার পর একটা টগবগে ঘোড়ার মত বড় বড় পা ফেলে সামনের দিকে ছুটলো।

"যীশু, মাদার মেরী, ও টেটসে আনিজা, বাঁচা বাঁচা—" চড়াই বেয়ে ওপর দিকে উঠতে উঠতে তারস্বরে চেঁচাতে শুরু করলো স্টুয়ার্ট। দম ফুরিয়ে এসেছিলো। নিশ্বাস নেবার জন্য একবার থমকে দাঁড়ালো স্টুয়ার্ট, পেছন ফিরে দেখলো। একটা সাদা উল্কা সাঁ-সাঁ করে ছুটে আসছে। এবার আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো স্টুয়ার্ট, "ও যীশু, ও মেরী, ও বড় ফাদার, ও আনিজা—বাঁচা বাঁচা—" উঁচু চড়াইর দিকে আবার ছুটলো স্টুয়ার্ট। মহাপ্রাণীটার জন্য বড় মায়া স্টুয়ার্টের। সাঙসু ঋতুর ঝকমকে সকালটা তার জন্য এমন একটা দুর্দৈব ঘনিয়ে রেখেছিলো, তা কি জানতো সে!

মাত্র কয়েকটা মুহূর্ত। তারপরেই স্টুয়ার্টের মাথায় বাজ পড়লো। বাজ নয়, পিয়ার্সনের বিরাট একটা থাবা।

"ও যীশু—" কাতর শব্দ করে লুটিয়ে পড়লো স্টুয়ার্ট।

কপালে এক আস্তর পাহাড়ী ধুলো জমেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে বেরিয়েছে। ঝকঝকে দু পাটি দাঁত মেলে হেসে উঠলো পিয়ার্সন। চোখের নীলাভ মণি দুটো কৌতুকে ঝিকমিক করছে। পিয়ার্সন বললো, "স্টুয়ার্ট, শুধু শুধু দৌড়লে। জানো তো মিশনারী হবার আগে আমি স্পোর্টসম্যান ছিলাম। হোমে থাকতে আমি কত ট্রফি জিতেছি। আর তুমি একটা ন্যাম্বিপ্যাম্বি পাহাড়ী চ্যাপ, আমার সঙ্গে ছুটে পারবে! হোঃ-হোঃ-হোঃ, হোয়াট এ ফান্! তুমি আর আমি দৌড়চ্ছি, একবার ভাবো তো সিনটা। ইজ ইট্ নট্ কমিক! হোঃ-হোঃ-হোঃ!"

আশ্চর্য হাসি পিয়ার্সনের। এ হাসির ঝাপটায় মনের সব কপাট-জানালা খুলে যায়। আর সেগুলোর মধ্য দিয়ে একটা সুন্দর প্রাণের শেষ পর্যন্ত দেখা যায়।

স্টুয়ার্ট নিরুত্তর। পাহাড়ী টিলায় চুপচাপ নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রয়েছে। ধারাল পাথরের ঘা লেগে লেগে হাত-পা-কপাল ছড়েছে, চামড়া ছিঁড়েছে। ফোঁটা ফোঁটা রক্ত ঝরছে।

পিয়ার্সন বললো, "হ্যালো স্টুয়ার্ট, একেবার ঘাপটি মেরে পড়ে রইলে যে! দৌড়তে ইচ্ছে হয়েছে, তা আমাকে বললেই পারতে। তোমার জন্যে এই নাগা পাহাড়ে নতুন করে আবার অলিম্পিকস্ তৈরী করতাম। হোঃ-হোঃ-হোঃ—"

আবারও সেই অবাধ, চারপাশ-মাতিয়ে-দেওয়া হাসি হেসে উঠলো পিয়ার্সন, "হোয়াট এ ওয়াণ্ডার! স্টুয়ার্ট দৌড়চ্ছে পিয়ার্সনের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে—"

ও পক্ষ নির্বিকার। স্টুয়ার্টের ঠোঁট ফাঁক করে জবাব ফুটলো না।

আচমকা হাসি থামিয়ে দিলো পিয়ার্সন। মুখে-চোখে ভীষণ কাঠিন্য দেখা দিয়েছে। চোখের দৃষ্টি প্রখর হয়ে উঠেছে। শিরা-স্নায়ু-ইন্দ্রিয়গুলো ধনুকের ছিলার মত টান-টান হয়ে গিয়েছে। এ এক অন্য পিয়ার্সন। হাসি কৌতুক পরিহাসে এই মানুষটা যে সব সময় সরস, সরব এবং সতেজ, এখন দেখলে একেবারেই বোঝা যায় না।

ঢোলা আলখাল্লাটা গুটিয়ে হাঁটু মুড়ে স্টুয়ার্টের পাশে বসে পড়লো পিয়ার্সন। তারপর তার পাঁজর বরাবর আঙুল দিয়ে খোঁচা বসিয়ে দিলো। দাঁতে দাঁত চেপে বললো, "ঘাপটি মেরে রয়েছে! একটা ডেভিল্স্ সন! আর একটা জুডাস! ওঠ্—"

আঙুলের খোঁচা খেয়ে কোঁৎ করে উঠেছিলো স্টুয়ার্টের পাঁজর। এবার

ধীরে ধীরে পাহাড়ী টিলায় উঠে বসলো সে। কপাল থেকে খানিকটা তাম্রা গাঢ় রক্ত ফাটা-ফাটা ঠোঁটের ওপর এসে পড়েছিলো স্ট্যুয়ার্টের। জিভ বের করে রক্তের ফোঁটাগুলি চাটতে লাগলো স্ট্যুয়ার্ট। ভুরু দুটো কেটে গিয়েছে। তামাটে গাল থেকে এক খাবলা মাংস উঠে গিয়েছে। এখন অত্যন্ত অসহায় দেখাচ্ছে স্ট্যুয়ার্টকে। নিতান্তই নিরুপায়।

পিয়ার্সন চিৎকার করে উঠলো, "স্পাই! তুই একটা স্পাই! মোস্ট হেটেড বীস্ট—আমাকে ফলো করে করে আসছিলি?"

"ইয়াস ফাদার।" হাউ-হাউ করে ডুকরে উঠলো স্ট্যুয়ার্ট। পিয়ার্সনের হাঁটু দুটো আঁকড়ে ধরে বললো, "হু-হু ফাদার, আমি স্পাই। কী করবো? হুই বড় ফাদার যে তোর পিছু পিছু যেতে বলে। আমি কিছু জানি না। আমার কোন দোষ নেই। তুই রোজ বস্তিতে যাস। এই লাংফু, লাঞ্ছু, ফচিয়াগা—সব বস্তিতেই তোর পিছু পিছু যাই।"

স্নায়ু-শিরাগুলো এতক্ষণ ধনুকের ছিলার মত টান-টান হয়ে ছিলো। পিয়ার্সনের মনে হলো, এবার সেগুলো একসঙ্গে কটাৎ করে ছিঁড়ে যাবে। ভীষণ গলায় সে বললো, "তারপর রোজ ম্যাকেঞ্জীর কাছে গিয়ে বলিস, বস্তিতে ঘুরে ঘুরে আমি কী করি, কী বলি; তাই না?"

"হু-হু—" প্রবলভাবে মাথা নাড়তে লাগলো স্ট্যুয়ার্ট, "আমার কোন দোষ নেই ফাদার, সব হুই বড় ফাদারের কাজ। পারডন্ মি।"

এই তিন বছরে স্ট্যুয়ার্টের বুনো পাহাড়ী জিভের নীচে কতকগুলি ইংরাজী শব্দ এবং বিচিত্র উচ্চারণের মহিমা গুঁজে দিয়েছে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। ইংরাজী এবং নাগা—দুটি ভাষার অদ্ভুত বিস্ময়কর মিলন ঘটেছে স্ট্যুয়ার্টের মুখে।

ভয়ে আতঙ্কে এবং আশঙ্কায় স্ট্যুয়ার্ট কাঁপতে শুরু করেছে। ফিসফিস গলায় সে বললো, "পারডন্ মি ফাদার। আমাকে যেতে দে, আমার কোন দোষ নেই।"

কোন দিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই পিয়ার্সনের। সে ভাবতে লাগলো। সাওসু ঋতুর এই পাহাড়ী পৃথিবী থেকে তার মনটা এক অপরূপ রূপময় জগতের দিকে উধাও হয়ে গেলো। শ্রদ্ধায় ক্ষমায় প্রেমে সে জগৎ সুন্দর শোভন এবং শুচিময়। পৃথিবী-ঘেরা সব অন্ধকার এবং কলুষ, সব অন্যায় এবং অবিচার একটি মধুর ক্ষমায় আর সুন্দর প্রেমে স্তব্ধ করে এগিয়ে চলেছেন এক জ্যোতির্ময় পুরুষ। মানবপুত্র! সেই অমৃত পুরুষের নির্দেশ কি সফল হলো নাগা পাহাড়ের এই স্ট্যুয়ার্টের মধ্যে? ক্রিশ্চ্যানিটির মহিমা কি চরিতার্থ হলো?

একটু আগে পিয়ার্সনের মনে হয়েছিলো, এই পাহাড়ের টিলায় টিলায় ঝোপে জঙ্গলে লতায় পাতায়, এই সমাহিত বনভূমিতে পরম পিতার নীরব অস্তিত্ব রয়েছে। সে কি একটা বিভ্রান্তি! সে কি মিশনারীর আশ্চর্য পরিতৃপ্ত এবং প্রশান্ত মনের বিলাস? আচমকা একটা ধমক খেলো পিয়াসন। না না, এ কথা চিন্তা করাও মিশনারীর পক্ষে অপরাবের। এ এক ঘৃণিত পাপাচরণ। এই পৃথিবী, তার চারপাশে যে সীমাহীন, অন্তহীন মহাব্যোম রয়েছে, তার সর্বত্র, সমস্ত প্রাণে, জীবলোকে, সৃষ্টি এবং বিনাশে, বস্তুতে, আকারে নিরাকারে, বিন্দুতে অণুপরমাণুতে পরম পিতার কল্যাণস্পর্শ রয়েছে। মঙ্গলদৃষ্টি রয়েছে। ভাবতে ভাবতে সমস্ত চৈতন্য ভরে গেলো পিয়ার্সনের।

নিরবধি কালের এই পৃথিবী রয়েছে। আছে মানবপুত্রের প্রেম। আছে শয়তানের কুৎসিত কারসাজি। প্যারাডাইসের স্বপ্ন। আছে ইনফার্নোর অন্ধকার। সব কিছুর ওপর অন্ধকারের লীলাময় এই বিক্ষুব্ধ, অশান্ত পৃথিবীর ঊর্ধ্বে লাইটহাউসের মত রয়েছে বেথেলহেমের উজ্জ্বল তারাটি। সমস্ত দুর্যোগের মধ্যে সেই অনির্বাণ দিশারী পৃথিবীকে পথ দেখাচ্ছে। রিপু, লালসা এবং আসক্তির ডাঙস খেয়ে খেয়ে যে পৃথিবী অস্থির বিভ্রান্ত এবং ক্রমাগত তাড়িত হয়ে চলেছে, যীশু তাকে শান্ত নিরুত্তেজ এবং স্নিগ্ধ করে চলেছেন।

আজ প্রথম এই ধরনের অদ্ভুত এক ভাবনায় মগ্ন হয়ে গিয়েছিলো পিয়ার্সন। ভাবতে ভাবতে তন্ময় এবং আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলো। আচমকা তার দৃষ্টি পড়লো সামনের দিকে। তাজ্জবের ব্যাপার! তার ভাবনার সুযোগ নিয়ে কখন যেন টিলার ওপর থেকে স্টুয়ার্ট পালিয়ে গিয়েছে। শুধু মাত্র কয়েক ফোঁটা রক্ত পাথুরে মাটিতে জমাট বেঁধে রয়েছে।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালো পিয়ার্সন। বাঁ দিকে মাও-গামী পথটা একটা আঁকাবাঁকা ময়াল সাপের মত পড়ে রয়েছে। সহসা দৃষ্টিটা চমকে উঠলো পিয়ার্সনের। একটা সাদা বিন্দু অনেক দূরের বাঁকে সাঁ করে অদৃশ্য হয়ে গেলো। নির্ঘাত স্টুয়ার্ট।

সেদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে পিয়ার্সন গর্জে উঠলো, "সন অব বীচ। আচ্ছা, কোহিমায় ফিরে বোঝাপড়া হবে।" বলতে বলতে উতরাই-এর দিকে নামতে লাগলো, "তোকেও ছাড়বো না, ঐ ম্যাকেঞ্জীকেও না।"

চল্লিশ

গোটা দুই ছোট ছোট টিলা, একটা আতামারী জঙ্গল এবং তিনটে ঝরনা পেরিয়ে লাংফু গ্রামের সীমানায় এসে পড়লো পিয়ার্সন। সুন্দর ছবির মত এক পাহাড়ী জনপদ। পাথরের খাঁজে খাঁজে ঘরবাড়ি।

এই সাঙসু ঋতু। ফুল এবং পাখির মরশুম। রাশি রাশি ফুল। আরেলা, সোমু, গুসু, টঘু টুঘোটাঙ। রাশি রাশি পাখি। গুটস্থঙ, আউ, খুকুঙ গুঃ। ফুল আর পাখির রঙে রঙে ছোট্ট পাহাড়ী গ্রাম লাংফুকে বড় সুন্দর দেখাচ্ছে।

খেজাঙের কাঁটা ঝোপটা পেছনে রেখে লাংফু গ্রামের মোরাঙের পাশে এসে পড়লো পিয়ার্সন। সামনের চত্বরে অনেকগুলো ছোট ছেলে বর্শা ছুঁড়ে ছুঁড়ে নিশানা ঠিক করছিলো। বড় হয়ে এরাই ওস্তাদ শিকারী হবে। পিয়ার্সনকে দেখতে পেয়ে তারা চেঁচামেচি শুরু করলো। ছোট ছোট পাহাড়ী ছেলে। নেঙটো, তামাটে দেহ। বর্শা ছুঁড়ে ফেলে তারা সাঁ-সাঁ করে ছুটে এসে পিয়ার্সনকে ঘিরে ধরলো, "পাগলা সায়েব এসেছে, পাগলা সায়েব এসেছে—"

এই সব গ্রামের লোকেরা পিয়ার্সনকে পাগলা সায়েব বলে।

কয়েকটা ছেলে পিয়ার্সনের সাত ফুট দীর্ঘ দেহটা বেয়ে বেয়ে কাঁধে ঘাড়ে কোমরে উঠতে লাগলো। দু পাটি সাদা দাঁত বের করে নির্বিকার ভঙ্গিতে হাসতে লাগলো পিয়ার্সন।

ইতিমধ্যে নানা গলায় বায়না শুরু হয়েছে, "ও পাগলা সায়েব, চল্ আমরা টেফঙ (পাহাড়ী বানর) ধরতে যাবো। শিগগির চল্—"

"না না, বাঘ শিকার করতে যাবো হুই ঝরনার ধারে।"

"না না. শিকার না, আখুশি ফল আনতে যাবো হুই ফচিয়াগা বস্তিতে।"

"না না, শিকারেও যাবো না, হুই ফচিয়াগা বস্তিতেও যাবো না। গল্প বল্ পাগলা সায়েব—"

জনকয়েক পিয়ার্সনের লালচে চুলের গোছা বাগিয়ে ধরে টানাটানি শুরু করে দিয়েছে। কেউ ধারাল নখ বসিয়ে দিয়েছে সাদা ধবধবে হাতে। কোনদিকে বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নেই। এতটুকু বিকার নেই। শুধু নিঃশব্দ

মিটমিটি হাসিতে মুখখানা ভরিয়ে রেখেছে স্পোর্টসম্যান পিয়ার্সন। অজস্র শিশুকণ্ঠের কলকলানিতে সাঙস্থু ঋতুর সকালটা মেতে উঠেছে।

মাস তিনেক ধরে এই সব পাহাড়ী গ্রামগুলোতে আসছে পিয়ার্সন। প্রথম প্রথম এদের ভাষা পরিষ্কার বুঝতো না সে। তামাটে পাহাড়ী মানুষের দেশে সাত ফুট ধবধবে পিয়ার্সন এক সীমাহীন বিস্ময়। প্রথম দিকে তাদের সঙ্কোচ ছিলো। দু চোখের কোঁচকানো দৃষ্টিতে ছিলো সন্দেহ আর সংশয়। হুন্টসিঙ পাখির মত সাদা এই মানুষটা তাদের অভ্যস্ত পাহাড়ী জীবনে কিসের খোঁজে এসেছে? সন্দিগ্ধ দূরত্ব বজায় রেখে তারা তাকিয়ে থাকতো পিয়ার্সনের দিকে।

লাংফু গ্রামের সর্দারই তাকে প্রথম নিয়ে এসেছিলো। বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর কাছে ঘন ঘন গতায়াত আছে সর্দারের। তাকে তিন চোঙা রোহি মধু কবুল করে এই ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামে আসার অধিকার পেয়েছিলো পিয়ার্সন।

প্রথম প্রথম পাহাড়ী মানুষগুলির দৃষ্টিতে যে সন্দেহ এবং সংশয় বল্লমের ফলার মত চোখা হয়ে থাকতো, একদিন তার বদলে প্রসন্ন অভ্যর্থনা ফুটে বেরুলো। এই পাহাড়ী জীবন হাসি খুশি সহজ ভালবাসা এবং সরল মনের সবগুলি বৃত্তি দিয়ে তাকে জড়িয়ে ধরলো। আজকাল এদের ভাষা বুঝতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হয় না। নিজেও ভাঙা ভাঙা উচ্চারণে পাহাড়ী কথা বলতে পারে পিয়ার্সন।

ছোট ছোট ছেলেগুলি এবার অসহিষ্ণু হয়ে উঠেছে, "ও পাগলা সায়েব, দাঁড়িয়ে রইলি যে; আমাদের কথা মোটেই শুনছিস না তুই।"

"শুনছি তো।"

একটা খুব ছোট ছেলে লালচে চুলের গোছা ধরে বাদুড়ের মত ঝুলছিলো। তীক্ষ্ণ গলায় সে চেঁচিয়ে উঠলো, "হুই ত্থাখ্ সায়েব, সর্দারেরা জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে। হুই ত্থাখ্, হুই—যাবি?"

"তাই তো। এই জন্যে বুঝি তোদের গ্রামটা একেবারে খালি হয়ে গিয়েছে। সবাই দেখি জঙ্গলের দিকে যাচ্ছে।" বলতে বলতে অনেক নীচের উপত্যকায় তাকালো পিয়ার্সন।

উপত্যকাটা টিলায় টিলায় দোল খেয়ে নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। নীচের সেই খাদে নিবিড় বন। অজস্র বুনো গাছ এবং লতার বাঁধনে বন জটিল হয়ে রয়েছে। বনটাকে একটা বাঁকা খারে বর্শার মত ঘিরে রেখেছে দোইয়াঙ নদী। সেই নদীর পারে লাংফু গ্রামের জোয়ান ছেলেদের ছোট ছোট দেখাচ্ছে।

তাদের থাবার বর্শার ফলায় ফলায়, তীরের মাথায় মাথায় সাঙস্থ ঋতুর রোদ ঝকমক করছে।

সকলের সামনে রয়েছে গ্রামের সর্দার। তার মুঠিতে একটা বিরাট বল্লম।

জিজ্ঞাসু চোখে ছোট ছোট ছেলেগুলোর দিকে তাকালো পিয়ার্সন। বললো, "তোদের গ্রামের লোকেরা জঙ্গলে শিকার করতে যাচ্ছে না কি রে?

"না না—" ছেলেগুলো একসঙ্গে হল্লা শুরু করলো।

"তবে কী করতে যাচ্ছে? ঝুমের আবাদের জন্যে জঙ্গল পোড়াতে?"

"না রে পাগলা সায়েব, তা-ও নয়। চিনাসঙবাকে ফুঁড়তে যাচ্ছে ওরা। সদ্দার চিনাসঙবার মুণ্ডু এনে মোরাঙে ঝোলাবে। ওর রক্ত দিয়ে মোরাঙ চিত্তির করবে।" ছোট ছোট ছেলেগুলির গলা থেকে উল্লসিত শোরগোল আকাশের দিকে উঠে গেল।

শুনতে শুনতে থাড়া মেরুদাঁড়াটার মধ্য দিয়ে যেন হিম নামতে শুরু করলো পিয়ার্সনের। রক্তের কণাগুলোর মধ্য দিয়ে এক ঝলক বিদ্যুৎ বয়ে গেলো। কাঁপা কাঁপা গলায় পিয়ার্সন বললো, "চিনাসঙবা কে রে?"

"চিনাসঙবা হলো ইটিভেনের মেয়ে।"

"তাকে ফুঁড়বে কেন?"

অসংখ্য শিশুকণ্ঠে এবার দোইয়াঙ নদীর জলোচ্ছ্বাসের মত শব্দ হলো, "তুই কী রে পাগলা সায়েব! তোর একটুও মগজ নেই। আমাদের বস্তির, লাঙ্কু বস্তির, দুই ফচিয়াগা বস্তির সবাই জানে আর তুই জানিস না! কাল মাঝ রাত্তিরে চিনাসঙবা যে মোরাঙে এসে ঢুকেছিলো! মাগীদের তো মোরাঙে ঢুকতে নেই। সদ্দার ক্ষেপে গিয়েছে। ভয়ে চিনাসঙবা জঙ্গলে পালিয়েছে। তাকে ফুঁড়বার জন্যেই তো সকালবেলা জোয়ান ছেলেদের নিয়ে সদ্দার জঙ্গলে গিয়েছে।"

অসহ্য গলায় পিয়ার্সন বললো, "মোরাঙে কেন ঢুকেছিলো চিনাসঙবা? কী রে?"

ছোট ছোট ছেলেগুলো এবার একেবারে থেমে গেলো। এই জটিল জিজ্ঞাসার কোন সরল উত্তর তাদের জানা নেই। চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো তারা। ফিসফিস গলায় একজন বললো, "তা তো জানি না রে পাগলা সায়েব।"

যে ছেলেটি পিয়ার্সনের লালচে চুলের গোছা ধরে ঝুলছিলো, এবার সে একটা পাহাড়ী আপেলের মত টুপ করে নীচে খসে পড়লো। মাথায় কয়েক গাছা মরা মরা ফ্যাকাশে চুল। লিকলিকে ঘাড়ের ওপর বড় মাথা। অতিকায়

দুটো কান। অস্বাভাবিক ছোট দুটো কুতকুতে চোখ। বিরাট পেট। হাত-পা সরু সরু। মাংসহীন, নীরক্ত দেহ। পাটল রঙের মোটা মোটা ঠোঁটের মিটিমিটি হাসির সঙ্গে ছোট ছোট চোখের মজাদার ভঙ্গি ঘুরিয়ে ছেলেটি বললো, "ইজা হুবুতা! শয়তানের বাচ্চারা, তা-ও জানিস না! হুই চিনাসঙবার গায়ে যে পিরীতের জ্বালা ধরেছে। সদ্দারের ছোট ছেলে হলো ওর লগোয়া লন্যা (প্রেমিক)। রাত্তিরে মরদের গন্ধ না পেলে মাগীর ঘুম আসে না। সেই ছোড়াটার খোঁজেই তো চিনাসঙবা কাল রাত্তিরে মোরাঙে ঢুকেছিলো।"

ছোট ছেলেটিকে বড় বিজ্ঞ-বিজ্ঞ দেখাচ্ছে। দু চোখে কৌতুক মিশিয়ে ছেলেটিকে লক্ষ্য করছিলো পিয়ার্সন। যতটা ছোট সে তাকে মনে করেছিলো, আসলে ততটা ছোট সে নয়। তেরো চোদ্দ বছর বয়স হবে। এই পাহাড়ের অফুরন্ত রোদ-বাতাস-আলো থেকে প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্য যোগাড় করে নিতে পারে নি সে। দেহের মধ্যে নানা রোগ শিকড় গেড়ে বসেছে। সেই সব রোগ তার পুষ্টি, তার স্বাস্থ্য এবং বাড়কে চিরকালের জন্য ঠেকিয়ে রেখেছে। দেহটা বাড়তে পারে নি। দুর্বল অশক্ত দেহ নিয়ে আর পাঁচটা শিশুর মত সে দৌড়-ঝাপ করতে কি শিকারে যেতে পারে না। অঙ্গপ্রত্যঙ্গের ক্রিয়া নেই, সঞ্চালনও নেই। একপাশে বসে বসে সে কেবল দেখে আর ভাবে। ক্রমাগত ভাবতে ভাবতে মনটা অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে ক্রিয়া করে। সুস্থ মানুষের মধ্যে সহজ বৃত্তিগুলির অনুশীলন যেমন হয়, এই সব অসুস্থ জীর্ণ দেহের মানুষের মধ্যে তেমন হয় না।

পাহাড়ী গ্রামে যেমন নানা শাসনবিধি, আচার-বিচার, ন্যায়-অন্যায়ের কড়াকড়ি রয়েছে, ঠিক তেমনি খোলামেলা আকাশের নীচে দিনের আলোতে হঠাৎই হয়তো জীবনের আদিম প্রবৃত্তির নগ্ন প্রকাশ দেখা যায়। সেই সব চোখে পড়ে ছেলেটির। সে ভাবে। মনটা পঙ্গু হাড় জিরজিরে দেহের শিরা উপশিরার আলো আঁধারি গালঘুঁজিতে অসহ্য তাড়নায় ছুটতে থাকে। একটু একটু করে মনটা পাকে। বয়সের তুলনায় জৈব প্রবৃত্তিগুলি সম্বন্ধে অনেক বেশি ধারণা হয়। মনের মধ্যে তোলপাড় চলে। রোগা অশক্ত দেহের, পাকা মনের ছেলেটির দিকে তাকিয়ে অদ্ভুত কৌতুক বোধ করছে পিয়ার্সন।

আচমকা পিয়ার্সন চমকে উঠলো। নীচের উপত্যকা থেকে ভয়ঙ্কর শোরগোল উঠে আসছে। দোইয়াঙ নদীর দুপারের বনভূমিতে অসংখ্য বর্শা ঝলকাচ্ছে। সমগ্র সত্তা ভীষণভাবে নাড়া খেয়ে উঠলো পিয়ার্সনের।

"হো-ও-ও-ও—য়া—য়া—"

"হো-ও-ও-ও—য়া—য়া—"

ছোট ছোট ছেলেদের জটলাটা ভেঙেচুরে উপত্যকাব দিকে ছুটে চললে পিয়ার্সন। পায়ের তলা দিয়ে ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে লাগলে কাঁটাঝোপ, টিলা, ধারাল পাথরের পথ। মাথার ওপর সরে সরে যাচ্ছে আতামারী বন, খাসেম গাছের ডালপালা, ফুল আর হালকা মেঘের আকাশ এই মুহূর্তে, এখনই, দোইয়াঙ নদীর পারে ঐ ঘন জঙ্গলটার পাশে তাকে পৌছতে হবে। আরো, আরো জোরে পা চালিয়ে দিলো স্পোর্টসম্যান পিয়ার্সন। আর পেছন থেকে ছোট ছোট ছেলেদের কলকলানি ধাওয়া করে আসতে লাগলো, "ও পাগলা সায়েব, শিকারে যাবি না? ও পাগলা সায়েব গল্প বলবি না? তুই কোথায় পালাচ্ছিস?"

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

একটা খেজাঙের কাঁটাঝোপ ঘিরে চিৎকার উঠছে।

লাংফু গ্রামের সর্দার কানের নীয়েঙ দুলে নাড়া দিয়ে, হাতের বাঁকা বল্লম ঝাঁকিয়ে হুঙ্কার ছাড়লো, "হু-হু, মাগীটা এই ঝোপের মধ্যেই লুকিয়ে রয়েছে তোরা সবাই বর্শা হাঁকড়া। মাগীটার একটা পা আমি দেখতে পেয়েছি। হুই যে, হুই যে—"

জন তিনেক জোয়ান ছেলে ঝোপের পাশ থেকে সর্দারের কাছে ছুটে এলো, "কই রে সদ্দার?"

সমস্ত মুখে চামড়া কুঁকড়ে অসংখ্য আঁকিবুকি ফুটে রয়েছে। কপিশ চোখজোড়া জলছে। লাংফু গ্রামের সর্দার হুমকে উঠলো, "আহে ভু টেলো একেবারে কানা হয়ে গেছিস দেখি। বর্শা হাঁকড়ে আগে তোর চোখ উপড়ে নেওয়া দরকার। হুই দেখছিস না?"

খেজাঙের কাঁটা ঝোপটার একেবারে মাঝখানে একটি উলঙ্গ নারীদেহ হাঁটু মুড়ে গুটিসুটি মেরে বসে রয়েছে। চারপাশে খেজাঙ কাঁটা। কেমন করে ঝোপের মধ্যে ঢুকেছে; তা সে-ই জানে। অসহায় করুণ চোখে সর্দারের দিকে তাকিয়ে রয়েছে মেয়েটি।

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

"হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

জোয়ান ছেলেরা সমানে চেঁচাতে লাগলো। কেউ কেউ ঝোপের মধ্যে বর্শা ঢুকিয়ে মেয়েটিকে খোঁচাতে শুরু করেছে।

"হুই, হুই তো বসে রয়েছে মাগীটা। হুই তো চিনাসঙবা।"

লাংফু গ্রামের সর্দার পাখির পালকের মুকুটে ঝাঁকানি দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, "আর দেরি করছিস কেন? এবার বর্শা হাঁকড়াতে শুরু কর। মাগীটাকে ফুঁড়ে আবার বস্তিতে ফিরতে হবে না? দুপুর হয়ে এলো। খিদে পাচ্ছে। নে তাড়াতাড়ি কর।"

খেজাঙের কাঁটাঝোপে তীক্ষ্ণ আর্তনাদ উঠলো। চিনাসঙবা বললো, "আমাকে মারিস না সদ্দার। বর্শা হাঁকড়ালে একেবারে সাবাড় হয়ে যাবো।" একটু থেমে ও পাশের বেঁটেখাটো জোয়ানটাকে লক্ষ্য করে বললো, "এই উলুবাঙ, আমাকে মারিস না। তুই না আমার পিরীতের জোয়ান। তোর খোঁজেই তো কাল রাত্তিরে মোরাঙে ঢুকেছিলাম।"

উলুবাঙ দাঁতমুখ খিঁচিয়ে উঠলো, "পিরীতের মরদ! কাল কি তোকে আমি মোরাঙে ঢুকতে বলেছিলাম! এখন তোকে কে বাঁচাবে?" বলতে বলতেই খেজাঙ ঝোপের ওপর বর্শা ছুঁড়লো উলুবাঙ।

চিনাসঙবা কি জানতো উলুবাঙ নামে এক সুন্দর পিরীত, এক উদ্দাম পাহাড়ী যৌবন এত নির্মম, এত নিষ্ঠুর? সে কি জানতো, পাহাড়ী জীবনের রীতিতে মমতা নেই, করুণা নেই, প্রেমের জন্য বিন্দুমাত্র ক্ষমা নেই।

খেজাঙের কাঁটাঝোপে এতটুকু ফাঁক নেই। পাতায় কাঁটায় এবং সরু সরু ডালে নিবিড় এবং জটিল হয়ে রয়েছে। উলুবাঙের বর্শা সেই কাঁটাঝোপ ভেদ করে চিনাসঙবার সুন্দর কোমল দেহটাকে ফুঁড়তে পারে নি।

উলুবাঙের সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য জোয়ানেরা বর্শা ছুঁড়তে লাগলো। কিন্তু খেজাঙের কাঁটাঝোপ বড় ঘন। তার মধ্য দিয়ে বর্শা ঢুকতে পারলো না। একটা আঁচড় পর্যন্ত লাগলো না চিনাসঙবার গায়ে। নিষ্পলক, অসহায় দৃষ্টিতে তাকিয়ে, হাঁটু দুটো বুকের মধ্যে গুঁজে দলা পাকিয়ে রয়েছে চিনাসঙবা। কথা বলছে না, নড়ছে না, কাঁপছে না। একেবারেই বোবা হয়ে গিয়েছে সে।

লাংফু গ্রামের সর্দার সাঙ্ঘাতিক ক্ষেপে উঠেছে। একটা বর্শাও লক্ষ্যে গিঁথছে না। সব নিশানাই ব্যর্থ হয়ে ফিরে আসছে। কদর্য মুখভঙ্গি করে সে হুঙ্কার ছাড়লো, "পাহাড়ী জোয়ান হয়েছে শয়তানের বাচ্চারা! ঝোপের

মধ্যে মাগীটা বসে রয়েছে; তাকে যদি একজনও ফুঁড়তে পারে! ইস্ত্রা টিবুঙ! তোদের কিচ্ছু করতে হবে না। যা, ভাগ। আমিই ছুই চিনাসঙবাকে সাবাড় করবো।"

ছুটি ঘোলাটে চোখ চারদিকে ঘুরপাক খাইয়ে লাংফু গ্রামের সর্দার আবার গর্জে উঠলো, "এই চিনাসঙবা, এই মাগী, ঝোপ থেকে বেরিয়ে আয়। নইলে ঝোপে আগুন ধরিয়ে দেবো। হু-হু—"

এতক্ষণে চিনাসঙবা নড়লো। বুকের মধ্যে গোঁজা হাঁটু দুটো ছিটকে গেলো। চারপাশের বনভূমি চমকে দিয়ে আর্ত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, "আ-উ-উ-উ-উ, না না, আগুন দিস নি সদ্দার। পুড়িয়ে পুড়িয়ে না মেরে বর্শা দিয়েই খতম করে দে।"

"হিক-হিক-হিক—" বিকট, ভীষণ গলায় টেনে টেনে হেসে উঠলো লাংফু গ্রামের সর্দার। বললো, "হু-হু, এর নাম হলো ওষুধ! বেরিয়ে আয়, বেরিয়ে আয় শিগগির। বর্শা হাঁকড়াবার জন্যে হাতটা বড় নিসপিস করছে।" বলতে বলতেই দৃষ্টিটাকে জোয়ান ছেলেদের দিকে ঘুরিয়ে নিলো, "শোন রে টেফঙের বাচ্চারা, তোরা কেউ চিনাসঙবার গায়ে হাত দিবি না। আমি বর্শা দিয়ে গিঁথে, বল্লম দিয়ে ফুঁড়ে, সুচেন্যু দিয়ে কুপিয়ে একটু একটু করে মারবো। হিক-হিক-হিক।" আবারও সেই হাসি শুরু হলো।

খেজাঙের কাঁটাঝোপ থেকে হামাগুঁড়ি দিয়ে বেরিয়ে এলো চিনাসঙবা। তার সমস্ত দেহটা থরথর করে কাঁপছে।

"হিক-হিক-হিক—" বীভৎস হাসির রেশটা তখনও থামে নি। লাংফু গ্রামের সর্দার পরিতৃপ্ত ঘড়ঘড়ে গলায় বললো, "তোকে তারিয়ে তারিয়ে মারবো রে মাগী। যা, ছই আতামারী গাছটার গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়া।"

সর্দারের নির্দেশমত আতামারী গাছের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়ালো চিনাসঙবা। দৃষ্টিটা বিস্ফারিত হয়ে গিয়েছে। কিছুই সে দেখতে পাচ্ছে না, শুনছে না। উজ্জ্বল তামাটে মুখখানা পাঁশুটে দেখাচ্ছে। নগ্ন সুঠাম দেহটা টলছে। দাঁড়িয়ে থাকতে পারছে না চিনাসঙবা। একটা কথাই সে এখন ভাবতে পারছে, কখন সর্দারের থাবা থেকে বিরাট থাবে বর্শার ফলাটা ছুটে এসে তার পাঁজর ফুঁড়ে দেবে।

একটু দূরে বর্শাটা দিয়ে তাক করতে করতে ভয়ানক চোখে তাকালো

লাংফু গ্রামের সর্দার। তার চোখের কালো খসখসে পাতাটা পড়ছে না। ঘোলাটে, ঈষৎ লালের ছোপধরা মণি দুটোতে ভয়ঙ্কর হিংস্রতা জ্বলছে।

আকাশের দিকে বর্শাটা তুলে সর্দার যেইমাত্র ছুঁড়তে যাবে, তার আগেই বিরাট একটা আজারি পাখির মত দুটো বাহু বিস্তার করে মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়লো পিয়ার্সন।

বর্শাটা নামিয়ে দাঁতমুখ খিঁচিয়ে হুমকে উঠলো লাংফু গ্রামের সর্দার, "আহে ভু টেলো! এর মধ্যে তুই আবার কেন এসেছিস পাগলা সায়েব। ভেগে পড় এখান থেকে। মাগীটাকে ফুঁড়তে দে।"

"না।" ভয়ানক, অস্বাভাবিক গলায় পিয়ার্সন গর্জন করে উঠলো। সেই গর্জন দুপাশের পাহাড়ে আছাড়ি-পিছাড়ি খেতে খেতে পাকিয়ে পাকিয়ে ওপরের বাতাসে মিশে গেলো। চারপাশের বনস্থলীতে গর্জনের রেশ অনেকক্ষণ জেগে রইলো।

লাংফু গ্রামের লোকেরা চমক খেয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলো। পিয়ার্সনের গলার এমন একটা সাঙ্ঘাতিক আওয়াজের সঙ্গে তাদের কোন পরিচয় নেই।

এবার শান্ত, ধীর গলায় পিয়ার্সন বললো, "না, আমার সামনে মেয়েলোককে খুন করতে দেবো না।"

লাংফু গ্রামের সর্দার ক্রূর চোখে তাকালো। বললো, "এখনও সরে যা বলছি পাগলা সায়েব। নইলে জানে মেরে ফেলবো। তুই আমাদের বস্তিতে রোজ আসিস; তোকে আমরা খাতির করি। তাই বর্শা হাঁকড়াচ্ছি না। এবার সরে যা। মাগীটাকে সাবাড় করতে দে।"

স্থির দৃষ্টিতে একবার পাহাড়ী সর্দারটির দিকে তাকালো মিশনারী পিয়ার্সন। মিশনারী পিয়ার্সন নয়, স্পোর্টসম্যান পিয়ার্সন। সর্দারের ঘোলাটে চোখে হত্যা ঝিলিক দিচ্ছে। ভীষণ ভয়ঙ্কর এবং বীভৎস হত্যা। শিউরে উঠলো পিয়ার্সন। নাগা পাহাড়ের এই বনস্থলীতে, এই উপত্যকায়, এই উজ্জ্বল রোদের দিনে তার স্পোর্টসম্যান জীবনের এবং মিশনারী জীবনের এমন একটা মারাত্মক অরডিল, এমন একটা সাংঘাতিক পরীক্ষা অপেক্ষা করছিলো, তা কি সে জানতো?

এবার খানিকটা দূরে আতামারী গাছের গায়ে একটা নগ্ন নারীদেহের দিকে তাকালো পিয়ার্সন। নিশ্চয়ই চিনাসঙবা। এতক্ষণ চিনাসঙবা কাঁপছিলো, টলছিলো। এখন একেবারেই নিথর হয়ে গিয়েছে। তার স্নায়ুশিরা,

অস্ফুট বন্য মনের বোধ-বুদ্ধি-অনুভূতি, হাড়-মেদ-মজ্জা নিষ্ঠুর অপঘাতের প্রতীক্ষায় আড়ষ্ট, অথর্ব হয়ে গিয়েছে। চোখের ঈষৎ পিঙ্গল তারা দুটো স্থির হয়ে রয়েছে।

এপারে লাংফু গ্রামের সর্দার নামে এক আদিম হত্যা ; ওপারে চিনাসঙবা নামে এক অসহায় জীবন। আলারি পাখির মত বিশাল দুটো বাহু বিস্তার করে এই ঝকঝকে রোদের দিনে নাগা পাহাড়ের একটি হত্যা এবং একটি নিরুপায় জীবনকে দেখতে দেখতে স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছালো পিয়ার্সন। জীবন আর মৃত্যু। এই পাহাড়ী পৃথিবীতে তারা কী সহজ! কী স্বচ্ছন্দ! কী অন্তরঙ্গ! কী পাশাপাশি!

পিয়ার্সনের সমস্ত চৈতন্য জুড়ে একটা অমোঘ কর্তব্যের বোধ ক্রমাগত তাড়না করতে লাগলো। চিনাসঙবাকে বাঁচাতেই হবে। যেমন করেই হোক।

লাংফু গ্রামের সর্দার আবারও হুঙ্কার দিলো, "সরে যা পাগলা সায়েব।"

"না।" নির্মম চোখে তাকালো পিয়ার্সন। তার গলায় বাজ চমকালো যেন, "ওকে কেন মারবি? ও কী করেছে?"

"ইজা হুবুতা!" দাঁতে দাঁতে কড়মড় শব্দ করে লাংফু গ্রামের সর্দার বললো, "সে আমাদের বস্তির ব্যাপার। হুই মাগী মোরাঙে ঢুকে মোরাঙের ইজ্জত মেরেছে। মাগীর আবার মরদ না পেলে রাত্তিরে ঘুম আসে না। মরদের খোঁজে মোরাঙে ঢুকেছিলো। আমরা জেগে উঠে তাড়া দিতে এই জঙ্গলে পালিয়ে এসেছে।" চারপাশের জোয়ানদের দিকে দৃষ্টিটা ঘুরিয়ে সর্দার বললো, "তাই না রে শয়তানের বাচ্চারা?"

"হু-হু—" মাথা নেড়ে সমস্বরে সকলে সায় দিলো, "হুই উলুবাঙের খোঁজে মোরাঙে ঢুকেছিলো। উলুবাঙ হলো চিনাসঙবার পিরীতের জোয়ান।"

একপাশে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সকলের ভাবগতিক লক্ষ্য করছিলো উলুবাঙ। এবার প্রবল বেগে চওড়া ঘাড়, সেই সঙ্গে কোমর থেকে শরীরের উঁচু অংশটা নাড়তে নাড়তে বললো, "হু-হু, ঠিক কথা। চিনাসঙবা আমার পিরীতের মাগী। তাই বলে রাত্তিরে ও মোরাঙে ঢুকবে! ও জানে না মাগীদের মোরাঙে ঢুকতে নেই। ঢুকলে খুনখারাপি হয়ে যায়। বস্তির সব মানুষকে সারাদিন না খেয়ে 'গেন্না' পালতে হয়! আনিজার নামে হলদে কুকুর বলি দিতে হয়। শয়তানীকে সাবাড়ই করে ফেলবো।" বলতে বলতে উলুবাঙ ফুঁসে উঠলো। বর্শা উঁচিয়ে লালচে ক্রুদ্ধ চোখে চিনাসঙবার নিথর নিস্পন্দ দেহটার দিকে তাকালো।

অবশ, আড়ষ্ট চোখে চিনাসঙবা তাকিয়ে রয়েছে। কিছুই যেন শুনতে দেখতে বা বুঝতে পারছে না। যন্ত্রণা উত্তেজনা রোষ হিংসা—পাহাড়ী মনের তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট ধর্মগুলো পর্যন্ত সে যেন হারিয়ে ফেলেছে। অদ্ভুত ধরনের এক মৃত্যুর ভয় তার শিরা-স্নায়ু-শোণিতের দেহটাকে বিকল, অথর্ব করে দিয়েছে। আতামারী গাছের গায়ে হেলান দিয়ে নিঝুম হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে চিনাসঙবা।

"সব শুনলি তো! এবার মাগীটাকে ফুঁড়তে দে।" সহজ, অত্যন্ত স্বাভাবিক গলায় বললো লাংফু গ্রামের সর্দার।

"না, ওকে আমি মারতে দেবো না।"

"না মারলে মাগীটা থাকবে কোথায়? জঙ্গলে থাকলে বাঘ কি ময়ালের পেটে যাবে। হয়তো বুনো মোষের গুঁতোয় সাবাড় হবে। নইলে ডাইনী হবে। গুণতুক শিখে আমাদের খতম করবে।" একটু থেমে, দম নিয়ে সর্দার আবার বললো, "ও পাপ রেখে কাজ নেই। তুই যা পাগলা সায়েব। আমরা ওকে ফুঁড়ি। বস্তিতে তো ওকে ঢুকতে দেবো না, এই পাহাড়েও থাকতে দেবো না। যা, যা সায়েব।"

"কেন, বস্তিতে ঢুকতে দিবি না কেন?"

"বস্তিতে ঢোকালে আমাদের ওপর আনিজার খারাপ নজর এসে পড়বে। সিঁড়িক্ষেতে ফসল ফলবে না। গাছে ফল ধরবে না। কুকুর শুয়োরেরা বিয়োবে না। নতুন বিয়ের ছুঁড়িগুলো বাঁজা হয়ে যাবে। এবার বুঝতে পারছিস, মাগীটাকে কেন খুন করবো?"

"যদি ও বাঁচতে চায়? যদি চিনাসঙবা অন্য পাহাড়ে পালিয়ে যায়?"

লাংফু গ্রামের সর্দার গর্জে উঠলো, "পালালেই হলো! ইজা হুবুতা! আমরা পাহাড়ী মানুষ না! আমাদের হাতে বর্শা নেই!" বলতে বলতে চোখ জোড়া জ্বলতে লাগলো সর্দারের। এই মুহূর্তে তাকে কী ভয়ঙ্করই না দেখাচ্ছে।

একটু চমকে উঠলো পিয়ার্সন। চমকের ভাবটা কাটলে তীক্ষ্ণ গলায় বললো, "মারবিই তবে মেয়েটাকে?"

"হু-হু, মাগীটাকে মারবার আগে তোকে সাবাড় করবো। মোরাঙে ঢুকে হুই শয়তানী মোরাঙের ইজ্জত মেরেছে। তুই এসেছিস তাকে বাঁচাতে! তুই একটা আস্ত আনিজা।" বলতে বলতে সর্দার বর্শাটা ছুঁড়ে মারলো।

সাত ফুট দীর্ঘ একটা দেহ। শিরায় শিরায় চলন্ত রক্তের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎ

খেলে গেলো যেন। ছিপছিপে একটা বেতের মত দেহটা একপাশে মুয়ে পড়েই খাড়া হয়ে গেলো। এর মধ্যে বর্শাটা সাঁ করে পাশের একটা খাসেম গাছে গেঁথে গিয়েছে। নিমেষের মধ্যেই ঘটনাটা ঘটলো।

তারপর একান্ত আচমকা সারপ্লিসটা খুলে ফেললো পিয়ার্সন। বেরিয়ে এলো সাত ফুট ঋজু এক স্পোর্টসম্যান। একবার লাংফু গ্রামের সর্দারের দিকে সে তাকালো। সর্দারের ঘোলাটে, ঈষৎ লালচে চোখে মৃত্যু ঝিলিক দিচ্ছে। সেই ভয়ানক চোখজোড়া নিষ্পলক হয়ে পিয়ার্সন নামে এক দুর্দান্ত প্রতিপক্ষের দিকে তাকিয়ে রয়েছে।

প্রথমটা বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো সর্দার। তার বর্শার লক্ষ্যকে ব্যর্থ করে দিয়েছে ঐ সাদা মানুষটা, ঐ পাগলা সাহেব। তার অসংখ্য বছরের জীবনে এমনটি আর কোন দিনই ঘটে নি। তার বর্শার তাক এমন করে আর কোনদিনই ব্যর্থ হয় নি। সর্দারের সঙ্গে সঙ্গে পাহাড়ী জোয়ানগুলোও অবাক এবং স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে।

হঠাৎ কেউ কিছু করা বা বলার আগেই আতামারী গাছটার দিকে ছুটে গেলো পিয়ার্সন। চিনাসঙবার একটা হাত ধরে টানতে টানতে সামনের নিঃশব্দ ঝরনাটা পেরিয়ে গেলো। প্রথমটা অদ্ভুত ঘোরের মধ্যে ছুটছিলো চিনাসঙবা। বলা যায়, পিয়ার্সনই তাকে ছোটাচ্ছিলো। একটু একটু করে ঘোরটা কেটে গেলো। প্রাণ বাঁচাবার আদিম জৈবিক তাড়নায় পিয়ার্সনের পাশে পাশে নিজেই সে এবার দৌড়াতে লাগলো। জোরে, আরো জোরে। তীব্র, প্রবল গতিতে।

একটা সাদা এবং একটা উজ্জ্বল তামাটে দেহ সাঁ-সাঁ করে দূরের চড়াইটার দিকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে।

পেছন থেকে লাংফু গ্রামের সর্দার চিৎকার করে উঠলো, "শয়তানের বাচ্চারা ভাগলো। ধর—ধর—ফুঁড়ে ফেল।"

সঙ্গে সঙ্গে চারপাশের জোয়ানদের গলায় একটা প্রচণ্ড হুঙ্কার ভেঙে পড়লো, "হো-ও-ও-ও-য়া-য়া—"

একচল্লিশ

কোহিমা পাহাড়ে বাতাস মেতে উঠেছে। সমতলের দেশ পাড়ি দিয়ে কত দূর থেকে বাতাস এসেছে, কে জানে? পাক খেতে খেতে চারপাশের বনভূমি মাতিয়ে ঝাঁকিয়ে নাচিয়ে, ফুল-পাতা ঝরিয়ে, এলোপাথাড়ি ডালপালা ভেঙেচুরে, টিলায় টিলায় আছাড়ি-পিছাড়ি খেয়ে সোঁ সোঁ ছুটেছে। কোহিমার বাতাস—জঙলী, উদ্দাম এবং পাহাড়ী; জখমী জানোয়ারের মত সে কেবল ফোঁসে আর গর্জায়।

কোহিমার আকাশে আশ্চর্য সুন্দর চাঁদ উঠেছে। সু-লু (শুক্ল) পক্ষের চাঁদ। সাদা জ্যোৎস্না শান্ত স্তব্ধ ফেনার মত ছড়িয়ে পড়েছে। এই শহর কোহিমা, চারপাশে টিলায় টিলায় চূড়ায় চূড়ায় দোল-খাওয়া নাগা পাহাড় আবছা আলো এবং আঁধারির বুননে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

চার্চের সামনে নিরপেক্ষভাবে ছাঁটা ছোট ঘাসের জমি। সবুজ মখমলের মত নরম এবং সুখস্পর্শ। একটু দূরে কাঠের সাদা ক্রশ। মানবপুত্র নিজের রক্ত দিয়ে এই রিপুতাড়িত, ভোগাসক্ত এবং সংস্কারাচ্ছন্ন জগৎকে শুদ্ধ করেছিলেন। পবিত্র করেছিলেন। এই ক্রশ আক্ষেপ মূঢ়তা এবং প্রায়শ্চিত্তের স্মৃতি।

ঘাসের জমিতে খানকয়েক বেতের চেয়ার ইতস্তত ছড়ানো। একটিতে জাঁকিয়ে বসেছে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা দিয়ে অলস ভঙ্গিতে জপমালা জপছে।

সামনের গেটে ক্যাঁচ করে শব্দ হলো।

বীডস্ জপতে জপতে গভীর, আত্মগত ভাবনায় মগ্ন হয়ে ছিলো বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। কপালে মাকড়সার জালের মত কতকগুলি সূক্ষ্ম হিজিবিজি রেখা ফুটে রয়েছে। গেটে শব্দ হতেই চমকে তাকালো ম্যাকেঞ্জী। ভাবনাটা পেঁজা তুলোর মত মনের মধ্যে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়লো। সামনের দিকে তাকিয়ে চোখের কটা মণি দুটো একটু নেচে প্রসন্নতায় ভরে গেলো। কপাল থেকে মাকড়সার জালটা মুছে গিয়েছে। সোচ্ছ্বাস গলায় ম্যাকেঞ্জী বললো, "হ্যালো জনসন; কখন এলে কোহিমায়? এসো, বোসো—"

একজন সুদর্শন তরুণ মিশনারী ম্যাকেঞ্জীর পাশে এসে ঘন হয়ে দাঁড়ালো। ম্যাকেঞ্জী অতি মাত্রায় ব্যস্ত হয়ে উঠলো, "আরে তুমি দাঁড়িয়ে রইলে কেন? ঐ চেয়ারটায় বোসো।"

কুণ্ঠিত ভঙ্গিতে সামনের বেতের চেয়ারে বসলো জনসন। একটুক্ষণ চুপ। ম্যাকেঞ্জী আবার বললো, "তারপর মাই চ্যাপ, জুনোবটতে কেমন প্রীচিঙ চলছে?" কথা বলতে বলতে সমস্ত মুখে একটি ঝিকিমিকি সস্নেহ হাসি ফোটালো। এই ধরনের হাসি বহুদিনের সাধনায় আয়ত্ত করেছে ম্যাকেঞ্জী। যে-কোন সময় একান্ত অবলীলায় সে এমন ভঙ্গিতে হাসতে পারে। সমস্ত মুখে ঝিকিমিকি হাসি আর দুটো চোখের কটা মণিতে অতি ধূর্ত অতি চতুর এবং সূক্ষ্ম ফাঁদ পেতে জনসনের দিকে তাকিয়ে রইলো পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী।

"প্রীচিঙ খুব সুবিধের হচ্ছে না ফাদার।" ভারি বিষন্ন দেখালো জনসনকে।

"কেন?" কটা চোখের মণিতে সেই ধূর্ত এবং সূক্ষ্ম ফাঁদটা এবার একটু একটু করে স্পষ্ট হতে লাগলো বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর।

"কেন আবার? এদিকে ফাদার যীশু মাদার মেরী করবে; ওদিকে আবার কুকুর, শুয়োর, মোষ বলি দেবে। নুড়ি-পাথর-সাপ-বাঘ পুজো করবে। এমন করলে এত কষ্ট করে প্রীচ্ করার কী লাভ?" হতাশ, মুষড়ে-পড়া গলায় জনসন বললো।

"আডোলেটারস্, ইনফিডেলস্, হিলি বীস্টস্—" জপমালা জপতে জপতে শব্দগুলোকে কড়মড় করে চিবুতে লাগলো যেন ম্যাকেঞ্জী, "এই প্যাগান-গুলোকে ব্যাপটাইজ করা আমরা তো কোন ছার, যীশুর ফোরফাদারেরও সাধ্য নেই। স্কাউণ্ড্রেলস্, হিলি সোয়াইনস—"

পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর উচ্চারণে মহিমা আছে। এমন সংযমে, মুখের একটি রেখাকেও বিকৃত না করে, জপমালার ওপর ডান হাতের বুড়ো আঙুলটা নিরুত্তেজ রেখে এত আস্তে কথাগুলো সে জিভ থেকে খসিয়ে দেয়, মনে হয়, বড় পাদ্রী বুঝি কোন সুনীতিবিষয়ক অরাক্যল আওড়াচ্ছে।

জনসন বললো, "কী বললেন ফাদার?"

"ও কিছু নয়। ব্যাপারটা কি জানো জনসন—" বেতের চেয়ারটা আরো একটু এগিয়ে সরাসরি দৃষ্টিতে জনসনের চোখের মধ্যে তাকালো ম্যাকেঞ্জী। দৈব আবেশ যেন ভর করলো তার গলায়, "এত সহজে বিশ্বাস হারালে কিংবা হতাশ হলে তো চলবে না মাই বয়। জানো তো, প্রভুর নির্দেশমত আমরা,

এই মিশনারীরা সমস্ত ওয়ার্ল্ডে ছড়িয়ে পড়েছি। সন্স অব সিনার্সদের অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে যেতে হবে। ডোণ্ট বী ডিজেক্টেড মাই চ্যাপ। পৃথিবীর দশ দিকে যেশাসের নাম ছড়িয়ে দিতে হবে। ইন ডেজার্ট, ইন সী, ইন ফরেস্ট, ফ্রম ওয়ান পোল টু অ্যানাদার, বুঝলে কি না জনসন, যেখানে এতটুকু জীবনের চিহ্ন রয়েছে, সেখানেই আমরা, ইয়াস আমরা হোল্ড অ্যালফ ট্ দা গনফেলন অব ক্রিশ্চ্যানিটি। সার্টেনলি, ডু উই মাস্ট—" ম্যাকেঞ্জীর ভরাট গম্ভীর গলাটা ধীর স্থির শান্ত। উত্তেজনা নেই, মত্ততা নেই তার মুখে-চোখে। তীক্ষ্ণ কর্তব্যবোধে জনসনকে সজাগ করে দিতে দিতে ম্যাকেঞ্জী আবার বললো, "বোঝো তো জনসন, অন্ধকারের সঙ্গে যেশাসকে কত সংগ্রাম করতে হয়েছে। এই অন্ধকার পাশব প্রকৃতির মানুষের কুসংস্কার, তার মূঢ়তা, হীনতা এবং হিংস্রতার অন্ধকার। শেষ পর্যন্ত জগতের কল্যাণের জন্য পাপাচারীর সন্তানদের মতিগতি শুদ্ধ করার জন্য প্রাণ পর্যন্ত তাঁকে দিতে হয়েছে! তবু কর্তব্য থেকে তিনি এক-পা সরে যান নি। আমরা তাঁরই সন্তান। তাঁর অভিপ্রেত পথে নেমে আমাদের বিচলিত হলে তো চলবে না, মাই বয়।"

ম্যাকেঞ্জী লক্ষ্য করতে লাগলো তাঁর কথাগুলোতে জনসনের মুখেচোখে কি প্রতিক্রিয়া হচ্ছে।

লজ্জিত গলায় জনসন বললো, 'না, না ফাদার, আমি তা মীন্ করি নি। কর্তব্যে কি সংগ্রামে আমি একটুও ভয় পাই না। ক্রিশ্চ্যানিটির জন্য আমি প্রাণ পর্যন্ত দিতে পারি। কিন্তু—"

"কিন্তু কী?" তির্যক, ধারাল দৃষ্টিতে তাকালো ম্যাকেঞ্জী। চোখের ফাঁদটা এবার আরো স্পষ্ট হয়েছে, "বলো, তুমি থামলে কেন?"

"আপনি যা বলেছেন, তা করতে গিয়ে জুনোবটতে মারা পড়েছিলাম আর কি? পাহাড়ীরা স্পীয়ার নিয়ে তাড়া করেছিলো। অল্পের জন্য বেঁচে গিয়েছি।" ভীত ত্রস্ত গলায় জনসন বলে চললো, "আমি তো ভেবেই পাই না ফাদার, প্রীচিঙের সঙ্গে এর সম্বন্ধ কোথায়?'

ম্যাকেঞ্জীর মুখ থেকে সুন্দর, সস্নেহ হাসিটুকু মিলিয়ে গেলো। মসৃণ সাদা কপালে একটা অদৃশ্য মাকড়সা আবার আঁকাবাঁকা রেখায় কুটিল জাল বুনতে লাগলো। ফিসফিস গলায় বড় পাদ্রী বললো, "ইউ টু ডেসপেয়ার অ্যাণ্ড ড্রুপ, মাই চ্যাপ! তোমাকে আমি সবচেয়ে বেশি বিশ্বাস করি। ইয়াস, তোমার ওপর ভরসা করে আমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারি। জুনোবটর ছোট

সেন্টারে এখন তুমিই সর্বেসর্বা। তুমি জানো না, কোহিমার এই বড় চার্চে আমার পর তুমিই বড় পাদ্রী হবে। ইউ উইল বী মাই সাক্সেসর।"

"থ্যাঙ্কস্, মেনি থ্যাঙ্কস্ ফাদার। আপনার এই ম্যাগনানিমিটির জন্য আমি চিরকৃতজ্ঞ। আই অ্যাম এভার গ্রেটফুল।" উৎসাহে দেশলাইর কাঠির মত ফস্ করে জ্বলে উঠেই নিবে গেলো জনসন। কাঁপা ভাঙা গলায় বললো, "কিন্তু ফাদার, প্রাণের ভয়ের কথা বাদ দিলেও কনসায়েন্সে বড় বাধছে। মন থেকে কিছুতেই সায় পাচ্ছি না। কনসায়েন্স—"

সরু, চিকন শব্দ করে হাসলো ম্যাকেঞ্জী। জনসনের পিঠে মৃদু চাপড় মারতে মারতে বললো, "কনসায়েন্স খুব ভালো জিনিস জনসন। ভেরী গুড থিঙ। কিন্তু জানো মাই বয়, মাঝে মাঝে ঐ বিবেকবোধটাকে ধরেবেঁধে শিকেয় তুলে রাখা দরকার। নইলে ওটা বড় গণ্ডগোল পাকিয়ে দেয়। হে-হে, বুঝলে কি না, কনসায়েন্স, অনেস্টি, মোরালিটি এই সব সনোরাস ভোকাবুলারিগুলো মাঝে মাঝে ভুলে যেতে হয়। নইলে অসুবিধা হয়, ভয়ানক অসুবিধা হয়।"

"কিন্তু ফাদার—" দুটি কুণ্ঠিত শব্দ করে জনসন থেমে গেলো। তার থতমত দৃষ্টিটা ম্যাকেঞ্জীর মুখের ওপর থমকে গেলো।

এই কোহিমা শহর, স্থ-লুর রাত্রি, স্তব্ধ ফেনার মত জ্যোৎস্না, আকাশের ছায়াপথ, চারপাশে বন-টিলা-পাহাড়, মাঝখানে এই চার্চ। কেমন এক আবছা রহস্যে সব কিছু ভরে রয়েছে।

ম্যাকেঞ্জী হাসছে। জনসনের মনে হয়, ম্যাকেঞ্জীর হাসি বড় দুর্বোধ্য। জটিল অঙ্কের চেয়েও দুরূহ। সেই হাসিটা এখন স্বর্গীয় হয়ে উঠেছে। শান্ত, গম্ভীর গলায় ম্যাকেঞ্জী বললো, "বুঝেছি, সব বুঝেছি জনসন। একটা কথা তোমাকে পরিষ্কার করে দিতে চাই। তার আগে বলবো, আমার জীবনে ভূয়োদর্শন অনেক হয়েছে। তোমার চেয়ে আমার বয়সও কম করে দুগুণ হবেই। অভিজ্ঞতা বলো, বয়স বলো, জীবনের দর্শন বলো—সব দিক থেকেই আমি তোমার সিনিয়র। আই থিঙ্ক, ইউ মাস্ট অ্যাডমিট।"

"ও—স্থয়োরলি ফাদার, স্থয়োরলি—" জনসন মাথা নাড়লো।

মাকড়সা যেমন লূতাতন্তু দিয়ে জাল বুনে বুনে মাছি ভোমরা কি পতঙ্গ শিকারের আশায় তাকিয়ে থাকে, ঠিক তেমনি ভঙ্গিতে পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী তাকালো জনসনের দিকে। বললো, "ভেরি গুড মাই বয়। এবার আসল

কথায় আসা যাক। সাত বছর ধরে এই নাগা পাহাড়ে আমি প্রীচ্ করছি। এখানে এসে একটা বড় সত্য আমি খুঁজে পেয়েছি। ইয়াস, এ কলোসাল ট্রুথ; পারহাপস্ দা বেস্ট ইন মাই লাইফ। বলতে পারো মাই বয়, সে-টি কী?"

ম্যাকেঞ্জীর চোখজোড়া সন্ধানী আলোর মত জনসনের মুখে এসে পড়লো। সে মুখ বোকা, মূঢ় এবং বিহ্বল দেখাচ্ছে।

ম্যাকেঞ্জী আবারও বলতে লাগলো। তার গলায় আত্মপ্রসাদ এবং কৌতুকের স্বর, "পারলে না তো! জানি, পারবে না। কিন্তু মাই বয়, কথাটা আমি অনেক, অনেকবার বলেছি। লাইক এনি ওল্ড টেল টোল্ড, দেন রি-টোল্ড সো মেনি টাইমস্। যাই হোক, সত্যটি হলো, আমরা প্রথমে ব্রিটিশারস্, তার পরে মিশনারী। এ শুধু সত্য নয়, এ আমাদের আদর্শ, জীবনদর্শন।"

"কিন্তু ফাদার, পিয়ার্সন যে বলে আমরা প্রথমে মিশনারী, পরে ব্রিটিশার!"

"পিয়ার্সন!" সমস্ত মুখের সেই স্বর্গীয় হাসিটুকু নিবে নিবে দুটো ঠোঁটের ফাঁকে একটা সূক্ষ্ম এবং কুটিল ভঙ্গির মধ্যে মিলিয়ে গেলো। চোখের কটা মণি দুটো একবার যেন জ্বলে উঠলো। গলাটা একটু কঠিনও যেন শোনালো, "কোহিমায় আসার পর তোমার সঙ্গে আজ পিয়ার্সনের দেখা হয়েছে না কি?"

"না ফাদার। জুনোবট যাবার আগে পিয়ার্সনের কাছে ওকথা শুনেছি।"

বিড়বিড় করে প্রায় নিঃশব্দে কী যেন বলতে লাগলো বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী।

জনসন বললো, "আই কান্ট ফলো ইউ ফাদার—"

"না না, ও কিছু নয়। আমার কথাটা সব সময় মনে রাখার চেষ্টা করবে; আমরা প্রথমে ব্রিটিশারস্, পরে মিশনারী।"

"ও তো ন্যারো আউটলুকের কথা।"

ম্যাকেঞ্জী করুণার হাসি হাসলো। মুখেচোখে পরম বাৎসল্যের ভঙ্গি ফুটে বেরুলো। বললো, "তোমাদের বয়সে ও কথা মনে হবে। কিন্তু অনুপাতটা কষে দেখো তো! তুমি তো অঙ্কের ছাত্র ছিলে। দেখো, ব্রিটিশারদের যে জনসংখ্যা তার তুলনায় আমরা মিশনারীরা কজন? খুব সামান্য। ভেরি মাইনর ইন নাম্বার। তা হলেই বোঝো, মিশনারী নামে পরিচিত হতে দৃষ্টিভঙ্গি আরো কত ছোট করতে হয়!"

"ইয়াস ফাদার—" বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো জনসন। ম্যাকেঞ্জীর সামনে এলে বিচারবুদ্ধি বিবেক দেহমন শিরাস্নায়ুর সমস্ত জোর বিকল হয়ে যায়। অথর্ব, আড়ষ্ট হয়ে বসে থাকা ছাড়া উপায় থাকে না। কী এক সম্মোহন জানে যেন ম্যাকেঞ্জী। তার গলার স্বরে, চোখের কটা দৃষ্টিতে অদ্ভুত ধরনের কুহক আছে।

ম্যাকেঞ্জী বললো, "লোকের কাছে আমাদের পরিচিত হতে হবে মিশনারী নামে আর কাজ করতে হবে ব্রিটিশার হিসেবে।"

"কেন ?"

"স্বার্থের খাতিরে। ফর এ বেটার কজ, ফর এ গ্রেটার ইণ্টারেস্ট। বুঝলে কি না, একটু আগে বলেছিলাম সারা পৃথিবীতে ক্রিশ্চানিটি প্রীচ্ করতে হবে। তার মানে কী? তার মানে হলো, ক্রিশ্চ্যানিটির তলায় তলায় ব্রিটিশ রাজত্বকে বাড়ানো। আণ্ডার ওয়ান ব্রিটিশ ব্যানার, আণ্ডার হিজ এক্জল্টেড ম্যাজেস্টিস্ রুল সমস্ত পৃথিবীকে জড়ো করতে হবে। এই কাজে ক্রিশ্চ্যানিটি হলো আমাদের সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। প্রভু যীশুর পুণ্যনাম আমাদের স্বার্থে লাগাতে হবে। রাজত্ব বাড়লে প্রীচিঙের ক্ষেত্রও বাড়বে। আশা করি, এবার সব কিছু পরিষ্কার হয়েছে।"

"হয়েছে। কিন্তু ফাদার, এ তো ক্রিশ্চ্যানিটি আর যীশুর নামকে দস্তুরমত এক্সপ্লয়েট করা।"

বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর মুখে আবার সেই স্বর্গীয় হাসি ফুটে বেরিয়েছে। কণ্ঠ আশ্চর্য সংযত, "মাই বয়, 'এক্সপ্লয়েট' শব্দটা শুনতে খারাপ। ও কথা বোলো না। এ সব কথা থাক। সমস্ত পরিষ্কার করে দিয়েছি, এ সম্পর্কে আর কোন কথা নয়। এবার অন্য আলোচনায় আসা যাক।"

একটু সময় চুপচাপ। ম্যাকেঞ্জীর আঙুলের তলা দিয়ে জপমালাটা নিয়মিত মসৃণ গতিতে সরে সরে যাচ্ছে। চাঁদটা আরো উজ্জ্বল হয়েছে। দূরে ওক-বনের মাথা চিকচিক করছে। শান্ত, স্তব্ধ এবং সমাহিত হয়ে রয়েছে চারপাশের পাহাড়। একটা আঁচড়ের মত ফুটে বেরিয়েছে আনিজা উইখুর দীর্ঘ রেখাটা।

জনসন বললো, "একটা ব্যাপার আমার কাছে কিছুতেই ক্লিয়ার হচ্ছে না ফাদার।"

"কী ব্যাপার ?

"ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। আপনি যে পাহাড়ী মেয়েগুলো যোগাড় করে এখানে পাঠাতে বলেছিলেন, তার সঙ্গে আমাদের প্রীচিং আর রাজত্ব বাড়াবার কী সম্পর্ক? তা ছাড়া ও তো সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আপনার কথামত মেয়ে যোগাড় করতে গিয়ে প্রাণটা গিয়েছিলো আর একটু হলে। আমার বড় ভয় করে এ সব করতে।" নিবু নিবু ভীরু গলায় জনসন বললো।

গেটে কঁ্যাচ করে শব্দ হলো। ঘাসের জমিতে মস্‌মস্‌ আওয়াজ করে একজোড়া উদ্ধত ভারী বুট এগিয়ে আসছে। পুলিস সুপার বসওয়েল।

সোল্লাস অভ্যর্থনায় গদগদ হয়ে উঠলো বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী, "আসুন, আসুন মিস্টার বসওয়েল।"

একটা বেতের চেয়ার টেনে বসে পড়লো বসওয়েল। বিরাট পাইপের গর্ভে টোব্যাকো পুরতে পুরতে ম্যাকেঞ্জীর দিকে তাকালো, "তারপর ফাদার, আমাদের সেই স্কীমটা যে তামাদি হতে চললো। আপনার সাহায্য না পেলে বড় অসুবিধায় পড়ব। অসুবিধা কি, স্কীম স্কীমই থেকে যাবে। তাকে আর বাস্তবে রূপ দেওয়া যাবে না।" একটু থেমে তরিবত করে টোব্যাকো ঠাসতে ঠাসতে আবার বললো, "ইয়াস, কয়েক ডজন পাহাড়ী গার্ল আমার চাই। এই হিলি বিউটি দিয়েই বাস্টগুলোকে আমি শায়েস্তা করবো। বুঝতেই পারছেন, আমরা মানে পুলিসের লোকেরা গ্রামে গ্রামে হানা দিয়ে তো মেয়ে যোগাড় করতে পারি না। তাতে অনেক ল্যাঠা। পাহাড়ীগুলো সাঙ্ঘাতিক ক্ষেপে রয়েছে। গ্রামে গ্রামে ঘুরে দ্যাট মিন্‌ক্স, দ্যাট ড্যামন্‌ড্‌ উইচ গাইডিলিওটা আমাদের বিপক্ষে পাহাড়ী কুত্তাগুলোকে তাতাচ্ছে। কী বলবো ফাদার, গ্রেট ওয়ারের সমস্ত হরর, সব ম্যাসাক্‌র্‌ আমার চোখের সামনেই ঘটেছে। জীবনে আমার অনেক অভিজ্ঞতা। কিন্তু গাইডিলিও শয়তানী আমাকে পাগলা করে ছাড়ছে।" পাইপটা আধাআধি আন্দাজ মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে হিংস্রভাবে কামড়ে ধরলো বসওয়েল।

পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর বুড়ো আঙুলের নীচে জপমালাটা একবার চমকে থেমে গেলো। তীক্ষ্ণ স্বরে সে জিজ্ঞাসা করলো, "গাইডিলিও এখন কোথায়?"

"কোথায় তাই যদি জানবো, তা হলে কি কোহিমার পাহাড়ে চুপচাপ বসে থাকি না পাইপ কামড়াই।" দু হাতের দশটা মোটা মোটা আঙুলে হতাশাব্যঞ্জক মুদ্রা ফুটিয়ে বসওয়েল বললো, "বুঝলেন ফাদার, গ্রেট ওয়ার-ফেরত লোক আমি। জীবনে অনেক কিছু দেখেছি। কিন্তু এই গাইডিলিও

মেয়ে নয় ফাদার, একটা দুঃস্বপ্ন। পাঁচশো পুলিস নিয়ে হান্টিং ডগের মত পাহাড়ে পাহাড়ে হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এই হয়তো খবর পেলুম শয়তানীটা লোহ্টাদের গ্রামে রয়েছে। দলবল নিয়ে সেখানে ছুটলাম। কোথায় কে? পৌঁছে দেখি বেমালুম হাওয়া হয়ে মিলিয়ে গিয়েছে। এই তো পরশু রাত্রিতে কোনিয়াক সর্দার খবর দিয়ে গেলো, ছুকরিটা না কি তাদের পাশের গ্রামে আস্তানা গেড়েছে। আবার ছুট ছুট। সমস্ত রাত্রি গ্রামটাকে ব্যারিকেড করে রইলাম। সকালবেলা পাহাড়ীদের ঘরে ঘরে ঢুকে সার্চ করলাম। তাজ্জবের ব্যাপার! কখন যে আমাদের ব্লক আপের মধ্য দিয়ে সাঙ্গোপাঙ্গদের নিয়ে মাগীটা ভেগেছে, টেরই পেলুম না। লাইফটাকে একেবারে মিজারেবল্ করে তুলেছে পাহাড়ী কুত্তীটা। ওহ্, ক্রাইস্ট! যা দেখছি, গ্রেট ওয়ারের সব ফেম আমার নষ্ট হয়ে যাবে এই কোহিমাতে এসে।" অবসন্ন ক্লান্ত ভঙ্গিতে বেতের চেয়ারে নিজের বিরাট দেহটাকে টান-টান করে ছেড়ে দিলো বসওয়েল।

পাশ থেকে জনসন বললো, "এমনও তো হতে পারে পাহাড়ী সর্দারেরা হ্যারাস করার জন্যে আজেবাজে খবর দিচ্ছে।"

বিরাট মাথাটা প্রবলভাবে নেড়ে মৃদু মৃদু হাসলো বসওয়েল, "ওহ্, নো নো মাই ইয়ং ফাদার। এ একেবারেই অসম্ভব। ব্রিটিশার স্পাই চিনতে ভুল করে না। যদি করতো, তা হলে এত বড় দুনিয়ায় রাজত্ব করা আমাদের কোনকালেই সম্ভব হতো না। তা ছাড়া এই পাহাড়ী মানুষগুলো অন্য ধাতুতে গড়া। আমাদের সভ্য জগৎ থেকে বিশ্বাসঘাতকতা, নিমকহারামি নামে বিশেষ বিশেষ শব্দগুলো এখনও এই সব পাহাড়ে এসে পৌঁছুতে পারে নি। তাই বাঁচোয়া। একবার যদি এদের টাকা-কাপড়-খাবার দিয়ে বশ করে নিতে পারা যায়, তা হলে জীবনে এরা কোনদিনই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। তাই ভরসা আছে, আজ হোক কাল হোক গাইডিলিও ধরা পড়বেই। আর তা সম্ভব হবে এই পাহড়ীদের দিয়েই।" একটু থামলো পুলিস সুপার বসওয়েল। দু পাটি দাঁতের ফাঁকে পাইপটাকে আরো, আরো হিংস্রভাবে কামড়ে ধরলো। চিবিয়ে চিবিয়ে বলতে লাগলো, "সেদিন, ইয়াস দ্যাট ডে কোহিমার খোলা রাস্তায় দাঁড় করিয়ে মাগীকে আমি চাবুক মারবো। তারপর বেয়নেট প্রাকটিস করবো। অ্যাণ্ড দেন—" ভয়ঙ্কর মুখভঙ্গি করে, একটা সাঙ্ঘাতিক ইঙ্গিত দিয়ে বসওয়েল থেমে গেলো।

কিছুক্ষণের জন্য এক ধরনের স্পর্শাতীত স্তব্ধতা নেমে এলো ঘাসের জমিতে।

দাঁতের ফাঁক থেকে পাইপটাকে হাতের তালুতে নিয়ে মোটা মোটা আঙুল দিয়ে বার কয়েক তাল ঠুকলো বসওয়েল। তার পর আবার বলতে লাগলো, "অবশ্য সব রকম ব্যবস্থাই আমি করেছি। প্লেনসম্যানদের সঙ্গে যাতে এই পাহাড়ের কোন যোগাযোগ না থাকে, এই গাইডিলিওর মুভমেন্টের খবর যাতে প্লেনসের লোকেরা জানতে না পারে, তার জন্যে সব পথ বন্ধ করে দিয়েছি। সে সব থাক। যে জন্যে আসা! আমাদের সব সময় সতর্ক থাকতে হবে। সমতলের লোকদের সঙ্গে কোন মতেই পাহাড়ীগুলোকে মিলতে দেওয়া হবে না। তা ছাড়া কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে। সেই জন্যেই স্কীমটা ফেঁদেছিলাম। তা মেয়ে যোগাড় করতে পারলেন ফাদার?"

"আমি তো আপনার কথামত জুনোবট, চোঙলিয়া, সাখ্বট--সব জায়গায় মিশনারীদের খবর পাঠিয়েছি। তারা যেন মেয়ে যোগাড় করে কোহিমায় পাঠিয়ে দেয়। এই তো জুনোবট থেকে জনসন এসেছে। তাকে জিগ্যেস করুন।" ম্যাকেঞ্জী বললো। তার আঙুলের নীচে জপমালাটা আবার সচল হয়েছে।

পাইপের মাথায় তাল ঠুকতে ঠুকতে বসওয়েল বললো, "কী ব্যাপার ইয়ং ফাদার, মেয়ে যোগাড় করতে পারলেন?"

"না। একেবারেই ইমপসিব্‌ল্‌। আমি নিজে গিয়েছিলাম গ্রামে গ্রামে। পাহাড়ীরা বর্শা নিয়ে তেড়ে আসে।" প্রখর দৃষ্টিতে বসওয়েলের মুখের দিকে তাকালো জনসন।

"চ্‌ক্‌-চ্‌ক্‌—" ব্রহ্মতালু এবং জিভের সহযোগে অদ্ভুত শব্দ করলো বসওয়েল, "সর্বনাশ, আপনি নিজে যান কেন? কক্ষনো এই সব ব্যাপারে নিজে সামনে যাবেন না। পেছনে থেকে পাহাড়ীদের দিয়ে করাবেন। নিজে গেলে মিশনারীদের সম্বন্ধে এই হিলি বীস্টগুলো খারাপ ধারণা করে নেবে। এতে আমাদের ক্ষতি, ভীষণ ক্ষতি।"

"পাহাড়ীদের দিয়ে কী করে করাবো?"

"হাঃ-হাঃ-হাঃ—" শান্ত, সমাহিত কোহিমার রাতকে চমকে দিয়ে বসওয়েলের গলায় অট্টহাসি বাজলো, "এবারে হাসালেন ইয়ং ফাদার। এমন একটা বোকা হাবা প্রশ্ন আমি আপনার কাছে আশা করি নি।" পাইপের মাথায় মোটা মোটা আঙুলের তালটা এবার আরো উদ্দাম হয়ে উঠেছে।

বসওয়েল আবার শুরু করলো, "মনি মনি—টাকা, ব্রাইব, ইয়াস ব্রাইব ; এই ব্রাইব দিয়ে এদের রিপুতে ক্রমাগত সুড়সুড়ি দিতে হবে। তারপর এই পাহাড়ের মনুষ্যত্বকে সরলতাকে কিনে নিতে হবে। আই থিঙ্ক মাই ইয়ং ফাদার, দিস সিলভার মেট্যাল ক্যান মেক এনি ইমপসিবল্ পসিবল্, পসিবল্ ইমপসিবল্। তবে রুটির কোন দিকে মাখন মাখাতে হবে, সে আর্টটা জানা চাই। অর্থাৎ টাকাটা কেমন করে খরচ করতে হবে, সে সম্বন্ধে দস্তুরমত জ্ঞান থাকা চাই। আর একটা কথা, পাহাড়ীগুলো একটু একটু করে চালাক হয়ে উঠছে। তাই এই সব গুরুতর ব্যাপারে ইউ মাস্ট চ্যুজ রাইট পারসনস্।"

জনসন বললো, "আমি কিন্তু একটা ব্যাপার কিছুতেই বুঝতে পারছি না মিস্টার বসওয়েল। এই মেয়ে-সংগ্রহের সঙ্গে ধর্মপ্রচারের কী সম্পর্ক ? একটু আগে ফাদারকে আমি সে কথা জিগ্যেস করছিলাম। এ তো দস্তুরমত পাপ। আমার বড় ভয় করে।"

পরিষ্কার গলায় বসওয়েল বললো, "কোন সম্পর্কই নেই। প্রীচিংএর সঙ্গে মেয়ে-যোগাড়ের কোন যোগাযোগই থাকতে পারে না। আবার পারেও।" দুটো মোটা মোটা ঠোঁটের ফাঁকে এক টুকরো রহস্যময় হাসি ঝুলতে লাগলো বসওয়েলের। আগের কথার খেই ধরে বললো, "কী বলছিলেন ইয়ং ফাদার, ভয়! হেঃ—ভয় শব্দটা কিন্তু ইংরেজের জীবনে থাকতে নেই। আর পাপ? আপনি দেখছি, অত্যন্ত টাচি। অনেক লোককে অন্ধকার থেকে আলোতে আনতে গেলে, ব্যাপটাইজ করতে গেলে এ সব ব্যাপার ধর্তব্যের মধ্যে আনতে নেই। ভয় করে! পাপ! হেঃ ভীতু, কাওয়ার্ড কোথাকার?"

"কিন্তু মিস্টার বসওয়েল, আপনি তো বললেন না প্রীচিংএর সঙ্গে মেয়ে-যোগাড়ের সম্পর্ক কী?" কাঁপা-কাঁপা, ভাঙা গলায় জনসন বললো। তার চোখ দুটো অসহায়ভাবে বসওয়েলের বিরাট মুখে আটকে রইলো।

"সেটা হলো আমার স্কীমের ব্যাপার। ব্রিটিশ রাজত্বকে এই পাহাড়ে বাঁচিয়ে রাখার জন্যে এই সম্পর্কটার দরকার। মেয়েগুলোকে আমি কোহিমার পুলিস ব্যারাকে ছেড়ে দেবো। পুলিসগুলো হলো ইণ্ডিয়ার প্লেনসম্যান। এবার বুঝতেই পারছেন ; আশা করি। একটা রহস্যময় হাসি বসওয়েলের বিরাট ভয়ঙ্কর মুখখানায় কতকগুলো কুটিল রেখা ফুটিয়ে তুললো।

অবাক, বিমূঢ় মুখে তাকিয়ে রইলো জনসন। কাঁপা, প্রায় অসাড় গলায় বললো, "পুলিস ব্যারাকে মেয়েগুলোকে পাঠিয়ে কী হবে মিস্টার বসওয়েল?"

"কী হবে! হে-হে-হে—" টেনে টেনে শব্দ করে হাসতে লাগলো বসওয়েল। সে হাসিতে মেদস্ফীত, বিপুল দেহটা দুলতে লাগলো। একটা বিরাট মাংসের পিণ্ড থরথর করে কাঁপছে। হাসির দমকে আঙুলের ফাঁক থেকে আইভরি পাইপটা ঘাসের জমিতে ছিটকে পড়লো।

আঙুলের নীচে জপমালাটা আবার থেমে গিয়েছে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর। মুখে বিরক্তি ফুটে বেরিয়েছে। ঈষৎ ঝাঁঝালো গলায় সে বললো, "এতটা ম্যাডলহেডেড তোমাকে আমি ভাবতে পারি নি জনসন; এতটা বোকা তুমি! খাতার পাতায় পাতায় খালি অঙ্কই কষেছো, তাকে জীবনে প্রয়োগ করতে শেখো নি।" গম্ভীর, ভরাট গলায় ম্যাকেঞ্জী বলে চললো, "আমাদের পুলিসরা হলো ইণ্ডিয়ার সমতলের লোক, আর মেয়েগুলো এই পাহাড়ের। প্লেনসে গান্ধী স্বরাজ স্বরাজ করে চল্লিশ কোটি লোককে ক্ষেপিয়ে তুলছে। এই নাগা পাহাড়ে তার দেখাদেখি গাইডিলিও পাহাড়ী কুত্তাগুলোকে তাতাচ্ছে। সমতল আর পাহাড়ের লোকেরা একসঙ্গে হলে উপায় থাকবে না। তাই দু দলের মধ্যে সব সময় একটা বিরোধ জিইয়ে রাখতে হবে। এর নাম হলো রাজনীতি।" একটু থামলো ম্যাকেঞ্জী।

পেঁজা তুলোর মত কয়েক টুকরো মেঘ আকাশের কোনাকুনি পাড়ি দিচ্ছে। দূরের ওক-বনে ক্রুক ক্রুক শব্দ করে এক ঝাঁক আউ পাখি ডেকে উঠলো। এখন রাত্রি কত, ঠিক ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। তবে কোহিমা শহর আশ্চর্য নিস্তব্ধ, নিঃঝুম।

একটু পরে ম্যাকেঞ্জী আবার শুরু করলো, "পাহাড়ীগুলো মনে করবে, তাদের মেয়েদের ইজ্জত নিচ্ছে সমতলের লোকেরা। আমরা গ্রামে গ্রামে তাই চাউর করে দেবো। আর বউ কি স্থইটহার্ট ছেড়ে চাকরির দায়ে যে সব প্লেনসম্যান এখানে এসেছে, তাজা হিল বিউটি পেলে তারা পোষা কুকুরের চেয়েও বেশি বশে থাকবে। এ সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত। আমার বিশ্বাস, পাহাড়ীদের একবার ক্ষেপিয়ে দিতে পারলে গাইডিলিওর মুভমেণ্ট ইণ্ডিয়ার প্লেনসম্যানদের বিরুদ্ধে ঘুরে যাবে। তার পর বুঝতেই পারছো।" ঠোঁট দুটো সামান্য ফাঁক করে শব্দহীন অথচ ভঙ্গিময় হাসি হাসলো ম্যাকেঞ্জী।

ঘাসের জমি থেকে আবার পাইপটাকে কুড়িয়ে নিয়েছে বসওয়েল। নতুন উদ্যমে তামাক পুরতে পুরতে সে বললো, "এবার আশা করি বুঝতে পারছেন ইয়ং ফাদার। ব্যাপাটা সহজ সরল করে দিলে এই দাঁড়ায়, যেমন করেই

হোক পাহাড়ের এই মুভমেণ্ট ভেঙেচুরে তছনছ করে দিতে হবে। আই থিঙ্ক, নাউ ইউ উইল অ্যাডমায়ার মাই স্কীম।"

ডান দিকের ভুরুটা কুঁচকে, কপালে খোঁচ ফেলে জনসনের পিঠে গোটা কয়েক মৃদু এবং সস্নেহ চাপড় দিলো ম্যাকেঞ্জী। বললো, "মাই বয়, এবার যাও। অনেক রাত্রি হয়েছে। তুমি টায়ার্ড হয়েও আছো, যাও, খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়ো গিয়ে।"

বেতের চেয়ার থেকে উঠে পড়লো জনসন। ক্লান্ত, এলোমেলো পা ফেলে সামনের চ্যাপেলের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেলো। কপালের দু পাশে দুটো রগ দপদপ করে লাফাচ্ছে। গলার কাছে একটা নীল শিরা পাকিয়ে পাকিয়ে উঠছে। স্নায়ু ইন্দ্রিয় হাড় মেদ দিয়ে গড়া দেহটা অবসাদে ঝিমঝিম করছে। কেমন যেন ভয় ভয় লাগছে। বুকের মধ্যে বাতাস যেন বার বার ফুরিয়ে আসছে। হাঁপ ধরছে। আতঙ্কে এবং উত্তেজনায় ফোঁটা ফোঁটা ঘাম জমেছে কপালে। সমস্ত চৈতন্য কেমন যেন অবশ, অসাড় হয়ে যাচ্ছে। জনসনের মনে হলো, এখন পিয়ার্সনকে পেলে ভালো হতো। খুব ভাল হতো।

রূপকথায় গরগনদের কাহিনী শুনেছে। জনসন ভাবলো, বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী এবং পুলিস সুপার বসওয়েল, দুজনেই গরগন। তাদের সামনে এলে সমস্ত চৈতন্য, বিচার, বুদ্ধি, বিবেক লোপ পেয়ে যায়। সমস্ত সত্তা পাথরের মত নিষ্প্রাণ হয়ে যায়। নিজের স্বাধীন ভাবনা এবং চিন্তাগুলি প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে পায় না। শুধু মাথা নেড়ে তাদের কথায় সায় দেওয়া ছাড়া দেহমনের সক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলি বিকল হয়ে যায়।

গরগন, এই নামকরণের কৃতিত্ব পিয়ার্সনের। পিয়ার্সন ওদের দুটোকে গরগন নামে ডাকে। জনসনের মনে হয়, শুধু গরগন নয়, নরকের দুটো প্রেত ম্যাকেঞ্জী আর বসওয়েল নাম নিয়ে কোহিমার পাহাড়ে উঠে এসেছে।

পাহাড়ী অজগর যেমন নিশ্বাসে নিশ্বাসে এবং দৃষ্টির জাদুতে নিরীহ সম্বরকে আচ্ছন্ন, বিমূঢ় করে তার গ্রাসের মধ্যে টেনে আনে, ঠিক তেমনি করে ম্যাকেঞ্জী ও বসওয়েল তার বুদ্ধি বিচার চিন্তা ভাবনা অথর্ব করে তাকে মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসে। আর একটা অসহায়, নিরুপায় শিকারের মত তাদের সামনে চুপচাপ বসে থাকে জনসন।

চ্যাপেলের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে অতীত জীবনটাকে মনে পড়

জনসনের। সঙ্গে সঙ্গে মনের সঙ্গোপন কোণে বর্তমান জীবনের সঙ্গে একটা তুলনামূলক দ্বন্দ্বও বুঝি চলে।

সে জীবনটা ইংলণ্ডের আঙুর-ক্ষেতে, ছায়াতরুর তলায় তলায়, পাইন এবং ফুল-পাতা-ভরা ঝোপেঝাড়ে ছড়িয়ে ছিলো। সে সব দিনে য়ুনিভার্সিটিতে পিওর ম্যাথমেটিকসের নোট নিতো জনসন আর রোমান্টিক কবিতা লিখতো। কবিতার বিষয় ছিলো নিসর্গ। নদীর নীল জলে উইলো পাতার ছায়া কাঁপে, রূপালী মাছ লাফায়, আকাশে সূর্য রঙ খেলে, সোনার জরিমোড়া মেঘ উড়ে যায়, রুপোর তারের মত ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ে, হু-হু বাতাস ছোটে, উঁচু উঁচু গাছগুলো এলোপাথাড়ি মাথা কোটাকুটি করে, রাত্রি নামে, কখনও আঁধি কখনও জ্যোৎস্না। ফেনার মত সাদা ধবধবে আলো ছড়িয়ে ছড়িয়ে শান্ত স্থির হয়ে থাকে। রোদ-বৃষ্টি-মেঘ-বাতাস এবং মরশুমী পাখির ডানার শব্দ তার রক্তে মিশে ছিলো। সুযোগ পেলেই নিঃসঙ্গ নিরালা আগবনের ধারে বসে ঘাস ফড়িং প্রজাপতি দেখতো। দূরে দূরে কৃষাণদের গোলাঘর, বাতাসের শব্দ, পাখির ডাক—সব মিলিয়ে একটা অনির্বচনীয় খুশিতে মনটা ভরে থাকতো।

ইংরেজ মিশনারী, যারা ভারতবর্ষ ঘুরে এসেছে, তাদের কাছে সেদেশের অনেক কথা শুনেছে জনসন। শুনে মুগ্ধ বিস্মিত হয়ে গিয়েছে। টেগোর এবং কোন কোন ইংরেজ লেখকের রচনায় ভারতবর্ষের কিছু কিছু কাহিনী সে পড়েছে। সে দেশের প্রকৃতিরূপ নাকি অপূর্ব! অতি মনোরম। যত দূর দৃষ্টি ছড়ানো যায়, শুধু সীমাহীন সমতল, নীল আকাশ, ফসলভরা সবুজ ক্ষেত। পাহাড়-নদী; শুনতে শুনতে কিংবা পড়তে পড়তে মন নেচে উঠেছে। এক অসহ্য, অমোঘ আকর্ষণে ইণ্ডিয়ার মাটি তাকে ক্রমাগত টেনেছে।

ভারতবর্ষে আসার সবচেয়ে সোজা, সহজ পথটাই ধরেছিলো জনসন। সরাসরি সে চার্চে চলে গিয়েছিলো। সেখান থেকে পরম পিতার পতাকা মাথায় তুলে ইণ্ডিয়ায় চলে এলো। কিছুদিন চিল্কা হ্রদের পাশে এক উপজাতি গ্রামে কাটিয়ে কোহিমা পাহাড়ে এসেছে, তা-ও মাস কয়েক হলো।

এই নাগা পাহাড়। টিলা-উপত্যকা-মালভূমি-গুহা-বন, ফুল-পাখি-গাছ-পাতা, সাপের মত পাকখাওয়া ঝরনা, গর্জমান নদী। জনসনের ভালো লেগেছিলো। অপরিসীম ভালো লাগার উত্তেজনায় মনটা সব সময় ঝিমঝিম করতো। রক্তে রক্তে এই পাহাড়, তার আকাশ-বাতাস নেশার মত জড়িয়ে থাকতো।

কোহিমা থেকে যে পাহাড়-কাটা পথটা মাও-এর দিকে চলে গিয়েছে, সেটা ধরে একা একা অনেকদূর চলে যেতো জনসন। বাঁ পাশে অতল গভীর খাদ, ঘন বন। লালচে রঙের আখুশি ফল থোকায় থোকায় পেকে রয়েছে, সবুজ পাতায় রোদ চিকচিক করে। শান্ত, হিম-হিম ছায়া রয়েছে খেজাং কাঁটার ঝোপে। ঝাঁকে ঝাঁকে আউ পাখি পাখা ঝাপটায়। বাতাসে ঢেউ ওঠে, সোঁ-সোঁ শব্দ হয়। কখনও চোখে পড়ে, খাসেম গাছের মাথায় পাহাড়ী বানর লাফাচ্ছে। নীচের উপত্যকায় দাঁতাল শুয়োর ছুটছে। এক ধরনের নীলচে পাহাড়ী সাপ হামেশাই দেখা যায় হিলহিলে দেহ নিয়ে এঁকেবেঁকে পলক ফেলতেই অদৃশ্য হয়। বেশ লাগে জনসনের। দেখতে দেখতে মধুর খুশিতে দু চোখ ভরে যায়। মন বুঁদ হয়ে থাকে।

পড়ন্ত বিকেলে পশ্চিম পাহাড়ের মাথায় সূর্যটা রক্তপিণ্ডের মত দেখায়। রোদ নিবু-নিবু হয়ে আসে। বাতাসে হিম-হিম আমেজ ঘন হতে থাকে। সেই সময় কোহিমার ফিরতি পথ ধরে জনসন।

সন্ধ্যায় চার্চে ফিরে সোৎসাহে বলতো, "ফাদার, অদ্ভুত ধরনের সব গাছ আর লতা দেখলুম। এত মোটা লতার এত ছোট পাতা হোমে দেখি নি। সাদা গাছ দেখলাম একটা; নাম জানি না। আমাদের চার্চে তো পাহাড়ীরা আসে; তাদের কাউকে নিয়ে একদিন যাবো গাছ-লতা চিনিয়ে দেবে।"

ম্যাকেঞ্জী বিশেষ কথা বলতো না। দু ঠোঁটে মৃদু নিঃশব্দ হাসি ফুটিয়ে মাথা নাড়তো। প্রথম প্রথম সে হাসিতে সস্নেহ প্রশ্রয় ছিলো, কিছুটা বা কৌতুক।

একদিন হয়তো জনসন বললো, "এই দেশটা চমৎকার। এমন সুন্দর বন আর পাহাড় দেখি নি। আজকে ফাদার, নীলচে সাপ দেখলুল। এত ভালো লাগলো।" গলায় মুগ্ধ স্বর ফুটে উঠতো জনসনের।

ম্যাকেঞ্জী বিড়বিড় করে কী বলতো, ঠিক বোঝা যেতো না।

উচ্ছ্বাসে ছেদ পড়তো। থতমত গলায় জনসন বলতো, "বেগ ইওর পারডন্।"

আশ্চর্য ক্ষমতা ম্যাকেঞ্জীর; একটু বিচলিত হয় না সে। মুখের রেখাগুলোকে একটু না ভেঙে, যথাযথ রেখে সেই মৃদু নিঃশব্দ হাসি হাসতো। বলতো, "খুব খুশী হলাম। এই দেশ তা হলে তোমার ভালো লেগেছে?"

"বলেন কী ফাদার!" অসহ্য উৎসাহে ফেটে পড়তো জনসন, "এমন দেশ জীবনে আর দেখি নি।"

শান্ত নির্লিপ্ত গলায় ম্যাকেঞ্জী বলতো, "বেশ বেশ। তবে একা একা বেশি ঘুরো না। তোমার ঐ চার্মিং নীলচে সাপগুলো কিন্তু সাঙ্ঘাতিক বিষাক্ত। বাঘ, হাতী, দাঁতাল শুয়োর কিন্তু হমেশাই বেরোয়। আর পাহাড়ীরা বিদেশী দেখলে বর্শা দিয়ে ফুঁড়েও ফেলতে পারে। সাবধানে ঘোরাফেরা করবে।"

দিনগুলো ভালোই চলছিলো। রোদ-পাখি-মেঘ-আকাশ-নদী-ঝরনা দেখতে দেখতে, পাহাড়ী ধুলো গায়ে মেখে পথ হাঁটতে হাঁটতে নেশা ধরে যেত। একদিন সন্ধ্যার পর ম্যাকেঞ্জী বললো, "পাহাড় দেখে, বন-নদী-ঝরনা দেখে তো মাসখানেক কাটালে। আশা করি, এবার তুমি আসল কাজের জন্য তৈরী হবে।"

একটু চমকে জনসন বলেছিলো, "কী কাজ!"

"বাঃ! যে কাজের জন্য তোমার এখানে আসা, সেই কাজ। প্রীচিং।" একটু কঠিনই হয়তো শুনিয়েছিলো ম্যাকেঞ্জীর গলা, "শোনো, আমি ঠিক করেছি আসছে সপ্তাহ থেকেই তোমাকে পিয়ার্সনের সঙ্গে পাহাড়ীদের গ্রামে পাঠাবো। দেখবে, কেমন করে প্রীচ্ করতে হয়। আর পাহাড়ীদের ভাষাটা শিখে নেবে। বুঝলে?" একটু ছেদ, আবার, "কাল সকালে আমার সঙ্গে দেখা করবে। প্রীচিং সম্বন্ধে দু-চারটে কথা বলবো।"

"ইয়াস ফাদার।" দু পাশে মাথা হেলিয়ে জনসন বলেছিলো খুব আস্তে; নিরুৎসাহ গলায়।

আচমকা পাশে চোখ পড়েছিলো জনসনের। বেতের চেয়ারে পিয়ার্সনের সাত ফুট ঋজু দেহটা চুপচাপ বসে রয়েছে। নিশ্বাসের শব্দ হচ্ছে না। বুকটা উঠানামা করছে কিনা, বোঝা যায় না। চওড়া কাঁধ, মোটা ঈষৎ থ্যাবড়া নাক, জানু পর্যন্ত দীর্ঘ পেশীপুষ্ট হাত এবং বিশাল সবল একখানা বুকের দুর্দান্ত মানুষটা এমন নিঝুম হয়ে রয়েছে, দেখতে কিংবা ভাবতে কেমন যেন লাগে। জনসনের নজর পড়লো পিয়ার্সনের চোখে। দেখলো পিয়ার্সনের চোখজোড়া জ্বলন্ত ধাতুপিণ্ডের মত জ্বলছে, নির্নিমেষ হয়ে ম্যাকেঞ্জীর মুখে আটকে আছে। তার দৃষ্টিতে জ্বালা রোষ ক্ষোভ এবং হিংস্রতা একাকার হয়ে মিশে রয়েছে। দেখতে দেখতে জনসন বিহ্বল, আড়ষ্ট হয়ে গিয়েছিলো।

একটু পরে ম্যাকেঞ্জী উঠে ভেতরের দিকে চলে গেলো।

দাঁতে দাঁত চেপে পিয়ার্সন গর্জে উঠেছিলো, "স্কাউণ্ড্রেল।"

জনসন চমকে উঠলো, "কে ?"

"কে আবার ? ম্যাকেঞ্জী।"

"না না, ও কথা বলছো কেন ? ফাদার লোক খুব ভালো। আমাদের কত ভালবাসেন।"

বিরক্ত ঝাঁঝালো গলায় পিয়ার্সন বললো, "কাল সকালে বুঝবে, কেন গালাগালি দিলাম। কালকে তোমার যে সকালটা আসবে, একদিন এমনি একটা সকাল আমার জীবনেও এসেছিলো।" বলতে বলতে সশব্দে বেতের চেয়াড় ছেড়ে উঠে পড়েছিলো পিয়ার্সন।

এই পাহাড়ের প্রকৃতিরূপ চড়া, তীক্ষ্ণ অথচ মধুর সুরে বাঁধা হয়েছিল জনসনের মনে। পরের দিন সকালে সুরটা ছিঁড়ে গেলো। একটা তীব্র ঝনঝনানি সমস্ত চৈতন্য জুড়ে ঢেউয়ের মত কেঁপেছিলো।

ম্যাকেঞ্জী প্রীচিংয়ের নতুন ভাষ্য শুনিয়েছিলো; অদ্ভুত তাৎপর্য শিখিয়েছিলো। মিশনারী হবার আগে কি নাগা পাহাড়ে আসার আগে প্রীচিং সম্বন্ধে এমন হীন ধারণা তার কোন দিন হয় নি। ভয়ে, আশঙ্কায় বুকটা তার থরথর কেঁপেছে। যে সব আঘাত এবং অনভ্যস্ত অভিজ্ঞতা থেকে মনের বৃত্তিগুলি হঠাৎ পরিণত হয়, এমন কিছুর মুখোমুখি এর আগে সে হয় নি। মনের দিক থেকে সুন্দর শুভ্র পবিত্র শিশুকাল পেরিয়ে আসতে পারে নি জনসন। তাই ম্যাকেঞ্জীর ভাষ্য তার স্নায়ুগুলোকে মুচড়ে-দুমড়ে বিকল করে দিয়েছে। চারপাশের সুন্দর পাহাড়-আকাশ-ওকবন-পাইনবন, এদের মধ্যে পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী নামে জীবনের এক সাঙ্ঘাতিক রূপ ছিলো, এর আগে তা কি কোনদিন ভাবতে পেরেছিলো জনসন ?

মনে মনে জনসন ভীরু, দুর্বল এবং কুণ্ঠিত। প্রতিবাদ করতে সে জানে না। কুণ্ঠা, দ্বিধা ও সহজাত সঙ্কোচ সব সময় তাকে নিঃশব্দ করে রাখে। অথচ ভেতরে ভেতরে সমগ্র সত্তার মধ্যে ভীষণ আলোড়ন হয়। যে প্রতিবাদ বেরিয়ে আসার পথ পায় না, তা ভাবনায় চিন্তায় পাক খেয়ে খেয়ে ছটফট করতে থাকে। যন্ত্রণায় বেদনায় জীবন দুঃসহ হয়ে ওঠে।

দিন কয়েক আগে জুনোবটতে বড় পাদ্রী লোক পাঠিয়েছিলো। জন কতক পাহাড়ী মেয়ে যোগাড় করে কোহিমায় পাঠাতে হবে। ম্যাকেঞ্জীর আদেশ। হ্যাঁ আদেশই বলা উচিত, অমান্য করার সাহস নেই তার। গ্রামে গ্রামে মেয়ের খোঁজে নিজেই গিয়েছিলো জনসন। মেয়ে মেলে নি। পাহাড়ীরা বর্শা

ঁচিয়ে তাকে ফিরিয়ে দিয়েছে। শাসিয়েছে, আর কোনদিন এমন মতলবে এলে প্রাণ নিয়ে ফিরতে হবে না। অনেক দিনের জানাশোনা, তার কাছ থেকে নিমক কাপড় খাবার অনেক পেয়েছে, তাই এবারটা রেহাই দিয়েছে। এর পর আর উপায় থাকবে না।

চার্চের দিকে এগিয়ে আসতে আসতে মনের ওপর এলোমেলো ভাবনার ছায়া পড়ছিলো। আচমকা ভাবনার ঝোঁকটা এক দিকে ঘুরে গেলো। একটু আগে বসওয়েলের স্কীমের কথা শুনেছে জনসন। মেয়ে দিয়ে কোন উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে, তা বুঝতে পেরেছে। শুনতে শুনতে ক্ষমাহীন পাপবোধে, অস্পৃশ্য অপরাধের ছোঁয়ায় সমস্ত চৈতন্য কালো হয়ে গিয়েছে। দেহমন অশুচি হয়ে গিয়েছে। এখন গলিত দুর্গন্ধ একটা পিণ্ডের মত দলা পাকিয়ে প্রবল কান্নার বেগ হাড়-মেদ-শিরা-রক্ত চুরমার করে গলার কাছে আঠার মত আটকে রয়েছে। কান্নাটা বেরিয়েও আসছে না, নীচের দিকে নেমেও যাচ্ছে না। অনড় হয়ে গলার কাছে চেপে রয়েছে। জনসন ভাবলো, একটু কাঁদতে পারলে বুকটা হালকা হয়ে যেতো। সমস্ত সত্তার ওপর যে অসহ্য অকথ্য পীড়ন চলছে, তা থেকে মুক্তি পেতে হলে কাঁদতে হবে। কাঁদতেই হবে।

সে ভীরু, দুর্বল এবং কুণ্ঠিত। এখানে এসে পিয়ার্সনের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো। পিয়ার্সন দুর্বার, দুর্দম। তাকে পাওয়া গেলে এখন সব কিছু বলা যেতো। এই মানসিক পীড়ন, এই ভীষণ নির্যাতন সে আর সহ্য করতে পারছে না। বুকের মধ্যে বাতাস আটকে আটকে আসছে। চারপাশে এত অফুরন্ত বাতাস, তবু জনসনের নিশ্বাস নেবার মত সামান্য বাতাস যেন কোথাও নেই।

ক্লান্ত পা ফেলে ফেলে চ্যাপেলে চলে এলো জনসন। সাদা পাথরে মসৃণ বেদী। সামনে ক্রাইস্টের মর্মর মূর্তি। জ্যোতির্ময় পুরুষের প্রসারিত বাহুতে বরাভয় এবং করুণা। ক্ষমাসুন্দর প্রসন্ন দৃষ্টি। জনসন তাকিয়ে রইলো। আচমকা একটু আগের কান্নাটা গলার কাছে ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে উঠতে লাগলো। সাদা পাথরের বেদীতে আছড়ে পড়লো জনসন; আছড়ে পড়লো একটি পাপের অনুভূতি। পরম পুরুষের পায়ের নীচে লুটিয়ে লুটিয়ে একটু আশ্রয় চাইলো, ক্ষমা চাইলো।

সাদা পাথরের বেদীতে ফুলে ফুলে উঠছে একটি অপরাধ; জনসন কাঁদছে।

যে কান্নাটা গলার কাছে আটকে ছিলো, এবার সেটা পথ পেয়েছে। হু-হু বেগে নেমে আসছে। কাঁপা-কাঁপা আকুল গলায় জনসন বলছে, "ওহ্ ক্রাইস্ট, আই অ্যাম এ সিনার। সেভ মি, সেভ মি। আই কনফেস, আই অ্যাম এ সিনার। ওহ্ ক্রাইস্ট—"

জ্যোতির্ময় পুরুষের পায়ের নীচে একটি অন্যায়, একটি অনিচ্ছাকৃত পাপ কেঁদে কেঁদে শুদ্ধ হচ্ছে। পবিত্র হচ্ছে। চোখের জলে কালিমা ধুয়ে যাচ্ছে।

বিয়াল্লিশ

ভূতাবিষ্টের মত মুখোমুখি বসে রয়েছে পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী আর পুলিস স্থপার বসওয়েল। কেউ কথা বলছে না; একেবারেই চুপচাপ। শুধু ম্যাকেঞ্জীর আঙুলের তলা দিয়ে রুপোমোড়া জপমালাটা মসৃণ গতিতে সরে সরে যাচ্ছে। ঠুনঠুন করে মৃদু ধাতব শব্দ হচ্ছে। এ ছাড়া আর কোন শব্দ নেই। স্তব্ধ রাত্রির শান্তি এখন অবাধ, একটানা।

লোহার গেটে ক্যাঁচ করে আওয়াজ হলো। ম্যাকেঞ্জীর রোমশ আঙুলের নীচে এবং বসওয়েলের দাঁতের ফাঁকে আইভরি পাইপটা চমকে উঠলো।

একটি মাত্র মুহূর্ত। তার পরেই উল্লসিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলো ম্যাকেঞ্জী, "আরে সর্দার, এসো। তারপর তোমাদের সালুয়ালাঙ গ্রামের খবর কী?"

ঘাসের জমিটায় বড় বড় পা ফেলে সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার এগিয়ে এলো। ম্যাকেঞ্জীর পাশে ঘনিষ্ঠ হয়ে দাঁড়ালো। লম্বা বর্শা এবং ঝাঁকড়া মাথাটা এক-সঙ্গে ঝাঁকিয়ে সে বললো, "হু-হু ফাদার, অনেক খবর আছে। মজাদার খবর।"

"কী ব্যাপার?" কৌতূহলে চোখজোড়া তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো ম্যাকেঞ্জীর।

"হুই যে টেফঙের বাচ্চা সেঙাই তোর কাছে এসেছিলো, তাদের বস্তির নাম কেলুরি। আমাদের বস্তির মেহেলী শয়তানী সেখানে ভেগেছে; সে কথা তো তুই জানিস। মেহেলীকে ওরা আটকে রেখেছে। দুটো ছোকরাকে সেদিন রাত্তিরে ওদের বস্তিতে পাঠিয়েছিলাম। তাদের বর্শা দিয়ে ফুঁড়েছে। এর শোধ তুলতে হবে। তোরা আমাদের হয়ে লড়বি। তোদের বন্দুক নিয়ে আমাদের সঙ্গে যাবি। কেমন?" ঘোলাটে চোখে ম্যাকেঞ্জীর দিকে তাকালো সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার।

বিরক্ত উগ্র গলায় ম্যাকেঞ্জী বললো, "এই কথা বলবার জন্যেই বুঝি এত রাত্রে কোহিমা এসেছো?"

"না রে সাহেব, আরো খবর আছে।" আরো একটু ঘন হয়ে দাঁড়ালো সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার। তার গা থেকে একটা মিশ্র দুর্গন্ধ ধক করে নাকে এসে লাগলো ম্যাকেঞ্জীর। নাকটা স্বাভাবিক নিয়মেই কুঁচকে গেলো।

মুখে নিস্পৃহ ভঙ্গি ফুটিয়ে ম্যাকেঞ্জী বললো, "কি খবর, বলো ?"

"তিন দিন ধরে গাইডিলিও ডাইনীটা কেলুরি বস্তিতে এসে রয়েছে। হু-হু—" ঘন ঘন মাথা নাড়তে শুরু করলো সালুয়ালাঙের সর্দার। বললো, "তুই আমাকে টাকা-কাপড়-খাবার দিয়েছিলি। নিমকহারামি করবো না। গাইডিলিওর খবর দিয়ে গেলাম ফাদার।"

এতক্ষণ অনেকদূরের আবছা পাহাড়চূড়ার দিকে তাকিয়েছিলো বসওয়েল। অলস ভঙ্গিতে তামাকের ধোঁয়া ছাড়ছিলো। গাইডিলিওর নামটা কানে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে নড়েচড়ে খাড়া হয়ে বসলো। বললো, "কোথায়, হোয়ের ইজ্ দ্যাট উইচ, দ্যাট মিংক্স গাইডিলিও ?"

ম্যাকেঞ্জী বললো, "তিন দিন ধরে কেলুরি গ্রামে আস্তানা গেড়েছে।"

"এখুনি, জাস্ট নাউ আমরা স্টার্ট করলো। আমি আউট পোস্টে যাচ্ছি। ফোর্স নিয়ে রেডি হই গিয়ে। আপনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন ফাদার। আর এই ভিলেজ হেডম্যানটাকে ধরে রাখুন। আমাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে।" বলতে বলতে বিরাট দেহ নিয়ে লাফিয়ে উঠে পড়লো বসওয়েল। তারপর একরকম ছুটতে ছুটতে ঘাসের জমিটা পেরিয়ে কোহিমার আঁকাবাঁকা পথে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সর্দারের পিঠে একখানা হাত রেখে সোচ্ছ্বাস গলায় ম্যাকেঞ্জী বললো, 'বুঝলে সর্দার, এখুনি তোমাদের সঙ্গে পুলিস-বন্দুক নিয়ে আমরা যাবো। কেলুরি বস্তি থেকে মেহেলীকে ছিনিয়ে এনে তোমাদের দেবো। কি, খুশী তো ?"

"খুব খুশী, হু-হু খুব খুশী—" আনন্দ এবং উত্তেজনার মিশ্র অনুভূতিতে সালুয়ালাঙের বুড়ো সর্দারের চোখজোড়া বুঁজে আসতে লাগলো। জড়ানো গলায় বললো, "মেহেলীকে না আনতে পারলে না খেয়ে মরতে হবে। বস্তির মেয়ে অন্য বস্তিতে পালিয়ে রয়েছে, আমাদের ইজ্জত সাবাড় হয়েছে। সাঙটামরা অঙ্গামীরা ধান বদল করে না, হাঁড়ি দেয় না, লোহার ছুরি আর লাঙল দেয় না। আবাদ করতে পারি না। চল ফাদার, তাড়াতাড়ি চল।"

কোহিমার আকাশে স্থ-লু পক্ষের চাঁদ একেবারে গোল দেখাচ্ছে। স্নিগ্ধ উজ্জ্বল আলোতে দিক দিগন্ত এবং পাহাড়ের মাথাগুলো চকচক করছে।

একটু সময় কাটলো। পায়ের কাছে বশংবদ কুকুরের মত কুণ্ডলী পাকিয়ে বসে রয়েছে সালুয়ালাঙের সর্দার।

একটু পরেই বসওয়েল আসবে। কেলুরি গ্রামে হানা দিতে হবে। তবু কেন যেন তেমন উৎসাহ পাচ্ছে না ম্যাকেঞ্জী। সে ভাবলো ইণ্ডিয়ার মাটিতে সাত-সাতটা বছর কাটিয়ে উদ্দামতা যেন মরে আসছে। রক্ত ঝিমিয়ে যাচ্ছে। মাকড়সার জালের মত দেহমনের সক্রিয় ইন্দ্রিয়গুলোর ওপর ছায়া নেমেছে। ব্রটনক্রুকশায়ারের সেই দুর্দান্ত আউটল একটু একটু করে যেন নিজের মধ্যে শেষ হয়ে যাচ্ছে। মুখ মুখে যতই তর্জন-গর্জন করুক, এই ভয়ঙ্কর সত্যটা সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই ম্যাকেঞ্জীর। একটু একাকী হলেই এই ভাবনাটা টুঁটি টিপে ধরে। পারতপক্ষে তাই একা থাকে না ম্যাকেঞ্জী। ইণ্ডিয়ার নরম মাটির বিশ্রী প্রভাব আছে। জীবনের উদ্দাম ভীষণ গতিকে সে পদে পদে থামিয়ে দেয়।

ইণ্ডিয়ায় প্রীচ করতে এসে একটি নগদ লাভ হয়েছে ম্যাকেঞ্জীর। কয়েক দিন বাদে বাদে নিয়মিত কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে। কয়েক ঘণ্টা মাত্র মেয়াদ। তার মধ্যেই শরীরটাকে বড় পঙ্গু করে দেয়। দেহের সঙ্গে সঙ্গে মনেও রুগ্নতা দেখা দিয়েছে। যতটা সম্ভব ম্যাকেঞ্জী সব রকমের দুর্বলতাকে ঝেড়ে ফেলতে চায়। দেহ যাক, মনের দিকে দুর্বলতার হাত সে কিছুতেই বাড়াতে দেবে না। যতই ভাবে মনটা তত বেশি দুর্বল বোধ হয়। আক্রোশে ভেতরে ভেতরে যুঝতে যুঝতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে ম্যাকেঞ্জী।

চোখ জ্বালা-জ্বালা করছে। অবসাদে হাত-পা অসাড় হয়ে আসছে। কপালের দু পাশে দুটো রগ নাচছে। জ্বর আসবে বোধ হয়।

আরো খানিকটা পরে ঝড়ের মত এসে পড়লো পিয়ার্সন। তার পেছনে একটি উলঙ্গ পাহাড়ী মেয়ে। চিনাসঙবা। ম্যাকেঞ্জী তাকালো, চমকে উঠলো। তীক্ষ্ণ চড়া গলায় বললো, "কী ব্যাপার পিয়ার্সন?"

"ফাদার এই মেয়েটাকে ওর গ্রামের লোকেরা মেরে ফেলছিলো। আমি বাঁচিয়ে এখানে নিয়ে এসেছি। একে আশ্রয় দিতে হবে।"

ম্যাকেঞ্জী চিৎকার করে উঠলো, "ইট ইজ চার্চ। বদমাইসি করার জায়গা নয়। রাত দুপুরে নেংটা মেয়ে নিয়ে এখানে উঠবে, আমি কিছুতেই বরদাস্ত করবো না।"

থতমত, বিস্মিত, কিছুটা বা ভীত গলায় পিয়ার্সন বললো, "কী বলছেন ফাদার! আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। অসহায় মানুষকে রক্ষা করা তো ধর্ম পালনের মধ্যেই পড়ে।"

"আমি তোমার কাছে নীতিকথা শুনতে চাই না! গ্রামে গ্রামে তুমি

কিসের খোঁজে যাও, সব খবরই আমি পাই। এতকাল শুনেছি, এখন দেখলাম। তোমার লজ্জা করে না মিশনারী হয়ে পাহাড়ী মেয়েদের ওপর সুযোগ নিচ্ছো। ছিঃ-ছিঃ মিশনারীদের ইজ্জত আর রইলো না। তোমার জন্য সমস্ত মিশনারীরা পাহাড়ীদের চোখে ছোট হয়ে গেলো।" ধিক্কার দিয়ে চুপ করে গেলো ম্যাকেঞ্জী।

মাথার কোন একটা শিরায় ফস করে দেশলাইর কাঠি জ্বলে উঠলো যেন। জ্বলন্ত চোখে ম্যাকেঞ্জীর দিকে তাকালো পিয়ার্সন। কিন্তু আশ্চর্য শান্ত গলায় বললো, "আপনি স্পাই পাঠিয়ে গ্রামে গ্রামে আমি কী বলি, কী করি, সমস্ত খোঁজখবর নেন! তা আমি জানি। পরে সে সব বোঝাপড়া হবে। এখন এর একটা ব্যবস্থা করুন ফাদার। ওর গ্রামের লোকেরা ওকে পেলে একেবারে মেরে ফেলবে।"

"শুধু ওকেই মারবে, তোমাকে নয়?" চোখের মণি দুটো একপাশে এনে তেরছা নজরে তাকালো ম্যাকেঞ্জী। বললো, "যাক সে কথা। এ ব্যাপারে আমার কিছুই করার নেই।"

"কিন্তু—"

উগ্র ভয়ানক গলায় ধমকে উঠলো ম্যাকেঞ্জী, "তোমার কোন অজুহাত আমি শুনতে চাই না। তুমি চরিত্রহীন, রিপু আর কামের বশীভূত, চার্চ তোমার জায়গা নয়। গেট আউট, বেরিয়ে যাও। ইয়াস, বোথ অফ্ ইউ—"

"কী বলছেন ফাদার?"

"ঠিকই বলছি। চার্চে তোমাকে থাকতে দেওয়া হবে না। মিশনারী হওয়ার তুমি অযোগ্য। তোমার মত লোক একটি থাকলেও ক্রিশ্চ্যানিটির পক্ষে ভয়ানক বিপদের কথা। গেট আউট, গেট আউট—" চিৎকার করে উঠলো ম্যাকেঞ্জী। উত্তেজনায় গলার শিরাগুলো ফুলে ফুলে উঠছে। ঘন ঘন শ্বাস পড়ছে।

ম্যাকেঞ্জীর চিৎকারে চার্চ থেকে আরো কয়েকজন মিশনারী বেরিয়ে এসেছে। একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রয়েছে তারা।

স্থির গলায় পিয়ার্সন বললো, "বেশ, তাই হোক ফাদার। আমরা চলেই যাচ্ছি। আশা করি আবার দেখা হবে। সেদিনের জন্যে সব বোঝাপড়া তোলা রইলো।"

বলতে বলতে চিনাসঙবার একটা হাত ধরে শান্ত ভঙ্গিতে পা ফেলে ফেলে কোহিমার পথে নেমে গেলো পিয়ার্সন।

তেতাল্লিশ

রানী গাইডিলিও এসেছেন।

ছোট্ট কেলুরি গ্রামটা হাসিতে খুশিতে সম্ভ্রমে এবং হল্লায় মেতে উঠেছে।

গ্রামের পশ্চিম দিকে যে বড় মোরাঙটা রয়েছে, তার পাশ ঘেঁষেই একখানা সুন্দর ঘর বানিয়ে দিয়েছে কেলুরি গ্রামের মানুষেরা। মোটা মোটা বাঁশের পাটাতন, আতামারী পাতার ছাউনি আর ভেরা কাঠের দেওয়াল। ভেতরে বাঁশের মাচানে তুলোর দড়ির লেপ, খড়ের বালিশ, পরিপাটি বিছানা।

সকাল থেকে অনেকটা রাত পর্যন্ত ঘরটার সামনে নারী-পুরুষের জটলা থাকে। কেউ নিয়ে এসেছে রুগ্ন স্বামীকে, কেউ পঙ্গু বাপ-মা বা ছেলেকে। প্রত্যেকেই নিজের নিজের বিকলাঙ্গ অক্ষম প্রিয়জনকে নিয়ে এসেছে। গাইডিলিও একটু ছোঁবেন। তাঁর স্পর্শে রোগ-জরা চলে যাবে অক্ষম পঙ্গু অসুস্থ মানুষগুলো সুস্থ বলিষ্ঠ এবং সক্ষম হবে। আনিজার খারাপ নজর সরে যাবে। সেই আশায় সারাদিন ভিড় জমে থাকে গাইডিলিওর ঘরের সামনে।

এখন দুপুর। ঝকঝকে রোদে পাহাড়টা ভরে গিয়েছে। দূরের বনটা নিশ্চল সবুজ নদীর মত দেখায়। বনের মাথায় এক ধরনের লাল ফুল থোকায় থোকায় ফুটেছে। মনে হয়, সবুজ নদীর মাথায় আগুন জলছে।

ঘরটার সামনে একখণ্ড তিন কোণা পাথর। তার ওপর বসে রয়েছেন রানী গাইডিলিও। তাঁর সঙ্গে এসেছে জদোনাঙ, লিকোক্যুঙবা, আরো জন কয়েক পাহাড়ী তরুণ। গ্রামে গ্রামে দমকা ঝড়ের মত ছুটে বেড়াচ্ছেন গাইডিলিও। নাগাপাহাড়ের প্রাণকোষে স্বাধীনতার যে প্রখর আকাঙ্খাটি ফুটেছে, তাকে দিকে দিকে, প্রতিটি নাগার মনে ছড়িয়ে না দেওয়া পর্যন্ত তাঁর ক্লান্তি নেই, বিরাম নেই।

মানুষগুলো দলা পাকিয়ে ঘন হয়ে বসেছে। রীতিমত শোরগোল শুরু হয়েছে।

সবচেয়ে বেশি মাতব্বরি করেছে সেঙাই। কখনও ধমকে, কখনও গর্জে আবার কখনও বর্শার বাজু দিয়ে খুঁচিয়ে সকলকে বাগে রাখছে।

কেলুরি গ্রামে গাইডিলিও এসেছেন। এর সবটুকু কৃতিত্ব এবং আত্মপ্রসাদ যেন একমাত্র সেঙাইর প্রাপ্য। তার মুখচোখ দেখলে মনে হয়, সেটুকু সে আত্মসাৎ করে বসে আছে। ঘন ঘন মাথা নেড়ে সে বলেছে, "বলেছিলাম না রানী আসবে, হু-হু। ছাখ তোরা, বড় বড় চোখ, চওড়া কপাল—"

সকলেই এসেছে, কিন্তু মেহেলী আসে নি। আর পনেরো দিন মাত্র; তার পরেই তেলেঙ্গা সু মাসের শুরু। সেই মাসেই সেঙাইর সঙ্গে মেহেলীর বিয়ে। প্রথামত বিয়ের আগে মেহেলীর সঙ্গে সেঙাইর দেখা হওয়া বারণ। তাই মেহেলী আসে নি।

ওপাশে পিঙলেই সমানে চিৎকার করছে। তার পাঁজরে বর্শার বাড় দিয়ে একটা খোঁচা বসিয়ে দিলো সেঙাই। সঙ্গে সঙ্গে পিঙলেই হুমকে উঠলো, "ওরে টেফঙের বাচ্চা, খুব ফুটুনি হয়েছে তোর। পনেরো দিন পর মেহেলীকে বিয়ে করে মোরাঙ থেকে ভাগবি, তাই বুঝি মেজাজ গরম হয়ে রয়েছে! একেবারে জানে সাবাড় করে ফেলবো।"

"ইজা হুবুতা! চুপ কর শয়তান; শুনছিস না, রানী কথা বলছে।" সেঙাই ধমকে উঠলো।

কে যেন বললো, "ও রানী, বল না, আমাদের এই পাহাড়ের গল্প বল। কাল বলতে বলতে রাত্তির হয়ে গেলো, এবার তার পর থেকে বল।"

প্রসন্ন হাসিতে মুখখানা ভরে গেলো রানী গাইডিলিওর। বললেন, "গল্প নয়, সত্যি কথা। জান তো, কত বড় আমাদের এই নাগা পাহাড়। কত জাত আমাদের! রেঙমা, সাঙটাম, আও, লোহ্টা, কোনিয়াক, অঙ্গামী, সেমা। তাদের আবার কত বংশ! তার ইয়ত্তা নেই। আমাদের পাহাড়ে সাহেবরা এসেছে। সাহেবদের সঙ্গে আমাদের ঝগড়া নেই। কিন্তু তারা যখন আমাদের পাহাড়ে সদ্দারি করছে, তখন তো আর সহ্য করা যায় না।"

"হু-হু, একেবারে ফুঁড়ে ফেলবো না সায়েব শয়তানগুলোকে! হু-হু—" অসংখ্য গলা থেকে একটি ক্রুদ্ধ গর্জন কেলুরি গ্রামের আকাশের দিকে উঠে গেলো।

সামনের দিকে হাত বাড়িয়ে গাইডিলিও বললেন, "শোন যে কথাটা বলবার জন্যে আমি পাহাড়ে পাহাড়ে ছুটে বেড়াচ্ছি। সাহেবরা আমাদের মেয়েদের ইজ্জত নিচ্ছে। আমাদের ধর্ম নষ্ট করছে। এ কি আমরা মানুষ হয়ে সইতে পারি?" দুটি শান্ত স্নিগ্ধ চোখ কঠিন এবং তীক্ষ্ণ হয়ে উঠলো গাইডিলিওর।

পরনে মণিপুরী বেশভূষা ; তার নীচে রক্তমাংস, মেঘমজ্জার আড়ালে একটি আগুনের কণা জ্বলছে। দু চোখের তারায় তার ছটা ফুটেছে।

"না-না—" মাথা নেড়ে নেড়ে, লম্বা লম্বা বর্শাগুলো ঝোঁকে মানুষগুলো হল্লা করতে লাগলো।

"আসান্যেরা (সমতলের বাসিন্দা) সাহেবদের খেদাবার চেষ্টা করছে। আমরা পাহাড়ীরা সাহেবদের পছন্দ করি না। এই পাহাড় থেকে তাদের ভাগাতে হবে। কি, তোমরা রাজী তো?" স্থির, অপলক দৃষ্টিতে সামনের জটলাটার দিকে তাকালেন গাইডিলিও।

"হু-হু, তুই যা বলবি, আমরা তাই করবো রানী। তুই আমাদের বস্তির সেঙাই আর সারুয়ামারুকে বাঁচিয়ে দিয়েছিস। সাহেবরা কি মারই দিয়েছিলো! তোর কথামত আমরা চলবো।" জটলার মধ্য থেকে বুড়ো খাপেগার গলা পর্দায় পর্দায় চড়তে লাগলো।

গাইডিলিও বলতে লাগলেন, "আমাদের এই নাগা পাহাড়ে আমরা কত জাত একসঙ্গে রয়েছি। ঝগড়া করেছি, ভালবেসেছি। সুচেন্যু দিয়ে একে অন্যকে কুপিয়েছি, বর্শা দিয়ে ফুঁড়েছি। আবার আওশে ভোজে কি টেটসে আনিজার নামে যখন শুয়োর বলি দিই, তখন রেঙমা হলে অঙ্গামীকে ডেকে খাওয়াই; সাঙটাম হলে কোনিয়াকদের নেমতন্ন করি। ঝগড়া হলে নিজেরাই মিটমাট করি, কি পুষে রাখি। পিরীত করলে নিজেরাই করি। এর মধ্যে অন্য কারুকে ডাকি না, ডাকবোও না।" একটু দম নিয়ে আবার শুরু হলো, "সাহেবরা আমাদের ওপর সদ্দারি করতে এসেছে। আমরা পাহাড়ী মানুষ, গায়ে রক্ত থাকা পর্যন্ত আমাদের পাহাড়ে সাহেবদের সদ্দারি করতে দেবো না।"

"ঠিক ঠিক—" আবার চেঁচামেচি শুরু হলো। একটানা সেই চিৎকারে ছেদ নেই, থামবার লক্ষণ নেই।

বুড়ো খাপেগা হুঙ্কার ছাড়লো, "চুপ, রামখোর বাচ্চারা—"

শোরগোলের রেশ থেমে এলো।

এক সময় আবার গাইডিলিও বলতে লাগলেন, তাঁর গলাটা তীক্ষ্ণ ধাতব শব্দের মত বাজতে লাগলো, "এই পাহাড়ের এক দিক থেকে আর-এক দিকে আমরা ছুটে বেড়াচ্ছি। বস্তিতে বস্তিতে গিয়ে সকলকে জানিয়ে দিচ্ছি, সাহেবরা আমাদের পাহাড়ে এসে কেমন করে মেয়েদের ইজ্জত নিচ্ছে, ধর্ম নষ্ট

করছে, সদ্দারি করছে। সেই রাগে আমাদের পেছনে লেগেছে ওরা। পুলিসরা বন্দুক নিয়ে তাড়িয়ে তাড়িয়ে বেড়াচ্ছে। আমাদের পেলে গুলি করে মারবে।"

তোকে মারবে! তুই আমাদের বস্তিতে রয়েছিস; একবার এদিকে এসে দেখুক না। শয়তানের বাচ্চারা। জান নিয়ে ফিরতে হবে না। তুই আমাদের বস্তিতে থাক রানী।" জটলার মধ্য থেকে কেলুরি গ্রামের সর্দার বুড়ো খাপেগা উঠে দাঁড়ালো। অর্ধনগ্ন দেহ, লাফাতে লাফাতে গাইডিলিওর পাশে এসে দাঁড়ালো।

"তা হয় না সর্দার। বস্তিতে বস্তিতে আমাদের ঘুরতে হবে। নাগ পাহাড়ের প্রত্যেকটা মানুষকে সাহেবদের কথা বলতে হবে। আসামীরা (সমতলের বাসিন্দা) সাহেবদের ভাগাবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। দরকার হলে জান দিচ্ছে। তাদের সর্দারের নাম হলো গান্ধীজী। তোমরা যদি আমার পাশে একসঙ্গে দাঁড়াও, এই পাহাড় থেকে সাদা শয়তানগুলোকে আমরাও খেদিয়ে দিতে পারি। সকলে মিলে না দাঁড়ালে সাহেবদের সঙ্গে পারা যাবে না।" গাইডিলিওর গলা অত্যন্ত দৃঢ় শোনালো।

বুড়ো খাপেগার ঘোলাটে চোখের তারাদুটো নড়ে উঠলো। হাতের বর্শায় ঝাঁকানি দিয়ে সে বললো, "হু-হু, তুই একবার বল না রানী, জোয়ান-গুলোকে বর্শায় শান দিতে বলি, সুচেন্যুর ফলায় ধার দিতে বলি। তীরধনুক বানাতে বলি। আসান্যুরা (সমতলের বাসিন্দা) সায়েবদের সঙ্গে লড়ছে, আর আমরা পারবো না?"

"না, না—" সন্ত্রস্ত গলায় গাইডিলিও বললেন, "খবরদার, মারামারি নয় আমরা মারবো না, ওরা আমাদের মারুক। কত মারবে? মারতে মারতে নিজেরাই একদিন ঘায়েল হয়ে পড়বে।"

বিস্মিত, বিমূঢ় দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো বুড়ো খাপেগা। বললো, "এ কেমন লড়াই! মার খাবো তবু মারবো না!"

ওপাশ থেকে সেঙাই চেঁচিয়ে উঠলো, "কী রে সদ্দার, কোহিমা থেকে ফিরে রানীর এই লড়াইটার কথা তোকে বলেছিলুম না? মার খাবো কিন্তু মারবো না?"

"হু-হু—" বুড়ো খাপেগা ঘাড় নাড়লো।

গাইডিলিও হয়তো কিছু বলতেন। তাঁর মুখচোখ দেখে তাই মনে হচ্ছিলো। তার আগেই আচমকা বুড়ো খাপেগা সরোষ ক্ষিপ্ত গলায় চিৎকার করে উঠলো,

"ইজ্জা হুবুতা! এই মেহেলী, এই মাগী, তোকে না বলেছি সেঙাইর সামনে বেরুবি না। পনেরো দিন পর তেলেঙ্গা সু মাসে তোদের বিয়ে। কতবার বলেছি, বিয়ের আগে তোদের দেখা হলে আনিজার গোঁসা হবে। তা নয়, মরদের গন্ধ না পেলে মাগী ঠিক থাকতে পারে না। তর আর সয় না। আজ সাবাড়ই করে ফেলবো শয়তানীকে।" বিশ্রী, কুৎসিত মুখভঙ্গি করে উঠে দাঁড়ালো বুড়ো খাপেগা।

বুড়ো খাপেগার চিৎকারে এবং তার চেয়েও অনেক বেশি আতঙ্কে পাহাড়ী নারী-পুরুষের জটলাটা একেবারে স্তব্ধ হয়ে গিয়েছে। বিয়ের আগে মেহেলীর সঙ্গে সেঙাইর দেখা হয়েছে। পাহাড়ীদের সংস্কার এবং বিশ্বাসের দিক থেকে এ এক সাঙ্ঘাতিক অপরাধ। এই অজুহাতেই আনিজার রোষ এবং দণ্ড কখন কী রূপ ধরে এসে পড়বে, সেই আশঙ্কায় মানুষগুলোকে ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে।

জটলাটার এক পাশে চুপচাপ এসে দাঁড়িয়েছিলো মেহেলী। ভিড়ের মধ্যে একাকার হয়ে মিশে রানী গাইডিলিওকে দেখছিলো।

রানী গাইডিলিওর অনেক গল্প সে শুনেছে খাপেগার কাছে। কোহিমা থেকে ফিরে বুড়ো খাপেগার কেসুঙে বসে গাইডিলিওর কথা বলেছে সেঙাই। ভেতরের ঘর থেকে সে সব শুনেছে মেহেলী। সেই থেকে তার মনে গাইডিলিও সম্বন্ধে এক অদম্য আগ্রহ জন্মেছে।

দুদিন হলো কেলুরি গ্রামে রানী গাইডিলিও এসেছেন। মেয়ে-মরদ সকলেই তাঁকে দেখছে। অথচ মেহেলীর দেখার উপায় নেই। গাইডিলিওর কাছে সেঙাই আছে।

কাল রাত্রে জোয়ান ছেলেমেয়েরা ফসলবোনার নাচ দেখিয়েছে। সারুয়ামারুর বউ জামাতসু সুরেলা গলায় গান শুনিয়েছে। খুলি এবং মোটা বাঁশের বাঁশির সুরে সমস্ত কেলুরি গ্রামটা বুঁদ হয়ে ছিলো। ফূর্তির তাড়নায় দুটো মোষ পুড়িয়ে খেয়েছে জোয়ানেরা। চোঙায় চোঙায় রোহি মধু গিলেছে। নাচ গান হল্লা চিৎকার বাজনা, দুটো দিন অবিরাম চলছে। রানী গাইডিলিও নাচগানের খুব তারিফ করেছেন। বাজনাদারেরা গায়েনরা খুব উৎসাহ পেয়েছে। নাচ-গান এবং গাইডিলিও সম্বন্ধে অদ্ভুত অদ্ভুত কথা শুনিয়ে যাচ্ছে নানা জনে। অসহ্য কৌতূহলের তাড়নায় চুপি-চুপি একবার দেখতে এসেছিলো মেহেলী। ভেবেছিলো, ভিড়ের আড়াল থেকে গাইডিলিওকে এক পলক দেখেই চলে যাবে। কিন্তু ঠিক ঠিক খাপেগা সর্দারের নজরে পড়ে গেলো।

ভয়ে আতঙ্কে বুকের মধ্যটা তুরু-তুরু কাঁপছে। চোখের সামনে সব কিছু ঝাপসা, আবছা হয়ে আসছে। ক্রমে ক্রমে বুনো অস্ফুট মনের অনুভূতিগুলো লোপ পেয়ে যাচ্ছে মেহেলীর। ঘোর-ঘোর আচ্ছন্ন দৃষ্টি; বেহুঁশের মত দাঁড়িয়ে রয়েছে। পা, মাথা টলছে। গা কাঁপছে থরথর।

এই পাহাড়ী সমাজ বড়ই নিষ্ঠুর। তার প্রথা, সংস্কার এবং বিশ্বাসগুলো অমান্য করলে চরম শাস্তি পেতে হয়। এ ব্যাপারে সামান্য করুণা আশা করাও বৃথা।

বুড়ো খাপেগা বর্শা বাগিয়ে এগিয়ে আসছে।

রানী গাইডিলিওর পাশ থেকে লিকোক্যুঙবা চেঁচিয়ে উঠলো, "এই সর্দার, কী করছ? খুনখারাপি করবে না কি? এই—"

লিকোক্যুঙবার গলায় বাকি কথাগুলো আটকে রইলো। সামনের পাশুটে রঙের ঘাসবন ফুঁড়ে হু-হু করে সারুয়ামারু ছুটে এলো। উত্তেজনায় তামাটে মুখখানা লাল দেখাচ্ছে। বুকটা উঠছে, নামছে। ফোঁস-ফোঁস করে নিশ্বাস পড়ছে। লম্বা দম নিয়ে সারুয়ামারু বললো, "সদ্দার, সব্বনাশ হয়ে গিয়েছে।"

মেহেলীর দিকে এগিয়ে আসতে আসতে সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো খাপেগা সর্দার। লাল লাল নোংরা দাঁত খিঁচিয়ে বললো, "কী হয়েছে?"

"সালুয়ালাঙ বস্তি থেকে অনেক সায়েব আর পুলিস বন্দুক নিয়ে আমাদের বস্তির দিকে আসছে। কোহিমার সেই ফাদার আছে, আমাকে আর সেঙাইকে যারা মেরেছিলো, তারাও আছে। এতক্ষণে টিজু নদী বুঝি পেরিয়ে এসেছে শয়তানগুলো। কী হবে সদ্দার! কী হবে রানী!" সারুয়ামারুর গলাটা উত্তেজনায় কাঁপতে লাগলো।

তিনকোণা পাহাড়ী গ্রাম কেলুরি। এপারে চড়াই, ওপারে উতরাই। চারপাশে মালভূমি এবং উপত্যকা। কেলুরিতে এসেই গ্রামের তিনটি প্রান্তে তিনজন পাহাড়ী জোয়ানকে মোতায়েন রেখেছিলেন রানী গাইডিলিও। কখন, কোন দিক থেকে অতর্কিতে পুলিস এসে হানা দেবে, কিছু ঠিক নেই।

গাইডিলিও উঠে দাঁড়ালেন। শান্ত গলায় বললেন, এইবার আমাদের যেতে হবে সর্দার। টিজু নদীর দিক দিয়ে পুলিসরা আসছে। বাঁ দিকে খাদ। আমরা কোন দিক দিয়ে যাবো? কোন দিক দিয়ে গেলে ওরা আমাদের দেখতে পাবে না, সেই দিকটা দেখিয়ে দাও সর্দার।"

"কেন যাবি আমাদের বস্তি থেকে? সায়েবরা আসছে, লড়াইটা

ধরিয়ে দি। আসাম্যরা (সমতলের বাসিন্দা) সায়েবদের সঙ্গে লড়াই করছে, আমরা পাহাড়ীরা পারি কিনা ছাখ্ ?"

"না, না সর্দার, মারামারি খুনোখুনি আমাদের লড়াই নয়। এ কথাটা তোমাদের অনেকবার বলেছি।" একটু থেমে দৃঢ় গলায় বলতে লাগলেন গাইডিলিও, "আমরা ধরা পড়লে তো চলবে না সর্দার। নাগা পাহাড়ের সব মানুষকে সাহেবদের কথা বলতে হবে। বোঝাতে হবে।"

বুড়ো খাপেগা মাথা নাড়লো, "হু-হু—"

গাইডিলিও বললেন, "একটা কথা তোমরা মনে রেখো সর্দার, একটু পরেই পুলিস আসবে। গ্রাম তছনছ করে দেবে, তোমাদের মারবে, ঘরে হয়তো আগুন ধরিয়ে দেবে। তোমরা কিন্তু তাদের মেরো না। না মেরে মার খেয়েই আমাদের লড়াই।"

বিমূঢ়, বিহ্বল চোখে তাকিয়ে রইলো বুড়ো খাপেগা। একটু পর বললো, "সায়েবরা মারবে, মার খাবো আর মারবো না, তেমন মানুষ আমরা পাহাড়ীরা হু-হু—"

শঙ্কিত গলায় গাইডিলিও বললেন, "না না, মারামারি নয় সর্দার। তোমরাই তো বলেছিলে আমি যা বলবো, তাই করবে।"

নীরবে ঘাড় নাড়লো বুড়ো খাপেগা। তাতে হাঁ-না কিছুই বোঝা গেলো না।

সামনের দিকে এগিয়ে এলেন রানী গাইডিলিও। তাঁর পেছনে জদোনাঙ। পাশে পাশে আরো জনকয়েক পাহাড়ী তরুণ।

চলতে চলতে গাইডিলিও বললেন, "এখন আমরা যাচ্ছি সর্দার; আবার আমরা তোমাদের গ্রামে আসবো। যেদিন এই পাহাড়ের কোথাও সাহেবদের সদারি থাকবে না, সেদিন নিশ্চয় আসবো। আজ সাহেবদের ভয়ে আমাদের পালিয়ে যেতে হচ্ছে, সেদিন পালাতে হবে না।" ভাবাবেগে গলাটা কাঁপতে লাগলো।

অস্ফুট মন দিয়ে গাইডিলিওর ভাবাবেগ বোঝা সুসাধ্য নয়। তবু তাঁর কথাগুলো বুড়ো খাপেগার মন ছুঁয়েছে। নিঃশব্দে সে মাথা নাড়ছে।

গাইডিলিও আবার বললেন, "তিন দিন তোমাদের গ্রামে রইলাম। তোমাদের ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করছে না সর্দার।"

বুড়ো খাপেগা উৎসাহিত হয়ে উঠলো, "তুই থেকে যা রানী, তোর যদ্দিন

খুশি।" একটু ম্লান হাসি ফুটলো গাইডিলিওর মুখে, "আজ নয় সর্দার, যেদিন নিশ্চিন্তে এসে থাকতে পারবো; সেদিন আসবো।"

এক সময় সকলে গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে এসে পড়লো। বুড়ো খাপেগা সামনের দিকে ডান হাতখানা বাড়িয়ে বললো, "হুই উতরাই ধরে চলে যা। তিনটে পাহাড় পেরিয়ে গেলে কোনিয়াকদের বস্তি ইটিগুচি পাবি। ওদের সদ্দারের কাছে আমার নাম বলবি। সে আমার খুব দোস্ত। সেখানে তোদের কোন ভয় নেই। হুই সায়েব শয়তানদের সাধ্যি নেই, সেখানে গিয়ে তোদের গায়ে হাত তোলে।"

উতরাই ধরে দু-পা নীচের দিকে নেমে গিয়েছিলেন গাইডিলিও। থেমে, পেছন ফিরে বললেন, "পুলিসরা তোমাদের বস্তিতে আসছে। হয়তো অনেক অত্যাচার করবে। তোমরা কিন্তু ওদের মেরো না। তাতে আমাদের, এই নাগা পাহাড়ের, ভীষণ ক্ষতি হবে।"

আবার উতরাইএর দিকে নামলেন রানী গাইডিলিও।

সামনে নিবিড় জটিল বন; প্রকৃতির অফুরান বদান্যতা। মধ্যে মধ্যে আঁকাবাঁকা ঝরনা, জলপ্রপাত এবং ছোট ছোট পাহাড়ী নদী। সেগুলোর মধ্য দিয়ে একটা পথ সোজা সামনের দিকে এগিয়ে গিয়েছে। একটি মাত্র পথ। সে পথ দুর্গম এবং ভয়ঙ্কর।

চলতে চলতে মুখ উঁচু করে গাইডিলিও আকাশের দিকে তাকালেন।

চুয়াল্লিশ

উপত্যকায়, বনের মাথায়, পাহাড়ের চূড়ায় সাঙসু ঋতুর রোদ জ্বলছে। স্বচ্ছ, নীল আকাশে ধূসর রঙের কয়েকটি বিন্দু ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে। ওগুলো মরশুমী পাখি। গুটসুঙ, আউ আর ইবাতঙ পাখিরা বাতাসে সাঁতার কাটছে। সাঙসু ঋতুতে নাগা পাহাড়ের আকাশে এই সব পাখি দেখা যায়।

একটু আগেই পেছনের উতরাই বেয়ে নেমে গিয়েছেন রানী গাইডিলিও। নাগা পাহাড়ের দিক-দিগন্তে, গ্রামে জনপদে, চড়াই-উতরাই-মালভূমি-উপত্যকায় অস্ফুট-মন বন্য মানুষের প্রাণে প্রাণে স্বাধীনতার প্রখর আকাঙ্ক্ষাটি বীজ-ফসলের মত বুনে চলেছেন। লোহ্টা, রেঙমা, সাঙটাম, আও—নানা মানুষ, নানা জাতি-গোত্র-বংশ-কুল, নানা ভাষা-উপভাষার এই বিরাট বিস্তীর্ণ পাহাড়ী জগৎকে একটি শপথের মালায় গেঁথে ক্রমাগত ছুটছেন। সেই শপথের নাম স্বাধীনতা।

টোঘু টুঘোটাঙ পাতার চাল, চারপাশে আস্ত আস্ত বাঁশের দেওয়াল, নীচে খাসেম কাঠের পাটাতন। নতুন ঘরখানায় দুদিন ছিলেন গাইডিলিও। ঘরটার সামনে পাহাড়ী মানুষের জটলাটা এখনও স্তব্ধ হয়ে রয়েছে।

একটু পরেই বুড়ো খাপেগা সেঙাই এবং অন্যান্য জোয়ান ছেলেরা গাইডি-লিওকে পথ দেখিয়ে ফিরে এলো।

সারুয়ামারু ভীরু কাঁপা গলায় বললো, "কী হবে সদ্দার?"

"কিসের কী?" নিরোম ভুরু দুটো কুঁচকে বুড়ো খাপেগা তাকালো।

"হুই যে বললুম, সায়েবরা আসছে। হু-হু, কোহিমার সেই বড় ফাদার রয়েছে সামনে। সালুয়ালাঙ বস্তির সদ্দার রয়েছে। মণিপুরী পুলিসের হাতে বন্দুক রয়েছে। দূর থেকে একবার তাক করলে জানে লোপাট হয়ে যাবো। কী হবে সদ্দার?" সারুয়ামারুর পিঙ্গল চোখের মণি দুটো স্থির হয়ে রয়েছে। গলার স্বরটা কাঁপছে, "আমার বড় ভয় করছে সদ্দার।"

বর্শার বাজুতে ঝাঁকানি দিলো বুড়ো খাপেগা। দুটো ঘোলাটে, পিচুটি-ভরা নোংরা চোখ দপ করে জ্বলে উঠলো। ভাঙা ক্ষয়া শেষ দাঁত ক-টা কড়মড়

শব্দে বাজলো। খাপেগা হুমকে উঠলো, "ভয় করছে! ইজা হুবুতা! তোকে আমিই সাবাড় করবো। তুই না পাহাড়ী জোয়ান! হুই শত্তুরদের বস্তি থেকে আমাদের বস্তিতে না বলে কয়ে, না জানিয়ে শুনিয়ে ওরা এসে ঢুকবে, তা হবে না। লড়াই বাধাতেই হবে। তা নইলে আমাদের ইজ্জত থাকবে না। কোনিয়াকরা সাঙটামরা গায়ে থুথ্ দেবে।"

এর মধ্যে মেয়ে-পুরুষেরা উঠে চারপাশ থেকে ঘিরে ধরেছে বুড়ো খাপেগাকে। মাথা নেড়ে নেড়ে তারা সায় দিলো, "হু-হু, ঠিক বলেছিস সদ্দার। আমাদের বস্তির ইজ্জত আছে না? না বলে কয়ে শয়তানেরা বস্তিতে ঢুকবে, জান থাকতে তা আমরা হতে দেবো না। হু-হু।"

সকলকে ঠেলে গুঁতিয়ে একটা অর্ধনগ্ন যুবতী সামনের দিকে এগিয়ে এলো। সে হলো সারুয়ামারুর বউ জামাতস্থ। রুক্ষ ঘন চুলের ফাঁকে ফাঁকে আরেলা ফুল গোঁজা। সুগোল মসৃণ স্তন দুটি টসটস করছে; কিছুদিনের মধ্যে সন্তানের জন্য প্রাণরস আসবে। সুধাভারে ভরে যাবে। চোখের কোলে কালো দাগ পড়েছে, মাজা উদর ফুলেছে, নিটোল উরুর পাতলা চামড়ার নীচে লাল রক্তের ফিনফিনে ধারাগুলি উত্তেজনায় ছুটাছুটি করছে। মাতৃকুক্ষিতে সন্তান রয়েছে; সেই সন্তানের ভার বয়ে বয়ে গর্ভিণী জামাতস্থ সকলকে তার মাতৃত্ব দেখিয়ে বেড়ায়। খুব সম্ভব এই দেখিয়ে বেড়ানোর মধ্যে সে অতি স্পষ্ট এক গৌরব বোধ করে।

অলস ভঙ্গিতে মাথার ওপর হাত দুটো তুলে হাই তুললো জামাতস্থ। চোখের ঘনপক্ষ্ম পাতাদুটি সন্তান ধারণের গর্বে বুঁজে বুঁজে আসছে। অপরিসীম ক্লান্ত গলায় সে বললো, "এই সদ্দার, আসল কথাটা ভুলে মেরে দিলি, দেখছি।"

"কী আবার ভুললাম রে কুকুরের বাচ্চা।" ক্রুদ্ধ বিরক্ত চোখে তাকালো বুড়ো সর্দার।

"খুব যে খিস্তি দিচ্ছিস। হুই মেহেলী যে বিয়ের আগেই সেঙাইকে দেখলো, তার একটা ব্যবস্থা হবে না? তোর আক্কেল নেই? তুই এখনও বেঁচে রয়েছিস। তুই থাকতে বস্তিতে পাপ ঢুকবে? আনিজার গোঁসা এসে পড়বে? তা হতে পারে না।"

প্রবলভাবে ঘাড়খানা ঝেঁকে বুড়ো খাপেগা বললো, "হু-হু, হতে পারে না। আমি এখনও বেঁচে রয়েছি। আমি কিছু ভুলি নি জামাতস্থ। আগে হুই

সায়েব আর সালুয়ালাঙ বস্তির শয়তানগুলোকে সাবাড় করি। তারপর মেহেলী মাগীর চামড়া উপড়ে ফেলবো। আমি যদ্দিন বেঁচে আছি, তদ্দিন বস্তিতে পাপ হতে দেবো না।" ভয়ানক গলায় বললো বুড়ো খাপেগা।

বুড়ো খাপেগা। এই কেলুরি গ্রামের নিষ্ঠুর ক্ষমাহীন অতীতের জীবন্ত মূর্তি সে। এই পাহাড়ের অমোঘ রীতিনীতি, আচার-ব্যবহার, পাপপুণ্যের বোধ এবং নিরবধিকালের সমস্ত সামাজিক অনুশাসনের নিয়ামক।

কিছুক্ষণ পর আচমকা চিৎকার করে উঠলো বুড়ো খাপেগা, "হো-য়া-য়া-য়া-য়া—হো-য়া-য়া-য়া-য়া—বস্তির জোয়ানেরা, তোরা সবাই মোরাঙ থেকে তীর-ধনুক-বর্শা-দা-কুড়াল নিয়ে যা। খবদ্দার, হুই শয়তানের বাচ্চারা যেন আমাদের বস্তিতে ঢুকতে না পারে।"

অসংখ্য গলা থেকে একটা ভীষণ উত্তেজিত শব্দ সাঙসু ঋতুর বাতাস চিরে-ফেঁড়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে শূন্যে মিলিয়ে গেলো, "হো-য়া-য়া-য়া—হো-য়া-য়া-য়া-য়া—"

হাতিয়ারের খোঁজে মোরাঙের দিকে ছুটে গেলো জোয়ান ছেলেরা।

একপাশে চুপচাপ দাঁড়িয়ে ছিলো ওঙলে আর সেঙাই। বুড়ো খাপেগা বললো, "আমরা হুই টিজু নদীর দিকে যাচ্ছি। তোরা দুজনে মাগীগুলোকে নিয়ে জোহেরি কেসুঙে যা। মেয়েদের ইজ্জত তোরা রাখবি। তাদের ইজ্জত নষ্ট হলে টেটসে আনিজা তোদের পাহাড় থেকে খাদে ফেলে মারবে। খবদ্দার ওঙলে, খুব সাবধান সেঙাই।"

"হু-হু, তুই ঘাবড়াস নি সদ্দার। শয়তানেরা আমাদের বস্তির মেয়েদের গায়ে হাত তুললে জান নিয়ে ফিরতে হবে না।" সেঙাই বললো। তার চোখজোড়া ক্ষ্যাপা বাঘের মত ধকধক জ্বলছে। ওঙলের দিকে ঘুরে সে আবার বললো, "এই ওঙলে, মেয়েদের ডাক।"

"হো-য়া-য়া-য়া-য়া—"

"হো-য়া-য়া-য়া-য়া—"

মোরাঙের দিক থেকে জোয়ানদের চিৎকার ভেসে আসছে।

ওঙলে আর সেঙাই মেয়েদের নিয়ে ডান দিকের টিলাটা পেরিয়ে জোহেরি কেসুঙের পথে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

সাঙসু ঋতুর উজ্জ্বল দিনটির ওপর অশুভ ছায়া এসে পড়েছে। ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামটার বিনাশকামী আত্মার মধ্য থেকে একটা আদিম হিংস্র সত্তা আড়মোড়া ভেঙে জেগে উঠেছে। বর্শার মুখে মুখে তাজা উষ্ণ রক্তের ফোয়ারা

ছুটবে, কুড়ালের ঘা লেগে লেগে মানুষের মুণ্ডু ধড় থেকে খসে পড়বে—পাহাড়ী বন্য প্রাণের বিজ্ঞানে এর চেয়ে অমোঘ সত্য আর কী আছে? এখানে বেঁচে থাকাটাই একটা সাঙ্ঘাতিক তাজ্জবের ব্যাপার। সব সময় মৃত্যু এবং হত্যার জন্য এখানে উত্তেজক প্রস্তুতি।

জোহেরি কেসুঙের দিকে যেতে যেতে সেঙাই বললো, "রানী গাইডিলিও খুনখারাপি করতে বারণ করে দিয়েছে। সায়েবরা মারলেও আমরা যেন না মারি। কিন্তু সদ্দার বোধ হয় সে কথা শুনবে না। দলবল নিয়ে সে তো টিজু নদীর দিকে ছুটলো। কী হবে বল তো ওঙলে? আমরা কী রানীর কথাটা মানবো না?"

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে ওঙলে চেঁচিয়ে উঠলো, "আহে ভু টেলো! ওরা মারবে, আর আমরা বুঝি পড়ে পড়ে মার খাবো! হুই সব আবদার এই পাহাড়ে চলবে না। হু-হু, তোর কী হয়েছে, বল তো সেঙাই?" একটু থেমে আবার, "খুনটুন করবি না তো কেমন পাহাড়ী জোয়ান? মনে থাকে যেন, বস্তির মেয়েদের ইজ্জত সদ্দার আমাদের হাতে ছেড়ে দিয়েছে। ওদের ইজ্জত বাঁচাতেই হবে।"

সেঙাইকে সতর্ক করে দিলো ওঙলে।

"হু-হু, ঠিক বলেছিস। বস্তির ইজ্জত মাগীদের ইজ্জত সব রাখতে হবে। হুই সাহেবরা আসছে, কোহিমায় ওরা আমাকে মেরেছিলো। সালুয়ালাঙের শত্তুররা আসছে। ওরা আমার ঠাকুরদার মুণ্ডু কেটে নিয়েছিলো। সব ক-টাকে আজ বর্শার মাথায় গেঁথে রাখবো।" প্রতিহিংসায় চোখজোড়া জ্বলতে লাগলো সেঙাইর।

সকলকে চমকে দিয়ে বিকট গলায় আমোদের হাসি হাসলো ওঙলে। বললো, "এই তো পাহাড়ী মরদের মত কথা বেরিয়েছে। মাঝে মাঝে খামোকা এমন করিস কেন বল তো? খুনোখুনির ব্যাপারে এত ভাবিস কেন? আমরা হলাম পাহাড়ী, এত ভাবাভাবি করলে আমাদের চলে! মনে যা আসে তাই আমরা করি। সুন্দরী মাগী দেখলে, তার সঙ্গে পিরীত জমাতে ইচ্ছে হলে তাকে আমরা ছিনিয়ে আনি। অচেনা মানুষ বস্তিতে দেখলে এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলি। বুনো মোষ কোপাই, বাঘ মারি। আগুনে শুয়োর ঝলসে রোহি মধু দিয়ে খাই আর ভোঁস-ভোঁস করে ঘুমোই। অত ভাবাভাবি আমাদের ধাতে সয় না রে সেঙাই। অত ভাবতে গেলে মরেই

যাবি।" বলতে বলতে মেয়েদের তাড়া দিতে লাগলো ওঙলে. "এই মাগীরা, চল চল। পা চালা। সায়েবরা এসে পড়লে গতর দুলিয়ে চলা বেরিয়ে যাবে।"

একটি মেয়ে পিছিয়ে পড়েছিলো। তার দিকে তাকিয়ে ওঙলে বললো, "কী রে ইখুজা, পিছিয়ে হাঁটছিস কেন? সায়েব ভাতার করবার মতলব বুঝি?"

ইখুজা অশ্রাব্য অকথ্য গালি দিলো। গালাগালিটা গায়ে মাখলো না ওঙলে। হো-হো করে হেসে উঠলো মাত্র।

দ্রুত পা ফেলে ফেলে জোহেরি কেসুঙের রুক্ষ পাথুরে উঠোনটায় এসে পড়লো সকলে। বিরাট এক খণ্ড পাথর ডান পাশটা ঘিরে জোরি বংশের বাড়িটার দিকে উঠে গিয়েছে।

ওঙলে আবার বললো, "এই মেয়েরা, ঘরে ঢোক। আমরা বাইরে আছি।"

কেলুরি গ্রামের সব ক'টা জোয়ানী-ছুকরি-বুড়ী-বউ-বাচ্চা সেঙাইদের ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়লো।

আর বাইরে দু টুকরো বড় পাথরের ওপর জাঁকিয়ে বসলো সেঙাই এবং ওঙলে। তাদের থাবায় দুটো লম্বা খারে বর্শা। রোদ পড়ে ধারাল ফলা দুটো ঝকমক করছে। দুজনের দেহমনের ইন্দ্রিয়গুলো ধনুকের ছিলার মত টান-টান হয়ে রয়েছে।

ওঙলে বললো, ''খুব সাবধান সেঙাই।"

সেঙাই সামনের দিকে ঝুঁকে বর্শার ফলার ধার পরখ করতে করতে বললো, "আমি ঠিক আছি। তুই সাবধান হ টেফঙের বাচ্চা, চারদিকে নজর রাখ।"

একটু সময় চুপচাপ। অস্বস্তিকর নীরবতা চারপাশ থেকে ঘনিয়ে এলো। একবার কোথায় আউ পাখি ককিয়ে উঠলো। এ ছাড়া শব্দ নেই। অসহ্য গুমোট। হু-হু বাতাস এসে ওক বনে আজ বোধ হয় আর মাথা কোটাকুটি করবে না।

খানিকটা পর ওঙলে বললো, "এতকাল সদ্দারের মুখে খালি লড়াইর কথা শুনেছি। দু-একটা মাথা কাটা ছাড়া তেমন লড়াই দেখিও নি, করিও নি। আজ বড় মজা লাগছে রে সেঙাই। শত্তুরদের মুণ্ডু কেটে আগেকার মানুষদের মত মোরাঙের সামনে গেঁথে রাখবো। মোরাঙের দেওয়াল রক্ত দিয়ে চিত্তির করবো। ভারি ফুর্তি হচ্ছে। তোর হচ্ছে না সেঙাই?"

"হু-হু।" দু চোখ তুলে সেঙাই বললো, "আমি কিন্তু অন্য কথা ভাবছি ওঙলে।"

"আবার কী ভাবছিস? ভাবনার ব্যারামে ধরেছে তোকে। বল কী ভাবছিস?" তামাটে চারকোণা মুখে বিরক্ত ভ্রূকুটি ফুটে বেরুলো ওঙলের।

"ঠিকই বলেছিস। ভাবনার ব্যারামেই আমাকে ধরেছে।" একটু থেমে মাথার চুল খামচা মেরে ধরে সেঙাই বললো, "শোন ওঙলে, ভাবছি এর পর কী হবে?"

"কিসের পর কী হবে?"

"তুই যে সদ্দার বললো, সায়েব আর সালুয়ালাঙ বস্তির শয়তানগুলোকে খতম করে মেহেলীর চামড়া উপড়ে ফেলবে। কী হবে বল দিকি?" সেঙাইর মুখখানা বড়ই বিমর্ষ দেখালো।

"ইজা হুবুতা! বউর চামড়ার কথা এখন থেকে ভাবতে শুরু করেছিস? মেহেলীর চামড়ার চেয়ে বস্তির ইজ্জত অনেক ওপরে। সেটা আগে বাঁচাতে হবে। সে কথা ভুলিস নি সেঙাই।" বলতে বলতে উঠে দাঁড়িয়ে সেঙাইর দু কাঁধ ধরে ঝাঁকানি দিলো ওঙলে।

কিছু একটা জবাব দিতো সেঙাই। কিন্তু তার আগেই টিজু নদীর দিক থেকে সামনের উপত্যকাটা বেয়ে একটা তুমুল হল্লার রেশ ছুটে এলো, "হো-য়া-য়া-য়া-য়া—"

সঙ্গে সঙ্গে এক ঝাঁক অপরিচিত এবং ভয়ঙ্কর শব্দ শোনা গেলো, "বুম্-ম্-ম্-ম্—বুম্-ম্-ম্-ম্—"

"আউ-উ-উ-উ—আউ-উ-উ-উ—"জোয়ানদের তীক্ষ্ণ এবং অস্বাভাবিক গলার আর্তনাদ ভেসে এলো।

ওঙলে শিউরে উঠলো। সেঙাই চমকে উঠলো। দুটো পাহাড়ী জোয়ানের শিরায় শিরায় রক্ত ফেনিয়ে ফেনিয়ে প্রবল উচ্ছ্বাসে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো। অজানা অপরিসীম আতঙ্কে বুক ছমছম করছে। বিমূঢ় ভীত দৃষ্টিতে পরস্পরের দিকে তাকিয়ে রইলো ওঙলে এবং সেঙাই।

"বুম্-ম্-ম্-ম্—বু-ম্-ম্-ম্-ম্—"

"আ-উ-উ-উ-উ—আ-উ-উ-উ-উ—"

অপরিচিত সাঙ্ঘাতিক ঐ শব্দগুলো, পাহাড়ী জোয়ানদের আর্তনাদ, সব মিলিয়ে কী এক অশুভ সঙ্কেত চারপাশ থেকে চেপে আসছে। সাংসু ঋতুর

উজ্জ্বল দিন, ঝলমলে রোদ, গুহাগোপন জলপ্রপাতের শব্দ—এই মুহূর্তে সব শব্দ যেন থেমে যাচ্ছে, সব উজ্জ্বলতা নিবে আসছে।

ভেতরের ঘর থেকে জামাতসু বাইরে বেরিয়ে এলো। তার পেছন পেছন এলো মেহেলী। কাঁপা-কাঁপা গলায় জামাতসু বললো, "হুই সব কিসের শব্দ রে সেঙাই?"

"কী জানি? এমন ধরনের শব্দ কোন দিন শুনি নি।"

মেহেলী বললো, "আমার বড্ড ভয় করছে রে সেঙাই। জোয়ান ছেলেরা অমন করে ককাচ্ছে কেন রে?"

"ঠিক বুঝতে পারছি না।" ভীরু ভাঙা গলায় সেঙাই বলতে লাগলো, "তুই ঘরে যা মেহেলী। এখনো তোর আমার বিয়ে হয় নি। তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস, সদ্দার টের পেলে আর রেহাই রাখবে না। যা যা—"

"ঘরের মধ্যে আমার ভয় করছে।"

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে কুৎসিৎ মুখভঙ্গি করলো ওঙলে। খেঁকিয়ে খেঁকিয়ে বলতে লাগলো, "ভয় করছে! তা হলে পাহাড়ী মাগী হয়েছিস কেন? ভয় করছে, না পিরীতের জ্বালায় ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিস। বাইরে আমরা বসে আছি না? আমাদের না মেরে তোদের গায়ে কেউ হাত দিতে পারবে? যা যা, ঘরে ঢোক। পনেরো দিন পর তেলেঙ্গা সু মাসে তোদের বিয়ে। সবুর সইছে না শয়তান ছুটোর। ঠিক কথা বলেছে সদ্দার, চামড়া উপড়ে নেবে তোর। যা যা, ঘরে ঢোক।"

তাড়িয়ে তাড়িয়ে জামাতসু আর মেহেলীকে আবার ঘরের মধ্যে ঢুকিয়ে দিলো ওঙলে।

"বু-ম্-ম্-ম্—বু-ম্-ম্-ম্—"

আকাশে বাতাসে সাঙসু ঋতুর পাখিরা ছড়িয়ে পড়েছে। বনের মাথা থেকে অসংখ্য পাখির ঝাঁক—আউ, গুটসুঙ, ইবাতঙ—ডানা মেলে উড়ে পালাচ্ছে। ঐ অনভ্যস্ত ভয়ানক শব্দগুলো বনভূমিতে হাহাকার ছড়িয়ে দিয়েছে। দাঁতাল শুয়োরেরা দল বেঁধে ঘোঁত-ঘোঁত করতে করতে ছুটছে। বুনো মোষ, সম্বর, চিতাবাঘ, নীলচে রঙের পাহাড়ী সাপ—সব দলা পাকিয়ে দিগ্বিদিকে পালাচ্ছে। দক্ষিণ পাহাড়ের খাদ পেরিয়ে অঙ্গামীদের জঙ্গলের দিকে ছুটেছে একদল চিতি হরিণ। এই পাহাড়ী বনের পশুজগৎ, তাদের এতকালের সাজানো সংসার ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে চলে যাচ্ছে।

জোহেরি কেসুঙের উঠোন থেকে সেঙাই এবং ওঙলে দেখতে লাগলো, কেমন করে পাখি-পশু-সাপ-পতঙ্গ ঝাঁক বেঁধে পালাচ্ছে।

ওঙলে বললো, "নির্ঘাত খুনোখুনি বেধেছে রে সেঙাই। লড়াইটা বেশ জমেছে মনে হচ্ছে।"

"কী করে বুঝলি ?"

"সদ্দার বলেছে, আমাদের পাহাড়ে যখন লড়াই জমে ওঠে, হৈ-হল্লায় বন থেকে বাঘ-শুয়োর-সাপ বেরিয়ে আসে। ভারি মজাদার ব্যাপার, কিন্তু আমার বড় আপসোস হচ্ছে রে সেঙাই।"

"কেন ?" সেঙাইর চোখ দুটো কৌতূহলে ঝিকমিক করতে লাগলো।

"আপসোস হবে না! তুই বড় বোকা সেঙাই। আমরা জোয়ান মরদ, আমাদের বস্তির সঙ্গে অমন খাসা লড়াই বেঁধেছে, সবাই বর্শা হাঁকাচ্ছে। আর এখানে বসে বসে আমরা মাগীদের পাহারা দিচ্ছি। এখন পর্যন্ত একটা কোপ ঝাড়তে পারলাম না। হাতটা যা নিসপিস করছে। ইজা হুবুতা!" উত্তেজনায় নিজের হাতটা কামড়াতে লাগলো ওঙলে। তামাটে মুখটা ঝকমক করছে।

"হু-হু, ঠিক বলেছিস।" সেঙাই মাথা নেড়ে সায় দিলো।

"বু-ম্-ম্-ম্—বু-ম্-ম্-ম্—" শব্দগুলো অনেকটা কাছাকাছি এসে পড়েছে।

কেলুরি গ্রামের দক্ষিণ প্রান্তে পাটকিলে রঙের যে ন্যাড়া টিলাটা রয়েছে, আচমকা তার পাশ থেকে ভাঙা গলার আর্ত চিৎকার ভেসে এলো, "খো-কু-ঙ-ঙ-গা-আ-আ—"

চিৎকারটা শুনে ভীষণভাবে চমকে উঠলো সেঙাই এবং ওঙলে। কান খাড়া করে ভাবতে লাগলো, ভুল শুনছে না তো! নাঃ, কোন ভুল নেই। সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে অন্তরাত্মাটা থরথর করে কাঁপতে শুরু করলো। পরস্পর মুখ চাওয়াচাওয়ি করতে লাগলো দুজনে। ঐ চিৎকারের মধ্যে একটা অনিবার্য ইঙ্গিত রয়েছে। কেলুরি গ্রামের বাধা চুরমার হয়েছে। তাদের প্রতিরোধ তছনছ করে সাহেবরা ছুটে আসছে, তাদের সঙ্গে আসছে সালুয়ালাঙের শয়তানেরা। কেলুরি গ্রামের বীরত্ব গর্ব দুঃসাহসের গৌরব এবং দম্ভ ভেঙেচুরে একটা অপঘাত ধাওয়া করে আসছে যেন। আর উপায় নেই।

"খোকু-ঙ-ঙ-গা-আ-আ—" পাহাড়ী যুদ্ধের পরিচিত সঙ্কেত। লড়াইয়ে হেরে গ্রামের দিকে পালিয়ে আসার সময় জোয়ান ছেলেরা এমন শব্দ করে।

কেলুরি গ্রামের জোয়ানেরা হেরে পালিয়ে আসছে।

"খোকু-ঙ-গা-আ-আ—" ছোট পাহাড়ী গ্রামটা ঘিরে আর্ত চিৎকার পাকিয়ে পাকিয়ে বাতাসে মিলিয়ে যাচ্ছে।

জোহেরি কেসুঙের উঠোনে ভয়ে আশঙ্কায় স্তব্ধ হয়ে বসে রয়েছে ওঙলে ও সেঙাই। এক সময় ফিসফিস সন্ত্রস্ত গলায় ওঙলে বললো, "কী রে সেঙাই, আমরা তা হলে হেরে গেলাম। সেবারও হেরেছিলাম, সালুয়ালাঙ বস্তির শয়তানেরা তোর ঠাকুরদার মুণ্ডু কেটে নিয়ে গিয়েছিলো। আর এবার হারলাম সায়েবদের কাছে।"

"তাই তো দেখছি।" আবছা গলায় সেঙাই বললো।

"খোকু-ঙ-ঙ-গা-আ-আ—"

ঘরের মধ্যে বুড়ি-ছুঁড়ী-বউ-বাচ্চা তুমুল চেঁচামেচি শুরু করেছে। কান্না চিৎকার অশ্রাব্য গালাগালি—সরু মোটা ঘড়ঘড়ে তীক্ষ্ণ গলার মিশ্র শব্দ দলা পাকিয়ে একাকার হয়ে বাঁশের দেওয়াল ফুঁড়ে বেরিয়ে আসছে। মেয়েরা ভয় পেয়েছে ; ভীষণ, সাঙ্ঘাতিক ভয়।

ভেতর থেকে মেহেলী বললো, "এই সেঙাই, বস্তির জোয়ানরা যে পালিয়ে আসছে! কী হবে?"

সেঙাই এবং ওঙলে, কেউ কোন জবাব দিল না। হতবাক, চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইলো দুজনে।

আচমকা দক্ষিণ প্রান্তের সেই পাটকিলে ন্যাড়া টিলাটার পাশ থেকে পিঙলেই আর খোখিকেসারি বংশের দুটো জোয়ান ছেলে, ফামুসা এবং যাসেমু উঠে এলো। তাদের সমস্ত দেহে তাজা রক্তের ছোপ লেগে রয়েছে। তিনজনে সাঁ করে সামনের একটা ছোট ভাঁজ পেরিয়ে মোরাঙের দিকে ছুটে পালালো।

সেঙাই চেঁচিয়ে উঠলো, "এই পিঙলেই, এই ফামুসা, এই যাসেমু, কী ব্যাপার? কী হয়েছে? এই শয়তানের বাচ্চারা?"

তিনজনের একজনও উত্তর দিলো না। মুহূর্তের মধ্যে তারা মোরাঙের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

পিঙলেইদের দিকে তাকিয়ে ছিলো ওঙলেও। মুখ ফিরিয়ে সে ফুঁসে উঠলো, "দেখছিস সেঙাই, ওদের গায়ে কী রক্ত! নির্ঘাত সায়েবরা মেরেছে। এর বদলা—"

আরো কিছু হয়তো বলতো ওঙলে। বিশ্রী মুখভঙ্গি করে খানিকটা

চেঁচামেচি করতো, গালাগালিতে সাওসু ঋতুর দিনটাকে কদর্য করে তুলতো। লাল লাল অসমান দাঁতগুলো কড়মড় করে বাজাতো; কিন্তু তার আগেই পাটকিলে টিলাটার পাশ থেকে দুটো ভয়ঙ্কর মুখ উঁকি দিলো। পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী এবং পুলিস সুপার বসওয়েল। মুখ দুটো কী হিংস্রই না দেখাচ্ছে এখন। স্নেহ-মায়া-করুণা নামে ললিত সুকুমার বৃত্তিগুলির কোন চিহ্নই নেই সে মুখে।

চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে, যাচাই করে, বিপদের আশঙ্কা নেই জেনে, বুক বেয়ে বেয়ে টিলার মাথায় উঠে এলো বসওয়েল এবং ম্যাকেঞ্জী। তাদের পেছন পেছন এলো একদল মণিপুরী-বিহারী-আসামী পুলিস। এলো জনকতক সাদা মানুষ। সকলের হাতেই রাইফেল এবং রিভলভার। ট্রিগারের ওপর তর্জনীগুলো নির্মমভাবে চেপে রয়েছে। সকলের সঙ্গে উঠে এলো বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জী। তার পাশে সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দার। এসেছে মেহেলীর বাপ সাঞ্চামখাবা। এসেছে নানকোয়া গ্রামের রাঙসুঙ এবং তার ছেলে মেজিচিজুঙ। কতদিন হলো একশোটা খারে বর্শা দিয়ে তারা বউপণ দিয়ে গিয়েছে মেহেলীর বাপকে। এই পাহাড়ের মেহেলী নামে সেরা মেয়েটি তাদের চাই। সকলের পেছনে নানকোয়া এবং সালুয়ালাঙ গ্রামের সব ক-টা জোয়ান ছেলে লম্বা লম্বা বর্শা বাগিয়ে এসেছে।

চাপা বীভৎস গলায় বসওয়েল বললো, "খুব সাবধান, এই হিলি বীস্টগুলো কিন্তু সাঙ্ঘাতিক। কখন কোথা থেকে যে বিষমাখা তীর ছুঁড়ে বসবে, তার ঠিক নেই। বি কেয়ারফুল, চারদিকে নজর রাখো। তবে তেমন ভয় নেই। গ্রেট ওয়ার-ফেরত লোক আমি, আমাকে ঘায়েল করা অত সহজ নয়।" বিশাল মাংসল মুখখানায় আত্মপ্রসাদ এবং দম্ভের হাসি নেচে বেড়াতে লাগলো বসওয়েলের। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরেই গর্জে উঠলো বসওয়েল, "এক ঘণ্টা ধরে গুলি ছোঁড়া হচ্ছে। পাহাড়ী বীস্টগুলো মরলো, জখম হলো। কিন্তু গাইডিলিও কোথায়? কোথায় সেই শয়তানী, আই মাস্ট র‍্যানস্যাক দা এনটায়ার ভিলেজ। ডাইনীটাকে ধরতেই হবে। আচ্ছা ফাদার, এই সর্দারটা ভুল খবর দেয় নি তো? আমি আবার ওদের ভাষা পুরোপুরি বুঝি না।" একটু থেমে বললো, "আমার এক-এক সময় সন্দেহ হয় গাইডিলিও বলে কেউ আছে কি না? একটা মিরেজের পেছনে ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছি বোধ হয়। উঃ, হরিবল! গ্রেট ওয়ারের লোক আমি। জীবনে অনেক আজব অভিজ্ঞতা হয়েছে কিন্তু আপনাদের এই নাগা পাহাড়ে টু চেঞ্জ দিস হিল উইচ

আমি হিমসিম খেয়ে যাচ্ছি ফাদার। হয়রান হয়ে পড়েছি। এত পাহাড়ী মানুষ মরলো, জখম হলো, কিন্তু শয়তানীটাকে বাগেই পাচ্ছি না। নিন, আপনার সর্দারকে জিগ্যেস করুন, গাইডিলিও কোথায়?"

বসওয়েলের কথাগুলো ম্যাকেঞ্জীর মনে কী প্রতিক্রিয়া করলো, আদৌ করেছে কি না, মুখ দেখে তা বুঝবার উপায় নেই। বসওয়েলের দিকে তাকিয়ে কপাল বুক বাহু ছুঁয়ে ছুঁয়ে সে ক্রশ আঁকলো। ঠোঁটে সূক্ষ্ম নির্লিপ্ত হাসিটুকু লেগেই রয়েছে। একটু পর মুখ ঘুরিয়ে শান্ত গলায় নিভুর্ল উচ্চারণে পাহাড়ী ভাষায় বলতে লাগলো, "কী হে সর্দার, তুমি ঠিক জানো তো, এই কেলুরি গ্রামে গাইডিলিও এসেছিলো?"

"হু-হু—" পালকের মুকুট নেড়ে সালুয়ালাঙের সর্দার বললো, "আমি নিজের চোখে দেখেছি। তিন দিন এই বস্তিতে ছিলো গাইডিলিও। রাত্তির বেলা লোক পাঠিয়ে খোঁজ রেখেছি, ডাইনীটা আর কোথাও পালাবে কিনা?"

"গ্রামের মধ্যে কারুকেই তো দেখছি না। সব গেলো কোথায়?"

"বন্দুকের আওয়াজ শুনে নির্ঘাত জঙ্গলে পালিয়েছে। দেখলি না, শয়তানের বাচ্চারা আমাদের ফুঁড়তে গিয়েছিলো। গুলি খেয়ে ক-টা পড়তেই বাকীগুলো জঙ্গলে পালালো।" সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার ক্ষয়া হলদে ছোপ-ধরা দাঁত বের করে আমোদের হাসি হাসলো। বললো, "হু-হু, টেফঙের বাচ্চারা বন্দুকের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছে বর্শা দিয়ে। থুঃ থুঃ—" রুক্ষ টিলাটার মাথায় একদলা থুথু ছিটিয়ে দিলো সর্দার। আবার শুরু করলো, "ফাদার, তুই আমাদের মেহেলীটাকে এনে দে। নইলে বস্তির ইজ্জত আর থাকছে না। অঙ্গামীরা ধান বদল করছে না, সাঙটামরা কোদাল, মাটির হাঁড়ি কি উল্কির রঙ দিচ্ছে না। মাগীটাকে ছিনিয়ে দে আমাদের। এই ত্যাখ না, নানকোয়া বস্তির রাঙসুঙ এসেছে। ওর ছেলে মেজিচিজুঙের সঙ্গে মেহেলীর বিয়ে দেবে। এই জন্যে একশোটা খারে বর্শা বউপণ দিয়ে গিয়েছে। মেহেলীকে মেজিচিজুঙের সঙ্গে বিয়ে না দিলে নানকোয়া বস্তির সঙ্গে আমাদের লড়াই বেধে যাবে।"

বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর ঠোঁটে হাসিটুকু তেমনি ভঙ্গিতেই আটকে রয়েছে। মোটা মোটা রোমশ আঙুলের নীচে জপমালাটা থামলো না। স্নিগ্ধ, মধুর গলায় সে বললো, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই। মেহেলীকে তোমরা ঠিক পাবে। কিন্তু গাইডিলিওকে তো আমাদের চাই।"

"হু-হু।" সালুয়ালাঙের সর্দার সায় দিলো।

"তা হলে এখানে দাঁড়িয়ে থাকলে তো চলবে না। গ্রামের ভেতরে চলো। খুঁজে বের করতে হবে তো তোমাদের মেহেলী আর আমাদের গাইডিলিওকে। আমরা এ বস্তির কিছুই চিনি না। কোথায় কী আছে, জানি না। আমাদের পথ দেখিয়ে চলো।"

"হু-হু, চল্ ফাদার। আমি তো আছি; এ বস্তির সমস্ত কিছু আমি চিনি। অনেক দিন আগে আমাদের সালুয়ালাঙ আর এই কেলুরি মিলিয়ে একটা মস্ত বড় বস্তি ছিলো। তার নাম কুরগুলাঙ। ছোটবেলা কতবার এসেছি এই বস্তিতে। চল্ ফাদার, চল্—আমি সব দেখিয়ে দিচ্ছি।"

বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী বসওয়েলের দিকে তাকালো। বললো, "চলুন পুলিস সুপার, ভেতরে গিয়ে খোঁজ নিতে হবে।"

"চলুন।" চওড়া ঘাড়খানা ঘুরিয়ে চারদিকে ভালো করে তাকিয়ে ভরাট থমথমে গলায় বসওয়েল বললো, "ট্রুপস, খুব সাবধান। পাহাড়ীগুলোকে দেখা মাত্র গুলি করবে। গাইডিলিওকে না পেলে এই পাহাড়ের সব মানুষ আমি খুন করবো। দেখি, পাই কি না? আর ইয়াস্, ঐ ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দেবে। পাহাড়ী কুত্তীটা কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারে, আমিও দেখবো।"

ভারী ভারী পা ফেলে সামনের দিকে এগিয়ে এলো পুলিস সুপার বসওয়েল। তার পাশে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। পেছন পেছন ইউরোপীয় সার্জেন্টদের দল; আসামী-বিহারী-মণিপুরী পুলিসের ঝাঁক। তাদের পেছন পেছন নানকোয়া এবং সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ান ছেলেরা এগিয়ে আসছে।

বেয়নেট, রাইফেল ও রিভলভারের নল এবং বর্শার মাথায় মাথায় ধারাল রোদ জ্বলছে। শক্ত পাথুরে টিলায় ভারী ভারী বুটের শব্দ হচ্ছে। খট্ খট্, খট্ খট্।

জোহেরি কেসুঙের উঠোন থেকে নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছে সেঙাই আর ওঙলে।

সেঙাই বললো, "রামখোর বাচ্চারা যে বস্তির মধ্যে ঢুকে পড়লো রে ওঙলে!"

দাঁতে দাঁত পিষে অস্ফুট শব্দ করলো ওঙলে। বললো, "তাই তো দেখছি।"

আচমকা জোহেরি কেসুঙের মধ্যে চিৎকার করে উঠলো মেহেলী। বাঁশের দেওয়ালের ফাঁকে চোখ রেখে সে সাহেব-পুলিস-বর্শা-বন্দুক, সব দেখে ফেলেছে। নির্জীব গলায় মেহেলী বললো, "এই সেঙাই, আমাদের সালুয়ালাঙ বস্তি থেকে সর্দার এসেছে, বাপ এসেছে। বাঘ-মানুষ মেজিচিজুঙ এসেছে। ছুই শয়তানটাই তো আমাকে বিয়ে করতে চায়। ওরা যে আমাকে খতম করবে!"

এত মানুষ, সাহেব, নানকোয়া এবং সালুয়ালাঙ গ্রামের অসংখ্য জোয়ান, মণিপুরী-আসামী-বিহারী-পুলিস, তাদের বর্শা-বন্দুক-কুড়াল দেখতে দেখতে খুবই ভয় পেয়েছে সেঙাই। বুকের মধ্যে নিশ্বাস আটকে আটকে আসছে। চোখের তারা ছুটো অসাড় হয়ে যাচ্ছে। এমন সময় মেহেলীর কথাগুলো কানে ঢুকলো। সঙ্গে সঙ্গে প্রতিক্রিয়া ঘটে গেলো। স্থূল পৌরুষবোধে সাঙ্ঘাতিক ঘা লেগেছে। চোখজোড়া জ্বলে উঠলো। চড়া, তীক্ষ্ণ গলায় সেঙাই চেঁচিয়ে উঠলো, "চুপ মার মাগী। আমি আছি না? আমার হাতে এই বর্শাটা থাকতে কেউ তোকে ছুঁতে পারবে! এফোঁড়-ওফোঁড় করে ফেলবো।"

কালচে মাড়িসমেত ছু পাটি দাঁত বের করে, বিকট শব্দ করে হাসতে লাগলো ওঙলে। হাসির দমকে তার বলিষ্ঠ পেশল দেহটা কাঁপছে; ধনুকের মত বেঁকছে। আবার টান-টান হয়ে খাড়া হয়ে যাচ্ছে। ওঙলে বললো, "ভালোই হলো সেঙাই; খুব ভালো। ছুই সায়েবরা, ছুই সালুয়ালাঙের শয়তানেরা আসতে মেজাজটা খাসা হয়ে গেলো।"

"কেন?"

"কেন আবার?" হাসি থেমে গিয়েছিলো। উত্তেজিত গলায় ওঙলে আবার বলতে লাগলো, "তুই আমাদের বস্তীর সেরা জোয়ান আর মেহেলী হলো সালুয়ালাঙ বস্তির সেরা মেয়ে। তোদের বিয়েতে কম করে তিন কুড়ি মাথা ধড় থেকে না নামলে জুত হয়!" একটু থেমে কপাল-ভুরু কুঁচকে বললো, "রামখোর বাচ্চারা কেমন করে বস্তিতে ঢুকলো বল তো সেঙাই?"

"নির্ঘাত আমরা হেরে গেছি। নইলে ওরা ঢুকবে কেমন করে? সদ্দারটার দেখা নেই। সেটা হয় মরেছে, নয় তো জঙ্গলে পালিয়েছে। ছুই যে শুনলি না 'খো-কু-ঙ-গা-আ-আ—'; হেরে গেলেই তো জোয়ানেরা অমন করে চেঁচায়।"

একটু আগে শব্দ করে আমুদে হাসি হাসছিলো ওঙলে। এখন তাকে

ভীত, বিষণ্ণ এবং সন্ত্রস্ত দেখাচ্ছে। মাথা নেড়ে সে বললো, "ঠিক বলেছিস সেঙাই। আমরা হেরেই গেছি।"

আচমকা উত্তর দিকের আকাশে লকলকে আগুন দেখা দিল। প্রথমে উত্তর, তারপর দক্ষিণ, তারও পর পশ্চিমদিকের আকাশ ঘিরে ক্রমে ক্রমে লেলিহ্ আগুন সমস্ত গ্রামটাকে বেষ্টন করলো।

টিলায় টিলায়, মস্ত মস্ত পাথরের ভাঁজে, চড়াই এবং উতরাইর উঁচুনীচুতে কেলুরি গ্রামের ঘরবাড়িগুলো ছড়ানো ছিটানো। ছোট ছোট ঘর। আতামারী পাতার ছাদ, ওক কাঠের পাটাতন, চারপাশে অখণ্ড বাঁশের দেওয়াল। ঘরের চালে চালে আগুনের ফণা নেচে বেড়াচ্ছে। বাঁশের গাঁটগুলো ফাটছে। ফট্-ফট্ শব্দ হচ্ছে। আতামারী পাতার চাল পুড়ে পুড়ে উৎকট গন্ধ বেরুচ্ছে। ঘরপোড়া ছাই উড়ে উড়ে যাচ্ছে। উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম—ছোট্ট পাহাড়ী গ্রামটার তিন দিক থেকে কান্না-চিৎকার-আর্তনাদের শব্দ পাকিয়ে আকাশের দিকে উঠে যাচ্ছে, "আ-উ-উ-উ-উ, আ-উ-উ-উ-উ, আ-উ-উ-উ-উ।" মাঝে মাঝে 'বুম্-ম্-ম্ বুম্-ম্-ম্' আওয়াজ হচ্ছে। হল্লা এবং শোরগোলের মিশ্র শব্দ শোনা যাচ্ছে। সব মিলিয়ে একটা ভয়ঙ্কর তাণ্ডব।

আর টিলায় টিলায়, চড়াইর মাথায় মাথায় ভারী ভারী পা ফেলে ছুটাছুটি করছে পুলিস সুপার বসওয়েল। মাথার চুল উড়ছে, রিভলভার বাগিয়ে উন্মাদের মত অট্টহাসি হাসছে। মনে হয়, বসওয়েলের ঘাড়ে প্রেতাত্মা ভর করেছে। বাঁশের গাঁট ফাটার শব্দ, হল্লা-চিৎকার-কান্না-গোঙানির শব্দ, গুলির শব্দ, সব ছাপিয়ে তার উন্মত্ত গলা পর্দায় পর্দায় চড়ছে, "গাইডিলিও! ড্যামন্ড্ উইচ, ডার্টি উম্যান! কোথায় লুকিয়ে থাকতে পারিস, আমি একবার দেখবো।"

বসওয়েলের ঠিক পেছনেই দাঁড়িয়ে রয়েছে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। বীডসের ওপর আঙুলগুলো পরম নির্বিকার। কপালের একটি রেখাও স্থানচ্যুত হয় নি। এমন কি ঠোঁটের সেই হাসিটুকু পর্যন্ত অবিচল।

পুবদিকে জোহেরি বংশের এই বাড়ির উঠোনে দাঁড়িয়ে গ্রামপোড়া আগুন দেখছিল সেঙাই আর ওঙলে। দেখতে দেখতে অপরিসীম আতঙ্কে বিহ্বল এবং আড়ষ্ট হয়ে পড়েছিলো।

সহসা ঘরের মধ্যে নারীকণ্ঠের আর্তনাদ উঠলো, "আগুন আগুন। এই

সেঙাই এই ওঙলে, দুই পশ্চিমদিকেই তো আমাদের ঘর। সব পুড়ে বুঝি ছারখার হলো।"

একজন বললো, "আমাদের ছেড়ে দে। পাঁচ খুদি ধান আর জোয়ার রেখে এসেছি ঘরে। পরশু রাত্তিরে টাটকা রোহি মধু বানিয়েছি। সব পুড়ে গেলে তেলেঙ্গা সু মাসটা চলবে কেমন করে?"

আর একটি গলা শোনা গেলো, "বাচ্চা ছেলেটাকে শুইয়ে রেখে এসেছি ঘরের মধ্যে। নির্ঘাত পুড়ে মরছে। ইজ্জত দিয়ে কী হবে? আমার বাচ্চা চাই।"

ঘরের মধ্য থেকে সাঁ করে বাইরে বেরিয়ে এলো একটি অর্ধনগ্ন নারীদেহ। চক্ষের পলকে দেহটা সামনের বড় টিলার আড়ালে অদৃশ্য হলো।

নারীকণ্ঠের চিৎকার তুমুল হয়ে উঠেছে। উত্তর-দক্ষিণ-পশ্চিম, পোখিকেসারি বংশ, জোরি বংশ, নগুসেরি, সোচরি, লোহেরি—নানা বংশের ঘরবাড়িগুলো পুড়ে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে নিরুপায়, অসহায় আক্রোশে ফুলতে লাগলো সেঙাই এবং ওঙলে।

পুবদিকের খাড়া চড়াই বেয়ে বেয়ে সেঙাইদের কাছাকাছি এসে পড়লো বুড়ী বেঙসানু, ফাসাও আর নজলি। দিন কয়েক আগে তিন পাহাড়ের ওপারে কোনিয়াকদের গ্রাম ফচিমাঙে কুটুম বাড়ি গিয়েছিলো তারা। অনেক খানি উঁচুনীচু দুর্গম পাহাড়ী পথ ভেঙে এসেছে। রীতিমত হাঁপাতে শুরু করলো বুড়ী বেঙসানু। জিভ বেরিয়ে পড়েছে। জীর্ণ বুকের শুকনো স্তন দুটো ঘন ঘন নিশ্বাসের তালে তালে উঠছে নামছে। বুড়ী বেঙসানু বললো, তার গলায় ভীত কৌতূহলের সুর বাজলো, "এই সেঙাই, এই ওঙলে, ব্যাপার কী? চড়াই ডিঙিয়ে আসতে আসতে আগুন নজরে পড়লো। একেবারে ছুটতে ছুটতে আসছি। এখন তো জঙ্গল পোড়াবার সময় না। তা হলে বস্তিতে আগুন ধরেছে না কি?"

"আগুন ধরে নি। সায়েবরা ধরিয়ে দিয়েছে।"

"সায়েবরা ধরিয়ে দিয়েছে! ইজা হুবুতা! শয়তানদের ফুঁড়ে ফেল সেঙাই। কুড়াল দিয়ে কুপিয়ে সাবাড় কর ওঙলে।" উত্তেজনায়, রাগে বুড়ী বেঙসানুর গলার স্বর কয়েক পর্দা চড়ে ভয়ানক শোনাতে লাগলো। নিশ্বাস দ্রুততর হলো। বুকটা আরো জোরে কাঁপতে লাগলো। ঘোলাটে চোখের অস্পষ্ট তারা দুটো ঈষৎ লাল হয়ে উঠলো।

"তার আর উপায় নেই ঠাকুমা। থাকলে কি আর এখানে দাঁড়িয়ে আছি ?" একটু থেমে লম্বা দম নিয়ে সেঙাই বলতে লাগলো, "আমরা হেরি গেছি সায়েবদের কাছে। সদ্দার জোয়ান ছোকরাদের নিয়ে সায়েবদের রুখতে গিয়েছিলো। সবাইকে সাবাড় করে সায়েবরা বস্তিতে ঢুকেছে। একটু আগে পিঙলেই, ফামুসা আর যাসেমু মোরাঙের দিকে ছুটে পালালো ; ওদের গা থেকে দরদর করে রক্ত পড়ছিলো।"

"আহে ভু টেলো! আনিজা তোদের ঘাড় মুচড়ে রক্ত খাক।" দাঁতমুখ খিঁচিয়ে বুড়ী বেঙসানু খেঁকিয়ে উঠলো, "শয়তানের বাচ্চারা, এখানে দাঁড়িয়ে কী করছিস ? বস্তির সবাই লড়াই করলো, মরলো, আর তোরা এখানে জানের ভয়ে লুকিয়ে রয়েছিস! থুঃ-থুঃ—" একদলা থুথু সেঙাই এবং ওঙলের মুখে ছুঁড়ে মারলো বুড়ী বেঙসানু।

বেঙসানুর সাড়া পেয়ে ঘর থেকে সব মেয়েরা বেরিয়ে এসেছে। চারপাশ থেকে বুড়ী বেঙসানু, ওঙলে এবং সেঙাইকে ঘিরে ধরেছে। সকলের মুখেচোখে কেমন এক আতঙ্কের ছায়া পড়েছে।

বুড়ী বেঙসানু আবার খেঁকিয়ে উঠলো, "কেলুরি বস্তির ইজ্জত তোরা ডুবিয়ে দিলি।"

সেঙাই বললো "সদ্দারই তো আমাদের এখানে থাকতে বলেছে। লড়াই করতে যাবো কেমন করে ?"

"কেন থাকতে বলেছে এখানে ?"

"কেন আবার ? বস্তির মাগীদের ইজ্জত বাঁচাবার জন্যে।"

পয়তাল্লিশ

টিলার ফাঁক থেকে, পাথরের ভাঁজ থেকে, উঁচুনীচু উতরাইয়ের আশপাশ থেকে আগুন জিভ মেলছে আকাশের দিকে। মোরাঙ পুড়ছে, চাল-দেওয়াল-পাটাতন পুড়ছে, গাছের আগায় কুমারী মেয়েদের শোয়ার ঘরগুলি পুড়ছে। পাহাড়ী মানুষগুলো তাদের অস্ফুট মনের কামনা-বাসনা দিয়ে, অফুরন্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা দিয়ে ঘর বানিয়েছিলো। ঘর পুড়ে পুড়ে ছাইয়ে বিলীন হচ্ছে। সংসার ভেঙে তছনছ হচ্ছে।

বসওয়েলের মনের বৃত্তিগুলির মধ্যে বিনাশকামিতাই বুঝি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ এবং স্পষ্ট। মহাযুদ্ধ-ফেরত বসওয়েল। নির্বিচার হত্যা, ধ্বংস এবং তাণ্ডবের মত উন্মাদকর নেশা তার কাছে আর কী আছে? তার হাতের গুলি যখন মানুষের পাঁজর ভেদ করে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছোটায়, তার নির্দেশে মানুষের সাজানো গোছানো গ্রাম-জনপদ যখন পুড়ে ছারখার হয়ে যায়, নিরাশ্রয় পশুর মত সচকিত সন্ত্রস্ত হয়ে চারদিকে মানুষ যখন পালাতে থাকে, তখন অবর্ণনীয় উল্লাসে বসওয়েলের মন ভরে যায়। বিনাশকামিতার বৃত্তিটা তার মনে এত বলিষ্ঠ, এত সযত্নে লালিত হয়েছে যে অন্যান্য সুকুমার বৃত্তিগুলি মোটেই পুষ্টিলাভ করে নি।

চারপাশে আগুন এবং ধ্বংস। দু-চারটে গুলিবিদ্ধ মৃতদেহও এপাশে-ওপাশে পড়ে রয়েছে। নেশাটা মোটামুটি মন্দ জমে নি। রাক্ষসের মত টিলায় টিলায় দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে বসওয়েল। তার প্রচণ্ড অট্টহাসি পাথরে পাথরে ঘা লেগে উৎকট এবং ভীষণ শোনাচ্ছে, "হাঃ-হাঃ-হাঃ।" উন্মত্তের মত হেসে চলেছে বসওয়েল। আচমকা ঘুরে দাঁড়িয়ে সে বললো, "কী ফাদার, ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিলুম। কিন্তু কোথায়; গাইডিলিও কোথায়? পুলিসরা দু-একটাকে গুলি করে মেরেছে, বাকী পাহাড়ীগুলো কোথায় ভাগলো? পেলে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে ঠিক খবর আদায় করতাম। ঐ হেডম্যানটাকে জিগ্যেস করুন। ব্যাপারটা কী?"

পেছনে দাঁড়িয়ে নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে সমানে জপমালা জপছে বড় পাদ্রী

ম্যাকেঞ্জী। কটা চোখে ফাঁদ পেতে এদিক-সেদিক তাকাচ্ছে। কিছু-একটা জবাব সে দিতো। কিন্তু, তার আগেই সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার চিৎকার করে উঠলো, "হুই, হুই যে সেঙাই! হুই যে মেহেলী! ইজা হুবুতা!"

চক্ষের পলকে ঘটে গেলো ঘটনাটা। টিলার মাথা থেকে বিরাট খারে বর্শাটা আকাশের দিকে তুলে ধরলো সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার। তার পরেই নীচের উতরাইতে লাফিয়ে পড়লো। তার পেছন পেছন অসংখ্য পাহাড়ী জোয়ান লাফ দিলো। হাতের থাবায় ঝকমকে বর্শা, মাথায় আউ পাখির পালকের মুকুট, কোমর থেকে জানু পর্যন্ত ডোরা-কাটা পী মুঙ কাপড়। পেশীপুষ্ট তামাটে দেহগুলো উতরাই বেয়ে বন্যার মত নেমে গেলো। তাদের সঙ্গে নামলো একটানা ভীষণ, ভয়ঙ্কর গর্জন, "হো-য়া-য়া-আ-আ-আ, হো-য়া-য়া-আ-আ-আ—"

ঘটনাটা এত দ্রুত এবং আকস্মিকভাবে ঘটলো যে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী হতবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। এমন কি বসওয়েলের অট্টহাসিও থেমে গেলো।

কয়েক মুহূর্ত নিশ্চেষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকার পর ম্যাকেঞ্জী ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লো, "কুইক মিস্টার বসওয়েল, ওদের মধ্যে খুনখারাপী বাধলে আমাদের উদ্দেশ্য বানচাল হয়ে যাবে। তাড়াতাড়ি চলুন।"

পেছন দিকে তাকিয়ে বসওয়েল হুঙ্কার ছাড়লো, "ট্রুপস, কুইক মার্চ ডাউন দা হিল।" সঙ্গে সঙ্গে হাত বাড়িয়ে দিকনির্দেশ করলো, "কুইক—"

টিলার ওপর থেকে প্রথমে লাফ দিলো বসওয়েল। তার সঙ্গে সঙ্গে ম্যাকেঞ্জী, মণিপুরী-বিহারী-আসামী পুলিসের ঝাঁক এবং ইউরোপীয় সার্জেন্টের দল। ভয়ঙ্কর কিছু একটা ঘটে যাবার আগেই তাদের জোহেরি কেসুঙে পৌঁছতে হবে। যেমন করেই হোক।

জোহেরি কেসুঙের সামনে পাটকিলে রঙের বিরাট টিলাটার নীচে এসে থমকে দাঁড়ালো সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দার; তার পেছনে নানকোয়া গ্রামের রাঙসুঙ, তার ছেলে মেজিচিজুঙ এবং মেহেলীর বাপ সাঞ্চামখাবা। আর সবার পেছনে দুই গ্রামের পাহাড়ী জোয়ানেরা।

দূর থেকে বুড়ী বেঙসানুরা সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দারদের ছুটে আসতে দেখেছিলো। মুহূর্তের মধ্যে মেয়েবউরা ঘরের দেওয়াল থেকে তীর-ধনুক-কুড়াল

এবং বাঁকা খারে বর্শা নিয়ে সেঙাই আর ওঙলের পাশে এসে দাঁড়ালো। আদিম মানুষ এবং আদিম মানুষী। সকলের হাতে মৃত্যুমুখ অস্ত্রশস্ত্রগুলি ঝকমক করছে। এমন সব ভয়ঙ্কর মুহূর্তে অর্ধনগ্ন পাহাড়ী মেয়েরা পুরুষের পাশে অন্তরঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। হত্যা এবং মৃত্যু সমান অংশে বাঁটোয়ারা করে নেয়।

টিলার ভাঁজে একটা ক্রুদ্ধ হিংস্রতা ফুঁসছে। গর্জে চলেছে একটানা।

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

দীর্ঘ বাঁকানো খারে বর্শার ফলা। আকাশের দিকে বর্শাটাকে বাগিয়ে সেঙাই চিৎকার করে উঠলো, "শয়তানের বাচ্চারা, খবদ্দার। না বলে বস্তিতে ঢুকেছিস! ওপরে উঠলে সাবাড় করে ফেলবো। জানের মায়া থাকলে ভেগে পড়।"

ঝাঁকড়া মাথা ঝাঁকিয়ে সালুয়ালাঙের সর্দার গর্জে উঠলো, "ভাগবো! তোর ভয়ে ভাগবো না কি রে রামখোর ছা। সেবার টিজু নদী থেকে তোর ঠাকুরদার মাথা কেটে নিয়ে গিয়েছিলাম। এবার তোদের ঘর থেকেই বর্শার মাথায় তোর মুণ্ডুটা গেঁথে নিয়ে যাবো।"

সেঙাইর ঠিক পাশেই মস্ত বড় একটা কুড়াল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে মেহেলী। চোখের পাতা কোঁচকানো, তারা দুটো জলন্ত। স্তনে চুলে উরুতে সুডৌল গলায় সাঙসু ঋতুর রোদ চিকমিক করছে। মেহেলী তীক্ষ্ণ টানা গলায় বললো, "ভেগে পড় সর্দার। নইলে ঘাড়ের ওপর তোর মাথা থাকবে না। যা, ভাগ।"

সালুয়ালাঙের সর্দারের পাশ থেকে সাঞ্চামখাবা খেঁকিয়ে উঠলো, "এই মেহেলী, এই মাগী, টেফঙের বাচ্চা; শিগগির নেমে আয়। সেই নগদা সু মাসে নানকোয়া বস্তীর রাঙসুঙের কাছ থেকে বউপণ নিয়েছি। আর তুই কিনা এই বস্তিতে এসে সেঙাই শয়তানটার সঙ্গে পিরীত জমিয়েছিস! শিগগির আয়। বস্তিতে নিয়ে দু ঠ্যাঙ ধরে ফেঁড়ে ফেলবো, গায়ের ছাল উপড়ে নেবো। তারপর তেলেঙ্গা সু মাসে মেজিচিজুঙের সঙ্গে বিয়ে দেবো।"

তীব্র ধারাল গলায় মেহেলী চিৎকার করে উঠলো, "মেজিচিজুঙের সঙ্গে আমার বিয়ে দিবি! কক্ষণো না। তেলেঙ্গা সু মাসে সেঙাইর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তুই ওদের নিয়ে বস্তিতে ফিরে যা বাপ; নইলে খুনোখুনি হবে।"

"টেমে নুটুঙ! খুনোখুনি হবে! খুনোখুনিতে কি সাঞ্চামখাবা ভয় পায়! আমার বুকে পাহাড়ী রক্ত নেই! কলিজায় তাগদ নেই? হু-হু—" ক্রুর চোখে তাকালো সাঞ্চামখাবা। বললো, "তোদের দুটোকেই আজ ফুঁড়ে নিয়ে যাবো।" বলতে বলতে খাড়া পাহাড়ী টিলার গা বেয়ে বেয়ে ওপর দিকে উঠতে লাগলো সাঞ্চামখাবা।

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

"হো-য়া য়া-য়া-আ-আ—"

জোয়ানদের গলা থেকে উত্তেজিত ভয়ানক শব্দটা পাক খেয়ে খেয়ে আকাশের দিকে ছড়িয়ে পড়তে থাকে।

সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার বললো, "এই শয়তানের বাচ্চা সেঙাই, একদিন তোর ঠাকুর্দার রক্ত দিয়ে আমাদের মোরাঙের দেওয়াল চিত্তির করেছিলাম. আজ তোর রক্ত দিয়ে—"

সর্দারের কথা শেষ হবার আগেই ব্যাপারটা ঘটলো। মস্ত বড় এক খণ্ড পাথর তুলে নিলো বুড়ী বেঙসানু। মাংসহীন লিকলিকে হাতে দেহের সবটুকু শক্তি একত্র করে ছুঁড়ে মারলো। নির্ভুল লক্ষ্য। পাথরের খণ্ডটা সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দারের মাথায় গিয়ে পড়লো। চড়াৎ করে একটা শব্দ হলো খুলি ফেটে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটলো। আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করে উঠলো সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার, "আ উ-উ-উ-উ—মেরে ফেললো আমাকে। শয়তানের বাচ্চাটা আমাকে খতম করলো। ওদের ফুঁড়ে ফেল, সাবাড় কর।" টিলার গা বেয়ে গড়াতে গড়াতে নীচে গিয়ে পড়লো সালুয়ালাঙের সর্দার।

হামাগুড়ি দিয়ে অনেকটা উঠে এসেছিলো সাঞ্চামখাবা। হঠাৎ থমকে গেলো। আর জোহেরি কেসুঙের উঠোনে দাঁড়িয়ে ভাঙা কর্কশ গলায় একটানা অশ্রাব্য গালাগালিতে দুপুরটাকে ভরিয়ে তুললো বুড়ী বেঙসানু। সমানে গজগজ করতে লাগলো, "আমার সোয়ামীর মুণ্ডু নিয়েছিলি। তার শোধ তুললাম। এগিয়ে আয়, আরো ক-টাকে সাবাড় করি।"

সর্দারকে পাথরের ঘা খেয়ে নীচে পড়তে দেখে জোয়ান ছেলেরা বেশ দমে গিয়েছিলো; উঠতে উঠতে থেমে গিয়েছিলো। হতভম্ব ভাবটা কেটে যাবার পর সকলে সমস্বরে শোরগোল করে উঠলো, "হো-য়া য়া-য়া-আ-আ, হো-য়া য়া-য়া-আ-আ—"

এবড়োখেবড়ো, রুক্ষ টিলাটা বেয়ে বেয়ে আবার সকলে জোহেরি বংশের বাড়িটার দিকে উঠতে লাগলো।

সেঙাই চেঁচিয়ে উঠলো, "খুব হুঁশিয়ার শয়তানেরা। আর এগুস নি। মায়ের ছানা মায়ের কাছে ফিরে যা। যারা বিয়ে করেছিস, বউর কাছে ভাগ। নইলে রেহাই দেবো না কারুকে।"

"আমাদের সর্দ্দারকে মেরেছিস। বিশটা মাথা নিয়ে শোধ তুলবো।" নীচ থেকে সাঞ্চামথাবা গর্জে উঠলো, "মেহেলীকে এতদিন বস্তিতে আটকে পিরীত করেছিস ; সেই জন্যে তোর মাথাটা নেবো সবার আগে।"

রাঙসুঙের ছেলে মেজিচিজুঙ হামাগুড়ি দিয়ে দ্রুত এগুতে শুরু করলো। টিলাটার মাথায় জোহেরি কেসুঙের পাথুরে উঠোনে মেহেলী নামে এক রমণীয় পাহাড়ী যৌবন দাঁড়িয়ে রয়েছে। তার উজ্জ্বল তামাভ দেহে, সুঠাম চিকণ মাজায়, নিভাঁজ উরুতে, মসৃণ চামড়ায়, নিটোল গলায় অফুরন্ত স্বাস্থ্য এবং যৌবন-বিস্ফুরিত হয়ে রয়েছে। এর আগে কোনদিনই মেহেলীকে দেখে নি মেজিচিজুঙ। তার বাপ রাঙসুঙ মেহেলীর সঙ্গে তার বিয়ের বউপণ দিয়ে এসেছিলো। মেহেলীকে দেখতে দেখতে মেজিচিজুঙের চাপা কুতকুতে চোখ-জোড়া বিহ্বল, বিস্মিত হয়ে গেলো। মনে মনে সে স্থির করে ফেললো। যেমন করে হোক, যত রক্তপাতেই হোক, মেহেলীকে তার চাই। রক্তের কণাগুলো ঝনঝন করে বাজতে লাগলো। নিশ্বাস ঘন হলো। কামনাতুর নিষ্পলক চোখে মেহেলীর দিকে তাকিয়ে পিঠ বেঁকিয়ে আরো দ্রুত টিলা বাইতে লাগলো মেজিচিজুঙ।

সেঙাই এবং ওঙলের বর্শা তাক ঠিক করার জন্য মাথার ওপর উঠে গিয়েছিলো। কিছু একটা ঘটে যেতো। রুক্ষ টিলার গা বেয়ে তাজা টকটকে রক্তের ঢল নামতো। কিন্তু তার আগেই বসওয়েল ও ম্যাকেঞ্জী দলবল নিয়ে এসে পড়লো।

চমকে উঠলো ম্যাকেঞ্জী। কোহিমায় এত মার খেয়েও সেঙাই মরে নি। নিমেষে চমকটা ঝেড়ে ফেলে সে চেঁচিয়ে উঠলো, "এই সেঙাই, থামো থামো, বর্শা ছুঁড়ো না--"

টিলার গায়ে জোয়ান ছেলেরা আবার থমকে পড়লো।

সেঙাই হুমকে উঠলো, "বর্শা ছুঁড়বো না। সবার আগে তোকে খুন করবো শয়তানের বাচ্চা। আয়, এদিকে আয় একবার। কেলুরি বস্তিতে সর্দ্দারী ফলাতে এসেছিস! ওই সব এখানে চলবে না।"

বিন্দুমাত্র বিচলিত হলো না ম্যাকেঞ্জী। ঠোঁটে আটক হাসিটা আরও দ্রুত আকর্ণ হলো। সস্নেহ গলায় বললো, "আমি বুড়ো মানুষ, টিলা বেয়ে উঠতে পারবো না। তুমিই নেমে এসো। অনেক কথা আছে। অনেক কাপড়-টাকা এনেছি তোমাকে দেবো বলে।"

সেঙাই সমানে চেঁচাতে লাগলো, "তুই একটা আস্ত টেফঙের বাচ্চা। টাকা চাই না, তোর কাপড়ে মুতে দি। ওপরে আয়, তোকে ফুঁড়ি। কোহিমায় মেরেছিলি; তার বদলা নেবো না? তোকে আজ ফুঁড়বোই।"

মনে মনে শঙ্কিত হলো ম্যাকেঞ্জী। এই পাহাড়ী মানুষগুলোকে বিশ্বাস নেই। গোঁ যখন ধরেছে, তখন সেঙাই যে খুব নিরীহ ধরনের কিছু করবে, এমন ভরসা হচ্ছে না। বুকটা ধক করে উঠলো; চোখের কোণটা সামান্য কোঁচকালো। কিন্তু হাসিটা তেমনই আকর্ণ রয়ে গেলো। চড়া অথচ মোলায়েম গলায় বললো, "আমি কি তোমাদের মেরেছি? আসান্যুরা (সমতলের বাসিন্দা) তো মেরেছে।"

"ইজা হুবুতা!" দাঁত খিঁচিয়ে চেঁচালো সেঙাই, "রানী আমাদের বলেছে, তোরা সায়েব শয়তানেরা বলিস বলেই আসান্যুরা আমাদের মারে। আয় টেফঙের বাচ্চা, তোর মুণ্ডু নিয়ে আজ মোরাঙের সামনে গেঁথে রাখবো।"

একটু একটু করে ম্যাকেঞ্জীর মুখ থেকে হাসি মুছে গেলো। কপালে মাকড়সার জালের মত অসংখ্য জটিল রেখা ফুটে বেরিয়েছে। অনেক, অনেক কাল আগে ব্রেটনব্রুকশায়ারের এক সাঙ্ঘাতিক আউট ল'র ছায়া এসে পড়েছে দুটো কটা চোখের মণিতে। সারপ্লিসের কোন কোটরে অদৃশ্য হয়েছে বাদামী রঙের জপমালাটা। আশ্চর্য শান্ত এবং নিস্পৃহ স্বরে ম্যাকেঞ্জী বলতে লাগলো, "দেখছো তো সেঙাই, তোমাদের গ্রামে আসান্যুরা (সমতলের বাসিন্দা) পুলিসরা কেমন আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। বর্শা-তীর-ধনুক দিয়ে তোমরা আমাদের রুখতে গিয়েছিলে। পুলিসদের বন্দুকের গুলিতে গোটা কয়েক সাবাড় হতে বাকী সকলে জঙ্গলে পালালো। বুঝতেই পারছো, বর্শা-কুড়াল দিয়ে বন্দুকের সঙ্গে তোমরা লড়তে পারবে না। ভালোয় ভালোয় বলছি, গাইডিলিওকে বের করে দাও। নইলে আসান্যুরা তোমাদের—"একটা ভয়ানক ইঙ্গিত দিয়ে সেঙাইর দিকে তাকালো বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী।

সেঙাই বললো, "রানী চলে গিয়েছে বস্তি থেকে।"

"কোথায় গেছে?"

"তা আমরা জানি না।"

"তোমাদের কতবার বলেছি, ঐ গাইডিলিওটার সঙ্গে মিশবে না; ওকে বস্তিতে ঢুকতে দেবে না। গাইডিলিও হলো ডাইনী; রক্ত চুষে সবাইকে সাবাড় করবে।"

ভীষণ উত্তেজিত গলায় চেঁচিয়ে উঠলো সেঙাই, "মিছে কথা, মিছে কথা। গাইডিলিও হলো রানী। তোরা, তোরা ডাইনী। কোহিমায় যখন গিয়েছিলাম, তোরা আমাকে মেরেছিলি। হুই রানী আমাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। গাইডিলিওকে ডাইনী বললি, এখুনি তোকে সাবাড় করবো।"

অত্যন্ত আচমকা, মুহূর্তের মধ্যে ঘটে গেলো ঘটনাটা। সেঙাইর থাবা থেকে বর্শাটা সাঁ করে ছুটে গেলো। অব্যর্থ লক্ষ্য। বাঁকা খারে বর্শার ফলা ম্যাকেঞ্জীর কণ্ঠায় গেঁথে গেলো।

"ওহ্ ক্রাইস্ট, মারডার মারডার। মিস্টার বসওয়েল সেভ মি, সেভ মি। ওহ্-হ্-হ্—" প্রাণফাটা আর্তনাদ করে উঠলো ম্যাকেঞ্জী। ফিনকি দিয়ে তাজা রক্তের ফোয়ারা সাদা সারপ্লিসটাকে লাল করে দিলো।

প্রথমে বিচলিত এবং হতভম্ব হয়ে গিয়েছিলো বসওয়েল। জীবনে অনেক কিছু দেখেছে, মহাযুদ্ধের ধ্বংস এবং নির্বিচার হত্যা তার চোখের ওপরেই ঘটেছে। কোন দিনই সামান্য রক্তপাতে সে অধীর হয়ে পড়ে না। স্নায়ুমণ্ডলীর জোর তার অসাধারণ। কিন্তু এমন একটা ঘটনা তার জীবনে যতটা অভিনব, তার চেয়ে অনেক বেশি আকস্মিক এবং উন্মাদকর। মস্তিষ্কের সমস্ত বুদ্ধি এবং বিনাশকামী মনের অন্যান্য অপুষ্ট অনুভূতিগুলি দিয়ে কিছুতেই বসওয়েল বুঝে উঠতে পারছে না, কেমন করে একটা পাহাড়ী জোয়ান বন্দুক এবং রিভলভার সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করে বর্শা ছুঁড়তে পারে। এ যেন তাকেই, তার মারাত্মক জবরদস্ত অস্তিত্বকে অস্বীকার করা। সূক্ষ্ম এবং সাজ্ঘাতিক এক খোঁচা লেগেছে বসওয়েলের দম্ভের বোধে।

ঢালু উতরাই। ধারাল, রুক্ষ পাথর। সেখানে লুটিয়ে পড়েছে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। বিরাট, মেদস্ফীত দেহটা থরথর করে কাঁপছে। ম্যাকেঞ্জীর তাজা মিশনারী রক্ত এই কেলুরি গ্রামের, এই অ্যাডোলেট্রির পাহাড়ী জগৎকে স্নান করাচ্ছে। আর এক ক্রাইস্ট! এতক্ষণ আকাশ ফাটিয়ে আর্তনাদ করছিলো ম্যাকেঞ্জী। এবার গলাটা ক্ষীণ হয়ে আসছে। গোঁ-গোঁ শব্দে গোঙাচ্ছে, থেমে থেমে অনেকক্ষণ পর পর বলছে, "মিস্টার বসওয়েল,

মারডার মারডার। আমাকে মেরে ফেললে। ওহ্ ক্রাইস্ট, আমি আর বাঁচবো না।"

টিলার গায়ে নানকোয়া এবং সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ান ছেলেরা এবং তাদের পেছনে আসামী-বিহারী-মণিপুরী পুলিসের ঝাঁক নিশ্চল, স্তব্ধ হয়ে রয়েছে। ওত পেতে সুযোগের অপেক্ষা করছে।

বসওয়েলের সুকুমার বৃত্তিহীন মনে এই মুহূর্তে কেমন করে যেন অদ্ভুত এক উপমার জন্ম হলো। এই গ্রামের প্রতিটি বাড়িই এক-একটা দুর্গ। ওপরের ঐ বাড়িটা আদিম মানুষের শেষ দুর্গ। দুটো পাহাড়ী জোয়ান এবং অসংখ্য অর্ধনগ্ন মেয়েমানুষ বর্শা-কুড়াল-তীর-ধনুক বাগিয়ে দুর্গটাকে পাহারা দিচ্ছে। আর তারা, সভ্য জগতের মানুষ, আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত, আদিম বর্বরদের শেষ দুর্গ দখল করতে এসেছে। সভ্য জগতের সঙ্গে আদিম জগতের লড়াই। মনে মনে নিজের রসবোধে মুগ্ধ হয়ে গেলো বসওয়েল। একটু হাসলো। মোহিত হয়ে হাসলেও তাকে কী ভয়ঙ্করই না দেখায়।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। তার পরেই রক্তে রক্তে গ্রেট ওয়র বেজে উঠলো যেন। চোখের সামনে দিয়ে হুস্ হুস্ করে মিছিলের মত সরে সরে যেতে লাগলো হত্যা, রক্ত, আর্তনাদ, ফ্লাইং ফাইটার আর অ্যান্টি এয়ারক্রাফ্‌টের গর্জন; এবং অসংখ্য ওয়রফ্রন্ট।

হ্যাঁ, ওয়র ফ্রন্টই বটে। ঐ ওপরের বাড়িটা এই গ্রামের লাস্ট ফ্রন্টিয়ার। লাস্ট সিটাডেল। চোখের কপিশ মণিদুটো ধক্‌ধক্ করে জ্বলে উঠলো বসওয়েলের। এই নাগাপাহাড়ে এমন একটা ওয়রফ্রন্ট তারই জন্য অপেক্ষা করছিলো, আগেভাগে কি তা জানতো বসওয়েল? প্রচণ্ড শব্দ করে বসওয়েল চেঁচালো, "ফায়ার—"

সঙ্গে সঙ্গে রাইফেলের মুখগুলি থেকে নীলচে আগুনের সঙ্গে গুলি এবং গর্জন ছুটলো, "বুম্-ম্-ম্, বু-ম্-ম্-ম্—"

জোহেরি কেসুঙের চত্বরে গোটা কয়েক নারীদেহ লুটিয়ে পড়লো। তীক্ষ্ণ মরণ-কাতর গলায় ককিয়ে উঠলো, "আ-উ-উ-উ, আ-উ-উ-উ, আ-উ-উ-উ—"

একটা গুলি সেঙাইর কব্জি ফুঁড়ে বেরিয়ে গিয়েছিলো। ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটছে। হাত থেকে বর্শাটা খসে পড়েছে। কপালের দু পাশে সমস্ত রগগুলো একসঙ্গে নাচছে। কিছুই দেখতে পাচ্ছে না সেঙাই; সব আবছা ঝাপসা হয়ে আসছে। টলতে টলতে পড়ে গেলো। পাশেই দাঁড়িয়ে

ছিলো মেহেলী, সে-ও পাশে বসে পড়েছে। চোখ দুটো তার জ্বলছে। হাউ হাউ করে চেঁচাতে চেঁচাতে, কাঁদতে কাঁদতে সে বলছে, "তোকে ওরা মারলো সেঙাই, তোকে ওরা ফুঁড়ে ফেললো।" উরুর ওপর সেঙাইর মাথাটা তুলে নিলো মেহেলী।

টিলার গায়ে একটা ভীষণতা দাপাদাপি করছে। একটা অট্টহাসি আছাড়ি-পিছাড়ি খাচ্ছে। বসওয়েল চিৎকার করছে, "গ্রেট ওয়র-ফেরত লোক আমি। হিলি প্যাগানদের লাস্ট ফোর্টরেস আমার দখলে। আই হ্যাভ কঙ্কারড, আই অ্যাম ডিক্লেয়ার্ড ভিক্টর। হাঃ-হাঃ-হাঃ—স্পীয়ার দিয়ে বন্দুকের সঙ্গে লড়াই করতে এসেছে শয়তানগুলো!"

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

নানকোয়া এবং সালুয়ালাঙের জোয়ানগুলো এতক্ষণ টিলার গায়ে ওত পেতে ছিলো। এবার সমস্ত কেলুরি গ্রাম এবং চারপাশের বনভূমিকে চমকে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো। তারপর দ্রুত চড়াই বেয়ে ওপরের দিকে উঠতে লাগলো।

তাজা পাহাড়ী রক্তে জোহেরি কেসুঙের চত্বরটা ভিজে গিয়েছে। রক্তের মধ্যে নারীদেহগুলি থরথর করে কাঁপছে। কেলুরি গ্রামের অন্যান্য মেয়েরা বর্শা হাতে সন্ত্রস্ত ভঙ্গিতে চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে।

সকলের আগে আগে ছুটে এলো বসওয়েল। কেলুরি গ্রামের লাস্ট ওয়রফ্রণ্টে তার পা পড়লো।

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

টিলার গা বেয়ে বেয়ে একটা উন্মাদ ঝড় উঠে আসছে।

জোহেরি কেসুঙের মধ্য থেকে ছুটে বেরিয়ে এলো বুড়ী বেঙসানু। সাপের জিভের মত লিকলিকে পিঙ্গল রঙের চুল উড়ছে। ভুরুতে লোম নেই। ঘোলাটে ছানিপড়া চোখে ঘোলাটে তারাদুটো ধক্‌ধক্ করছে। উলঙ্গ শুকনো দেহ; হাড়গুলো উৎকটভাবে চামড়া ফুঁড়ে বেরিয়েছে। বুকের দুপাশে একজোড়া নীরস স্তন ঝুলছে। পাটকিলে রঙের মাড়ি দেখা যাচ্ছে। নোংরা ক্ষয়া দাঁতের পাটি ফাঁক হয়ে রয়েছে। গালের পাশ দিয়ে জিভ বেরিয়ে পড়েছে। উত্তেজনায় শুকনো বুকটা ফুলছে ফুঁসছে, উঠছে নামছে। হাতের

মুঠিতে মস্ত এক কুড়াল। রাগে আক্রোশে দাঁতগুলো আপনা থেকেই ঘষে ঘষে শব্দ হচ্ছে। বুড়ী বেঙসানু সামনের দিকে আরো অনেকটা এগিয়ে এলো। ভয়ানক, তীক্ষ্ণ ভাঙা গলায় গর্জে উঠলো, "ইজা হুবুতা! রামখোর বাচ্চারা, আমাদের বস্তির এতগুলো মানুষকে ফুঁড়লি। আমার নাতি হুই সেঙাইকে ফুঁড়লি। আজ তোদের সব ক-টার ঘাড় থেকে মুণ্ডু খসাবো। হু-হু, আমার ছেলে সিজিটো শয়তানটা ছিলো সায়েবচাটা। ওটা বলতো, সায়েবদের গায়ের রঙ হুন্টসিঙ পাখির পালকের মত সাদা। নির্ঘাত তোরা সেই সায়েব। এই কেলুরি বস্তি থেকে তোদের আর জান নিয়ে ফিরতে হবে না।" দম নেবার জন্য একটু থামলো বেঙসানু। তারপর আবার চিৎকার শুরু করলো, "আহে ভু টেলো! মর মর। সালুয়ালাঙ বস্তির শয়তানগুলো এসেছিস। তোরা আমার সোয়ামীর জান নিয়েছিলি। তোদেরও রেহাই দেবো না। আপোটিয়া।"

একটা অপঘাত ছুটে আসছে। টিলা বেয়ে উঠে আসতে আসতে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো বসওয়েল। চওড়া, বিশাল বুকটার মধ্যে হৃৎপিণ্ড তুরু-তুরু করে উঠলো। বেশ বোঝা যাচ্ছে, ধমনীর ওপর এক ঝলক রক্ত উছলে পড়লো। গলাটা কেঁপে গেলো বসওয়েলের, "উইচ, স্যুয়োরলি এ উইচ। ওহ্, ক্রাইস্ট! হাউ হরিবল্! হাউ ডেঞ্জারাস!"

বুড়ী বেঙসানু নামে পাহাড়ী বিভীষিকাটা ছুটতে ছুটতে টিলার শেষ মাথায় এসে পড়লো। একটানা চেঁচাতে চেঁচাতে বললো, "আমি এখনও বেঁচে রয়েছি। আমি বেঁচে থাকতে জোহেরি বংশের ইজ্জত তোরা নষ্ট করবি! আয়, বেজন্মা না হলে এগিয়ে আয়। আজ তোদের একটাকেও ফিরতে দেবো না। আমরা জানে খতম হয়ে গেলেও বস্তির ইজ্জতে হাত দিতে দেবো না। আয় সায়েব শয়তানেরা। আমার ছেলে হুই সিজিটোটাকে কোহিমায় নিয়ে তোরা মাথা খেয়েছিস। সে আর আমার কাছে আসেই না। আমার নাতি হুই সেঙাইটাকে তোরা ফুঁড়লি! আয় সালুয়ালাঙের কুত্তারা। তোরা আমাদের তিনপুরুষের শত্তুর। তোদেরও সাবাড় করবো। টেমে নটুঙ!"

নিস্পন্দ হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে পুলিশ সুপার বসওয়েল। তার পেছনে থমকে রয়েছে নানকোয়া এবং সালুয়ালাঙ গ্রামের অসংখ্য জোয়ান।

বসওয়েল ভাবছিলো, পাহাড়ী ইজ্জত, গ্রাম-সমাজ এবং নারীর মর্যাদাবোধ

এখানে কী উগ্র! কী সাঙ্ঘাতিক! টিলার মাথায় একটি শুকনো নীরস নারীদেহে সেই ইজ্জত এবং মর্যাদাবোধ দাবাগ্নির মত জ্বলছে।

ওপাশ থেকে সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার চিৎকার করে উঠলো, "ডাইনী ডাইনী, নির্ঘাত ডাইনী। সায়েব, ওকে ফুঁড়ে ফেল, মেরে ফেল। নইলে ও সবাইকে সাবাড় করে ফেলবে।"

পাহাড়ীদের ভাষা ঠিকমত বোঝে না বসওয়েল। কিন্তু সালুয়ালাঙের সর্দারের চিৎকারে নিষ্ক্রিয় ভাবটা নিমেষের মধ্যে ঘুচে গেলো। বুড়ী বেঙসানু সাঁ-সাঁ করে ছুটে আসছে। কর্তব্য স্থির করে ফেললো বসওয়েল। কেলুরি গ্রামের লাস্ট ওয়রফ্রন্ট তার দখল করতেই হবে। শিরায় শিরায় রক্তের কণিকাগুলি আগ্নেয় ধাতুস্রোতের মত ছুটতে ছুটতে ধমনীতে ঘা দিতে লাগলো। কোমর থেকে রিভলভারটা টেনে বাগিয়ে ধরলো বসওয়েল। ট্রিগারের ওপর মোটা রোমশ তর্জনীটা চেপে বসলো। পুরু পুরু ঠোঁট দুটো মুখে হিংস্র ভঙ্গি ফুটিয়ে বেঁকে গেলো।

আরো, আরো অনেকটা এগিয়ে এসেছে বুড়ী বেঙসানু।

"উইচ, স্টপ!" বসওয়েল গর্জে উঠলো। গর্জনের রেশটা বাতাসে কাঁপতে কাঁপতে ছড়িয়ে পড়লো। তারপরেই রিভলভারের নলের মুখ দিয়ে খানিকটা নীল আগুন ছুটে গেলো, "বুম্-ম্-ম্-ম্—"

বেঙসানুর দুটো জীর্ণ স্তনের নাচে এবং বুকে চোখা চোখা হাড় প্রকট হয়ে রয়েছে। হাড় এবং চামড়ার খাঁচার মধ্যে ছোট্ট হৃৎপিণ্ডটা ধুকধুক করে বাজছে। সেই হৃৎপিণ্ডটা ফুঁড়ে রিভলভারের নীল আগুনটা ছুটে গেলো।

"আ-উ-উ-উ—" আর্তনাদ করে টিলার ওপর লুটিয়ে পড়লো বুড়ী বেঙসানু।

"হাঃ-হাঃ-হাঃ—" ভয়াল অট্টহাসি বাজলো বসওয়েলের গলায়, "এনি কারদার রেজিস্টান্স, ওয়াইল্ড বীস্টস্—হাঃ-হাঃ-হাঃ—"

"ঠাকুমা, ঠাকুমা—" কাতর গলায় বার দুই গুঙিয়ে উঠলো সেঙাই। শরীর এবং মন থেকে চৈতন্য লোপ পেয়ে যাচ্ছে। চোখ দুটো আপনা থেকেই বুঁজে বুঁজে আসছে। মেহেলীর উরুতে ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইলো সেঙাই। অসহ্য যন্ত্রণায় শিরা-স্নায়ু-হাড়-মাংস সব যেন ছিঁড়ে ছিঁড়ে ছিটকে পড়বে মনে হয়। কবজির হাড়টা চুরমার হয়ে গিয়েছে। ফিসফিস, আবছা গলায় সেঙাই ডাকলো, "মেহেলী—"

"কী বলছিস সেঙাই ?" ত্রস্তে মুখটা নীচের দিকে ঝুঁকিয়ে মেহেলী বললো।

"আমার বর্শাটা একবার দে তো।"

"কেন ?"

"শয়তানদের ফুঁড়বো।"

"তুই পারবি না সেঙাই। আমার কোলে চুপ করে শুয়ে থাক। দেখছিস না, কত রক্ত পড়েছে তোর ?"

"পারবো, খুব পারবো।" গোঙাতে গোঙাতে নির্জীব হয়ে পড়লো সেঙাই। আর কথা বললো না, বলতে পারলো না।

চোখের পাতাদুটো দু খণ্ড পাথরের মত ভারী হয়ে গিয়েছে। কিছুতেই চোখ খুলে রাখতে পারছে না সেঙাই। উজ্জ্বল তামাটে মুখখানা ফ্যাকাসে নীরক্ত হয়ে গিয়েছে।

মেহেলী নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সেঙাইর দিকে। কেলুরি গ্রামের দুর্দান্ত জোয়ান তার উরু দুটোর মধ্যে এখন কী নিথর নিস্পন্দ এবং নির্জীব হয়ে পড়ে রয়েছে! তবে কি সেঙাই মরে গেলো? আশঙ্কায় বুকের মধ্যটা দুরু-দুরু করে উঠলো। সেঙাইর দু কাঁধ ধরে প্রবল ঝাঁকানি দিলো মেহেলী। সমস্ত দেহে যন্ত্রণা জ্বালা এবং আতঙ্কের ভঙ্গি ফুটিয়ে তীব্র, অতি তীক্ষ্ণ গলায় চেঁচিয়ে উঠলো, "সেঙাই, এই সেঙাই—"

কোন জবাব দিলো না সেঙাই।

মেহেলী আবার ডাকলো। স্বর চড়িয়ে, উত্তেজিত, আরো তীক্ষ্ণ করে সমানে চেঁচাতে লাগলো।

অনেকক্ষণ পর বেহুঁশ চেতনার মধ্য থেকে আবছা গলায় সেঙাই বললো, "কী ?"

"তুই খতম হয়ে গেলি ?"

"হু-হু—"

"সেঙাই, এই সেঙাই—"

আবার থেমে গিয়েছে সেঙাই। সাড়া পাওয়া যাচ্ছে না।

শিরায় শিরায় তীব্র বেগে রক্তের ধারা ছুটাছুটি করছে মেহেলীর। জখমী ময়ালীর মত তার চোখজোড়া জ্বলছে। হিংস্র বলিষ্ঠ বুনো জোয়ানী সে। আরণ্যক প্রকৃতির ক্রূরতা ভীষণতা এবং দুর্বার জীবনবেগের মধ্যে সে মানুষ

হয়েছে। হত্যা, প্রতিহিংসা, চরম আক্রোশ এবং বিনাশকামিতা—আদিম জীবনের স্থূল, অতি স্পষ্ট প্রবণতাগুলি উত্তরাধিকারসূত্রে ও নিজের জৈবিক প্রয়োজনের তাড়নায় যোগাড় করে নিয়েছে মেহেলী।

দুই উরুর মাঝখানে মাথা রেখে নিঃসাড় হয়ে পড়ে রয়েছে সেঙাই। সাহেবরা তাকে ফুঁড়েছে। তাজা ঘন রক্তে সমস্ত দেহটা মাখামাখি। সেঙাইর রক্ত তার উরুতে হাতে লেগে রয়েছে। মেহেলী কি জানতো, সেঙাই নামে শত্রুপক্ষের অনাত্মীয়, স্বল্পজানা জোয়ানটাকে কেউ ফুঁড়লে কি মারলে তার যন্ত্রণা হয়; ভয়ানক, সাঙ্ঘাতিক রাগ হয়! দু চোখ জ্বালা করতে থাকে!

পাতলা চামড়ার নীচে চাপবাঁধা মাংসপিণ্ড এবং শিরা-উপশিরায় কি একটা যেন সমানে ফুঁসছে। স্নায়ুতে স্নায়ুতে একটা শ্বাপদ যেন অবিরাম হুঙ্কার ছাড়ছে। আবার চেঁচিয়ে উঠলো মেহেলী, "তোকে ওরা মারলো সেঙাই! দুই শয়তানের বাচ্চারা ফুঁড়লো!"

দেহটা অল্প অল্প কাঁপছে। বড় বড় শ্বাস পড়ছে। চোখের পাতা দুটো সামান্য ফাঁক হয়েছে। নির্জীব, প্রায় শোনা-যায়-না, এমন অসাড় গলায় সেঙাই বললো, "হু-হু—"

"আমি দুই টেফঙের বাচ্চাদের সাবাড় করবো। তুই আমার পিরীতের জোয়ান। পনেরো দিন পর তেলেঙ্গা সু মাসে তোর সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। তুই আমার সোয়ামী হবি। আর তোকে ওরা ফুঁড়লো। একটাকেও আজ রেহাই দেবো না।" চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগলো মেহেলী। মাথার চুল খামচা মেরে ধরে টানতে লাগলো। আক্রোশে জ্বালায় ছটফট করছে মেহেলী। শরীরটা কাঁপছে, নড়ছে, ঝাঁকানি খেয়ে দুলে দুলে উঠছে। হাউ-হাউ কান্নাটা বিকট শব্দ করে বাতাসে বাতাসে ছড়িয়ে পড়ছে।

পাহাড়ী মানুষের শোক প্রকাশের রীতিই আলাদা। এরা হাউ-হাউ করে কাঁদে, চেঁচায়। সেই সঙ্গে শোকের কারণের বিপক্ষে অভিযোগ করে, আক্রোশ জানায় এবং প্রতিহিংসা নেবার চেষ্টা করে। শোকের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে বিমূঢ় বিহ্বল হয়ে প্রতিশোধপ্রবণ বন্য প্রকৃতির কথা ভোলে না।

একটু পর আবার ডাকলো মেহেলী, "ওরা সবাইকে মারলো। তোর ঠাকুমাকে মারলো। বস্তির ঘরে ঘরে আগুন ধরালো। তোকেও খতম করলো। কী হবে সেঙাই? আমাদের কি বিয়ে হবে না?"

চোখের পাতা দুটো বুঁজে আসছে আবার। তবু সব যন্ত্রণা ঝেড়েঝুড়ে

শরীরটাকে দুমড়ে বেঁকিয়ে উঠে বসতে চাইলো সেঙাই। পারলো না। কাঁধে ভর দিয়ে তাকে আবার শুইয়ে দিলো মেহেলী।

নির্জীব গলায় সেঙাই বললো, "নির্ঘাত তোর আমার বিয়ে হবে।"

হঠাৎ জোহেরি কেসুঙটাকে কাঁপিয়ে দিয়ে ভীত সন্ত্রস্ত গলায় চিৎকার করে উঠলো মেহেলী, "সেঙাই সেঙাই, দুই শয়তানের বাচ্চারা উঠে আসছে। সামনে একটা আনিজা। আমার বড্ড ভয় করছে।"

টিলা বেয়ে বেয়ে এতক্ষণে জোহেরি কেসুঙের কঠিন পাথুরে উঠোনে উঠে এসেছে পুলিস সুপার বসওয়েল। কী এক জটিল ব্যাভিচারের ব্যাধিতে নাকে পচন লেগেছিলো; একটি হাড় খেসারত দিয়ে নাকটাকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে। নিশ্বাস-প্রশ্বাসের জন্য দুটো বড় গর্ত হয়ে রয়েছে। বীভৎস মুখখানায় একটা বীভৎসতর হাসি ছুটে বেড়াচ্ছে। কেলুরি গ্রামের লাস্ট সিটাডেল, লাস্ট ফ্রন্টিয়ারে উদ্ধত ভঙ্গিতে পা ফেলে পকেট থেকে আইভরি পাইপ বের করে সুগন্ধি তামাক পুরতে লাগলো। তারপর লাইটার দিয়ে অগ্নিসংযোগ করলো বসওয়েল।

বসওয়েলের পেছন পেছন উঠে এসেছে মেহেলীর বাপ সাঞ্চামখাবা, রাঙসুঙ এবং মেজিচিজুঙ। আর এসেছে সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দার, অসংখ্য জোয়ান ছেলে ও পুলিস-সার্জেন্টের দল।

রক্তাক্ত নারীদেহগুলো চারদিকে ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। বুড়ী বেঙ-সানুর উলঙ্গ শরীরটা ধনুকের মত বেঁকে গিয়েছে। পাটকিলে রঙের পাথুরে ধুলো রক্তে ভিজে গিয়েছে।

ভয়ানক গলায় আবার হেসে উঠলো বসওয়েল, "ওয়ার ফ্রন্ট! এহ্, উই ইনভেড অ্যাণ্ড কঙ্কার। এহ্, হোয়াট এ জয়—হাঃ-হাঃ-হাঃ—" বসওয়েলের তামাটে চুলগুলো বুনো বাতাসে উড়ছে। বড় বড় দাঁতের ফাঁক দিয়ে জিভ বেরিয়ে পড়েছে। উল্লাসের আতিশয্য ঘটলে বসওয়েল ঘন ঘন ঠোঁট চাটে। মোটা তামাক-পোড়া ঠোঁটদুটো চেটে সে হুঙ্কার ছাড়লো, "আগুন লাগাও—"

এক ঝাঁক শিকারী কুকুরের মত জনকতক পুলিস জোহেরি বংশের বাড়িটার দিকে ছুটে গেলো। আতামারী পাতার চাল, চারপাশে অখণ্ড বাঁশের দেওয়াল, কাঠের পাটাতন শুকিয়ে আগুনের জন্য যেন উন্মুখ হয়ে রয়েছে। চক্ষের পলকে ঘরের চালে আগুন নেচে উঠলো। বাঁশের গাঁট-ফাটা ফটফট শব্দ হতে লাগলো।

মেহেলীর উরুর ওপর থেকে হাতের ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইলো সেঙাই। রাগ আক্রোশ রোষ—মনের আদিম বৃত্তিগুলো চৈতন্যের মধ্যে ফুঁসে ফুঁসে উঠছে। অশক্ত দুর্বল দেহ। রক্ত ঝরে ঝরে শরীরটা সাঙ্ঘাতিক কাহিল হয়ে পড়েছে। গোঙাতে গোঙাতে সেঙাই বললো, "আহে ভু টেলো! শয়তানেরা আমাদের ঘরটা পুড়িয়ে দিলো। আমাদের বংশের ইজ্জত সাবাড় করলো। ফুঁড়েই ফেলবো সব কটাকে।"

নিষ্পলক চোখে তাকিয়ে চুপচাপ বসে ছিলো মেহেলী। একেবারে হতভম্ব হয়ে গিয়েছে সে। হঠাৎ তার দৃষ্টিটা সামনের দিকে পড়লো। নানকোয়া ও সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ান ছেলেরা তার দিকে এগিয়ে আসছে। সবার আগে আগে আসছে তার বাপ সাঞ্চামখাবা। এমন কি বুড়ো সর্দার ফাটা মাথা নিয়ে উঠে পড়েছে; এখন টিলা বাইছে।

গলা ফাটিয়ে মেহেলী আর্তনাদ করে উঠলো, "সেঙাই, এই সেঙাই—"

"শয়তানেরা আমাকে কেড়ে নিতে আসছে।"

"বর্শাটা আমার বাঁ হাতে দে দেখি একবার।" ফিসফিস অবশ গলায় সেঙাই বললো, "তোর গায়ে একবার হাত দিক না!"

"ইজা হুবুতা!" সাঞ্চামখাবা খেঁকিয়ে উঠলো, "টেফঙের বাচ্চার পিরীত ছাখ। সেই কবে রাঙসুঙের কাছ থেকে পণের বর্শা বাগিয়েছি, আর ছুঁড়িটা এখানে এসে শত্তুরদের ছোঁড়াটার সঙ্গে কেমন পিরীত জমিয়ে বসেছে ছাখ।"

এতক্ষণে টিলার মাথায় উঠে এসে সাঞ্চামখাবার পাশে দাঁড়িয়েছে সালুয়ালাঙের বুড়ো সর্দার। বেঙসান্থর পাথরের বাড়ি লেগে মাথা ফেটে গিয়েছে। থকথকে রক্তের ধারা কপাল, খসখসে চোখের পাতা এবং শুকনো তোবড়ানো গালের ওপর জমাট বেঁধে রয়েছে।

সাঞ্চামখাবা বললো, "তুই একবার বল সদ্দার, মাগী আর মরদটাকে বর্শার ডগায় ফুঁড়ে বস্তিতে নিয়ে যাই।"

সাঞ্চামখাবার কথায় কান দিলো না সর্দার। বিকট মুখভঙ্গি করে সমানে চেঁচাতে লাগলো, "শয়তানীটার জন্যে সকলে আমাদের ঘায়েল করছে। মাগী কেলুরি বস্তিতে ভেগে এসেছে; যেই এ খবর চাউড় হয়েছে, অমনি অঙ্গামীরা ধান বদল করছে না, কোনিয়াকরা হাঁড়ি-শাবল-কোদাল দিচ্ছে না। মাগীর জন্যে আমাদের অত নামকরা বস্তির ইজ্জত আর রইল না। আহে থুঙকু সালো!"

একটু থেমে, ঘড়ঘড়ে গলায় কেসে সর্দার গলাটা আরো চড়ালো, "বস্তিতে নিয়ে মাগী তোর ছাল উপড়ে নেবো। শত্তুরদের বস্তিতে তোকে মারবো না, আনিজা গোঁসা হবে।"

পাখির পালকের মুকুটটা ঝাঁকাতে ঝাঁকাতে সাঙ্গামখাবা বললো, "উঠে আয় মেহেলী, উঠে আয়।"

"না না, আমি যাবো না।"

"যাবি না!" খেঁকিয়ে উঠে রক্তচোখে তাকালো সাঙ্গামখাবা।

"না না।" উৎকট গলায় চিৎকার করতে লাগলো মেহেলী। মাথার সঙ্গে সমস্ত শরীরটা নাড়াতে লাগলো, "না না, যাবো না। সেঙাইকে ছেড়ে কিছুতেই যাবো না।"

"যাবি না! কেন যাবি না?" ধন্দভরা চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বিশাল থাবে বর্শার ফলাটা আকাশের দিকে বাগিয়ে আরো সামনে এগিয়ে এলো সাঙ্গামখাবা। বুনো মোষের মত ফোঁস্-ফোঁস্ করতে করতে বললো, "বেশি ফ্যাকর-ফ্যাকর করবি না মাগী। তা হলে একেবারে ফুঁড়ে ফেলবো। সিধে কথায় না উঠে এলে বর্শায় গেঁথে টানতে টানতে বস্তিতে নিয়ে যাবো। শয়তানী, তোর জন্যে বংশের ইজ্জত, আমাদের বস্তির ইজ্জত রইল না। অঙ্গামীরা, কোনিয়াকরা, চারপাশের বস্তির লোকেরা আমাদের দেখলেই গায়ে থুথু দিচ্ছে। উঠে আয়, উঠে আয় শিগগির।"

"টেমে নটুঙ! আমি তো বললাম, যাবো না। আর পনেরো দিন পর তেলেঙ্গা সু মাসে আমার বিয়ে হবে। সেঙাই আমার সোয়ামী হবে। সেঙাইকে ছেড়ে যাবো না। তুই চলে যা বাপ, নইলে সেঙাই তোকে সাবাড় করে ফেলবে।" বলতে বলতে সেঙাইর মুখের দিকে তাকালো মেহেলী। সেঙাইর উজ্জ্বল তামাটে মুখখানা, স্বাস্থ্যপুষ্ট পেশল দেহটা এখন বড়ই কাহিল দেখাচ্ছে।

এই পাহাড়ী পৃথিবীর ক্রোধ বড় ভয়ঙ্কর এবং সর্বনাশা। তার প্রকাশও আকস্মিক। কখন কোন কথায়, কোন ঘটনায় এই বন্য আদিম মানুষগুলো জ্বলে উঠবে, আগে থেকে তার হদিশ মেলে না। কিন্তু অত্যন্ত সঙ্গত কারণেই এখন ক্ষেপে উঠলো সাঙ্গামখাবা। দাঁত খিঁচিয়ে বলতে লাগলো, "সোয়ামী! শত্তুরদের ছুই সেঙাই শয়তানটা তোর সোয়ামী হবে! আপোটিয়া। হোক আনিজা গোঁসা, আজ তোকে আর ছুই সেঙাইটাকে খতম করে বস্তিতে

ফিরবো।" খারে বর্শাটা মাথার ওপর তুলে তাক ঠিক করতে লাগলো সাঙ্কামখাবা।

"হা-আ-আ-আ"—বর্শাটা ছুঁড়ে মারার ঠিক আগেই চেঁচাতে চেঁচাতে জোরি বংশের বাড়ি থেকে নীচে লাফিয়ে পড়লো জামাতস্থ। ছুটতে ছুটতে মেহেলীকে আড়াল করে দু হাত তুলে একটানা চিৎকার করতে লাগলো।

সাঙ্কামখাবার হাতে বর্শার তাকটা কেঁপে গেলো।

উত্তেজনায় আশঙ্কায়, লাফিয়ে এতটা পথ ছুটে আসার ধকলে সমস্ত দেহ থরথর করে কাঁপছে সারুয়ামারুর বউ জামাতস্থর। জামাতস্থ গর্ভিণী। কয়েকদিনের মধ্যেই এই পাহাড়কে একটা বাচ্চা জন্ম দেবে। স্ফীত উদর, ভারী পাছা। স্তনদুটো টসটস করছে। আলস্যভরা চোখদুটো থেকে এখন আগুনের হলকা ছুটছে। নিজের রক্তমাংস দিয়ে মাতৃকুক্ষিতে একটি প্রাণ সযত্নে লালন করছে, এই পাহাড়কে একটা তাজা সজীব জীবন সে উপহার দেবে, সেই গৌরবে এবং দেমাকে গর্ভ হবার পর থেকেই সমস্ত গ্রামটায় পাছা দুলিয়ে দুলিয়ে সে হেঁটে বেড়াতো। এখনকার জামাতস্থর সঙ্গে সেই গরবিনী, গর্ভধারণের তেজে পুলকময়ী জামাতস্থর কত তফাত!

জামাতস্থ হুমকে উঠলো, "শয়তানের বাচ্চারা, মেহেলীকে ছিনিয়ে নিতে এসেছিস! তোদের সয় না। সালুয়ালাঙ বস্তির সেরা মেয়েটার সঙ্গে এই কেলুরি বস্তির সেরা মরদটার বিয়ে হবে, তোদের তা সইছে না কেন রে রামখোরা? যা যা, হুই পাহাড়ের মাথা থেকে খাদে লাফিয়ে পড়ে মর গিয়ে। টেটসে আনিজা তোদের ঘাড় মুচড়ে রক্ত খাক। নিজেরা লড়াই করে মেহেলীকে কেড়ে নিতে পারিস না, সঙ্গে করে আবার সায়েরদের এনেছিস! মুরোদ কত!" রোষে রাগে জামাতস্থ ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগলো।

জোহেরি বংশের বাড়ি পুড়ছে। বাঁশের গাঁটগুলো শব্দ করে ফাটছে। টিলার মাথায় দাপাদাপি করতে করতে বসওয়েল অট্টহাসি হাসছে, "হাঃ-হাঃ-হাঃ—হোয়ের ইজ গাইডিলিও? এই পাহাড়ের মাথায় মাথায় আমি আগুন লাগিয়ে দেবো। দেখি কত দিন, ইয়াস, হাউ লঙ ছ্যাট্ মিংক্স গাইডিলিওটা লুকিয়ে থাকতে পারে। হাঃ-হাঃ-হাঃ—"

বিকট গলায় হাসতে হাসতে বসওয়েল মাথা ঘুরিয়ে এদিকে তাকালো। কিছুটা কৌতুকে এবং অভাবনীয় আনন্দে তার চোখজোড়া জ্বলে উঠলো। হাঁ-করা মুখ থেকে বিস্ময়ের একাক্ষর অব্যয় বেরিয়ে এলো, "এঃ—"

তারপরেই বসওয়েল চেঁচিয়ে উঠলো, "এহ্, হোয়াট এ ফান! পাহাড়ীটা বর্শা দিয়ে তাক করছে। সামনে মাগীটা দাঁড়িয়ে রয়েছে। লিভিং টার্গিট! হাউ ইন্টারেস্টিং! হোয়াট এ ফান!"

জোহেরি কেসুঙের পাশ থেকে এলোপাথাড়ি পা ছুঁড়তে ছুঁড়তে বসওয়েল ছুটে এলো। এই নাগা পাহাড়ে, এই বুনো প্যাগানদের দেশে তার জন্য এমন একটা বিস্ময়কর, রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা ছিলো, আগে কি কখনও তা কল্পনা করতে পেরেছিলো সে? একটা পাহাড়ী মানুষ বর্শা দিয়ে চোখের সামনে জীবন্ত একটি মেয়েকে ফুঁড়বে। কী মজা!

সেঙাইর মাথাটা উরুর ওপর রেখে দু হাত দিয়ে চেপে বিহ্বল হয়ে বসে রয়েছে মেহেলী। একটু আগে জামাতসুই বুড়ো খাপেগাকে বলেছিলো, তার আর সেঙাইর বিয়ের আগে দেখাদেখি হয়েছে। পাহাড়ী রীতি এবং বিয়ের প্রথাগুলির বিচারে এ রীতিমত পাপ, সাঙ্ঘাতিক অপরাধ। বিয়ের আগে ভাবী বরবউর দেখাসাক্ষাৎ এবং আলাপের জন্য এদের বিধানে ক্ষমা নেই, বিন্দুমাত্র করুণা নেই। সেই মারাত্মক পাপাচরণের সঙ্গে সঙ্গে কঠিন কর্তব্যের কথা বুড়ো খাপেগাকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলো জামাতসু। মেহেলীকে শাস্তি দিতে হবে। ভীষণ, নিষ্ঠুর শাস্তি।

তাজ্জবের ব্যাপার, সেই গর্ভিণী জামাতসুই এখন সাঞ্চামখাবার উদ্যত বর্শার সামনে মেহেলীর নিশ্চিত মৃত্যুকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। অবাক, হতভম্ব হয়ে বসে থাকা ছাড়া মেহেলী কী-ই বা করতে পারে?

সাঞ্চামখাবা গর্জে উঠলো, "এই মাগী, ভাগ্ এখান থেকে।"

"আমি কেন ভাগবো? তুই ভাগ্ শয়তানের বাচ্চা। আমাদের বস্তি থেকে তোরা সবাই ভাগ্।"

গর্ভবতী নারীকে আঘাত করা এই পাহাড়ের নীতিবিরুদ্ধ কাজ। এই নীতিঘাতী অপকর্ম কেউ করে বসলে তার শাস্তি হয় মৃত্যু।

বর্শাটা মাথার ওপর থেকে নামিয়ে ক্ষ্যাপা বাঘের মত ফুলতে লাগলো সাঞ্চামখাবা। "এই মাগী, বর্শার সামনে থেকে সরে বাচ্চা বিয়োতে যা।"

"কিছুতেই যাবো না রে ধাড়ী টেফঙ। আমি জ্যান্ত থাকতে মেহেলীকে ফুঁড়তে দেবো না। তেলাঙ্গা সু মাসে মেহেলী সেঙাইর বউ হবে। তাকে কি না ফুঁড়তে এসেছিস শয়তান। ইজা হবুতা!" জামাতসু খেঁকিয়ে উঠলো।

নিরুপায় আক্রোশে সাঞ্চামখাবা চেঁচাতে লাগলো, "মেহেলী হবে

মেজিচিজুঙের বউ। মেজিচিজুঙের বাপ রাঙস্থঙের কাছ থেকে আমি বউপণ নিয়েছি।" একটু দম নিয়ে আবার ফোঁসানি শুরু হলো, "আর মেহেলীর সঙ্গে বিয়ে হবে কি না সেঙাইর! সরে যা মাগী। নইলে—"

ভয়ানক ইঙ্গিত দিয়ে সাঞ্চামখাবা থেমে গেলো।

লাফাতে লাফাতে সাঞ্চামখাবার পাশে এসে দাঁড়ালো বসওয়েল। একসঙ্গে হাত-পা-মাথা নেড়ে প্রচুর উৎসাহ দিতে লাগলো সাঞ্চামখাবাকে, "ইয়াস, জাস্ট থ্রো দা স্পীয়ার। অ্যামুজিঙ ইমপালসিভ গেম, আই সী। ডু থ্রো—"

সাদা ধবধবে সায়েবটা বিজাতীয় দুর্বোধ্য ভাষায় কী যেন বলছে, ঠিক বোঝা যাচ্ছে না। বিমূঢ়, হতবাক হয়ে বসওয়েলের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলো সাঞ্চামখাবা।

আশ্চর্য! খাড়া টিলাটা বেয়ে কখন যে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী ওপরে উঠে এসেছে, কারুর খেয়াল ছিলো না। কণ্ঠার হাড়ের ফাঁকে লম্বা বাঁকা বর্শার ফলা গেঁথে গিয়েছিলো। সেটাকে টেনে খুলে ফেলেছে। সাদা সারপ্লিসটা রক্তে লাল টকটকে হয়ে গিয়েছে। মিশনারী প্রাণ, বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর জীবন, না না, অনেককাল আগে কোন আবছা অতীতের নেপথ্যে ব্রেটনক্রক-শায়ারের এক ভয়ঙ্কর আউটল'র প্রাণ বড় কঠিন। নাগা পাহাড়ের একটা বর্শার ফলা সেই প্রাণকে চিরকালের জন্য থামিয়ে দেবার পক্ষে যথেষ্ট নয়।

সাঞ্চামখাবাকে সমানে উৎসাহ দিয়ে চলেছে বসওয়েল, "ছোঁড ছোঁড়, বেশ তাক করে বর্শাটা ছোঁড় দিকি। দেরি কোরো না।"

পাশ থেকে ম্যাকেঞ্জী বললো, "না না মিস্টার বসওয়েল, বর্শা ও ছুঁড়তে পারে না।"

"হোয়াই?" ঘাড় ঘুরিয়ে বিস্মিত গলায় বসওয়েল বললো, "আই সী, আপনি বেঁচে আছেন! আমি মনে করেছিলাম, আপনি মারা গেছেন।"

ম্যাকেঞ্জী অদ্ভুত হাসি হাসলো। সে হাসিতে ক্ষোভ জ্বালা আত্মপ্রসাদ দম্ভ সূক্ষ্মভাবে মিশে রয়েছে! স্থূল মানসিক বৃত্তির মানুষ বসওয়েল। তার পক্ষে ম্যাকেঞ্জীর হাসির উপাদানগুলি বিশ্লেষণ করে আলাদা করা কোনক্রমেই সম্ভব নয়। এমন চেষ্টাও সে করলো না।

ম্যাকেঞ্জী বলতে লাগলো, "মিশনারীর জীবন, বিশেষ করে আমার মত

মিশনারীর প্রাণ এই নাগা পাহাড়ের একটা ঘায়েই যদি শেষ হয়ে যায়, তা হলে এখানে ব্রিটিশ রুল কদিন টিকবে বলতে পারেন মিস্টার বসওয়েল ?" একটু থেমে, "যাক, যে কথা বলেছিলাম। স্পীয়ার ও ছুঁড়বে না।"

"কেন কেন ? হোয়াই ?" অনেকটা কাছাকাছি এগিয়ে এলো বসওয়েল। তার মুখেচোখে ঔৎসুক্য ফুটে বেরিয়েছে।

"ওদের রীতি আছে ; গর্ভিণী মেয়েদের গায়ে ওরা আঘাত করে না। তা সে যত শত্রুই হোক। এই রীতি ওরা কিছুতেই অমান্য করবে না।"

"পাহাড়ী বীস্টগুলোর আবার রীতিনীতি আছে না কি ? স্ট্রেঞ্জ !"

"অদ্ভুতের কিছুই নেই মিস্টার বসওয়েল। পৃথিবীর সব জায়গাতেই নিয়ম রয়েছে। সব দেশের সব সমাজই তাদের নিজের নিজের নিয়মে চলেছে। এই নাগাদেরও নিজস্ব আইন-কানুন, সামাজিক রীতি-নীতি, আচার-বিচার, শাসন-শাস্তি থাকাই তো স্বাভাবিক।"

"আশ্চর্য তো ! আমর ধারণা ছিলো প্রিমিটিভ বর্বরদের সামাজিক বোধই নেই ; সুশৃঙ্খল রীতিনীতি তো দূরের কথা !"

মৃদু হেসে ম্যাকেঞ্জী বললে, "এদের সামাজিক বোধ, আচার-বিচার আমাদের সভ্য মানুষদের চেয়ে অনেক সময় ভালো এবং শ্রেয় বৈ মন্দ নয়। সে সব কথা পরে হবে। বিকেল হয়ে আসছে। ঝপ করে রাত্রি নামবে। এখনই এই গ্রাম থেকে আমাদেব চলে যাওয়া দরকার। রাত্রি হলে কোথা থেকে কী ঘটে যাবে ! জন্তু-জানোয়ার আছে। তা ছাড়া, বন্দুকের ভয়ে পাহাড়ীগুলো জঙ্গলে পালিয়েছে। অন্ধকারে হঠাৎ অ্যাটাক করে বসলে বেঘোরে মারা পড়তে হবে। সমস্ত গ্রাম তো জ্বালালাম, গুলি চালালাম, তছনছ করে খুঁজলাম কিন্তু গাইডিলিওকে পাওয়া গেল না। শয়তানীটা আমাদের গন্ধ পেয়েই পালিয়েছে। চলুন, ঐ সালুয়ালাঙ গ্রামেই ফিরে যাই। ওরা আমাদের নুন খেয়েছে। কখনই বিশ্বাসঘাতকতা করবে না। সালুয়ালাঙ বস্তিতে নিরাপদে থাকা যাবে। কাল সকালে কোহিমা ফিরবো।"

"ঠিক আছে।"

সালুয়ালাঙ গ্রামের বুড়ো সর্দার ছুটে এলো ম্যাকেঞ্জীর কাছে। আজ বিশেষ রকমের সাজসজ্জা করছে সে। শত্রুপক্ষের গ্রাম কেলুরিতে অভিযান চালাবে। তাই আরি পী কাপড় পরেছিলো। সেই কাপড়ে চিতাবাঘের মাথা, মানুষের কঙ্কাল, বুনো মোষের শিঙ এবং অজগরের মাথা আঁকা রয়েছে। মাথার

মুকুটে হরিণের শিঙ ও ইবাতঙ পাখির পালক গুঁজেছিলো। পায়ে বাঘের হাড় বাঁকিয়ে গোল করে পরেছে। কবজিতে হাতীর চামড়ার পেটী। দাঁতাল শুয়োরের অনেকগুলো দাঁত গলায় ঝুলিয়েছে, ঝনঝন শব্দ হচ্ছে। মাথার তামাটে চুলগুলো সাপের চামড়ার ছিলা দিয়ে আঁটো করে বাঁধা। গা থেকে মিশ্র উগ্র দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। এক থাবায় বিরাট সুচেন্যু, আর এক থাবায় লম্বা বর্শা। সর্দার বললো, "হু-হু ফাদার, হুই যে মেহেলীটা বসে রয়েছে। ওটার কোলে সেঙাই শয়তানটা শুয়ে রয়েছে। তুই একবার বল, আমরা মেহেলীটাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাই।"

"যাও, নিয়ে যাও তোমাদের মেহেলীকে।" সরাসরি দৃষ্টিতে সালুয়ালাঙের সর্দারের দিকে তাকিয়ে ম্যাকেঞ্জী বললো, "কি সর্দার, খুশী তো?"

"হু-হু—"

"তোমরা তোমাদের মেহেলীকে পেলে। আমরা কিন্তু গাইডিলিওকে পেলুম না।"

"কী করবো ফাদার! আমি তো ঠিক খবরই দিয়েছিলাম। ডাইনীটা যে এমন করে ভাগবে, কেমন করে জানবো?"

"ঠিক আছে। এবার না হয় ভেগেছে। কতবার আর ভাগবে ডাইনীটা? তোমরা তাকে তাকে থাকবে। খবর পেলেই কোহিমায় চলে যাবে। গাইডিলিও ডাইনীটাকে ধরতেই হবে।"

"হু-হু, গাইডিলিও ডাইনীর খবর পেলেই তোকে বলে আসবো কোহিমায়। তোর নিমক খেয়েছি, টাকা-কাপড় নিয়েছি। নিমকহারামি করবো না।"

"মনে থাকে যেন। যাও, মেহেলীকে নিয়ে তোমাদের গ্রামে চলো।" ম্যাকেঞ্জীর গলাটা বড়ই উদার শোনালো। নির্বিকার ভঙ্গিতে নির্দেশ দিয়ে বসলো সে।

সাঁ করে ঘুরে দাঁড়ালো সালুয়ালাঙ গ্রামের সর্দার। তার কুতকুতে ঘোলাটে চোখজোড়া নানকোয়া ও সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ান ছেলেদের মুখের ওপর দিয়ে সরে সরে যেতে লাগলো। ধারাল সুচেন্যুটা নীচে নামিয়ে রেখে ডান হাত দিয়ে বুকের ওপর গোটা কয়েক চাপড় বসিয়ে দিলো সে। তারপর চিৎকার করে উঠলো, "যা জোয়ানের বাচ্চারা, হুই মেহেলী মাগীকে ছিনিয়ে আমাদের বস্তিতে নিয়ে যা।"

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

আকাশ-ফাটানো শোরগোল শুরু হলো।

জন কয়েক জোয়ান ছেলে মেহেলীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো। জামাতসু বাধা দিতে এগিয়ে এসেছিলো। তাকে ধাক্কা মেরে গুঁতিয়ে এক পাশে ফেলে দিয়েছে একটা জোয়ান। দু হাতের কঠিন বাঁধনে সেঙাইকে জড়িয়ে, তার বুকে মুখ গুঁজে রয়েছে মেহেলী। নিমেষের মধ্যে সেঙাইর বুক থেকে মেহেলীকে ছিঁড়ে কাঁধের ওপর তুলে নিলো জোয়ানেরা। উতরাই বেয়ে তারা ছুটলো টিজু নদীর দিকে। একটা ভীষণ ভয়ঙ্কর পাহাড়ী ঝড় যেন ছুটে চলেছে।

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

তুমুল উল্লসিত শোরগোল আকাশের দিকে কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠছে।

প্রাণ-ফাটা আর্তনাদ করে উঠলো মেহেলী। সে আর্তনাদে ছয় আকাশ, ছয় পাহাড় এবং বন-ঝরনা-প্রপাত দিয়ে ঘেরা এই নাগা পাহাড়ের হৃৎপিণ্ডটা যেন শিউরে উঠলো। মেহেলীর আর্তনাদ জোয়ানদের সঙ্গে ছুটে চলেছে, "আ-উ-উ-উ-উ—আমি যাবো না। সেঙাইকে ছেড়ে আমি যাবো না। শয়তানের বাচ্চারা, আনিজা ঘাড় মটকে তোদের রক্ত খাবে, খাদে ফেলে মারবে। আ-উ-উ-উ-উ—"

"হো-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

"হো-য়া-য়া-য়া-য়া-য়া-আ-আ—"

নানকোয়া এবং সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ানদের উল্লসিত হল্লা দু পাশের পাহাড়ে আছাড় খেতে খেতে নানা দিকে ছড়িয়ে পড়তে লাগলো।

টিজু নদীর দিকে মেহেলীর আর্তনাদ মিলিয়ে গেলো। জোহেরি কেসুঙের পাথুরে উঠোন থেকে নির্জীব চোখে সেদিকে তাকিয়ে ছিলো সেঙাই। কবজি ফুঁড়ে অনেক রক্ত ঝরেছে। অসহ্য যন্ত্রণায় শরীরের সমস্ত বোধগুলি অসাড় হয়ে গিয়েছে। হাত-পায়ের জোড়গুলো খুলে খুলে যাচ্ছে, মাথাটা ঝিমঝিম করছে। সব শক্তি হারিয়ে ফেলেছে সেঙাই। তবু সে পাহাড়ী মানুষ। এদের জীবনের আদিম দুর্দান্ত প্রকৃতি কবজির ক্ষত-মুখ দিয়ে খানিকটা রক্তপাতের সঙ্গে সঙ্গে শেষ হয়ে যায় না। শিরায় শিরায়, হাড়-মেদ-রক্তে যে বন্য হিংস্র প্রাণ প্রবল গতিবেগে সাঁ-সাঁ করে ছুটে চলেছে, সেটা এই মুহূর্তে উত্তেজনায় আক্রোশে

প্রতিহিংসায় ফুঁসে ফুঁসে উঠতে লাগলো। কোন রকমে কনুই ভর দিয়ে উঠে বসলো সেঙাই। মাথা টলছে, শরীরটা থরথর করে কাঁপছে। যন্ত্রণা এবং রাগে মুখখানা বিকৃত দেখাচ্ছে। বাঁ হাতটা বাড়িয়ে পাশের বর্শাটাকে তুলে নিলো। তারপর শরীরের অবশিষ্ট শক্তি দিয়ে সাঞ্চামখাবার দিকে ছুঁড়ে মারলো। দুর্বল, অশক্ত দেহ। বর্শাটা সাঞ্চামখাবার কাছ পযন্ত পৌছলো না।

সাঞ্চামখাবা বিকট শব্দ করে হেসে উঠলো। বললো, "ইজা হুবুতা! ছাখ ছাখ, সেঙাই শয়তানটা বর্শা ছুঁড়ছে। কী তাগদ, আমার গায়ে ছোঁয়াতেই পারলো না! আবার ফুঁড়বার মতলব!"

বিড়বিড় গলায় অশ্রাব্য গালাগালি করতে করতে লুটিয়ে পড়লো সেঙাই। বসে থাকতে পারছে না সে, কিন্তু চোখজোড়া জ্বলছে।

সাঞ্চামখাবা হাত বাড়িয়ে সেঙাইকে দেখিয়ে লাফাতে লাগলো। হাসতে হাসতে চেঁচালো, "রামখোর বাচ্চাটা বর্শা ছুঁড়েই কাত হয়ে পড়েছে। হিঃ-হিঃ-হিঃ—কী জোয়ান!"

ডান হাতের কবজি ফুঁড়ে একটা গুলি বেরিয়ে গিয়েছে। সেই রক্তাক্ত চূর্ণবিচূর্ণ শক্তিহীন হাতটার দিকে তাকিয়ে সেঙাই ককিয়ে উঠলো, "আ-উ-উ-উ-উ—আ-উ উ উ উ—"

বসওয়েল বললো, "সমস্ত গ্রাম ঢুঁড়েও তো গাইডিলিওকে পাওয়া গেলো না। এবার কী করা দরকার ফাদার?"

ম্যাকেঞ্জী বললো, "আপাতত আমরা ঐ সালুয়ালাঙ গ্রামে যাবো। তার আগে সেঙাইটাকে বেঁধে নেওয়া দরকার। ওর সঙ্গে গাইডিলিওর নিশ্চয়ই যোগাযোগ রয়েছে। ওটার কাছ থেকে অনেক খবর পাওয়া যাবে, মনে হচ্ছে।"

"আর ইউ স্যুয়োর?"

"নিশ্চয়ই। আমার কথা বর্ণে বর্ণে মিলিয়ে নেবেন।"

"কী করে বুঝলেন সেঙাইর সঙ্গে গাইডিলিওর যোগাযোগ রয়েছে?"

"এটা কিন্তু পুলিশ সুপারের মত কথা হলো না মিস্টার বসওয়েল। গাইডিলিও এই গ্রামে ছিলো। এ ব্যাপারে আমার এতটুকু সন্দেহ নেই। তা ছাড়া সেঙাই নিজেই তো বলেছে, কোহিমায় ও যখন গিয়েছিলো, আমরা ওকে ঠেঙিয়েছি; গাইডিলিও ওকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। তবেই বুঝুন, আমরা স্বাভাবিক নিয়মেই সন্দেহ করতে পারি, গাইডিলিওর সঙ্গে এই গ্রাম আর

সেঙাইর নিবিড় যোগ আছে। সন্দেহ যখন হয়েছে, একেবারে শেষ পর্যন্ত দেখাই যাক না। সেঙাইকে খুঁচিয়ে পিটিয়ে কিংবা ভালো কথা বলে এই হিল অ্যাজিটেশনের খবর পেতেই হবে।" শান্ত, দৃঢ় গলায় কথাগুলো বলে বীডস্ জপতে লাগলো ম্যাকেঞ্জী।

শ্রদ্ধায় সম্ভ্রমে বিস্ময়ে একেবারে হতবাক হয়ে গিয়েছিলো বসওয়েল। এবার ফিসফিস করে সে বললো, "আমি অতটা তলিয়ে দেখি নি। আপনার ইনটিউয়িশান দেখে আমি তাজ্জব হয়ে গিয়েছি।" তারপরেই ডান দিকে ঘুরে বসওয়েল হুঙ্কার ছাড়লো, "চ্যাটার্জি, ঐ কুত্তার বাচ্চা সেঙাইটাকে আমাদের সঙ্গে নেবার ব্যবস্থা করো।"

শিকারী কুকুরের মত টিলার শেষ প্রান্তে ছুটে গেলো বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি। বেল্টটাকে সামলাতে সামলাতে মণিপুরী পুলিসগুলির দিকে তাকিয়ে চেঁচালো, "কুত্তার বাচ্চাটাকে কাঁধে তুলে নাও।"

কয়েকটি মণিপুরী পুলিস সেঙাইর রক্তাক্ত দেহটার দিকে এগিয়ে গেলো।

এতক্ষণ একপাশে দাঁড়িয়ে সাহেব আর মণিপুরী পুলিসের ভাবগতিক লক্ষ্য করছিলো জামাতস্থ। সেঙাইকে কাঁধের ওপর তুলে নেবার সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরী পুলিসদের ওপর সে ঝাঁপিয়ে পড়লো। চিৎকার করে বলতে লাগলো, "না না, আমাদের বস্তির সেঙাইকে তোরা ফুঁড়েছিস। ওকে কিছুতেই নিতে দেবো না। কিছুতেই না।"

ধারাল দাঁত এবং তীক্ষ্ণ নখ দিয়ে কামড়ে আঁচড়ে পুলিসদের জামা ছিঁড়ে ফেললো জামাতস্থ; গা-হাত কেটে ফেঁড়ে একাকার করে দিতে লাগলো। পুলিসগুলো আকস্মিক আক্রমণে বিহ্বল এবং হতভম্ব হয়ে গিয়েছে।

অল্প সময়ের মধ্যে ঘটনাটা ঘটলো। ওপাশ থেকে বসওয়েল দৌড়ে এলো। বিরাট থাবায় জামাতস্থর চুলের গোছা বাগিয়ে পুলিসদের কাছ থেকে ছাড়িয়ে নিলো। বললো, "উম্যান, ডোণ্ট ডু সো।"

পিঙ্গল চোখদুটো রক্তাভ হয়ে উঠেছে জামাতস্থর। বুকটা ফুলে ফুলে উঠছে। রাগে উত্তেজনায় সমস্ত দেহটা দুলছে, কাঁপছে। ঘন ঘন নিশ্বাস পড়ছে। পুলিস সুপার বসওয়েলের চোখেমুখে কী এক ছায়া দেখে জামাতস্থ হুঙ্কার দিয়ে উঠলো, "ইজা হুবুতা!" চেঁচাতে চেঁচাতেই বসওয়েলের বুকের ওপর লাফিয়ে পড়ে দাঁত বসিয়ে দিলো।

চুলের গোছা ধরে জামাতসুকে বুক থেকে সরিয়ে সামনে দাঁড় করিয়ে দাঁতে দাত পিষলে বসওয়েল। চোখ দুটো জ্বলছে। চিবিয়ে চিবিয়ে নির্মম গলায় সে বললো, "উম্যান, ইউ আর কনসিভড্। পাহাড়ী রীতিতে তোমার গায়ে হাত তুলতে বাধে। বাট আই অ্যাম ব্রিটিশার, নো হিল বীস্ট। তুমি আমাদের কাজে বাধা দিচ্ছো। আমার জ্ঞানে এবং বিচারে এ রীতিমত অপরাধ। অ্যাণ্ড ফর দ্যাট—" বলতে বলতেই গর্ভিণী জামাতসুর স্ফীত উদরে ভারী বুটের প্রচণ্ড লাথি বসিয়ে দিলো বসওয়েল।

আর্তনাদ করে পাথুরে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো জামাতসু, "আ-উ-উ-উ-উ—"

সঙ্গে সঙ্গে মণিপুরী পুলিসদের কাঁধ থেকে সেঙাই চেঁচিয়ে উঠলো, "শয়তানের বাচ্চা জামাতসুকে খতম করে ফেললো। ওটাকে খতম কর, সাবাড় কর।"

বসওয়েলকে সাবাড় করবার মত সবল শক্তিমান একটা পাহাড়ী জোয়ানও আশেপাশে নেই।

রক্তের সমুদ্রে ছটফট করছে জামাতসু। গড়াগড়ি দিতে দিতে তার দেহটা কখনও ধনুকের মত বেঁকে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে টান-টান হচ্ছে। খানিকটা পর একেবারেই থেমে গেলো জামাতসু; দেহটা নিস্পন্দ হয়ে গেলো।

আর বসওয়েল উন্মাদ গলায় অট্টহাসি হাসছে, "হাঃ-হাঃ-হাঃ—"

ও পাশ থেকে সালুয়ালাঙের সর্দার গর্জে উঠলো, "ইজা হুবুতা! শয়তানের বাচ্চা সায়েব, তুই পোয়াতী মাগীকে খতম করবি! আমাদের ওপর আনিজার গোসা হবে না?" বলতে বলতে বর্শা তুলে তাক করলো।

ম্যাকেঞ্জী চিৎকার করে উঠলো, "বর্শা ছুঁড়ো না সর্দার, খবরদার। সায়েব তো ভালোই করেছে। তোমাদের শত্রুকে খতম করছে।"

"আহে ভু টেলো! শত্তুর, তাই বলে পোয়াতী মাগীকে সাবাড় করবে! এ পাপ সইবো না। শয়তানের বাচ্চাটাকে ফুঁড়বোই।" বলতে বলতে বর্শাটাকে ছোঁড়ার উদ্যোগ করলো সালুয়ালাঙের সর্দার।

কিন্তু তার আগেই বসওয়েলের রিভলভার থেকে এক ঝলক নীল আগুন ছুটে গেলো, "বু-ম্-ম্-ম্-ম্—"

পাঁজরে হাত চেপে বিকৃত আর্তনাদ করে দুমড়ে-মুচড়ে পাক খেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো সালুয়ালাঙের সর্দার।

নানকোয়া আর সালুয়ালাঙ গ্রামের জোয়ানরা মেহেলীকে নিয়ে অনেক

আগেই টিজু নদীর দিকে চলে গিয়েছিলো। এক পাশে দাঁড়িয়ে ছিলো মেহেলীর বাপ সাঞ্চামখাবা, রাঙসুঙ এবং মেজিচিজুঙ। কেউ কিছু করার বা বলার আগে তিনজনে লাফ দিয়ে টিলার মাথা থেকে নীচে পড়লো। সেখান থেকে ঘন জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলো।

বসওয়েল আবার অমানুষিক অট্টহাসি জুড়ে দিলো, "হাঃ-হাঃ-হাঃ—আমাকে বর্শা হাঁকাতে চায় পাহাড়ী কুত্তাটা! গ্রেট ওয়ার—"

"থামুন!" ভয়ানক গলায় ধমক দিলো ম্যাকেঞ্জী, "কী সর্বনাশটা করলেন, বলুন দিকি?"

বসওয়েলের হাসি থেমে গিয়েছে। কঠিন গলায় টেনে টেনে সে বললো, "কী সর্বনাশ করলাম?"

"পাহাড়ীটাকে ফুঁড়ে আমাদের ইণ্টারেস্টের দিক থেকে কত ক্ষতি হলো জানেন?" কুঞ্চিত চোখে তাকিয়ে ম্যাকেঞ্জী বলতে লাগলো, "ওর কাছ থেকে গাইডিলিওর খবর পাওয়া যেতো। একে তো সমস্ত নাগা পাহাড়টা আমাদের ওপর ক্ষেপে রয়েছে। ভালোভাবে প্রীচ্ করতে পারছি না। তার ওপর লয়াল পাহাড়ীদের খুন করলে উপায় থাকবে! একটু ঠাণ্ডা মাথায় বিবেচনা করে কাজ করতে হয়!"

রিভলভারের মাথায় আঙুল ঠুকতে ঠুকতে বোকা গলায় বসওয়েল বললো, "কিন্তু শয়তানটা যে বর্শা ছুঁড়তো!"

"ছুঁড়তো না। আমি ছুঁড়তে দিতাম না। যদি ছুঁড়তো আপনি মরতেন। ওকে মেরে হয়তো আপনার প্রাণ বাঁচলো, কিন্তু ওটা বেঁচে থাকলে গাইডিলিওকে অনেক আগেই ধরা যেতো, নাগা পাহাড়ে ব্রিটিশ রুল আরো জাঁকিয়ে বসতো। যাক, এমন ভুল আর কক্ষনো করবেন না মিস্টার বসওয়েল। সব সময় খুনখারাপিতে কাজ হয় না। এই তো সেঙাই আমাকে বর্শা দিয়ে জখম করলো। আমি ওকে মারলাম? না, ওকে মারবোই না। ওর কাছ থেকে গাইডিলিওর খবর আদায় করতে হবে না?"

নীচের দিকে মাথাটা ঝুলিয়ে অল্প-অল্প নাড়তে লাগলো বসওয়েল। ম্যাকেঞ্জীর প্রতি শ্রদ্ধার মাত্রাটা হঠাৎ দ্বিগুণ বেড়ে গেলো। আস্তে আস্তে সে বললো, "আমি অতটা তলিয়ে দেখি নি।"

দুর্বোধ্য হাসি হাসলো ম্যাকেঞ্জী। সেই সঙ্গে সস্নেহ গলায় বললো, "মানুষ মাত্রেরই ভুলচুক হয় মিস্টার বসওয়েল। যা হবার হয়ে গিয়েছে। এখনি

কোহিমা ফিরতে হবে। সালুয়ালাঙে তো যাবার উপায় নেই। পাহাড়ী তিনটে ছুটে পালালো। মেরেছিলেন যখন, ঐ ক-টাকেও যদি শেষ করতেন! যাক, নির্ঘাত ওরা লোক ডেকে আনবে। ওরা এসে পড়ার আগেই আমাদের সরে পড়তে হবে। কুইক।"

ছেচল্লিশ

সমস্ত রাতটা অচৈতন্য হয়ে ছিলো সেঙাই। যখন জ্ঞান ফিরলো, কোহিমা পাহাড়ের আকাশ থেকে সাওস্থ ঋতুর তাপহীন বিকেলটা নিবে আসতে শুরু করেছে। আকাশ-সাঁতার-ক্লান্ত পাখিদের ঝাঁক কোথায় মিলিয়ে যাচ্ছে।

সেঙাই চোখ মেললো। চোখজোড়া টকটকে লাল। আচ্ছন্ন দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো। সব আবছা, ঝাপসা। অনেকক্ষণ পর ঘোরটা সামান্য কেটে গেলে সেঙাই শিউরে উঠলো। রক্তের মধ্যে ভীতি, শঙ্কা এবং উত্তেজনা একযোগে কিলবিল করে ছুটতে লাগলো যেন।

কোহিমা থেকে ডিমাপুরের দিকে পুলিস ভ্যানটা সাঁ-সাঁ করে ছুটছে। মাঝখানে সেঙাই শুয়ে রয়েছে। আশেপাশে জন কয়েক পাহাড়ী জোয়ান হাঁটু গুঁজে দলা পাকিয়ে বসে রয়েছে। লোহার বেড়ি দিয়ে হাত-পা বাঁধা। কারো মাথার খুলি ফাটা, কারো উরু ভেদ করে গুলি বেরিয়ে গিয়েছে। কারো আবার ধারাল বেয়নেটের খোঁচা লেগে খাবলা-খাবলা মাংস উঠে গিয়েছে। পাহাড়ী জোয়ানগুলির শরীরে তাজা বন্য রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে।

ঘোর-ঘোর দৃষ্টিটা সকলের মুখের ওপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিলো সেঙাই। চেনাজানা একজনও বেরুলো না। তাদের কেলুরি গ্রামের একটা মানুষও নেই পুলিস ভ্যানটার মধ্যে।

এবার নিজের ডান হাতের কবজিটার দিকে তাকালো সেঙাই। তাকিয়েই চমকে উঠলো। কবজির ক্ষতমুখে রক্ত শুকিয়ে কালো হয়ে রয়েছে। কাঁধ পর্যন্ত সমস্ত হাতখানা অস্বাভাবিক ফুলেছে। ক্ষতমুখ থেকে লালচে বিষাক্ত রস ঝরছে। অসহ্য যন্ত্রণায় দেহ থেকে হাতখানা যেন খসে পড়বে। নির্জীব গলায় সেঙাই আর্তনাদ করে উঠলো, "আ-উ-উ-উ-উ, আ-উ-উ-উ-উ--"

জনকতক পুলিস জোয়ানগুলোকে ঘিরে বসেছে। তাদের হাতে রাইফেল; রাইফেলের মাথায় বেয়নেটের শাণিত ফলাগুলো কী হিংস্র!

সামনের দিকে উবু হয়ে বসেছে বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি। তার পাশে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। ম্যাকেঞ্জীর কণ্ঠায় সেঙাইর বর্শা গিঁথে গিয়েছিলো। এখন সেখানে মোটাসোটা বিরাট এক ব্যাণ্ডেজ।

তার-আঁটা ফোকরের মধ্য দিয়ে বাইরে তাকালো সেঙাই। কিছুদিন আগে সারুয়ামারুর সঙ্গে এই কোহিমা পাহাড়ে এসেছিলো; সে স্মৃতিটা এখনও টাটকা এবং সজীব রয়েছে।

ডিমাপুরগামী এই পথটার পাশে বিকিকিনি, লেনদেনের বাজার বসিয়েছে সমতলের বাসিন্দারা। সারুয়ামারু এখানে নিয়ে এসেছিলো তাকে। মাধোলালের সঙ্গে আলাপ হয়েছিলো সেঙাইর। মাধোলাল! অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প বলতো সে। আসান্যুদের (সমতলের বাসিন্দাদের) সর্দার গান্ধীর গল্প, রানী গাইডিলিওর গল্প। ছয় আকাশ ছয় পাহাড়ের পরপারে অজানা অপরিচিত দেশের, সেই সব দেশের বিচিত্র মানুষের, তাদের বিচিত্রতর জীবন-যাত্রা, রীতি-নীতি এবং ধরন-ধারণের গল্প বলতো। রহস্যময় দুর্বোধ্য নেশায় সেঙাই বুঁদ হয়ে থাকতো।

দৃষ্টিটা চমকে উঠলো সেঙাইর। ডিমাপুরগামী সড়কের পাশে সেই বাজারটার চিহ্নমাত্র নেই। সমতলের বাসিন্দারা, তাদের চাল-ডাল-নুন, তেল হারিকেন থেকে শুরু করে নানা মনোহারী পণ্যসম্ভার কী এক ভোজবাজিতে উধাও হয়েছে। মাধোলালের সেই ছোট্ট দোকানটা, বাঁশের মাচান, টিনের চাল, কাঠের দেওয়াল ভেঙেচুরে ছত্রখান হয়ে রয়েছে। শুধু মাধোলালের দোকানই নয়, সমতলের বাসিন্দাদের এই বাণিজ্যমেলাকে দলে-পিষে ভেঙে-মুচড়ে চুরমার করে দেওয়া হয়েছে।

বিড়বিড় গলায় সেঙাই বললো, "মাধোলাল, মাধোলাল—"

আঁকাবাঁকা পথটা ধরে টিলার ওপর দিয়ে, পাহাড়ের চূড়ার পাশ দিয়ে নিবিড় বনভূমি চিরে চিরে এগিয়ে চলেছে পুলিস ভ্যানটা। কখনও সড়কটা দোল খেয়ে সামনের দিকে নেমে গিয়েছে, আবার সঙ্গে সঙ্গেই খাড়া চড়াই বেয়ে ওপরের দিকে উঠেছে। তার-আঁটা ফোকর দিয়ে ছিটকে ছিটকে যাচ্ছে জলপ্রপাত, ঘন বন, ঝরনা, টিলা, খাদ।

বাইরে থেকে দৃষ্টিটাকে ভ্যানের মধ্যে নিয়ে এলো সেঙাই। ধারাল কটা চোখে তার দিকে তাকিয়ে রয়েছে ম্যাকেঞ্জী। নির্বিকার ভঙ্গিতে বীডস্ জপে চলেছে।

বাঁ হাতে ভর দিয়ে উঠে বসতে চাইলো সেঙাই। কিন্তু যন্ত্রণায় সমস্ত শরীরটা যেন অসাড় হয়ে গিয়েছে। সামান্য ঝাঁকানি লেগে মনে হলো, ডান হাতটা বুঝি ছিঁড়ে পড়বে। আধাআধি উঠেই আবার শুয়ে পড়লো সেঙাই।

ম্যাকেঞ্জী বললো, "কী সেঙাই, ঘুম ভাঙলো ? ঘুমটা কেমন হয়েছিলো ?"

প্রথমে জবাব দিলো না সেঙাই। একটু পর দুর্বল গলায় গর্জে উঠলো, "ইজা হুবুতা ! এই শয়তানের বাচ্চা, আমাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস ?"

বিচিত্র এক হাসির মহিমায় মুখখানা ভরে গেলো বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জীর। আশ্চর্য শান্ত গলায় সে বললো, "তোমাকে নিয়ে যাচ্ছি সালুয়ালাঙ বস্তিতে। তোমার সঙ্গে যে আজ মেহেলীর বিয়ে হবে।"

"সব মিছে কথা। সালুয়ালাঙ তো আমাদের কেলুরি বস্তির পাশে। আর এটা তো কোহিমা শহরের পথ।" একটু দম নিয়ে সেঙাই বললো, "সালুয়ালাঙের সদ্দারকে সাবাড় করেছিস ! তাদের বস্তিতে গেলে তোদের খতম করবে।"

বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটলো না ম্যাকেঞ্জীর। মুখের হাসিটা স্থানচ্যুত হলো না। অস্ফুট গলায় স্বগত বলতে লাগলো সে, "নাড়ীজ্ঞান একেবারে টনটনে। শয়তানটা ঠিক টের পেয়েছে, এটা সালুয়ালাঙে যাবার পথ নয়।"

ম্যাকেঞ্জীর গলা সেঙাইর কানে পৌঁছালো না।

সেঙাই চেঁচালো, "আহে ভু টেলো ! তোদের খুব ফুটানি হয়েছে। আমাকে ধরে কোথায় নিয়ে যাচ্ছিস, সেই কথাটা বল না টেফঙের বাচ্চা ? দাঁড়া হাতটা একটু ভালো হতে দে। তোদের সব ফুটানি বর্শা হাঁকড়ে লোপাট করবো। একবার বর্শা দিয়ে তোর গলাটা ফুঁড়েছিলাম ; তখন তুই মরিস নি। এবার তোকে নির্ঘাত খুন করবো।"

মুখের একটা রেখাও বিকৃত হলো না ম্যাকেঞ্জীর। জপমালাটার গায়ে আঙুলগুলো এতটুকু বিচলিত হলো না। ধীর শান্ত গলায় সে বললো, "আমাকে খুন করতে চাইছো সেঙাই ? খুব ভালো, খুব ভালো। কিন্তু হাতটা জখম হয়ে রয়েছে ; এখন তো ঠিক পেরে উঠবে না। ওষুধ দিয়ে হাতটা সারিয়ে একটা বর্শা দেবো'খন। তখন আমাকে ফুঁড়ো। তার আগে একটা কথা জিগ্যেস করি। ঠিক ঠিক জবাব দাও দিকি।" বলতে বলতে মুখখানা কানের কাছে নামিয়ে আনলো ম্যাকেঞ্জী। বললো, "মেহেলীর জন্যে মনটা খুব খারাপ লাগছে, তাই না সেঙাই ?"

"হু-হু—" সেঙাই মাথা নাড়লো।

"সত্যিই তো, মন খারাপ হবার কথাই। কিন্তু উপায় কী ?" মুখখানায় একটা খাটি জাতের বিমর্ষ ভঙ্গি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো ম্যাকেঞ্জী।

আচমকা অশক্ত, দুর্বল দেহের সমস্ত শক্তি কোমরে একত্র করে উঠে বসলো সেঙাই। হাউ-হাউ করে ডুকরে উঠলো, "তুই আমাকে মেহেলীর কাছে দিয়ে আয় সায়েব।"

"মেহেলীর কাছে যেতে চাইছো ?"

"হু-হু—"

"মেহেলীর কাছে তোমাকে নিয়ে যেতে পারি সেঙাই। কিন্তু তার আগে তুমি আমাকে আর একজনের কাছে নিয়ে যাবে। যদি তার কাছে নিতে পারো, তা হলে মেহেলীর সঙ্গে তেলেঙ্গা সু মাসেই তোমার বিয়ে দেবো।" বলতে বলতে কটা চোখ দুটো তীক্ষ্ণ করে সেঙাইর মুখের ভাবভঙ্গি লক্ষ্য করতে লাগলো ম্যাকেঞ্জী।

"কে সে ? কার কাছে তোকে নিয়ে যাবো ?"

ম্যাকেঞ্জীর মুখে স্বর্গীয় হাসি ফুটলো, "তোমাদের ঐ রানী গাইডিলিওর কাছে। আমার বড় ব্যারাম হয়েছে। সে ছুঁয়ে দিলে সেরে যাবে।"

সন্দিগ্ধ চোখে ম্যাকেঞ্জীর দিকে তাকিয়ে সেঙাই বললো, "তুই তো রানীকে ডাইনী বলিস। তার কাছে যে আবার ব্যারাম সারাতে চাইছিস !"

"তোমাকে রাগাবার জন্যে বলি। ওসব কথা থাক, তুমি আমাকে রানীর কাছে নিয়ে চলো।"

"রানীকে কোথায় পাবো ? সে তো আমাদের বস্তি থেকে চলে গেছে।"

"তবে মেহেলীকেই বা আমি কোথায় পাবো ? সে তো নাগা পাহাড় থেকে ভেগেছে।"

সেঙাই হুমকে উঠলো, "ইজা হুবুতা ! তোকে বর্শা দিয়ে ফুঁড়বো। তুই আমাকে বস্তিতে রেখে আয়।"

"বস্তিতে ফিরতে চাও ? আচ্ছা আট বছর পর ফিরো। কেমন ?" ম্যাকেঞ্জীর কণ্ঠ বড় সস্নেহ শোনালো।

"আট বছর ! আট বছর আমি কোথায় থাকবো ?"

"শিলং পাহাড়ে।"

"শিলং পাহাড়ে যাবো না, কিছুতেই না।" সেঙাই ফুঁসে উঠলো।

"কী মুশকিল ! সেখানে তোমার জন্যে একখানা ঘর তৈরি করে রেখেছি যে। না গেলে কি করে চলবে ?" বিরক্ত হতে হতে নিজেকে সামলে হেসে ফেললো ম্যাকেঞ্জী।

শিলং! নামটা এর আগেও বার কয়েক শুনেছে সেঙাই। মাধোলাল সারুয়ামারু এবং তার বাপ সিজিটোর কাছেই শুনেছে। ছয় আকাশ ছয় পাহাড়ের পরপারে কোথায় শিলং নামের অদ্ভুত রহস্যময় দেশটা রয়েছে, অতশত খবর জানে না সেঙাই। শিলং দেশটা তার অস্ফুট মনটাকে দুর্বোধ্য আকর্ষণে হয়তো টেনেছে। শিলংয়ের জন্য হয়তো সরল সাদাসিধে কৌতূহলও তার হয়ে থাকবে। কিন্তু এখন, এই মুহূর্তে শিলং সম্বন্ধে তার কোন মোহ নেই, কৌতূহল থাকলেও উবে গিয়েছে।

অপরিণত মন দিয়ে সেঙাই অন্তত এটুকু বুঝতে পেরেছে, মাধোলাল সারুয়ামারু কি তার বাপ সিজিটোর শিলংয়ের সঙ্গে ম্যাকেঞ্জীর শিলংয়ের বিন্দুমাত্র মিল নেই। ম্যাকেঞ্জীর শিলংয়ের সঙ্গে দুর্বোধ্য বিভীষিকা এবং আশঙ্কা যেন জড়িয়ে রয়েছে। সেখানে গেলে সে আর বাঁচবে না। নির্ঘাত মরে যাবে। আনিজার গোঁসা এসে পড়বে। শিলং পাহাড়ে সে যাবে না। কিছুতেই না। মেহেলীকে ছেড়ে, প্রিয়জন, ক্ষেত এবং শিকারের সঙ্গী, সবার ওপরে অভ্যস্ত বন্য জীবন ছেড়ে অজানা অচেনা শিলং পাহাড়ে আটটা বছর কাটাতে হবে। ভাবতেও মনটা অসাড় হয়ে আসে।

নাগাপাহাড় তাকে সব দিয়েছে। আলো-বাতাস দিয়েছে, ঝরনার জল দিয়েছে, স্বাস্থ্য-খাদ্য-আয়ু দিয়েছে। মা-বাপ-ভাই-বোন পিরীতের জোয়ানী থেকে শুরু করে নগদা উৎসব, ফসল বোনার উৎসব, জঙ্গল কাটার উৎসব শিকারের জন্য হিংস্র জানোয়ার, পাহাড়ী আরণ্যক মানুষের প্রয়োজনীয় সমস্ত উপকরণই দিয়েছে। না না, এই চিরকালের চেনা জগৎ ছেড়ে সেঙাই যাবে না।

সেঙাই চিৎকার করে উঠলো, "আমি যাবো না, কিছুতেই যাবো না শিলং পাহাড়ে। আমাকে ছেড়ে দে সায়েব, বস্তিতে ফিরে যাই।"

ম্যাকেঞ্জী কিছুই বললো না। শুধু সেই স্বর্গীয় হাসিটুকু সমস্ত মুখে ছড়িয়ে আটক করে রাখলো।

পাহাড়ী সড়ক বেয়ে পুলিস ভ্যানটা ডিমাপুরের দিকে ছুটে চলেছে। সেই সঙ্গে ছুটেছে সেঙাইর তীব্র তীক্ষ্ণ আর্তনাদ, "আমি যাবো না শিলং পাহাড়ে যাবো না। না না না।"

অনেকটা সময় কেটে গিয়েছে।

সামনের একটা জোয়ানের দিকে তাকালো সেঙাই। দু হাঁটুর মধ্যে মাথা গুঁজে চুপচাপ বসে রয়েছে। সেঙাই ডাকলো, "এই, তুই কে?"

জোয়ানটা মাথা তুললো। চোখের মধ্যে রক্ত জমাট বেঁধে রয়েছে যেন। অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলো সে।

সেঙাই আবার বললো, "তুই কে ?"

"আমি লেঙড়ি আও। ফচিমাঙ বস্তিতে আমাদের ঘর।"

এবার পাশের অন্য একটা জোয়ানের দিকে মুখ ঘুরিয়ে সেঙাই জিজ্ঞাসা করলো, "তুই কে ? তোদের কোন বস্তি ?"

"আমি ইয়ালুলুক। আমাদের বস্তি হলো জুনোবট।"

একটা একটা করে প্রত্যেক জোয়ানের নাম-ধাম-গোত্র-বংশের খবর নিলো সেঙাই। কেউ কোনিয়াক, কেউ আও, কেউ সাঙটাম, কেউ রেঙমা—নাগা পাহাড়ের দিগ্‌দিগন্ত থেকে, নানা গ্রাম-জনপদ থেকে এই সব পাহাড়ী ছেলেদের ছিঁড়ে নিয়ে এসেছে ম্যাকেঞ্জীরা।

সেঙাই বললো, "সায়েব শয়তানের বাচ্চারা তোদের ধরে আনলো কেন রে ?"

জোয়ানেরা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলো, "কেন আবার ? রানী গাইডিলিও আমাদের বস্তিতে গিয়েছিলো। কত কথা বলেছে রানী ! বলেছে, ছয় আকাশ আর ছয় পাহাড়ের ওধারে কোন ভিন দেশ থেকে সায়েব-শয়তানরা এসেছে সদ্দারি ফলাতে। বলেছে, আমাদের পাহাড় থেকে রামখোর বাচ্চাদের ভাগিয়ে দিতে হবে। আমরা রানীর কথামত কাজ করলাম। সায়েবদের কাছ থেকে নিমক নিই না, যীশু-মেরী বলি না, বুকে-কাঁধে-কপালে আঙুল ঠেকাই না। কেন রানীর কথা শুনবো না ? ওর ছোঁয়ায় ব্যারাম সারে, আনিজার গোসা চলে যায়। ওর কথা নির্ঘাত শুনবো।'

"হু-হু নির্ঘাত শুনবি।" সেঙাই সায় দিলো, "তারপর কী হলো, বল দিকি ?"

"তারপর হুই শয়তানেরা রানীর খোঁজে বস্তিতে বস্তিতে যেতে লাগলো। আমরা তাদের রুখলাম। বল দিকি তুই, জান থাকতে আমরা রানীকে ধরিয়ে দিতে পারি ?"

"না না, কক্ষনো না।"

"রানীকে আমরা ধরতে দিলাম না। রাগে সায়েবরা আমাদের বস্তি জ্বালিয়ে দিল, গুলি করে ফুঁড়লো। এখন জখম করে শিলং পাহাড়ে নিয়ে চলেছে।"

আচমকা সেঙাই চেঁচিয়ে উঠলো, "হুই শিলং পাহাড়ে আমরা যাবো না। যাবো না।"

সেঙাইর সঙ্গে সঙ্গে জোয়ানেরা গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে লাগলো, "আমরা যাবো না। যাবো না।"

বিশাল গোঁফে চাড়া দিয়ে বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি হুমকে উঠলো, "চুপ চুপ, কুত্তার বাচ্চারা।"

গালাগালিটা নির্ভেজাল মাতৃভাষাতেই দিল বৈকুণ্ঠ।

সেঙাইর কাছাকাছি বসে জপমালা জপছে বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী। এই শোরগোল চিৎকার এবং তর্জনগর্জনে বিন্দুমাত্র বিচলিত হবার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না। চারপাশে কঠিন নির্বেদের দেওয়াল টেনে একান্ত নির্লিপ্ত ভঙ্গিতে বসে রয়েছে সে।

সাতচল্লিশ

মণিপুর রোড স্টেশন।

সকালবেলা রেলের কামরায় পাহাড়ী জোয়ানগুলোকে ঠেসে, পুলিসদের নিরঙ্কুশ হেফাজতে এবং রাইফেল বেয়নেটের জিম্মায় রেখে কোহিমার দিকে ফিরে গেলো বড় পাদ্রী ম্যাকেঞ্জী।

সেঙাইদের সঙ্গে গেলো বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জি।

বিস্মিত বিহ্বল হয়ে রেলগাড়ি দেখলো সেঙাই। অন্য ছেলেরাও দেখলো। এর আগে তারা রেলগাড়ি দেখে নি। ভীতি, উৎকণ্ঠা এবং প্রবল ঔৎসুক্যের মিশ্র অনুভূতিতে চুপচাপ বসে রইলো সকলে।

এক সময় ঝকঝক শব্দ করে রেল ছুটতে শুরু করলো। জানলার ফাঁক দিয়ে পাহাড়ী বুনো দেশ ছিটকে ছিটকে বেরিয়ে যেতে লাগলো। সমতলের বাসিন্দাদের, নানা ধরনের বিচিত্র আকারের সব ঘরবাড়ি মিলিয়ে যেতে লাগলো। পাশে পাশে টেলিগ্রাফের তার। (ওগুলো যে টেলিগ্রাফের তার, আট বছর পরে তা জেনেছিলো সেঙাই)। রাঙা পাহাড়, ডিফু, লামডিঙ, চাপার মুখ—নানা স্টেশন। (স্টেশন এবং স্টেশনগুলোর নামও আট বছর পরেই জেনেছিলো সেঙাই। আট বছরে স্টেশনের নাম এবং টেলিগ্রাফের তারই শুধু নয়, আরো অনেক বিস্ময়কর বস্তু এবং মানুষ দেখেছিলো সেঙাই। অসংখ্য ব্যাপার বুঝেছিলো। জীবনের অনেক মৌল সমস্যা তাকে নাড়া দিয়েছিলো। সংখ্যাতীত ভূয়োদর্শন হয়েছিলো। সে সব অনেক পরের কথা। যথাসময়ে বলা যাবে।) কিছুক্ষণের বিরাম। নানা চেহারার মানুষের জটলা। শোরগোল, চিৎকার, যাত্রীদের ওঠানামা।

পাহাড়ী বুনো মানুষ সেঙাইর অস্ফুট মনটা বিস্ময়ে বুঁদ হয়ে গেলো। অবাক, নিষ্পলক চোখে সে তাকিয়ে রইলো। কিছু সময়ের জন্য চলমান বন জঙ্গল, সমতলের দেশ, এ দেশের বাসিন্দাদের ঘরবাড়ি দেখতে দেখতে কবজির যন্ত্রণার কথা, মেহেলী, কেলুরি গ্রাম, গাইডিলিও, অতীতের সব কথাই ভুলে গেলো সেঙাই।

শিলং পাহাড়ে যেতে চাইছিলো না সেঙাই। চিৎকার করছিলো,

গর্জাচ্ছিলো। এখন শিলং যাওয়ার পথটা এবং রেলগাড়ির মজাদার ঝাঁকানি মোটামুটি মন্দ লাগছে না। নাগা পাহাড়ের বাইরে এমন একটি সুন্দর দেশ যে ছিলো, তা কি আগে জানতো সেঙাই ?

জানালার সামনে পাহাড়ী জোয়ানেরা হুমড়ি খেয়ে পড়েছে।

একজন বললো, "এটাই বুঝি আসান্যুদের (সমতলের বাসিন্দা) দেশ ?"

"হু-হু"—সেঙাই মাথা ঝাঁকায়।

"দেশটা ভালো, খুব ভালো।"

"হু-হু, দেখছিস, আমাদের ঘরের চেয়ে আসান্যুদের (সমতলের বাসিন্দা) ঘরগুলো অনেক ভালো।"

"হু-হু, ঠিক বলেছিস।" সকলে সায় দিলো।

সেঙাই বললো, "শিলং থেকে বস্তিতে ফিরে এই রকম ঘর বানাবো।"

"কেন, তোর ঘর নেই ? বিয়ে হয় নি ?"

বেশ ভুলে ছিলো ; আবার মেহেলীর কথা মনে পড়লো। চোখজোড়া জ্বলে উঠলো। সেঙাই ফুঁসে উঠলো, "টেমে নটুঙ! বিয়ে আর হলো কই ? মোরাঙ থেকে বেরুতেই পারলাম না। বিয়ে করার আগেই তো শয়তানের বাচ্চারা মেহেলীকে ছিনিয়ে নিয়ে গেলো। আমাকে ফুঁড়লো। টেফঙরা ঘর বানাতে দিলে না।"

হাউ-হাউ করে সেঙাই কাঁদতে লাগলো।

কত সাধ ছিলো সেঙাইর ; অপরিণত মনে কত স্বপ্নই ঠাসা ছিলো। সমস্ত চৈতন্য জুড়ে স্পষ্ট-অস্পষ্ট, বোধ-অবোধ্য কত কামনাই না ছিলো। বিয়ের পর মেহেলীকে নিয়ে ঘর বেঁধে থাকবে। জোরি বংশের বাড়িটার পাশে সর্দার তাকে ঘর তোলার জায়গা দিয়েছিলো। বিয়ের সময় ফসলের, জন্মমৃত্যুর, বনপাহাড়ের আনিজাদের নামে সাদা শুয়োর বলি দেবে। গ্রামের সবাইকে ভোজ খাওয়াবে। নিজের ধরনে মনে মনে স্থূল ভোগ এবং উপভোগের জগৎ বানিয়ে নিয়েছিলো সেঙাই। কিন্তু সমস্ত কিছু তছনছ হয়ে গেলো। তাকে সাহেবরা চালান করছে শিলঙে ; মেহেলী যে কোথায় কতদূরে, তার হদিস কেই-বা দেবে ?

সেঙাই কাঁদছে। চুল ছিঁড়ে আশেপাশের জোয়ানদের আঁচড়ে কামড়ে শব্দ করে কাঁদছে। আদিম মানুষের কামনার প্রকাশ যেমন সাঙ্ঘাতিক, তার নৈরাশ্যও তেমনি মারাত্মক।

সেঙাইর বিচিত্র ধ্বনিময় কান্না মুহূর্তে অন্যান্য জোয়ানদের স্পর্শ করলো। তারাও সমস্বরে কান্না জুড়ে দিলো।

গাড়ির দোলানিতে একটু তন্দ্রামত এসেছিলো বৈকুণ্ঠ চ্যাটার্জির। দুটো দিন পাহাড়ীদের গ্রামে হানা দিয়ে কী ধকলটাই না গিয়েছে! তন্দ্রার ব্যাঘাত ঘটায় দাঁত খিঁচিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো বৈকুণ্ঠ, "থাম জানোয়ারের বাচ্চারা!"

ট্রেনের চাকার নীচে রেলের রেখা ফুরিয়ে এলো। গুয়াহাটি স্টেশন। সেখান থেকে পুলিস-ভ্যানে শিলং পাহাড়। মাঝে ডিমাপুরের পথের মত আঁকাবাঁকা পাহাড়ী সড়ক। সেই সড়কেই রাত্রি নামলো।

হিম-হিম বাতাস ছুটছে। ঠকঠক করে হাড় কাঁপে। খাদের পাশে কমলাবন আবছা হয়ে গেলো। ঘন ঝোপ, নিবিড় অরণ্য, বুনো লতাপাতার জটিল বাঁধনে বাঁধা টিলাগুলো এখন অস্পষ্ট।

এক সময় শিলং শহরের মধ্যে এসে ঢুকলো পুলিস-ভ্যান। পাইনপাতার ফাঁকে ফাঁকে বাতাসের কান্না বাজছে। সোঁ-সোঁ দীর্ঘশ্বাস উঠছে। তার-আঁটা ফোকরের মধ্য দিয়ে বাইরের দিকে তাকালো সেঙাই।

দু পাশ থেকে ঝলমলে আলোগুলো ছিটকে যাচ্ছে। সরে সরে যাচ্ছে দোকানপসার, বিচিত্র চেহারার মানুষ, বিচিত্রতর বেশভূষা।

ভ্যানটা ছুটছে, তার শ্রান্ত হৃদপিণ্ডের ঘস্‌ঘস্‌ শব্দ শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই সেটা বিরাট ফটকের মধ্যে ঢুকলো।

রেলের ঝাঁকানি, ভ্যানের দোলানি, এবং দুদিনের অবিশ্রান্ত ধকলে শরীরটা যেন কেমন করে উঠলো। কাঁধ থেকে আঙুলের ডগা পর্যন্ত সমস্ত ডান দিকটা ফুলে রয়েছে। অসহ্য টাটানি শুরু হয়েছে। সেঙাইর মনে হলো, ডান দিকটা খসে পড়বে। একটা যন্ত্রণার থাবা ক্রমাগত মাংস-শিরা-উপশিরাগুলোকে পাকিয়ে পাকিয়ে ধরছে যেন। এই দুদিন খানিকটা ঝলসানো মাংস, একচোঙা রোহি মধু আর একপিণ্ড গলা ভাত ছাড়া পেটে কিছুই পড়ে নি সেঙাইর। হঠাৎ ভ্যানের মধ্যে পিত্ত-বমি করে ভাসিয়ে দিলো সেঙাই। তার পরেই জ্ঞান হারিয়ে ফেললো। এই শিলং পাহাড়, হুস করে ছুটে-যাওয়া আলো-আলো দোকানপসার, পাইনবন তার চৈতন্য থেকে মুছে গেলো।

যখন জ্ঞান ফিরলো, তখন ছায়া-ছায়া ছেঁড়া-ছেঁড়া অন্ধকার। একটা মুখ

তার মুখের কাছে ঝুঁকে রয়েছে। এক পাশে তেলের লণ্ঠন মিটমিট করে জ্বলছে। ঘোর-ঘোর সন্দিগ্ধ চোখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে সেঙাই চমকে উঠলো। উঠে বসতে চাইলো। কিন্তু তার আগেই দু হাতের সস্নেহ চাপে আবার শুয়ে পড়লো সে।

আশ্চর্য! মানুষটা কথা বলছে না। তবু স্ফুটনোন্মুখ মনের সমস্তটুকু বোধ দিয়ে সেঙাই বুঝতে পারলো, এই মানুষটাকে দিয়ে বিপদ-আপদের কোনো সম্ভাবনা নেই। আচ্ছন্ন এবং বিহ্বল দৃষ্টিতে সেঙাই তাকিয়ে রইলো।

দৃষ্টি থেকে ঘোর-ঘোর ভাবটা কেটে গেলো একটু পরেই। সেঙাই দেখলো, মানুষটা তার মত নাগা নয়, সমতলের বাসিন্দা। অথচ তাদের ভাষাটা কী সুন্দর রপ্ত করেছে। মানুষটা বললে, "তুমি নিশ্চয়ই নাগা পাহাড় থেকে এসেছ। কী নাম তোমার?"

"হু-হু, আমি নাগা। কেলুরি বস্তিতে আমাদের ঘর; আমাদের বংশ হলো জোহেরি। আমার নাম সেঙাই।" একটু থেমে সেঙাই আবার বললো, "তুই কে?"

"আমি? আমার নাম বসন্ত সেন।" মুখখানা আরো ঝুঁকিয়ে দিলেন বসন্ত। বললেন, "তুমি বেহুঁশ হয়ে পড়েছিলে। এখন কেমন লাগছে?"

বসন্তর কথার উত্তর দিলো না সেঙাই। ফিসফিস বিস্মিত গলায় বললো, "তুই তো আসান্যু (সমতলের বাসিন্দা); আমাদের পাহাড়ীদের কথা কী করে শিখলি?"

মৃদু, সুন্দর হাসি হেসে বসন্ত বললেন, "অনেকদিন আমি নাগা পাহাড়ে ছিলাম। কোহিমা, ডিমাপুর, মোককচঙ, ওখা, তুয়েন সাঙ—তোমাদের পাহাড়ের সব জায়গায় ঘুরেছি। ঘুরতে ঘুরতে তোমাদের কথা শিখে ফেলেছি।" একটু ছেদ, আবার শুরু হলো, "তুমি এই জেলখানায় এলে কেন?"

"জলখানা কী?"

"যেখানে আটক করে রাখা হয়।"

"আটকে রাখবে কেন?"

"দোষ করলে, কারুকে মারলে-ধরলে, খুনখারাপি করলে, চুরি করলে আটকে রাখে। তুমি কী করেছিলে?"

সেঙাই সোৎসাহে বলতে শুরু করলো, "আমাদের পাহাড়ে একটা রানী

আছে; তার নাম গাইডিলিও। রানী বলতো, নাগা পাহাড়ে সায়েবেরা সদ্দারি করতে এসেছে। আমরা শয়তানদের সদ্দারি মানবো না।"

"ঠিক, ঠিক কথা।"

আগ্রহে চোখ দুটো ঝকমক করতে লাগলো বসন্তর। আরও একটু এগিয়ে ঘন হয়ে বসে বললেন, "তারপর?"

"রানীর কথামত আমরা কাজ করবো, ভাবলাম। সায়েবদের সদ্দারি মানবো না, ফাদারদের নিমক-কাপড় নেবো না, যীশু-মেরী বলবো না, আর ক্রশ আঁকবো না। সায়েবরা রেগে রানীকে খুঁজতে এলো আমাদের বস্তিতে। আমরা রুখতে গেলাম। শয়তানের বাচ্চারা আমাদের বস্তি জ্বালিয়ে দিলো। বন্দুক দিয়ে ফুঁড়লো। তারপর বেঁধে নিয়ে এলো এখানে। এই ছাখ, আমার কী করেছে?" ফুঁসতে ফুঁসতে ডান হাতখানা দেখালো সেঙাই। "আমাদের বস্তির জামাতস্থর পেটে বাচ্চা ছিলো, তাকে পেটে লাথি মেরে শয়তানেরা খতম করেছে। আমার ঠাকুমার বুক ফুঁড়ে সাবার করেছে। মেহেলীকে কেড়ে নিয়ে গেছে।" হাউ-হাউ করে কাঁদতে কাঁদতে বসন্তকে আঁচড়াতে কামড়াতে লাগলো সেঙাই।

পাহাড়ী মানুষের আক্রোশ এবং যন্ত্রণা প্রকাশের রীতি জানতেন বসন্ত। তাই বিচলিত হলেন না। অন্যমনস্ক গলায় বললেন, "মেহেলী কে?"

"আমার পিরীতের জোয়ানী। পনেরো দিন পরে আমার সঙ্গে মেহেলীর বিয়ের কথা ছিলো। রামখোর বাচ্চারা ওকে ছিনিয়ে নিলো।" সেঙাই কাঁদতে লাগলো।

সেঙাইর কান্না বসন্তকে স্পর্শ করেছিলো। কিন্তু তিনি ভাবছিলেন অন্য কথ। শান্ত স্নিগ্ধ মানুষটির প্রাণ টগবগ করে ফুটছিলো। তিনি ভাবছিলেন আসমুদ্রহিমাচল বিশাল বিপুল দেশ, তার আত্মা, মনুষ্যত্ব এবং আকাঙ্ক্ষার মধ্যে স্বাধীনতা নামে যে প্রখর জীবনবোধের জন্ম হয়েছে, তা থেকে এই দেশের একটি মানুষও বিচ্ছিন্ন হয়ে নেই। এই জীবনবোধের স্বপ্নে ও সংঘাতে অরণ্যচারী, গুহাবাসী, আদিবাসী, উপজাতি—প্রতিটি মানুষ প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

বসন্ত ভাবছিলেন, এই জীবনবোধকে গুলি মেরে দাবিয়ে রাখা যাবে না। অন্যায় অবিচার অত্যাচার মুখ বুজে সহ্য করার দিন শেষ হয়েছে। দেশে নতুন চৈতন্য এসেছে, নতুন উপলব্ধির আলো ছড়িয়ে পড়েছে।

জেলখানায় বসে বসে বাইরের খবর ঠিকমত পাওয়া যায় না। যা আসে তা ছাড়া-ছাড়া কাটা-কাটা। সেগুলো থেকে ধারাবাহিক ছবি ধরা যায় না। কল্পনা দিয়ে ফাঁক ভরাট করতে হয়।

অনেক সময় উৎকণ্ঠায় আশঙ্কায় সংশয়ে দৃঢ় কঠোর আশাবাদী মনটা আকীর্ণ হয়ে থাকে। দেশ কি ঠিক পথে চলেছে? কোন মত এবং পথে সিদ্ধি? সন্ত্রাসবাদ না অহিংস সত্যাগ্রহ? নানা চিন্তা নানা জিজ্ঞাসা মনের মধ্যে জটলা পাকায়। এক-এক সময় সন্দেহ জাগলে বড় দুর্বল হয়ে পড়েন বসন্ত। নৈরাশ্য আসে। কিন্তু আজ সেঙাইকে দেখতে দেখতে পূর্ব ভারতের বন্য আদিম জোয়ানটির মধ্যে সমগ্র দেশের আকাঙ্ক্ষার স্পন্দন শুনে আনন্দে উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, "না না, স্বাধীনতা আর ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। অসম্ভব। শয়তানের বাচ্চারা আর কত অত্যাচার করতে পারে আমরা দেশের সমস্ত মানুষ দেখবো।"

সেঙাই বললো, "তুই কী বলছিস? কিছুই যে বুঝতে পারছি না রে ধাড়ী টেফঙ।"

তন্ময় হয়ে নানা কথা ভাবছিলেন বসন্ত। একটু চমকে উঠলেন। উত্তেজনায় বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছিলেন। সেই বিভ্রান্তির পূর্ণ সুযোগ নিয়েছে দ্বিতীয় রিপু। মুহূর্তের জন্য সত্যাগ্রহীর অনুশাসনগুলি ভুলে গিয়েছিলেন বসন্ত; আত্মবিস্মৃত হয়েছিলেন। সত্যাগ্রহের পথ বড় দুর্গম। ছয় রিপু এবং পঞ্চেন্দ্রিয় দমন করে এ পথে হাঁটার অধিকার পাওয়া যায়।

সেঙাইকে দেখে মাত্রাছাড়া বেপরোয়া উত্তেজনা হয়েছিলো। রাগের বশে সত্যাগ্রহীর পক্ষে অশোভন কটূক্তিও করে ফেলেছিলেন। কিন্তু আজ আর সেজন্য বিশেষ অনুশোচনা হচ্ছে না।

পূর্ব সীমান্তে অরণ্যআদিম পাহাড়ী দেশেও যে নতুন জীবনবোধ জেগেছে, সে খবর এনেছে সেঙাই।

অপরিসীম আশায় উত্তেজনায় এবং আনন্দে সমস্ত চৈতন্য ভরে গেলো বসন্তর।

আটচল্লিশ

শিলং শহরের ওপর রাত্রি ঘন হচ্ছে। ছোট্ট সেলের মোটা গরাদের ফাঁক দিয়ে আকাশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন বসন্ত। গাঢ় ধোঁয়ারঙের কুয়াশার স্তরগুলি পাহাড়ের চূড়া ঢেকে রেখেছে। পাইনের পাতায় পাতায় বাতাসের একটানা সোঁ-সোঁ শব্দ বাজছে। আকাশ দেখা যাচ্ছে না। শান্ত, মৌন পাহাড়ী রাত্রি কী নিঃসাড়! কী ভীষণ নিস্তব্ধ!

থেকে থেকে নিঝুম রাত্রির আত্মা বিদীর্ণ করে আর্তনাদ উঠছে। উচ্চ, তীক্ষ্ণ এবং প্রাণফাটা কান্না একটু একটু করে গোঙানির রূপ নিয়ে থেমে আসছে। "ইয়া আল্লাহ্-হ্-হ্—"

পাশের সেলে মুসলমান কয়েদীটা কয়েক রাত্রি ধরে সমানে কাঁদছে। নিজেও ঘুমোয় না, আশে পাশের কারুকে ঘুমোতেও দেয় না। কদিন ধরে কিছু খাচ্ছে না, কারো সঙ্গে কথা বলছে না। সারাদিন উদ্‌ভ্রান্তের মত দূরের পাহাড়মালার দিকে তাকিয়ে বসে থাকে, আর রাত্রি হবার সঙ্গে সঙ্গে পরম-পিতার কাছে মাত্র দুটি শব্দ করে কাঁদে, "ইয়া আল্লাহ্-হ্-হ্—"

দিন-পাঁচেক আগে রায় বেরিয়েছে, জরু হত্যার অপরাধে ফাঁসি হবে লোকটার। দিন-কুড়ি পরেই বুঝি ফাঁসির দিন স্থির হয়েছে।

এখন বুক চাপড়ে কাঁদছে লোকটা। হতভাগাটা বোধ হয় পাগল হয়ে যাবে।

বসন্ত ভাবছিলেন। নানা চিন্তা, অসংখ্য ঘটনা মনের মধ্যে একাকার হয়ে, বলা যায়, হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ছে। ক রাত ধরেই তাঁর সমানে মনে হচ্ছে, জীবন এবং মৃত্যুর কী দুর্বিষহ যন্ত্রণাই না লোকটার মধ্যে দাপাদাপি করে বেড়াচ্ছে।

হঠাৎ কান্না থামিয়ে দিলো লোকটা।

অনেকক্ষণ পর বসন্তর ভাবনা একটি খাত বেয়ে ছুটলো। নিজের জীবনের কথা মনে পড়লো। কত বার যে পাশের সেলের কয়েদীটার মত জীবন এবং

মৃত্যুর সীমান্তে তাঁকে দাঁড়াতে হয়েছে, বাঁচার প্রবল আকাঙ্ক্ষা এবং মৃত্যুর হিম হতাশায় উন্মাদ হতে হয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই।

প্রতি মুহূর্তে মত-পথ-বিশ্বাস-আস্থা হারানো এবং প্রাপ্তির মধ্যে জন্ম ও মৃত্যু, পুনর্জন্ম এবং পুনরায় বিনাশ ঘটছে। জন্মমৃত্যুই বোধ হয় জীবনের আদিম ও প্রধান নিয়ামক। জীবনে জন্মের পর মৃত্যুর মত এত বৃহৎ দান আর নেই। জীবনকে খতিয়ে যাচাই করে নেবার জন্য অনাস্থা অবিশ্বাস অস্বীকৃতি এই সব অভাবমূলক শক্তিগুলি আপনা থেকেই মানুষের মধ্যে কাজ করে। অনাস্থা অবিশ্বাস আছে বলেই তো আস্থা এবং বিশ্বাস এত সুস্বাদু।

নিরবধি কাল ধরে জীবজগতে কত বিনাশ এবং সৃষ্টিই না হয়েছে। সৃষ্টির সঙ্গে বিনাশ যেমন অবিচ্ছিন্ন, বিনাশের সঙ্গে সৃষ্টিও তেমনি গাঁথা রয়েছে। এই সৃজন ও ধ্বংসশীল পৃথিবীতে পশু-পাখি-মানুষ-তৃণ-গুল্ম, অখণ্ড জীবজগৎ একটি অপরিহার্য নিয়মে এগিয়ে চলেছে। সেই নিয়মটি বিবর্তনের নিয়ম। জন্মমৃত্যু আছে বলেই এই বিবর্তন। আর এই বিবর্তন আছে বলেই পশু-পাখি-মানুষ, জীবনের খণ্ড খণ্ড প্রকাশগুলির মধ্যে এত বিস্ময় এবং বৈচিত্র্য।

বসন্ত ভাবছিলেন।

পাঁচ হাত লম্বা সাড়ে তিন হাত চওড়া ছোট্ট সেলের মধ্যে ওঠা বসা ছাড়া অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সঞ্চালনের উপায় নেই। এক পা এগুলেই পায়ের নীচে জমি ফুরিয়ে যায়। দেওয়ালে কপাল ঠোকে। বসে বসে ভাবনা ছাড়া, মনকে অস্বাভাবিক সক্রিয় এবং সঞ্চালিত করা ছাড়া কোন কাজ নেই।

তাই বসন্ত ভাবেন। হঠাৎ একটি ঘটনার কথা মনে পড়লো।

বছর তিনেক আগের ঘটনা। সন্ত্রাসবাদে তখন অসীম আস্থা বসন্তর। রক্তক্ষয় ছাড়া স্বাধীনতা অসম্ভব।

সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে কাটিহারে গিয়েছিলেন বসন্ত। কিষেণগঞ্জ থেকে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট বেরিয়েছেন সফরে। পথে কাটিহার স্টেশন পড়বে।

স্টেশন থেকে খানিকটা দূরে বাঁশবনে নিশ্বাস চেপে বসেছিলেন বসন্ত; পাশে দশজন সঙ্গী। হাতে হাত-বোমা।

নিঝুম ঘুটঘুটে রাত। পাল্লা দিয়ে ঝিঁঝিরা কাঁদছে। কোথায় ব্যাঙ ডাকলো। টিপটিপ বৃষ্টি পড়ছে। নীল নীল জোনাকি জ্বলছে নিবছে, নিবছে জ্বলছে। কোথা থেকে হঠাৎ দমকা বাতাস হুড়মুড় করে ভেঙে

পড়লো বাঁশবনে। মটমট শব্দ হলো। এগারোটি রুদ্ধশ্বাস মানুষ চমকে উঠলো।

ট্রেনটা স্টেশন থেকে বেরিয়ে এলো। লেভেল ক্রসিং পেরিয়ে একচক্ষু সিগন্যাল পোস্টটা পেছনে ফেলে বাঁশঝোপের কাছাকাছি এসে পড়লো।

মনে আছে, প্রচণ্ড উত্তেজনায় মেরুদণ্ডটা হঠাৎ টান-টান হয়ে গেলো। হৃৎপিণ্ডটা শব্দ করে থেমে গেলো। হাত থেকে নিজের অজান্তে বোমাটা ছুটে গিয়েছিলো। একটা ভয়ঙ্কর শব্দ, তারপর পর পর দশটা শব্দ। চক্ষের পলকে তাণ্ডব ঘটে গেলো। আর্তনাদ, চিৎকার, ঘস্-স্-স্ করে ট্রেন থামার শব্দ। তারপর কী হয়েছিলো, মনে নাই। শূন্য বালিয়াড়ির মধ্য দিয়ে ছুটতে ছুটতে মনে হয়েছিলো, একটা অস্বাভাবিক আতঙ্ক অন্ধকারে বিরাট রোমশ হাত বাড়িয়ে পিছু-পিছু ছুটে আসছে।

পরের দিন খবরের কাগজে বসন্ত পড়েছিলেন, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মারা যান নি। দেহাতী কয়েকটি শিশু এবং নারী হতাহত হয়েছে।

চারদিকে পুলিসের খানাতল্লাস শুরু হলো। হন্যে হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে পুলিস। আসামী ধরবেই।

বেগতিক দেখে দাদারা পাঞ্জাবে শারোয়ান সিংয়ের আস্তানায় চলে যেতে বললেন। এক বছর পাঞ্জাবে লুকিয়ে ছিলেন বসন্ত।

এই এক বছরের প্রতিটি মুহূর্ত তিলে তিলে মৃত্যুর যন্ত্রণা ভোগ করেছেন। নিরীহ শিশু এবং নারীদের হত্যাকারী হিসাবে মনে হয়েছে নিজেকে। অস্বস্তিকর এক অনুভূতি সব সময় তাঁকে তাড়না করতো। পাশের মুসলমান কয়েদীটির মত কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। কেমন এক আতঙ্ক সব সময় শ্বাসনালীটাকে চেপে ধরে থাকতো। পৃথিবীতে এত বাতাস, তবু মনে হতো, নিশ্বাস নেবার মত পর্যাপ্ত নয়। এত অফুরন্ত আলো, তবু মনে হতো, সব অন্ধকার, আচ্ছন্ন। রাত্রে চোখ দুটো ঘুমে বুঁজে এলেই শিশু এবং নারীর আর্তনাদ শুরু হতো। চিৎকার করে লাফিয়ে উঠে বসতেন বসন্ত। অসহ্য, অসহ্য!

আত্মপীড়নের মাত্রাটা যখন চরমে উঠতো, তখন নিজের রায় নিজেই ঠিক করে ফেলতেন বসন্ত। হ্যাঁ, ফাঁসিই হওয়া উচিত তাঁর। এক-একসময় মনে হতো, পুলিসের হাতে ধরা দিয়ে যন্ত্রণার হাত থেকে রেহাই পাবেন।

এমনি করে সন্ত্রাসবাদে বিশ্বাসী মনটা একদিন মরে গেলো। নতুন ভাবনার

পুঞ্জ-পুঞ্জ আলো এসে পড়লো। মেল ডাকাতি, দু-একটা খুনখারাপি কিংবা খণ্ড-খণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি করে দেশের এবং দেশের মানুষের কোন মৌলিক পরিবর্তন করা সম্ভব নয়। তা ছাড়া এই সন্ত্রাসবাদের মধ্যে পরোক্ষভাবে জড়িয়ে রয়েছে ভীতি এবং আতঙ্ক। পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে হয় সন্ত্রাসবাদীকে। আত্মগোপন করতে হয়। নিজের অজান্তেই বোমা-পিস্তলের রোমান্সের সঙ্গে মনের মধ্যে অপরাধবোধ লুকিয়ে থাকে। রোমান্সের জলুস নিবলে অপরাধবোধ মাথা চাড়া দেয়। তখন অবস্থা মারাত্মক হয়ে ওঠে। বসন্ত ভাবলেন, এ পথে উদ্দেশ্যে পৌছান সম্ভব হবে না।

দ্বিধায় যখন মন দুলছিলো, তখন পায়ের সামনে আর-একটা পথ পাওয়া গেলো। সে পথ অহিংস সত্যাগ্রহের। অসহযোগের। সত্যাগ্রহ করেই এক বছর শিলং জেলে আটক রয়েছেন বসন্ত। এ পথে অপরাধীর মত লুকিয়ে-চুরিয়ে বেড়াতে হয় না। সগৌরবে মাথা উঁচু করে চলা যায়।

সত্যাগ্রহে দীক্ষা নিয়ে নতুন জন্মলাভ হয়েছিলো বসন্তর।

আজকের অনেক পরিণত বসন্ত সেন ভাবেন, দেহই শুধু বাঁচন এবং মরণশীল নয়, মনও।

নিজের মনের আর একটি মৃত্যুর কথা মনে পড়লো বসন্তর। সেই খাসিয়া যুবতীটির কথা ভাবতে বসলে অন্তরাত্মাটা থরথর করে কাঁপতে থাকে। পাপবোধে সমস্ত সত্তা কালো হয়ে যায়। সেই খাসিয়া যুবতীর সঙ্গে তাঁর মেয়ে, হ্যাঁ মেয়েই তো, লী'কে মনে পড়ে। বুকের মধ্যে এক অদ্ভুত যন্ত্রণা মোচড় দেয়। নিশ্বাস নিতে কষ্ট হয়।

আচমকা পাশের সেলে সেই গোঙানি শোনা গেলো, "হা আল্লাহ্-হ্-হ্—

এবার গলার আওয়াজ তেমন উচ্চ কিংবা তীক্ষ্ণ নয়। কেমন যেন নির্জীব। বোধ হয়, হতাশার শেষ সীমায় এসে পড়েছে লোকটা।

কম্বল মুড়ি দিয়ে সেঙাই শুয়েছিলো। মুখ বাড়িয়ে বললো, "কে কাঁদে রে?

বসন্ত জবাব দিলেন না। চুপচাপ বসে রইলেন।

উনপঞ্চাশ

চুপচাপ শুয়ে ছিল সেঙাই। ঘুম আসছে না।

শিলং পাহাড়ে আসার পর দুটো দিন পার হয়ে গেলো। এই দুদিনে আদিম বুনো মনের বয়স যেন হঠাৎ অনেক বেড়ে গিয়েছে। কাল সমস্ত দিন চেঁচামেচি করেছে সেঙাই, কেঁদেছে, নিরুপায় আক্রোশে অশ্রাব্য গালাগালি করছে, নিজের চুল মুঠো-মুঠো ছিঁড়ে ফেলেছে, খিমচে কামড়ে বসন্তকে ক্ষত বিক্ষত করেছে। কিন্তু আজ একেবারে চুপচাপ, নিঝুম হয়ে পড়ে রয়েছে।

সেঙাই ভাবছে। তার ভাবনাটা সোজা সহজ খাতে বইছে না। চিন্তা-গুলোও শৃঙ্খলাবদ্ধ নয়। সেঙাইর ভাবনাগুলোকে গোছগাছ করে নিলে মোটামুটি এরকম দাঁড়ায়।

কোথায়, কতদূরে ছয় আকাশ ছয় পাহাড়ের ওপারে তাদের ছোট্ট গ্রাম কেলুরি পড়ে রইলো। তাদের জোহেরি কেসুঙ, আঁকাবাঁকা টিজু নদী, পাহাড়-প্রপাত-মালভূমি, চড়াই এবং উতরাই, সেই অরণ্য আদিম জীবজগৎ ; সেখানে কি আর কোন দিনই ফিরে যাওয়া যাবে? শত্রুপক্ষের জোয়ানী মেহেলীকে কি কোনদিন বিয়ে করা সম্ভব হবে? নানকোয়া গ্রামের বাঘমানুষ মেজিচিজুঙের সঙ্গে হয়তো এই সাঙসু ঋতুর রাত্রিতে মেহেলীর বিয়ে হচ্ছে। হয়তো সালুয়ালাঙ এবং নানকোয়া বস্তির শয়তানগুলো বিয়ের উৎসবে বাঁশের চোঙা ভরে আকণ্ঠ রোহি মধু গিলে, সাদা শুয়োরের মাংস চিবুতে চিবুতে হল্লা করছে। নাচ-গান-বাজনা এবং হল্লায় সালুয়ালাঙ গ্রামটা মেতে উঠেছে। অসহ্য, অসহ্য। বুকের মধ্যে রাগ এবং যন্ত্রণা মোচড় দিতে থাকে।

মেহেলীর কথা ভাবতে ভাবতে ভাবনাটা হঠাৎ অন্য দিকে ঘুরে গেলো। সেঙাই ভাবতে লাগলো, তাদের ছোট্ট গ্রামটাকে ভেঙেচুরে তছনছ করে দিয়েছে সাহেবরা। ঘরে ঘরে আগুন দিয়েছে। জোয়ানদের বন্দুক দিয়ে খতম করেছে। গর্ভিণী জামাতসুকে পেটে লাথি মেরে সাবাড় করেছে। বুড়ী বেঙসানুকে বুকে গুলি মেরে শেষ করেছে। কেলুরি গ্রামের, তাদের কত বড় বনেদী বংশের ইজ্জত নষ্ট করেছে। নানকোয়া এবং সালুয়ালাঙ বস্তির

জোয়ানরা মেহেলীকে ছিনিয়ে নিয়ে গিয়েছে। ভাবতে ভাবতে ফুঁসতে লাগলো সেঙাই। চোখের তারাদুটো জলতে লাগলো। না না, কারুকে সে রেহাই দেবে না।

ছোট্ট সেল। একপাশে টিমটিমে তেলের লণ্ঠন।

ওধারে গরাদের পাশে বসেছিলেন বসন্ত। এতক্ষণ জন্মমৃত্যু, জীবনের বিবর্তন, নানা বিষয়ে ভাবছিলেন। তার দৃষ্টি সেঙাইর ওপর এসে পড়লো। অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলেন বসন্ত। সেঙাই আসার পর থেকেই একটা নতুন ভাবনা অস্পষ্টভাবে মনের মধ্যে উঁকি মারছিলো। এই মুহূর্তে, হঠাৎ সেই ভাবনাটা অত্যন্ত স্পষ্ট হলো ; রাশি রাশি আলোক-কণিকার মত সমস্ত মনের ওপর ছড়িয়ে পড়লো।

বসন্ত ভাবলেন, আসমুদ্রহিমাচল এই বিশাল বিস্তীর্ণ ভারতবর্ষ ; কোটি কোটি মানুষ ; এই দেশের মানবতার আত্মা স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষায় জলছে। সমতলের, শহর-বন্দরের সুসভ্য মানুষই কেবল নয়, অরণ্যচারী এবং পাহাড়ী আদিবাসীরাও নতুন জীবনবোধের স্বপ্নে উন্মুখ হয়ে উঠেছে। এদের শিক্ষাদীক্ষা নেই, সুশৃঙ্খল নেতৃত্ব নেই, শুধু মাত্র অফুরন্ত প্রাণাবেগ এবং উন্মাদনা সম্বল করে স্বাধীনতার লড়াইতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। স্বাধীনতা সম্বন্ধে এদের অধিকাংশেরই হয়তো সুস্পষ্ট ধারণা পর্যন্ত নেই।

বসন্ত ভাবতে লাগলেন, সেঙাইকে শিক্ষাদীক্ষা এবং দেশকাল সম্পর্কে প্রয়োজনীয় ধারণা দেওয়া একান্ত উচিত। অফুরন্ত প্রাণাবেগের সঙ্গে শিক্ষা-দীক্ষা-জ্ঞানের মিলন ঘটলে এই সব আদিম মানুষগুলো দেশকে নতুন শক্তি দেবে।

বসন্ত স্থির সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছলেন, সেঙাই নামে ভারত সীমান্তের এক খণ্ড পাথরে তিনি অপরূপ ভাস্কর্য রচনা করবেন।

স্তব্ধ নির্নিমেষ চোখে তাকিয়ে রয়েছেন বসন্ত। লণ্ঠনের টিমটিমে আলোতে তাঁকে ধাতুমূর্তির মত দেখাচ্ছে।

পঞ্চাশ

ভোর রাত্রির দিকে সেলের তালা খোলার শব্দ শোনা গেলো। বসন্তর তন্দ্রামত এসেছিলো। কম্বলের মধ্যে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়েছিলো সেঙাই। ঘুম আসে নি।

দরজাটা খুলে গেলো। নিমেষের মধ্যে একটা ভারী দেহ ছিটকে এসে পড়লো সেঙাইর ওপর। বাইরে থেকে সিপাইরা ঠেলে ঢুকিয়ে দিয়েছে। তার পরেই আবার দরজাটা বন্ধ হয়ে গেলো।

সেঙাই চিৎকার করে উঠলো, "ইজা হুবুতা! আমার ঘাড়ে এসে পড়েছিস শয়তানের বাচ্চা! একেবারে জানে লোপাট করে দেবো। বর্শা দিয়ে ফুঁড়ে ফেলবো।"

মানুষটা জবাব দিল না। চুপচাপ পড়ে রইলো।

ডান হাতের জখমী কবজিটা যন্ত্রণায় টাটিয়ে উঠলো। কাতরাতে কাতরাতে এক পাশে সরে বাঁ হাত দিয়ে লোকটার গলা খিমচে ধরলো সেঙাই। সঙ্গে সঙ্গে আর্তনাদ শোনা গেলো, "আঃ-আঃ-আঃ—"

সেঙাইর চেঁচামেচিতে ধড়মড় করে উঠে বসেছিলেন বসন্ত। হামাগুড়ি দিয়ে লণ্ঠন হাতে সামনে এগিয়ে এলেন।

লোকটার মুখে আলো পড়তেই সেঙাই চমকে উঠলো। শেষ রাত্রির সঙ্কীর্ণ নিস্তব্ধ সেলটাকে শিউরে দিয়ে চিৎকার করে উঠলো, "তুই, তুই মাধোলাল। এই মাধোলাল, তোর কী হয়েছে? শয়তানের বাচ্চা, কথা বলছিস না কেন?"

সেঙাইর স্ফুটনোন্মুখ মনের ওপর কতকগুলো ছায়া নড়াচড়া করতে লাগলো। কোহিমা শহর থেকে ডিমাপুরগামী সেই আঁকাবাঁকা সড়ক, তার পাশে সমতলের বেনিয়াদের বাজার, তেল-লবণ-চাল, মোষের শিঙ, বাঘ-হরিণের ছাল, নানা রঙের নানা আকারের মনোহারী জিনিসের লোভানি; তার মধ্যে বাঁশের মাচানে বসে থাকতো মাধোলাল। রানী গাইডিলিওর গল্প

বলতো, সমতল দেশের গল্প, গান্ধীজী নামে একটি মানুষের আজব কাহিনী বলতো।

সেই মাধোলাল! তাজ্জবের ব্যাপার! শিলং শহরের জেলখানায় তার সঙ্গে যে দেখা হবে, এ কথা কি জানতো সেঙাই? না, কস্মিন্‌কালে ভেবেছিলো?

সেঙাই আবার ডাকলো, "এই মাধোলাল, শোন না, আমার দিকে তাকা।"

নির্জীব গলায় মাধোলাল আর্তনাদ করলো, "আঃ-আঃ-আঃ—"

হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে উঠলো সেঙাই, "তুই তো এখানে আঃ-আঃ করছিস! কোহিমায় তোর দোকানটা যে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে রামখোর বাচ্চারা। শুনলি রে শয়তান, তোর দোকানে কিছু নেই। সব লোপাট করে দিয়েছে।"

চোখের পাতা দুটো অতি কষ্টে মেললো মাধোলাল। রক্তাভ, ঘোর-ঘোর চোখ। জড়ানো বিকৃত গলায় বললো, "কে? কখন এলি? আয় বাপ বুধোলাল—"

দাঁতমুখ খিঁচিয়ে সেঙাই গর্জে উঠলো, "আহে ভু টেলো! আমাকে চিনতে পারছিস না রে ধাড়ী টেফঙ! আমি তো সেঙাই। সারুয়ামারুর সঙ্গে তোর দোকানে গিয়েছিলাম। তুই রানী গাইডিলিওর গল্প বলেছিলি। আসান্যুদের (সমতলের বাসিন্দা) সদ্দার গান্ধীজীর গল্প বলেছিলি। মনে পড়ছে না তোর! ইজা হুবুঙ তা!"

চোখের পাতা দুটো ভারী হয়ে বুঁজে আসছে। কোনক্রমে অর্ধেক চোখ মেলে তাকালো মাধোলাল। অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলো। তারপর ভাঙা অস্পষ্ট গলায় নাগা ভাষায় বলতে লাগলো, "বড় দরদ হচ্ছে। সায়েবরা মাজায় বন্দুকের গুলি করেছিলো। দাওয়াই দেয় নি। আঃ-আঃ-আঃ—"

শেষ পর্যন্ত কথা শোনা গেলো না। একটানা গোঙানি শুরু হলো।

এতকাল নাগা পাহাড়ে কাটিয়েছে। আজমীড় কি মারোয়াড়ের সেই দেহাতী গ্রাম এবং ভাষাটা প্রায় ভুলেই গিয়েছে মাধোলাল; নাগা ভাষাতেই সে কথা বলে।

সেঙাই চেঁচিয়ে উঠলো, "সায়েবরা তোকে ফুঁড়েছে। রামখোর বাচ্চারা আমাদেরও ফুঁড়েছে। ওদের সব কটাকে খতম করবো।" বলতে বলতে মাধোলালকে জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে কাঁদতে লাগলো।

একটু পর মাধোলালকে ছেড়ে বসন্তর দিকে তাকালো সেঙাই। বললো,

"তুই যে তোকে মাধোলালের কথা বলেছিলাম, এই যে সেই মাধোলাল। সায়েব শয়তানরা ওকে ফুঁড়েছে।"

"বুঝেছি।" লণ্ঠনটা নিয়ে মাধোলালের ওপর ঝুঁকে পড়লেন বসন্ত। তলপেট কোমর, এমন কি উরু পর্যন্ত অস্বাভাবিক ফুলে রয়েছে। কোমরের কাছে একটা ক্ষতমুখ। লালচে থকথকে রস গড়িয়ে আসছে। পাটকিলে রঙের পচা মাংস থেকে দুর্গন্ধ বেরুচ্ছে। দেখতে দেখতে শিউরে উঠলেন বসন্ত। আতঙ্কে চোখ দুটো বুঁজে এলো তাঁর। গ্যাংগ্রীন্। কী বীভৎস! কী ভয়ানক!

সেঙাইও দেখছিলো। মাধোলালের কোমরে ক্ষত দেখতে দেখতে অনেক দিন আগে সালুয়ালাঙ গ্রামের খোন্কের কথা মনে পড়লো। সেদিন খোন্কের বুকে বিরাট ক্ষত দেখে হিংস্র উল্লাসে মনটা ভরে গিয়েছিলো সেঙাইর। কিন্তু এই মুহূর্তে মাধোলালের আঘাত দেখতে দেখতে কী এক দুর্বোধ্য এবং অসহ্য বেদনায় শিরাস্নায়ুগুলো পাকিয়ে পাকিয়ে ছিঁড়ে পড়তে লাগলো। হৃৎপিণ্ডটাকে দলে-মুচড়ে তীব্র অদম্য কান্নার বেগ গলার মধ্য দিয়ে ছুটে আসতে চাইলো।

বিড়বিড় করে মাধোলাল বললো, "সায়েবরা আমার দোকানটা ভেঙে দিলে। আমি তো কোন দোষ করিনি। খালি রানী গাইডিলিও আর গান্ধীজীর গল্প বলেছি পাহাড়ীদের কাছে। বুঝলি বুধোলাল, বাপ আমার, খবদ্দার তুই পাহাড়ে যাবি না। নাগা পাহাড়ে পাপ ঢুকেছে। সীয়ারাম, সীয়ারাম। আঃ-আঃ-আঃ—"

গোঙাতে গোঙাতে থেমে গেলো মাধোলাল। ঠোঁট দুটো একটু একটু নড়লো; মুখটা হাঁ হয়ে রইলো। কোটরের মধ্যে চোখ দুটো বুঁজে রয়েছে। এক সময় সমস্ত শরীরটা নিস্পন্দ হয়ে গেলো।

বাঁ হাত দিয়ে মাধোলালের কাঁধে ঝাঁকানি দিলো সেঙাই। বললো, "শোন মাধোলাল, তোর কথামত আমি কাজ করেছি। সায়েবদের সঙ্গে আমাদের বস্তির লড়াই হয়েছে। রানীর খোঁজে শয়তানরা গিয়েছিল আমাদের বস্তিতে। আমি তাদের মারিনি। তুই বারণ করেছিলি। ওরাই আমাদের বন্দুক দিয়ে ফুঁড়েছে, ঘরে ঘরে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে। অনেক সয়ে সয়ে কোহিমার বড় ফাদারকে বর্শা হাঁকড়েছিলাম। কী করবো বল, ঠাকুমাকে জামাতসুকে সাবাড় করলো ওরা। মেজাজটা বিগড়ে গেল কি না!"

মাধোলাল জবাব দিলো না। তেমনি নিথর হয়েই পড়ে রইলো।

বসন্ত বললেন, "মাধোলাল বুঝি কোহিমাতে অনেক দিন ছিলো?"

"হু-হু, অনেকদিন। আমি মাস কয়েক আগে ওকে দেখেছি। আমাদের বস্তির সারুয়ামারু, বুড়ো নড্রিলো, আমার বাপ সিজিটো—সবাই ওর দোকান থেকে নিমক নিতো। মজাদার গল্প বলতো মাধোলাল। কথা শেষ হলেই বলতো, সীয়ারাম সীয়ারাম। তাই না রে মাধোলাল?" বলতে বলতে মাধোলালকে ঠেলা মারলো সেঙাই।

মাধোলালের গায়ে হাত পড়তেই সেঙাই চমকে উঠলো। দেহটা ভীষণ ঠাণ্ডা, হিমাক্ত। সেবার সালুয়ালাঙ গ্রামের খাদে পড়ে গিয়েছিলো সেঙাই। জা কুলি মাসের তুষারঝরা রাত। অসহ্য হিমে শরীরটা কুঁকড়ে ঠাণ্ডা হয়ে গিয়েছিলো। জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলো সেঙাই। মেহেলী না বাঁচালে খাদের মধ্যে মরে থাকতে হতো। সেই সাঙ্ঘাতিক রাত্রিতে হিমাক্ত দেহে মৃত্যুর লক্ষণ বুঝতে পেরেছিলো সেঙাই। মরে গেলে কিংবা মরতে বসলে মানুষের দেহ বরফের মত ঠাণ্ডা হয়ে যায়।

অপরিসীম আতঙ্কে সেঙাই চিৎকার করে উঠলো, "হ্যাখ হ্যাখ, মাধোলালটা কেমন ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছে।"

"ঠাণ্ডা মেরে গিয়েছে!" গলাটা কেঁপে গেলো বসন্তর। একবার মাধোলালের গায়ে হাত দিলেন। তারপর তড়িৎগতিতে হাতখানা তার নাকের সামনে আনলেন। অনেকক্ষণ পর সন্দেহ ঘুচলো। নাঃ, নিশ্বাস পড়ছে না।

মাথাটা নীচের দিকে ঝুলিয়ে ভগ্ন, দুর্বল গলায় বসন্ত বললেন, "মাধোলাল নেই।"

"নেই! এই তো রয়েছে মাধোলাল। আহে ভু টেলো!" কদর্য মুখভঙ্গি করলো সেঙাই।

"মাধোলাল মরে গিয়েছে।"

"মরে গিয়েছে!"

নির্নিমেষ, বিমূঢ় চোখে কিছুক্ষণ মাধোলালের দেহটার দিকে তাকিয়ে রইলো সেঙাই। তারপর হঠাৎ একটা প্রবল কান্নার তোড় বুকটাকে চুরমার করে গলাটাকে ফাটিয়ে হু-হু করে বেরিয়ে পড়লো। মাধোলালের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লো সেঙাই। ফুলে ফুলে কেঁপে কেঁপে কাঁদতে লাগলো। তার চোখ থেকে নোনা জল ঝরে ঝরে মাধোলালের মুখে মাখামাখি হতে লাগলো।

সেঙাইর মাথার ওপর হাত রাখলেন বসন্ত।

কোহিমা পাহাড়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে, এমন কি নিজের অজান্তে সেঙাইকে এক নতুন জীবনের কথা শোনবার ভার নিয়েছিলো মাধোলাল। সেই মাধোলাল আজ মারা গেলো। সেঙাইর জীবনে তার ভূমিকা শেষ হলো।

শিলং পাহাড়ে সেঙাইকে আর এক ব্যাপক, বিপুল এবং মার্জিত জীবনের শিক্ষাদীক্ষা দেবার দায়িত্ব সজ্ঞানে নিয়েছেন বসন্ত। মাধোলালের কাছ থেকে বসন্তর কাছে এই দায়িত্ব হস্তান্তর সেঙাইর সম্পূর্ণ অগোচরেই ঘটলো।

হাউ-হাউ শব্দ করে সেঙাই কাঁদছে। চুল ছিঁড়ছে। মাধোলালের দেহটাকে আঁচড়াচ্ছে, কামড়াচ্ছে।

সেঙাই! সে বন্য এবং হিংস্র। হত্যা কিংবা মৃত্যু তার কাছে বিচলিত হবার মত ঘটনাই নয়। জীবনের সব রকম ভীষণতায় সে অভ্যস্ত। তবু মাধোলালের মৃত্যুতে সে কাঁদছে। লালসা, প্রতিহিংসা, আক্রোশ, কাম, তীব্র রতিবোধ—আদিম মানুষের উগ্র প্রবণতাগুলো এই মুহূর্তে তার মন থেকে মুছে গিয়েছে। একটি সুকুমার বৃত্তি তার স্ফুটনোন্মুখ চৈতন্যকে ভরে রেখেছে। সেটি হলো মমতা, এবং মমতার সঙ্গে অপরিসীম বেদনা।

বাইরে গাঢ় কুয়াশা জমেছে। পাহাড়ী চক্ররেখা ঘিরে সেই কুয়াশা স্তরে স্তরে তুলোর মত ঝুলছে।

সেঙাইর মনে বেদনা ও মমতার জন্ম হলো।

সেঙাইর আদিম জীবন শেষ হলো।

॥ সমাপ্ত ॥